স্বর্গীয়

নবাব নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি, আই, ই

সপ্তদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩৬। | তৃতীয় সংখ্যা।

রামায়ণী যুগের ভাষা

(স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার।)

রামায়ণী যুগের পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে দেবভাষা ও মনুষ্য-ভাষা প্রচলিত ছিল। বেদগুলি দুরূহ দেবভাষায় রচিত ছিল। এই দেবভাষাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্র * উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে চারি প্রকারের ভাষা ব্যবহৃত হইত। ইহার তিন প্রকার ভাষা সাধারণের অবোধ্য দেব-ভাষা এবং চতুর্থ প্রচলিত মানুষ-ভাষা। সায়নের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, ত্রিবিধ দুরূহ ভাষায় বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম মন্ত্রের ভাষা, দ্বিতীয় কল্পের ভাষা ও তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষা। চতুর্থ ভাষা প্রচলিত লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা বলেন ঋক্ যজু ও সামের ভাষা পৃথক পৃথক তিন প্রকার, চতুর্থ ভাষা লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা যাজ্ঞিক-প্রদর্শিত কল্প ও ব্রাহ্মণকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন।

নিরুক্ত পরিশিষ্ট-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তী যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যানাং। ১।৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন।

এই উক্তি বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার সময়ে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কেন না রামায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। †

* চত্বারি বাক্ পরিমতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নেহিতা নেং গয়ন্তি তুরিয়ং বাচঃ মনুষ্যা বদন্তি। ১।১৬৪।৪৫

† ব্যহোহশ্বমেধ সখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোম ম মহস্তস্ত প্রথমং পরিকল্পিতম্। আদি। ১৪।৪০

রামায়ণের সময় দুরূহ দেবভাষার প্রচলন উঠিয়া গিয়া রামায়ণী বিশুদ্ধ ও সহজ সংস্কৃতের প্রচলন হয় এবং এই বিশুদ্ধ সরল ভাষায় রামায়ণের শ্লোকরচনা হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও নাগরিক এবং স্ত্রীলোকেরা মিশ্রভাষায় কথোপকথন করিতেন আমরা রামায়ণের আলোচনার দ্বারা এই বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আরণ্যকাণ্ডের ১১শ সর্গে ইল্বল-বাতাপি উপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে :—

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥

ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক সংস্কৃতে কথা বলিয়া শ্রাদ্ধের ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করিত।

তখন অনার্য্যদিগের মধ্যে পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই পৈশাচী ভাষা অনার্য্যভাষা নামে অভি-হিত হইত।* এই পৈশাচী বা অনার্য্যভাষার লক্ষণ

*ডাক্তার মুইর তাঁহার Original Sanskrit Texts &c- নামক গ্রন্থে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কোন্ কোন্ স্থান পিশাচ দেশ অন্তর্গত ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। শ্লোকাংশ এইরূপঃ—
পাণ্ড-কেকয়-বাহ্লীক-সহ্য-নেপাল-কুণ্ডলা।
সুধেশ ভোট-গান্ধার-হৈব-কনোজনা তথা॥
এতে পিশাচ দেশাঃ স্যুস্তদ্দেশ্যস্তদ্গুণো ভবেৎ। Vol. 11. P. 48

Dr. W. W. Hunter বলেন "Paishachi loosely applied to out-lying Non- Aryan dialects from Nepal to Cape Comorin—(Indian Empire, P. 337)

যে সকল স্থানে অনার্য্যবসতি ছিল এই উভয় উক্তি সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানকে লক্ষ্য করিতেছে।

কি রামায়ণে তাহার আভাস পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, অনার্য্যগণের এই পৈশাচী ভাষার ব্যবহার করিলে ইম্বল অনার্য্য প্রতিপন্ন হইবে এবং অনার্য্য ভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার কথায় মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, ইহা চিন্তা করিয়াই সে ব্রাহ্মণ সাজিয়া সংস্কৃত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোহিত ও স্বকার্য্য সাধিত করিত।

অন্যত্র হনুমান্ অশোকবনে সীতাকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন "এখন কি ভাষায় সীতার সহিত আলাপ করিতে হইবে।" তাঁহার চিন্তা হইল :—

যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ সুন্দরা ৩০।১৮

যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃতে কথা বলি, তবে আমাকে নিশ্চয় মায়ারূপী রাবণ বলিয়া সীতা ভীতা হইবেন। সুতরাং অনেক চিন্তার পর হনুমান্ স্থির করিলেন : —

বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং॥ সুন্দরা। ৩০।১৭

মানুষী সংস্কৃতে সীতার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে।

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে পূর্ব্বোউদ্ধৃত নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যের সমর্থন দ্বারা যে আমরা দেবভাষা ও মনুষ্য ভাষার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যে যাহাকে দেবভাষা বলা হইয়াছে রামায়ণে তাহাকেই ব্রাহ্মণকথিত সংস্কৃত ভাষা বলা হইয়াছে। নিরুক্তের মানুষভাষা রামায়ণেও মানুষভাষা নামেই পরিচিত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

এখন এই মানুষ ভাষা কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা হনুমানকে লাঙ্গুলধারী মর্কট বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা বলিবেন, সীতা বানরের কথা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া হনুমান্ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে সংকল্প করিয়াছিল। এইরূপ কল্পনা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া আমরা প্রথমেই নিরুক্ত পরিশিষ্ট ভাষ্যের মত উদ্ধৃত করিয়া দেবভাষার ও মনুষ্যভাষার প্রচলন দেখাইয়া আসিয়াছি।

সাধারণের কথিত ভাষাই মানুষভাষা। এই মানুষভাষা ও প্রাকৃত ভাষা এক। অনেক প্রাকৃত ভাষাকে বৌদ্ধ পালি ভাষার সহিত অভিন্ন মনে করেন। কেহ বা মহারাষ্ট্রী শূরসেনী প্রভৃতি ভাষকে প্রাকৃত বলেন। রামায়ণে মিশ্র ভাষার উল্লেখ আছে। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষাকেই সেই মিশ্রভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবার প্রাকৃত ভাষাকে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। *

মহারাষ্ট্রী ও পালী প্রভৃতি ভাষা যে প্রাকৃত ভাষারই রূপান্তর তাহা বলাই বাহুল্য।

রামের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।" ২৭

অর্থাৎ মিশ্রভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মিশ্র-ভাষায় নাটক ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র রচিত হইতে পারে না। কেননা, নাটকে যে প্রকৃতির লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে তাহাকে সেই ভাষাতেই কথা বলাইতে হইবে—"রাম প্রাকৃতাদি ভাষা সমন্বিত নাট্য শাস্ত্রাদিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ‡ আমাদের বিশ্বাস এই মিশ্র ভাষাই আর্য্য ভারতে সাধারণ কথিত ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এই কথিত ভাষাকেই হনুমান্ মানুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যভাষা সম্বন্ধে রামায়ণে অন্য কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

বানর, নাগ, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি পৈশাচীভাষা ব্যবহার করিত। রাম এই পৈশাচীভাষাও যে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও উপর্য্যুক্ত শ্লোক হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নতুবা রামের পক্ষে বিরাধ ও শূর্পনখার সহিত কথোপকথন সম্ভবপর হইত না।

রাবণ উত্তম সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন। সীতাহরণের পূর্ব্বভাগে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সীতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ‡

লঙ্কায় আর্য্য ভারতের মানুষী ভাষা অপ্রচলিত ছিল, তাই হনুমান্ সীতার সহিত মানুষী ভাষায় বাক্যালাপ করাই নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

---

* "উপাসক সম্প্রদায়", দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট।

‡ ব্যামিশ্রকেষু—প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদিষু। রামানুজ। ব্যামিশ্রকেষু—অর্থে প্রাকৃতের সহিত ভারতবর্ষের সকল ভাষাই গণনা করা যাইতে পারে।

‡ আরণ্য কাণ্ড ৪৬ সর্গ ১৪ শ্লোক।

অভিশপ্ত

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।)

বাদলার দিন,—অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর, আকাশে,—মেঘের ফাঁকে,—সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কাল মেঘের পার্শ্বে, সাদা মেঘগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া,—নীল আকাশের ম্লান-বিষণ্ণ-ছবিখানিকে যেন অনেকটা উজ্জ্বলতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এমনি সময়ে, একটি সুসজ্জিত ছোট কামরার একপার্শ্বে, জানালার সম্মুখে, দৌলতন্নেছা একাকী উপবেশন করিয়াছিল। জানালার উপর পাতলা সবুজ রঙের একখানা পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, পর্দ্দার একপার্শ্বে, মুখ বাহির করিয়া, দৌলতন্নেছা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়াছিল।

আকাশ যদিও, প্রতিদিনের মত, তেমনি নীল, বিপুল, দেখাইতেছিল, কিন্তু সেই দৃশ্য, তাহার মনকে, পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত আকাশ যেন, সাহাজাদার অন্তরের মতই, ভাবান্তরের ক্রুরতায়, লীন হইয়া গিয়াছিল। ইদানীং তাহার মনে হইতেছিল,—বিশাল সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন, ভাঙ্গা দালানের ছাদের মতই, তাহার মস্তকে পতিত হইয়াছে,—যাহার রুদ্ধ চাপে সে যেন দলিত ও আহত হইয়া, আড়ষ্ট অভিভূতবৎ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! তাহার বাহিরটা যদিও রুদ্ধ-স্রোত-নদী-বক্ষের মতই স্থির দেখাইতেছিল, কিন্তু বুকের ভিতর একটা প্রবল হাহাকার, হৃদ-যন্ত্রের পতন উত্থানের সহিত, অরুন্তুদ যন্ত্রণার তালে বাজিতেছিল!

দৌলতন্নেছা বিবির বয়স পঞ্চদশের অধিক না হইলেও, সে যে বয়সের অনুপাতে, অনেকটা অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল,—তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলেই প্রতীত হইতেছিল। তাহার স্নিগ্ধ-গোলাপী-রঙের-দেহে, একটা মনোরম মাধুর্য্যের প্রলেপ মাখান ছিল। সে তাহার সুঠাম-ক্ষীণ-দেহ বল্লরী লইয়া যেখানেই উপস্থিত হইত, সেখানেই কেমন এক শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইত! তাহার বেশভূষায় ইদানীং কোনই পারিপাট্য ছিল না,—মুখের চির উজ্জ্বল হাসিটুকুন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল! চোখের কোণে, অশ্রু-বিন্দু ও অভিমানের একটা অসীম দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল! যিনি তাহাকে এই অশান্তিময় জীবন সমস্যার মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তাঁহার প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভিমানের উৎস আত্মপ্রসারণ করিয়া, নয়নের তপ্ত অশ্রুধারাকে, রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল!

দৌলতন্নেছা বিবি—নবাব সাহেবের দূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী। অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিল। ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় বলিতে সংসারে তাহার কেহই ছিল না। এই নিঃসহায় বালিকা, বাদসার সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া, খোদ বেগম সাহেবের মাতৃ স্নেহ-ধারায়, স্বীয় চিত্তকে অভিসিঞ্চিত করিয়া লইয়াছিল! বেগম লুৎফুন্নেছা, প্রথম দর্শনেই, স্বর্গের কুসুম সদৃশ্য, সাদা হাস্য বিকশিতা নয়নানন্দ-বর্দ্ধক অনাথা শিশুটিকে ভালবাসিয়াছিল! তাঁহার ব্যবহারে মনে হইত, তিনি যেন, খোদার আদেশে, অজ্ঞাত কোন স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতীর্ণা হইয়া, অমৃতের উৎস লইয়াই, বালিকার অনাদৃতও ঘাতপ্রতিঘাত পূর্ণ, প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা অন্তরে, অসীম পুলক-স্পন্দন প্রবাহিত করাইয়া দিয়াছিলেন!

শৈশবকাল হইতেই দৌলতন্নেছা সাহাজাদার সহিত একত্র খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়াছিল! ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এক অজ্ঞাত ভাব প্রবণতার ফলে, উভয়েই উভয়ের প্রতি, চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইল! দৌলতন্নেছার অবাধ-স্বচ্ছন্দভাব, আন্তরিকতাময় আচরণ, কুণ্ঠাশূন্য—নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা, সাহাজাদার অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল! ক্রমে তাহাদের অন্তরের ভিতরকার উত্তাল শোণিত স্রোত, এতই উদ্দাম ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল যে, তাহারি গতিবেগে, তাহাদের অন্তরের সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ছিন্ন হইয়া গেল। সাহাজাদা, দৌলতন্নেছাকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া লইবার সংকল্প, নিতান্ত সহজ-ভাবে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না! যাহাকে জীবনের অরুণ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া, যৌবন পথে টানিয়া লইয়াছিল, তাহাকে জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত স্নেহ ভালবাসার প্রচুরতায় অভিষিক্ত করিতে সাহাজাদা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দৌলতন্নেছা শান্ত, সংযত, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যতার সহিত অটল মূর্ত্তিতে চলিতে চেষ্টা করিলেও, সাহাজাদার

স্নেহ-প্রবণ উদ্দাম আগ্রহের নিকট মস্তক অবনত করিয়া, একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। উহাদিগের মেলামেশার গভীরতা লক্ষ্য করিয়া, বাদসা ও বেগম সাহেবা, উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন!

হঠাৎ দৈবদুর্বিপাকে, মতিয়াকে দেখার পর হইতেই, সাহাজাদার অন্তরে, অসীম ভাবান্তর উপস্থিত হইল! একটা অননুভূত,—মতিয়াকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড তরঙ্গ, সবেগে তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত থাকিয়া, তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। মতিয়ার স্নেহ-প্রবণ-মূর্ত্তি, সাহাজাদার অন্তরের নিভৃত কোণে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চারিদিক একটা বিশাল শূন্যতায়, শুষ্ক মহামরুর মতই, ধূ-ধূ করিতে লাগিল! দৌলতন্নেছার প্রতি সাহাজাদার কোন দিনই যেন বিন্দুমাত্র স্নেহের টান ছিল না, এরূপ একটা ভাব, তাঁহার কঠোর নির্ম্মম তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণের ভিতরই প্রকাশ পাইত!

বেগম লুৎফুন্নেছা অনেক বুঝাইয়াও, পুত্রের মতের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলেন না। তিনি দৌলতন্নেছার বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, একটা অসীম অশান্তি বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন! বাদসার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়াও যখন, কোনই প্রতীকার করাইতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অতীতের বহু সুখ দুঃখ পূর্ণ স্মৃতির অনুসরণ করিয়া দৌলতন্নেছা, উদ্বেল-ব্যাকুল হৃদয়ে, বহুক্ষণ ধরিয়া জানালার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক, আপন মনে ভাবিতে লাগিল, কোন্ পাপে আমার এমন দশা হল? আশৈশব যাকে অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মায়া ধারায় অভিষিক্ত করে, নিতান্ত আপন করে নিয়েছিলুম, যার সামান্য অদর্শনে অন্তর একেবারে শতধা হয়ে যেত, তাকে এমনি করে পর হতে দেখে, নূতন ভাবে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যে পাচ্ছিনা! হা খোদা! যাঁকে এমনি করে আপন করে নিতে দিয়ে ছিলে, কোন্ দোষে আবার কেড়ে নিয়ে, নির্ম্মমের মত এমনি করে অপরকে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছ? মতিয়া,—হায়! সে খুবই ভাগ্যবতী;—আমার "ধথা সুর্ব্বস্ব" তাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, এ তার অসীম সৌন্দর্য্যের প্রভাবের ফল! খোদা আমাকেও যদি সে সমস্ত আকর্ষণী শক্তি দিয়ে গড়িয়ে দিতেন, তা হলে এমনি ভাবে,—সব খোয়ায়ে, একেবারে রিক্ত হবার আশঙ্কায় আমাকে এতটা বিব্রত হতে যে হতো না! যাকে পাবই না, তাঁকে ভালবাস্‌তে দিলে কেন? যদি আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ বুক ছাপিয়ে উদ্বেলিত হবার আয়োজন করে দিলে, তবে তাঁকে পাহাড় প্রমাণ ব্যবধানের ভিতর টেনে নিয়ে গেলে কেন! এ তোমার কোন্ ছলনা? তুমি যদি মানুষের অন্তর নিয়ে, এমনি খেলাই চিরদিন খেলে থাক, তবে মানুষ কেন তোমাকে স্নেহের পীযুষ ধারায় অভিষিক্ত করে, তোমাতে সবই নির্ভর কত্তে চায়? যিনি সর্ব্বক্ষণ আমার নয়ন মণির মতই আমাকে ধরা দিয়েছেন, কোন্ দোষে আজ তিনি দিনান্তেও একবার দর্শন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন? তিনি মতিয়াকে চান! তিনি মতিয়ার হবেন? তাতে যদি তাঁর সুখ হয়, তাতে আমি বাধা দিবার কে? তবে মতিয়া যে তাঁকে চায় না, তিনি কেন মতিয়ার এতবড় আজ্ঞা, তাচ্ছিল্য পায়ে ঠেলে দিয়ে, তারই সাহচর্য্যের জন্য এতটা উন্মাদ হয়েছেন? মতিয়ার কলা ব্যঞ্জক কঠোর মুখ ভার ও অসীম অবজ্ঞা সূচক প্রত্যাখ্যান, তিনি কেন এমনি করে, মাথা পেতে নিয়ে, তাকে করায়ত্ব করবার জন্য এতটা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন? হা খোদা! এ বিষয় তুমি তাকে বুঝতে দাওনা কেন? তার এত বড় অপমান সূচক প্রেরণার কথা মনে হলে আমার অন্তর যে শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়্‌তে চায়! আমি ত তাঁর রয়েছিই, আমিত কোন দিনই তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিনি, এ অন্তরে নিহিত শ্রেষ্ঠ-স্নেহ অর্ঘ্য দিয়েই ত তাঁকে পূজা কত্তে চেয়েছি, তাঁর তৃপ্তির জন্য, অন্তর প্লাবী উচ্ছ্বাস নিয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিতে আমিইত চাইছি, কেন তিনি তা পদদলিত করে, তাঁর আত্ম মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কত্তে ব্যস্ত হয়েছেন! হায়! কে বলে দিবে, কেন এমন হল! তাঁকে আর তেমনি ভাবে ফিরিয়ে যে আর পাবই না! তাঁকে পাব না? সে কি তিনি যে আমারি ছিলেন! এখনও আছেন চিরদিনই থাকবেন তিনি ছেড়ে গেলেও ত তাঁর স্মৃতি সম্বল করে, তাঁর ছবি অন্তরে আঁকড়ে ধরে, জীবন কাটিয়ে দিব তিনিই যতই পর হতে চান না কেন, অন্তরের গোপন কোণে তিনি যে আমারি থাক্‌বেন এ হতে বঞ্চিত কর্‌বার শক্তি কারো নেই-ই! এরূপ এলোমেলো, নানা চিন্তার আঘাতে দৌলতন্নেছা একেবারে অধীর হইয়া উঠিল! সে অনেকক্ষণ

ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল শেষে বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল! ভাবিতে লাগিল, আমিনা দিদির নিকট গেলে হয় না? তিনি ত আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখে থাকেন, তাঁর কথাগুলি কতই যেন স্নেহ মাখা, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। অতঃপর দৌলতন্নেছা ধীর পদ বিক্ষেপে আমিনার কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল!

বাদসার প্রাসাদের, এক প্রান্তে, একটি নির্জ্জন কক্ষে আমিনা বাস করিত। দৌলতন্নেছা প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া, শেষ কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, সাহাজাদা, একটি জানালার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া রহিয়াছে! দৌলতন্নেছা মুহূর্ত্তের মধ্যেই অনড়, অসাড় পুত্তলিকাবৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! তাহার চলিবার শক্তি যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

সাহাজাদার দৃষ্টি সহসা দৌলতন্নেছার মুখের উপর নিপতিত হইতেই,—নিতান্ত অপরাধীর মতই মস্তক নত করিল। প্রায় দশ মিনিট কাল, অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সাহাজাদা ধীরে ধীরে দৌলতন্নেছার সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে বলিল "দৌলত! তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? কোন অসুখ বিসুখ হয় নি ত?"

দৌলতন্নেছা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না,—সুধু সাহাজাদার মুখের প্রতি তাকাইয়া, মস্তক নত করিল।

সাহাজাদার কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "তোমার অসুখের কথা আমাকে কেউত কিছু বলেনি,—তোমার চেহারা দেখে মনে হয়, তুমি খুবই গুরুতর অসুখে ভুগছ! আমি আজই হাকিম ডাকিয়ে, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দোব।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার উক্তিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই দুর্জ্জয় অভিমানে, তাহার অন্তর নিতান্ত বিদ্রোহী হইয়া গেল। সে অসহিষ্ণুর ভাব দেখাইয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল "না—আমার ত কোন অসুখ হয় নি! হেকিমের কোনই প্রয়োজন আসতে পারে না।"

সাহাজাদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "তোমার শরীর যে আদখানা হয়ে গেছে,—অসুখ হয় নি বললেই ত আমি মেনে নিতে পাচ্ছি না,—আর কিছুদিন এভাবে থাক্‌লে,—বাঁচবার আশা—।"

দৌলতন্নেছা কথায় বাঁধা দিয়া বলিল "মরণের কথা বলছ—? তা আমার মরণ হ'লে ত সব দিকই রক্ষা পেত, তা'ত হবেই না! তুমি যে দিন হ'তে আমাকে এমনি ভাবে প্রত্যাখান করেছ, সে দিন হ'তেই আমি মৃত্যুর কামনা কচ্ছি, আমার মৃত্যু যে খুবই বাঞ্ছনীয়!" দৌলতন্নেছা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল।

সাহাজাদা একটুকুন বিচলিত হইল,—শেষে কোমল কণ্ঠে বলিল "দৌলত,—তা তুমি বলতে পার। আমি পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়ে পেতে কতনা চেষ্টা করেছি, কৈ কোন ফল ত হল না! অন্তরের পিপাসা যেন, ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমাকে ক্ষমা কর।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার উক্তিতে একেবারে মুসড়িয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ছিন্ন হইয়া গেল। নিতান্ত পাগলের ন্যায়, তীব্রকণ্ঠে বলিল প্রিয়তম! এ তোমার দোষ নয়—এ আমার কপালের দোষ, আমি ক্ষুদ্র বালিকা, এখনও অন্তরকে তেমনি ভাবে গড়ে নিয়ে, দুঃখের মাঝে, সুখের স্বাদ গ্রহণ কত্তে পারি নি, আমার যদি অদৃষ্ট ভাল হ'ত, তবে তোমাকে এমনি ভাবে, পর হতে দেখ্‌তে হত না।"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "তুমি যা' বলছ তা আমি সবই বুঝতে পাচ্ছি,—তবে—।"

দৌলতন্নেছা কথায় বাঁধা দিয়া বলিল "তবেই কি? মতিয়াকে পাওয়া তোমার কাম্য, তাই বলতে চাচ্ছ? তা'তে কোন বাঁধা দিবার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি না! তোমাকে স্বামীরূপেই বরণ করেছি, স্বামীরূপেই, আমার অন্তর দখল করে থাকবে, তুমি পরিত্যাগ করলেও আমি জানি,—আমি তোমারি।"

সাহাজাদা নির্ণিমেষ নয়নে দৌলতন্নেছার প্রতি তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "দৌলত! সে আশা আর নেই, কয়দিন হয়, আমি বাবাকে আমার মত জানিয়ে দিয়েছি, তিনি

জানিয়ে ছিলেন, মতিয়াকে আমি গ্রহণ কত্তে চাইলে,—তোমাকে তিনি সৎপাত্রে অর্পণ করে, তোমাকে সুখী কত্তে চেষ্টা করবেন। পাত্র তিনি নাকি এক রকম ঠিকই করে রেখেছেন।”

দৌলতন্নেছা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল” তুমি কি মত প্রকাশ করেছ—আমাকে জানাবে কি? আমার নিকট কিছুই গোপন করো না এই আমার অনুরোধ!”

সাহাজাদা বিনম্র কণ্ঠে বলিল” কোন কিছুই গোপন করবনা তোমার নিকট, আমি মতিয়াকে গ্রহণ করবার সপক্ষে মত দিয়েছি! মতিয়া যদি স্বইচ্ছায় বিবাহে মত দেয় তবে আমার মনে হয় হোসেন আলীর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। হোসেনআলী যেমন সুশ্রী, তেমনি সুপণ্ডিত, এমন ভাল ছেলে আমাদের এ অঞ্চলে আর নেই বল্লেই হয়। দৌলত! অতীতের সব ভুলে যাও। নূতন ভাবে, আবার জীবন পত্তন করে, সুখী হও, এই আমার একান্ত অনুরোধ। বাবা ভয়ানক জিদী লোক, এ বিষয়ে তিনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর সংকল্প কার্য্যে পরিণত করাবেনই, কোন কিছুতেই কিছু আটকাতে পারবেনা। তুমি আমাকে ভুলে—”

কথায় বাধা দিয়া দৌলতন্নেছা দৃঢ় স্বরে বলিল “তোমাকে ভুলে অপরকে আপন করে নিতে উপদেশ দিচ্ছ? তুমি পুরুষ, এ কথা তোমাদেরই সাজে, তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরটার সাড়া নিতে পারতে, কত বড় আগুন বুকে জ্বালিয়ে পুড়ে মরছি, তা যদি অনুভব কত্তে চাইতে, তবে এমনি ভাবে আমাকে পায়ে ঠেলে দিতে চাইতে না। তোমার অন্তর যে এত কঠিন, তা’ত এখন ও ধারণা কত্তে পাচ্ছি না, তবে মনে রেখো, তুমি মত দিলেই যে আমার সে ভাবে চল্‌তে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। তুমি মতিয়াকে গ্রহণ কর, তুমি মতিয়ার হও, কোন বাধা দিবনা, বাধা দিবার শক্তিও আমার নেই। তবে আমি তোমা ছাড়া আর কারোই হতে পাব্বি না, বা হবনা, এটা তুমি বেশ জেনে রেখো। তুমি আমার ছিলে,—এখনও আছ,—যতদিন বেচে থাকব, ততদিন তুমি আমারই থাকবে। তুমি আপনাকে ইচ্ছামত বিলিয়ে দিতে পার,—কিন্তু প্রকৃত স্ত্রী, কোন দিনই,—এমনি করে ভালবাসাকে যাচাই কত্তে পারে না। আমার জীবনের যা কাম্য, যা প্রিয়,—সকলই তোমার চরণে অর্পণ করেছি, ফিরিয়ে নেবার অধিকার ত আমার নেই! যদি এ বিষয়ে কেহ বল প্রয়োগ কত্তে চায়,—আমাকে অপরের হস্তে জোর করে বিলিয়ে দিতে চায়,—তবে মনে রেখো, দৌলত! সেদিন পৃথিবী ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবনা! সংসারের লীলা সাঙ্গ করে,—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে,—সেখানে গিয়েও তোমার ধ্যান কর্‌ব,—উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তোমার অপেক্ষা কর্‌ব,—এতে বাধা দিবার ত কেউ থাক্‌বে না! প্রিয়তম্! তুমি মনে রেখো,—খোদা বলে যদি কেউ থাকেন,—তবে এই মাতৃ পিতৃহীন অনাথার আকুল-আহ্বান একদিন তিনি শুন্‌বেনই—। তিনি তাঁর নিরপেক্ষ বিচার আসনে বসে, দেখিয়ে দিবেন, তুমি আমারি জীবন দেবতা তুমি আমারি সর্ব্বস্ব—।” দৌলতন্নেছার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না,—কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন যুগল আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিল। শেষে উন্মত্তের ন্যায়—স্খলিত চরণে স্বীয় শয়ন কক্ষের শয্যায় আশ্রয় লইয়া, রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। তাহার সেই ক্রন্দন উচ্ছ্বাস, কতটুকুন মর্ম্মস্পর্শী ও অসহনীয়,—সাহাজাদা তাহার কোন হিসাব করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিনা,—কে বলিতে পারে?

(ক্রমশঃ)
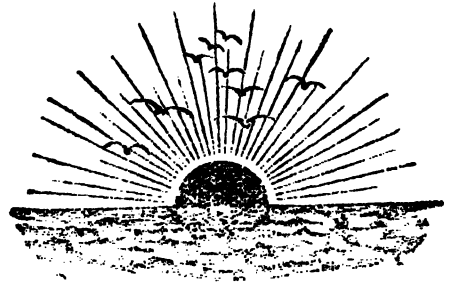
হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়

(শ্রীপূর্ণিমাপ্রভা রায় সরস্বতী)

হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ—আজ বিপন্ন। হিন্দু সমাজ আজ অন্য ধর্ম্মের প্রলুব্ধ শ্যেন দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া আত্ম চৈতন্যের অভাব হেতু অসাড় নিস্পন্দ। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে তাহাকে বাঁচিতে হইবে, আত্মোদ্ধার করিতে হইবে। আত্মোদ্ধারের শক্তি যে বিধাতা তাহাকে দিয়াছেন, আত্মচৈতন্যের বিস্ফুরণে সে যে বলীয়ান্—গরীয়ান্ ও হইতে পারে সে কথা আজ হিন্দু সমাজ ভাবিতেছেও না? এই আত্মদৌর্ব্বল্যই হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশকর ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। এই ভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক দিন বাঁচিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এইবার তাহাকে ভাগ্যের সহিত লড়িতে হইবে, পুরুষকার সাহায্যে গতানুগতিকতা বিদূরিত করিতে হইবে, সমাজকে সংস্কৃত পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে, সমাজ-দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায়েই সম্প্রীতি স্থাপন করিতে হইবে। হিন্দু সমাজ নানাদিক দিয়া দুর্ব্বল তাহাকে শক্তি সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সমাজকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবন্ত আকারে গঠন করিতে হইবে। হিন্দুর ব্যবহারিক ও আভ্যন্তরীণ জীবন শিক্ষা ও ধর্ম্মের সাহায্যে বলীয়ান্ করিতে হইবে। সমাজ দেহে যে সমস্ত বিষাক্ত বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে সেগুলি নষ্ট করিতে হইবে। হিন্দু সমাজকে আজ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা এই—প্রথমতঃ জাতিকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সমাজে ধর্ষিতা নারীর স্থান নির্ণয়, তৃতীয়তঃ বাল বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন চতুর্থত শুদ্ধি ও সংঘটন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। জাতিকে বাঁচিতে হইলে প্রথমতঃ সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে। কি আহারে বিহারে কি শিক্ষায় দীক্ষায়, অন্তর্জীবনে কি বহির্জীবনে সকল বিষয়েই সংযম শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সংযত চরিত্র ব্যক্তির জীবন বীর্য্য সম্পন্ন স্বঃস্থতা মণ্ডিত, ও গৌরব ব্যঞ্জক। অতীত যুগে হিন্দু সমাজের কি নারী কি পুরুষ সকলেই সংযম সাধনা বলে আত্মার কল্যাণ ও জীবনের সুখসাধন করিয়া গিয়াছেন। নারীর সংযম সাধনারই নামান্তর সতীত্ব, সংযমের প্রভাবে মানুষ দেবত্বে উপনীত হয়। "ধাত্রী পান্না" অসাধারণ চিত্ত সংযমের প্রভাবে নিজ পুত্রের প্রাণ দান করিয়া ভারতের গৌরবোজ্জ্বল রাজ বংশধরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সংযম মানবত্বে অমরত্ব আনয়ন করে। কোন্ সুদূর অতীতে ধাত্রী পান্নার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার চরিত্র গৌরব ইতিহাস আজিও অমর কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।

সংযমের অভাব বশতঃই সমাজে ব্যভিচারিতা উৎপন্ন হয়। তাহারই ফলে সমাজ-শক্তি আজ দুর্ব্বল পঙ্গু পুরুষগণ আজ নারী রক্ষার শক্তি হারাইয়াছে। দুর্বৃত্তদলনের সাহস তাহাদিগের নাই। তাহারা আজ মানব ধর্ম্মচ্যুত হইয়া বিকৃত হইয়াছে, সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের মতই বাঁচিতে হয়, শৃগাল কুকুরের মত মরিয়া লাভ কি? মহাজাতির অংশসম্ভূত যে জাতি মা, বোনকে দুর্বৃত্তের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে জাতির কাপুরুষতার কলঙ্ক রাখিবার স্থান কোথায়? হিন্দু দুর্ব্বল আর তাহাদের দৌর্ব্বল্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে হিন্দু নারীরা। দিন দিন কেবলই দুর্বৃত্তের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইয়া হিন্দু সমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। হিন্দু নারীর প্রাণভেদী হাহাকারে গগন পবন বিষাদ ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ষিতা নারীর স্থান—

সমাজ শক্তি পঙ্গু ও দুর্ব্বল তাই নারীগণ দুবৃত্তের প্রলুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে পতিত হইয়া লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হইতেছে; লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা সেই অসহায়া নারীগণ পরিশেষে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন সংগ্রামের চিন্তায় কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অবশেষে পতিতার বৃত্তি অবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করে। অথবা সেই সতীত্ব নাশ কারী দুবৃত্তের অঙ্ক শায়িনী হইয়াই জীবনাতিপাত করিতে থাকে। সমাজ তাহার উদ্ধারের বা দুর্বৃত্তকে শাস্তি প্রদান করিবার কোন প্রকৃষ্ট পন্থাই অবলম্বন করে না। এই কারণেই নারীর অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে সমাজের এই

সাংঘাতিক সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে ইহার প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? হিন্দু কি একেবারেই মানবত্বের বলিপ্রদান করিয়াছে তাহাত মনে হয় না। আজিও হিন্দু সমাজে উদার হৃদয় স্বজাতি বৎসল ধনী জমিদারগণের অভাব নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত অত্যাচারিগণের শাস্তি বিধান করিতে পারেন, অথবা তাহাদিগের শাস্তির জন্য সরকারের মনোযোগাকর্ষণ করিতে পারেন! যদি প্রত্যেক স্থলেই দুর্বৃত্তগণ স্ব স্ব দুষ্কর্ম্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ কার্য্য করিতে আর সাহস পাইবে না, ফলে নারী নির্য্যাতন ও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ধর্ষিতা নারীগণ সমাজে স্থান পায়না এবং কোন উপায়েই হিন্দু সমাজে থাকিতে পারে না! বলিয়াই দুর্বৃত্তদিগের সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে! একবার কোন রকমে হিন্দু নারীকে অপহৃত করিয়া আনিলে ঐ সকল নারী একমাত্র নির্য্যাতন কারীর কৃপার উপরই নির্ভর করে। তখন সেই অসহায়া নারীগণ দুর্ব্বৃত্ত ও সেই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক নানারূপে প্রলোভিত হইয়া থাকে। এবং অনিচ্ছা সত্বে ও তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করা হয়। এই কারণে দুর্ব্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায়না। এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধির হাত হইতে সমাজকে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রথমতঃ নারীকে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। অবলা দুর্ব্বলা করিয়া রাখিলে আর চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ ধর্ষিতা নারীগণকে সমাজে গ্রহণ করার চেষ্টা করিতে হইবে। সকল স্থলে সমাজে লওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে। সুতরাং প্রতি জিলায় জিলায় এমন এক একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ধর্ষিতা নারী-গণ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনাব্যয়ে আহারও বাসস্থান পাইতে পারে। ঐসকল প্রতিষ্ঠানে এরূপ শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে; যাহাতে তাহাদের মানসিক জীবন পবিত্র ও ধর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠে এবং বহির্জীবন ও কর্ম্ম কুশলতার স্বাস্থ্য হইয়া উঠে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নারীগণ শিল্প, কারু কার্য্য বয়ন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরোক্ষে দেশ ও জাতির উপকার সাধন করিয়া যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে থাকার কালীন ও তাহাদিগকে সমাজে পুনঃ গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই শিক্ষিতা ও নির্ম্মলান্তকরণা গণকে সমাজে লওয়া সহজ হইবে।

বিধবা বিবাহ—

হিন্দু সমাজের আর একটি সমস্যা বিধবার পুনর্বিবাহ। আবশ্যক হইলে হিন্দু বিধবাদিগকে পুনর্বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। "আপদ্ধর্ম্ম" হেতু শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে উহা দোষাবহ নহে। কিন্তু ইহা বিবেচ্য বিষয়। বিধবাগণ যদি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য ধারণে সমর্থা হন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের মনে হয় উচ্চ-বর্ণের বিধবাগণ, আজিও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে কাতর বা কুণ্ঠিত নহেন। হিন্দু সমাজ তথাকথিত দেবী স্বরূপিণী বিধবাগণকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আজ হিন্দু সমাজকে বিধবাগণের আত্ম সম্মানের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা যেন ভুলেও নিজকে অপরের "গলগ্রহ" ভাবিয়া অন্তরে গ্লানি অনুভব না করেন। তাঁহা-দিগের শুদ্ধান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ ধারা জাতিকে যেন সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। তাঁহাদের অন্তর যদি বিষাদাচ্ছন্ন হয়, তবে যে জাতির অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী; হিন্দু সমাজের যে সকল সম্প্রদায়ের বিধবাগণ ঠিকঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থা অথচ সেই সকল সম্প্রদায়ের কোন কোন সম্প্রদায়ে পূর্ব্বে বিধবা বিবাহের প্রচলনও ছিল। উচ্চ বর্ণের অন্ধানুকরণের ফলে বর্ত্তমানে সেই সকল সমাজে বিধবা বিবাহ অচল হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ে বিধবার পুনর্বিবাহ একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ে অগণিত বিধবাগণ, জাতি বৃদ্ধির বিষম অন্তরায় অপর দিকে কন্যার অভাব ও কন্যাপণের আধিক্য বশতঃ পুরুষগণ বিবাহ করিতেও পারে না। জাতি ধ্বংসের এই সকল কুপ্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে? আবশ্যক হইলে হিন্দু সমাজে সকল সম্প্রদায়েই বিধবা বিবাহের প্রচলন করিতে হইবে।

শুদ্ধি ও সংগঠন—

ধ্বংসোম্মুখ হিন্দু জাতির শক্তি সঞ্চয়ের আর একটি প্রকৃষ্ট পন্থা শুদ্ধি ও সংগঠন। চতুর্দ্দিক হইতে হিন্দু ধর্ম্মের উপর আক্রমণ চলিয়াছে। এ আক্রমণ এক দিনের দুদিনের নহে। সহস্র বৎসর যাবত হিন্দু সমাজ এ আক্রমণ সহ্য

করিয়া আসিতেছে। হিন্দু ধর্ম্ম এতদিন বাঁচিয়াছিল ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কল্যাণে। আজ বুঝি এই দুইয়েরই অভাব বশতঃ হিন্দু সমাজ আপনাকে হারাইতে বসিয়াছে। ইতিহাসে দেখিতে পাই পারস্য ও আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থলে সামাজিক শাসনের কঠোরত্ব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল না সুতরাং তদ্দেশবাসিগণ সহজেই ধর্ম্মান্তরের সংঘাতে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান কাবুলই মহাভারত বর্ণিত গান্ধার দেশ। ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী সে দেশেরই কন্যা ছিলেন। বহু সাধনায় ভারত তাহার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আজ বুঝি আর পারে না। এই যে ভারতে সাত কোটী মুসলমান তাহাদের অধিকাংশের শিরায় শিরায় কোন্ ধর্ম্মের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে? সে কথা বলিয়া আর গরল উদ্গীরণ করার আবশ্যক নাই। পাশ্চাত্যের প্রবল সংঘাতে ভারতে প্রায় অর্দ্ধ কোটি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর সৃষ্টি হইয়াছে। উাহারা কি হিন্দু ছিল না? কেন এই অপচয় হইল! হিন্দু সমাজের এই অপচয় শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত চলিয়া আসিতেছে; ইহার প্রতিবিধান আজ করিতে হইবে নতুবা হিন্দু মরিবেই? হিন্দু সমাজ পরকে আপনার করিবার আদর্শ গ্রহণ করে নাই। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব মত প্রচার করিয়া যে উদার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন হিন্দু সমাজ তাহাকে জীবন্ত আকারে ধরিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ও বৈদান্তিক মত প্রচারে পরকে আপনার বুকে গ্রহণ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; আর আজ শুদ্ধি আন্দোলন হিন্দু সমাজে নূতন জাগরণ আনয়ন করিয়াছে, ইহাকে প্রাণ দিয়া বাঁচাইতেই হইবে। মানুষ যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তখন সে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। অল্প বিস্তর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াই থাকে। সে যদি পরে স্বেচ্ছায় স্বীয় ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চাহে তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মে গ্রহণ করা দোষের নহে। যে সকল লোক স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদিকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করা উচিত। তর্ক উঠিতে পারে নবদীক্ষিত হিন্দুগণ, সমাজের কোন্ স্তরে থাকিবে। পৌরাণিক সমাজ বহুধা বিভক্ত সুতরাং প্রথম উদ্যমে তাহাকে সাম্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলে অযথা বেগ পাইতে হইবে। শুদ্ধি আন্দোলন চালাইতে হইবে সে জন্য পৌরাণিক সমাজকে ধূলিস্যাৎ করিবার আবশ্যক নাই, হিন্দু ধর্ম্মের যে কোন উপধর্ম্মে বা শাখাধর্ম্মে নবদীক্ষিত হিন্দুগণকে লওয়া হউক। প্রকৃতির নিয়মে কালে সকল বৈষম্য বিদূরিত হইয়া সমগ্র হিন্দু জাতি এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে। বৈষ্ণব সমাজও পৌরাণিক সমাজ হইতে পৃথক ভাবে গঠিত হইয়াছিল কিন্তু আজ বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোঁসাই নামে পরিচিত তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজভুক্ত বটে, তাহারা বৈষ্ণব সমাজভুক্ত হইয়াও বৈবাহিক আদান প্রদানে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজের আখরায় পৌরাণিক হিন্দুগণ পূজা অর্চ্চনা দিয়া থাকেন। ঝোলনোৎসব, রাসোৎসব প্রভৃতি বৈষ্ণবও পৌরাণিক উভয় সমাজেরই উৎসব। ইহা হইতে বুঝা যায় হিন্দু ধর্ম্মের যে কোন ধর্ম্মমতে শুদ্ধি ও সংগঠন কার্য্য চলিতে পারে। ভবিষ্যতে পৌরাণিক হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়াই যাইবে। তারপর অস্পৃশ্যতা লইয়া সমাজে বাক্ বিতণ্ডা চলিয়াছে কতক পরিমাণে উহাকেও বিদূরিত করিতে হইবে। আন্তরিক সম্প্রীতি থাকিলে ব্যবহারিক বৈষম্যে কিছু আসিয়া যায় না। জয়চন্দ্র ও পৃথ্বিরাজ একই শ্রেণীর লোক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা পাপ ছিল না কিন্তু তাঁহাদিগের পরস্পর বিদ্বেষের ফলে কত বড় একটা সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়া গেল। সুতরাং বৃথা বাক্ বিতণ্ডা ছাড়িয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যায়। হিন্দু সমাজ আজ সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠুক—

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং
পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ। ঋগ্বেদ ১।২২।১৩

'পৃথিবী, বায়ুলোক, অন্তরীক্ষলোক আমাদের এই দেহযজ্ঞ রসসিক্ত করুন্ এবং আমাদিগকে পুষ্টিদ্বারা পূর্ণ করুন্।

ভাব-ভোলা

(শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত)

মনের মাঝে ভাব খেলে যে যায়—
ত্রস্ত-কামে চ'লে যাওয়া—
পথিকগুলির প্রায়।

কোনোটা বা থম্‌কে দাঁড়ায় খানিক,
কোনোটা বা চম্‌কে চেয়ে,
চোকে জ্বালায় মানিক!

ধরা দিতে চায় না যে রে কেউ,
সাগর-বুকে ছুট্‌ছে যেনো—
ঢেউএর পরে ঢেউ!

জনম ভ'রে পেলেম নাকো থেই,
ভাবের ঘরে পুঁজি আমার
কিচ্ছুই যে নেই!

মিছেই তা'দের ছুটছি পিছু পিছু,
ডাক্ যে আমার শুন্‌ছে না কেউ;
কেউ দিলে না কিছু!

আপন মনে গাঁথ্‌তে গিয়ে মালা—
বারে বার ছিঁড়্‌ছে ডুরী,
এম্নি ঝালা পালা!

বক্ষ চিড়ে রক্ত দিয়ে আঁকি,
চিত্রে আমার ভাব ফুটে না,
সুধুই ঢেকে রাখি!

বাণীর ঘরে দুয়ার যে মোর আঁটা,
মিছেই কালি কলম নিয়ে,
সুধুই আঁচড় কাটা!

জনম গেলো ভাবের ভাবনায়,
অভাব যে তার ঘুচ্‌ল না, মোর
স্বভাব দোষে হায়!

যৌবন প্লাবন

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

(১৪)

ডাক্তার মধুসূদন রায় সে দিন হরিচরণকে হঠাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে নিখিলেশ্বরের বাড়ীতে দেখিতে পাইয়া দমিয়া গেলেন।

এই সে হরিচরণ এক দিন অসহায়া রোরুদ্যমানা অরুন্ধতীকে ইহার সঙ্গেই বিদায় দিয়াছিলেন! প্রায় কুড়ি বৎসরের বিস্মৃত প্রায় জীবনের একটা অধ্যায় আজ তাহার কাছে বইয়ের খোলা পাতার মতো প্রকাশ পাইল। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িল—মনে পড়িল সেই সরলা স্নেহ বিহ্বলা নারীর প্রাণভরা আত্মনিবেদন, মনে পড়িল কেমন করিয়া সে তাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল—শুধু তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া, সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা কি তিনি রক্ষা করিয়াছেন? অন্যায়ের ক্ষমা পৃথিবীতে নাই একথা বলা চলে না,— তাহা না হইলে ডাঃ রায়ের এত সুখ এত ঐশ্বর্য্য হইবে কেন? বিধাতার এই যে বিচার, এ বিচারের মীমাংসা মানুষের হাতে নাই। ডাঃ রায় নিখিলেশ্বরের সহিত বাড়ীর ভিতর চা খাইতে গেলেন! তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। নিখিলেশ্বর কারণটা বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া কহিলেন—ডাঃ রায়কে আমার এখানে পাইব সে যে আমাদের আশাতীত সৌভাগ্য। গিরিবালা ও আসিয়া চায়ের টেবিলে বসিয়াছিল। ডাঃ রায় শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন সৌভাগ্য— কিছুই নয়, নিখিলেশ বাবু, বরং আমারই সৌভাগ্য আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। পৃথিবীতে আসা যাওয়াই চলে আসছে, আমাদের চলে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে—যাবার আগে নূতন যাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়েই লাভ। মণ্টু ঘরের এ দিকে ও দিকে একটা বিড়ালের বাচ্চার পিছনে দৌড়াইতেছিল! বাচ্চাটা কোন মতেই ধরা দিবে না, মণ্টু ও কোন রকমেই বাচ্চাটাকে না ধরিয়া ছাড়িবেনা। গিরিবালা তাহার এই ছুটাছুটিটা দিব্য উপভোগ করিতেছিল। শেষটায় মণ্টুর তাড়ায় বিড়ালের ছানাটি যখন ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, তখন

খোকাবাবু পেছু হটিলেন। গিরিবালা ডাকিলেন—হরিচরণ। হরিচরণ মাথা নীচু করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—কি?

মণ্টু! বড্ডো দুষ্টুমি কচ্চে, ওকে নিয়ে যাও।

হরিচরণ আর একবার ডাঃ রায়ের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার দৃষ্টির মধ্যে চোখের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল। ডাঃ রায় চায়ের পেয়ালাটি মুখের কাছে তুলিয়া লইলেন মাত্র······মিষ্টি ও অন্যান্য ফল ফলারি কিছুই স্পর্শ করিলেন না।

গিরিবালা হাসিয়া কহিলেন—কই আপনিত কিছুই খেলেন না।

ডাঃ রায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—একদিন খুবই খেতে পারতাম মা, ত্রিশ বৎসর যদি বয়সটা পিছিয়ে দিতে পারতাম্ তা হলে আমার খাওয়া দেখতে পারতে—এখন আমাদের যে যাত্রার পালা। গিরিবালা হাসিল।

ডাঃ রায় নিখিলেশ্বরবাবুকে বাহিরে যাইবার পথে জিজ্ঞাসা করিল—এই হরিচরণটি কতদিন আপনার এখানে আছে?

সে অনেক দিন প্রায় দশ বারো বৎসরের কম না! ওকে আপনি জানেন নাকি?

ডাঃ রায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সে অনেক দিন আগে আমার ওখানে ছিল। সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। ওকে আমি খুব ভালবাসতুম।

রাত্রিতে শিববাবুর বাড়ীতেও খাবার সময় নিখিলেশ্বরের সহিত ডাঃ রায়ের দেখা হইয়াছিল—কিন্তু সেদিন আসর তেমন জমে নাই। যাহাকে লইয়া এত আয়োজন ও অভ্যর্থনা চলিয়াছিল, সেই ডাঃ রায় মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলিতেছিলেন মাত্র। Society Man বলিয়া সমাজে তাঁহার এক সময়ে যথেষ্ট নাম ছিল······সে কথা সকলেই জানিত। সেদিন রাজনীতির তর্কটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে ডাঃ রায় কটক চলিয়া গেলেন।

* * * *

ডাঃ রায় চলিয়া গেলে একদিন নিখিলেশ হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ডাঃ রায়ের ওখানে বুঝি চাকরি করতে?

হরিচরণ মাথা নীচু করিয়া কহিল—হাঁ, বাবু!

—ছেড়ে এলে কেন?

সে কথা জিজ্ঞেস কর্‌বেন না বাবু?

কেন? যদি বলতে কোন মানা থাকে, তা হ'লে বোলোনা হরিচরণ।

না, বাবু সে কথা আমি বলতে পার্‌বোনা, তা হ'লে মা লক্ষ্মীর অপমান করা হবে? মায়ের আমার কোন দোষ ছিল না বাবু। হরিচরণের দু'চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে আর বলিতে পারিল না।

নিখিলেশ গম্ভীর ভাবে বলিলেন······তোমার দুঃখ হয়, থাক্ ওসব।

আমি শুনতে চাই না, তুমি কাজে যাও······। হরিচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

সঞ্জয়ের জাতি ও নিবাস

(পণ্ডিত শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ)

সঞ্জয়, প্রাচীন বাঙ্গালার একজন মহাকবি। ইনি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, বাঙ্গালা পাঁচালী আকারে রচনা করেন। সঞ্জয় কৃত মহাভারতের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার একজন গবেষক, সঞ্জয় নাম দেখিয়াই ভূতের ভয়ে আৎকাইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন—"সুতরাং সঞ্জয়, পৌরাণিক ভূত নহে, একালের মানুষ।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) উত্তম। পিতাপিতামহদিগের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলিই দিতে হয়। এই গবেষক মহাশয়, স্বীয় বাস গ্রামের চারি দিক অনুসন্ধান করিলে দুই চারিটি জন্মেজয়, 'সঞ্জয়' দিগ্বিজয় এ কালে ও পাইতেন। তাহা হইলে তাঁহাকে আর ভূতের ভয়ে চমকিয়া উঠিতে হইত না। ইনি গবেষণায় স্থির করিয়াছেন—"মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণে প্রচারিত করেন।" গবেষণার মূল্য যত থাকুক কি না থাকুক, তাঁহার সাহসের দাম যে খুব বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। সঞ্জয় কিন্তু নিজে বলিয়াছেন

পাণ্ডব চরিত্র কথা শ্রবণে মঙ্গলগাথা
মহামুনি ব্যাস প্রকাশয়।
সেই কথা লোক মুখে শুনিয়া মনের সুখে
পাঞ্চালী করিল সঞ্জয়। (বনপর্ব্ব)

কাশীরাম দাস ও এইরূপই বলিয়াছেন—"

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।"

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ও বলিয়াছেন—

সেই কথা কহি আমি পয়ারের ছলে
মোর নিবেদন শুন পণ্ডিত সকলে॥
ভাষা ছন্দে কহি নাহি সমস্কার জ্ঞানে।
শুদ্ধাশুদ্ধ থাকে যদি করিবা শোধনে॥"

সকলেরই একই কথা। কেহই সংস্কৃতজ্ঞতার দাবী করেন নাই। সকলেই লোক মুখে শুনিয়া "পয়ার" "পাচালী" বা "ভাষা-ছন্দে" রচনা করিয়াছেন। এই "লোক মুখে শুনিয়া" বা "শ্রুতমাত্র" বলিতে কথক ঠাকুরের বক্তৃতাও হইতে পারে, অন্তকৃত পাঁচালী শ্রবণও হইতে পারে, অন্তকৃত পাঁচালী শ্রবণই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা, যেরূপ ভনিতা আমরা ত্রিলোচন ও কাশীদাসে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ ভনিতাই সঞ্জয়েও আছে।

সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

১। মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
সঞ্জয় কহিল তাহা শুনে পুণ্যবান্। বনপর্ব্ব

২। মহাভারতের কথা অমৃত সমান!
সঞ্জয় পয়ার কহে শুনে পুণ্যবান্॥ ঐ

৩। মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
সঞ্জয় কহিল তাহা ভব ভয় তরি।

৪। মহাভারতের কথা পীযুষের ধার।
বিরাট পর্ব্বেতে কহে সঞ্জয় পয়ার॥

বিরাট পর্ব্ব

৫। গোবিন্দ চরণে মন, সঞ্জয়ের বিরচণ,
বন পর্ব্বে ব্যাসের কাহিনী॥

এই সকল ভনিতার সঙ্গে ত্রিলোচনের—

(১) দ্বিজ ত্রিলোচন কহে বন্দিয়া শ্রীহরি।
শ্রবণে ভারত কথা হেলে ভবতরি॥

(২) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

প্রভৃতি পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়,—এ তিনজনই একটি ভাণ্ডার হইতে এই ভনিতাগুলি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। সে ভাণ্ডার যে, কোন পুরাতন পাঁচালী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঞ্জয়, ত্রিলোচন, বা কাশীদাস, কেহই "সংস্কৃতানভিজ্ঞের অনধিগম্য মহাভারতরূপ মহা-ভাণ্ডার" লোকের নিকট উন্মুক্ত করেন নাই। তাহারা সকলেই এক পুরাতন ভাণ্ডারের দরজা খোলা পাইয়া আপন ইচ্ছা ও রুচিমত মণিরত্ন কোচড়ে পুরিয়াছেন।

কাশীরাম দাস,—বর্দ্ধমান জেলার। ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী টাঙ্গাইল মহকুমার। সঞ্জয়ের নিবাস কোথায় ছিল, এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। বিরাট পর্ব্বের সমাপ্তি স্থলে সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

"দ্বিজকুলে উপজিল পূর্ব্বদেশে জাত।
ভারত পাঞ্চালী কহিল লোকের সাক্ষাত॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, সঞ্জয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস "পূর্ব্বদেশে" ছিল। রাঢ়ের লোকে, পদ্মার পূর্ব্ব সমস্ত স্থানকেই পূর্ব্বদেশ বলে। এ পূর্ব্বদেশ, পদ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত। কাজেই সঞ্জয়ের নিবাস কোন্ গ্রামে বা কোন্ পরগণায় ছিল, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যাইতেছে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, পদ্মা হইতে পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে কোন গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

কামাখ্যার কৌমার্য্য

(শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়)

ধরণীর বুকে সে ছিল এক জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি। পাশাপাশি দুইখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া স্বপ্নাহতের মত বসিয়াছিলাম কামাখ্যা আর আমি। অদূরেই একটা ঘাসবনের উপর চন্দ্রকিরণের ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। অপরের দৃষ্টিটা সেইদিকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম দেখ অজয়, জ্যোৎস্নাধারায় সমুজ্জল হয়ে এক একটা শিশির কনিকা কিরকম সোণালী হয়ে উঠেছে। হায়! কোন কল্পলোকের রূপপরিদের মিলন অশ্রু এরা কে জানে!"

কি একটা মুগ্ধ আবেশে কামাখ্যা তখন একেবারে তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কথাটার জবাব স্বরূপ সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। নিজ স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেই শিশির-স্নাত ঘাসবনটার উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সে সংক্ষেপে

জানাইল "শুনে তুমি আশ্চর্য্য হবে এমনি একটা সুন্দর জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রির স্মৃতি চিরদিনের জন্য গেঁথে আছে আমার অন্তরে—আর তাই হয়েছে আমার কুমার জীবনের মূল শিকড়।"

কথা শুনিয়া গা আমার পুলক বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমনি একটা জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রির স্মৃতি চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া আছে অন্তরের অন্তরে,—আর তাই হইয়াছে তার কুমার জীবনের মূল শিকড়! ব্যাপারটা আমাকে কম বিস্মিত করিয়া দেয় নাই। এতদিনের প্রচণ্ড প্রয়াসেও কামাখ্যার জীবনে যে কুমারব্রতের কোন হেতু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, তবে কি এ তাই! মিনতিমাখা দৃষ্টিটা তাহার দিকে মেলিয়া দিয়া বলিলাম "এমনি একটা রজনীই যদি তোমার কুমার জীবনের মন্ত্র নির্দ্দেশ করে থাকে, আজকে এই শুভ মুহূর্ত্তে বলবে সেটা আমার কাছে?—তুমিত জান সে কতদূর উপভোগ্য হবে!

জীবন্ত মরু।

মিনিট দুই তিন কামাখ্যার দিক হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অশান্ত বিহ্বল চোখদুটী সেই ঘাসবনটার দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া নিজের সাথে সে কি বোঝাপড়া করিতেছিল কে জানে! তারপর কতকটা আনমনেই যেন বলিয়া উঠিল "আমার কুমারব্রতের ইতিহাস শুনবার জন্য তোদের শত কৌতুহলের কোন মূল্যই আমি এতদিন দিইনি, কিন্তু আজ আর চুপ করে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। এতদিন যে সত্য কাহিনীকে আমার ওই অন্তঃস্থলটায় সুনিবিড় করে গুজে রেখেছিলুম আজ তা প্রকাশ পাবার পুলকে আপনি বের হয়ে আস্‌ছে।

কতক্ষণের জন্য কারও মুখে কথা ফুটিল না। হয়ত কামাখ্যার দিক হইতে এমনি একটা ক্ষুদ্র নীরবতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কি একটা গুমরিত বেদনায় তার মুখ ক্ষণেকের জন্য ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, তারপর কতকটা সুস্থ হইয়াই সে তার কুমারব্রতের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।—আর চোখে মুখে একটা অনিবার্য্য কৌতুহলের ভাব নিয়া আমি তাহাই শুনিতে লাগিলাম।—

তার নাম ছিল মাধুরী; আর সে ছিল ঠিক মাধুর্য্যেরই প্রতিমূর্ত্তি। কল্পলোকের সমস্ত লাবণ্য ফুটে উঠেছিল তার ভিতর। রূপ কথার ফুল রাণীর কথা জানে সবাই কিন্তু কেউ তাকে চোখে দেখতে পায়নি—এ যেন ছিল ঠিক তাই। অন্ধকার ঘরে প্রদীপের আলোর মত ঝরে পড়ত তার রূপ, দর্শকের হৃদয় আপ্লুত করে ঝরে যেত জ্যোৎস্না ধারার মত তার দীপ্ত মধুর হাসি।

পাশের বাড়ী। সেও আসত, আমিও যেতুম।—ছোটবেলা থেকে এমনি ভাব। আমার সাথে বসে না পড়লে তার পড়া শিখা হতোনা; তার নূতন বইয়ে বড় বড় অক্ষরে নামটা লিখে দেবার অধিকার ছিল শুধু আমারই একচেটে।—খেলা মেশাটা ছিল এমনি মধুর এমনি জীবন্ত।

ভোরবেলা উঠে ফুল তোলবার জন্য সে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত—ঘোষেদের সেই বাগান বাড়ীর দিকে। এক হাতে ফুল গাছের শাখাটা আমি নুইয়ে ধরতুম, আর সে সাজি ভরে ফুল তুলত। শীতের দিনের ফুর ফুরে বাতাসে ভোরবেলা যখন গা কাটা দিয়া উঠত, তখনও আমাদের এ ফুল কুড়ানোর ব্যত্যয় কোন দিন ঘটেনি—কাজটা ছিল এমনি সাধের, এমনি মধুর।

এসব হল ছোটবেলার কথা। তারপর কোন্‌দিন কৈশোরের কবল মুক্ত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলুম তা টেরও পাইনি।

রিপণ কলেজে বি, এ পড়ছিলুম, আর মাধু তার পিতার অভিপ্রায় মত কলেজের উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর না হয়ে বাড়ীতে যথাসম্ভব পড়াশুনা চালাচ্ছিল। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে তার বাবা উমাচরণ বাবুর সংস্কার এই ছিল যে মেয়েরা স্কুল কলেজের তথা কথিত উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। অভিভাবকের পক্ষে তখন আর তাহাদিগকে নিজ মনোনীত মঙ্গলকর পথে চালানো সম্ভবপর হইয়া উঠে না, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহারা দেশের চিরন্তন সমাজ ধর্ম্ম মেনে চলতে চায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উমানাথ বাবু ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তার উপর তার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই মাধুর সম্বন্ধে এমনি একটা ব্যবস্থা যে হবে আমরা জানতুম। মাধুর

কিন্তু খুব ইচ্ছা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তার নারীত্বকে প্রকৃত বিকাশের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীর অন্য সবার বিরুদ্ধ মতের সামনে তার ব্যক্তিগত বাসনা ও রুচি ভেসে গেল।

সেদিনকার তার সেই বিদ্রোহ ভাবটা এই দীর্ঘ দিন পরেও আমার বেশ মনে পড়ে। প্রাতঃকালে পড়ার ঘরে বসে বোধ হয় বা পড়াশুনাই করছিলুম, এমনি সময়ে মাধুরী এসে নিঃশব্দে একটা চৌকি টেনে বসে পড়ল। বেশ করে চেয়ে দেখলুম্ তার বড় বড় কাল চোখ দুটোতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল লেগে রয়েছে। আমি বিস্মিত হয়ে বল্লুম "একি মাধু তুমি কাঁদছ?" বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে ফিরে সে বল্ল "তুমি শুনেছ বোধ হয় কামাখ্যা দা, বাবা আমাকে কলেজে যেতে বারণ করেছেন।" মাথা নেড়ে ব্যথিত স্বরে বল্লুম তা আর কি করবে বল গার্বৃডিয়নের (guardian) কথা অমান্য করার ক্ষমতা ত আর তোমার নেই। শুষ্কস্বরে মাধু বলল "নেই বলেইত আজ অমনি ভাবে অভিভাবকের দিক্ থেকে একটা অন্যায় আদেশকেও মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। আমি কেবল ভাবি কবে দেশের পুরুষগুলোর ভিতর নারী শিক্ষার একটা সত্যিকার প্রয়োজন উপলব্ধি দেখা দিবে।"

কথাটা বলিতে গিয়া স্বর তাহার কান্নায় ভাঙ্গিয়া আসিল, আর বিরাট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাকে এত সহজে ছুটী দিতে রাজী ছিলুম না, কিন্তু মাধুরী একটা আসন্ন ব্যথাকে শান্ত করতে না পেরে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মর্ম্মদাহে অস্থির হয়ে আমারও ডাকবার সামর্থ্য রইল না।

মাধুর অভিভাবকরা কেবল মাধুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে দূরে রেখেই শান্ত থাকেনি; তারা তার উপর নানারকম আইন কানুন জারী করে তাকে একেবারে অশান্ত করে দিল। দিনের ভিতর কবার করে আমার ওখানে আসত বলে একদিন তার দিদিমা তাকে বেশ করে শাসিয়ে দিলেন,—নিজে সোমত্ত মেয়ে হয়ে পাশের বাড়ীর একজন যুবকের সাথে মিলে মিশে গল্প গুজব করাটা নাকি লোকের চোখে খারাপ দেখায় তাই। কথা শুনে বিশেষ ব্যথিত হলেও আমি আশ্চর্য্য হইনি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রকৃত অন্তলেচ্ছু অভিভাবক তার, কাজটি ছিল খুবই স্বাভাবিক।

তারপর মাধুর সাথে আর বড় বেশী দেখাশুনা হতো-না।—ছোটখাট পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এইমাত্র। মাঝে মাঝে ছোট দুই একটা কথায় বুঝে নিয়েছিলুম এই নূতন বাঁধনের মধ্যে আমার মত তার মনটাও মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

বি এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলেই মত পাশ করলেন আমাকে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বিলেত যাবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন থেকে আমার ভিতর ঘুরে মরছিল। কাজেই এ সুযোগটাকে আমি ছাড়তে পারিনি।

ফাল্গুনের কি একটা দিনে আমার ষ্টার্ট্ (start) করার কথা ছিল। মাধুর সাথে দেখা হয়ে উঠেনি বলে মনটা খারাপ বোধ হচ্ছিল। তবে বিশ্বাস এই ছিল যে যাবার আগে যা করে হোক মাধু আমার সাথে একটীবার দেখা করতে আসবে। কারণ তার সাথে একটা বোঝা পড়া হওয়া চাই।—মাধুরীর বিয়ে হওয়ার কথাটা তখন সত্যই উঠে পড়েছিল।—

দেখা হলো। দুপুরবেলা কি একটা কাজে বাড়ীর বের হয়ে যাচ্ছিলুম সম্মুখেই দেখি মাধুরী।—

দুজনেই ঘরে এসে বসলুম। মাধুরী প্রথম কিছুই বলতে চাইলে না। কথাটা আরম্ভ করতে হলো ঠিক আমারই দিক্ থেকে। "তুমি বোধ হয় শুনেছ মাধু কালকেই আমি বিলেতের দিকে রওনা হয়ে যাব।—আমার কাছে কিছু বলবার থাকে ত তোমার খুবই উচিত এইক্ষণে তা খোলাসা করে বলা।

কি একটা বলবার জন্য মাধুরীর রাঙ্গা ঠোঁট দুটী ক্ষণেকের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু কিছু বলা হলো না, মুখ তার রক্তিম হয়ে উঠল আর সে অহেতুক ভাবে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে বসে রইল।

আমি কিন্তু তার চুপ করে থাকাটাই মনে প্রাণে বরণ করে নিতে রাজী ছিলুম না। বেশ একটু অভিমানের

সুরেই বল্লুম "তুমি বোধ হয় জান না মাধু, তোমার সাথে আলাপ আলোচনা করবার আর কোন সুযোগ যাবার আগে আমার ঘটে উঠ্‌বে না। কাজেই বল্‌ছি আমার কাছে ব্যক্ত করবার যদি তোমার কিছু থেকে থাকে তবে সেটা এখনই বল্‌তে হবে। এইবার মাধুরী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ব্যথিত স্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বল্‌ল "তোমার কাছে বলবার আমার সত্যই কিছু নাই, মন যে আমার কি চায়, আর কাকে আশ্রয় করে তার বিকাশ পেতে চায় তা তুমি বেশ ভাল করেই জান। আমার ভয় হচ্ছে তুমি চলে গেলে চারিদিকের প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর কি টিকে থাকতে পারব!" মাধুর অভিভাবকেরা কিছুদিন থেকে তার বিবাহের বন্দোবস্ত করতে লেগে গিয়েছিল, শুনেছিলুম কোন এক কুলীন বর দেখে বিবাহ কাজটা সম্পন্ন হবে। সেই সত্য অভিপ্রায়টা লক্ষ্য করেই মাধুরী কথা কয়টী বল্‌ল।

মিনিট পাঁচ কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। মাধুরী আনমনে ওই জানালার দিকে চেয়ে থেকে কি ভাবছিল সেই জানে। তবে আমার মন এই চিন্তার রেশটাই আপনার জাল বুনে যাচ্ছিল যে সমাজের বুকে আজও আমরা কুসংস্কারের হাতেরই ক্রীড়া পুতুল। মেয়ে শিক্ষিতা হয়েছে, রূপ লাবণ্য তার যোগ্যটী আর নেই কোথায়, তাকে তার নিজ মনোনীত বরে বিয়ে দিয়ে তার নারীত্বের বিকাশের সুযোগ ঘটিয়ে দিবে, তা না, কোথায় শিক্ষিত অশিক্ষিত, বৃদ্ধ প্রৌঢ়, গণ্ডমূর্খ কুলীন সন্তান রয়েছেন তার হাতে মেয়ে সমর্পণ করে পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। শুনেছিলুম তার দিদিমার ইহাই ছিল পরম কামনা। আর তার বাপ,—তাঁরও ইচ্ছাটা এমনি বটে। বেশ বুঝছিলুম আমার বিদ্যার জোর তাদের সে কামনার দিকটা পূরণ করে উঠতে পারবে না। তারপর আমার ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার সঙ্কল্পটাও নাকি তাদের রোষদৃষ্টির কারণ হয়েছিল। মনের আগুন চাপতে গিয়ে আপনি বের হয়ে এল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

এতক্ষণে মাধুরী যাবার জন্য উঠে পড়েছিল। আমার দিকে পাছ ফিরে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে বল্‌ল "আমি তাহলে যাই।" আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ছুটে চলছিল সে। দ্বিধা সঙ্কোচের বাঁধ অনেকটা কেটে নিয়ে শুনিয়ে বল্লুম যাবার আগে একথাই বলে যাব মাধু, তোমার হৃদয়ের উপর নির্ভর করেই আমি আজ যাচ্ছি। আশা আছে বছর দুই পরে ফিরে এসে তোমায় আমি যা করে হোক আমার করে নিব।"

মাধুরী চলে গেল। চুপ করে বসে থেকে কেবলই ভাবতে লাগলুম্ এই যে একটা দুঃসহ ভার মাধুর উপর দিয়ে গেলুম তাকি ও সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে রক্ষা করতে পারবে? অভিভাবকেরা কুলীন বর দেখে মাধুর বিয়ে ঠিক করে বসবে, সেখানে কি ওর নিজের অভিরুচি ও খামখেয়ালীর কোন মূল্য থাকবে!—

* * * *

পরের কথা। সাগর পারের বিলেত রাজ্যিটায় বছর দুই বাস্তবিদ্যা করে, বারিষ্টারী খেতাব বহন করে যখন এই কামাখ্যা চৌধুরী বাড়ীর ধন বাড়ীতে ফিরে এল, তখন ওদিকে যা হবার তা হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত খবর যা পাওয়া গেল তা এই—আমি যাবার বছর খানেক পরে একজন ৫০ বৎসরের দ্বিতীয় বর কুলীনের সাথে মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যাপারটী এমনি পুরাণো হয়ে পড়েছিল যে সে সম্বন্ধে জানানোর মত এতটুকু আগ্রহ কারও ছিলনা।

মাধুরীর দিকে আমার অনুরাগের কথাটা ভাবতে আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। বেশ বুঝে নিলুম শেষ পর্য্যন্ত আমার দিকে মাধুরীর আকর্ষণ টেকসই হয় নি, বিয়ে হবার মধ্যে তার ইচ্ছাটাই হল বড় কারণ। একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, বাপমার দিকে যতটুকু গোঁড়ামীই থাক না কেন তার সম্মতির আভাস না পেয়ে কি আর কিছু হতে পারে?—তবে বরের বয়স আধিক্যটা আমার কাছে সমস্যাই রয়ে গেল।—বাড়ীতে আমার বিয়ের পাত্রী দেখার কিসব কল কোলাহল চলছিল। মনে মনে আরাম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললুম ভালই হল যে মাধুরীর কার্য্যের প্রতিশোধ নেবার মত একটা সুযোগ ঘটে যাবার উপক্রম হয়েছে।

সে দিন দুপুর বেলা ওবাড়ীর দিকে মুখ করা জানালার ধারে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আরাম নিঃশ্বাস মোচন করছিলুম্।—পাশের রাস্তা দিয়ে কে একজন ওবাড়ীতে প্রবেশ করছিল। বেশ করে চেয়ে দেখলুম মাধুরীদের সেই পুরাণো ঝি রমার মা।

চট্‌করে মনের মধ্যে খেয়াল চেপে গেল। আর তাকে ডেকে নিয়ে এলুম ঠিক আমারই ঘরে। সেই প্রথমে কথা বল্‌ল "এই সেদিন শুনলুম আপনি এসেছেন। শুনে অবধি মনে করছি, দেখে আসি একবার কামাখ্যা বাবুকে কেমন বড়টী হয়েছেন, তা বাবু কাজের ঝোঁকে কটাদিন এতটুকু ফুরসৎ পাওয়া গেলনা। পাবই বা কি করে, ছেলে বুড়ো সমানে 'ঝি এটা কর ঝি ওটা কর।'

তার অবান্তর কথাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে আমি প্রশ্ন করলুম্ "তা মাধুর বিয়ে বুঝি হয়ে গেল।" "হয়ে গেল বৈ কি বাবু সেত বছর খানেকের কথা, হুগলি সহরের ওধারটায় কি একটা বিষ্টুপুর আছে না, বিয়েত সুথা দিয়েই হল। কিন্তু বরের কথা জিজ্ঞেস করবেন না, এতবড় অপদার্থ হেংলো বুড়ো আর আমি জন্মে দেখেনি।" বলিস্ কিরে মাধুর বর হলো বুড়ো" ? "তা না ত কি শুনি ? বাপ আর দিদিমা মিলে মাধুদিদির বে ঠিক করলেন। কুল আর টাকা পয়সাই হল তাদের বড় কথা। বরের দিকে একটিবার চাইলে না। কথা পাকা হয়ে গেল আর মাধুদিদি আমার শুনে অবধি ওপোষ দিয়ে পড়ে থাকলে।—বর ত আর ও পছন্দ করে বরণ করেনি ?

ঝিয়ের শেষ কথাটা শুনে আনমনেই আরাম নিঃশ্বাস মোচন করলুম। বেশ একটু সমুৎসুক হয়েই প্রশ্ন করলুম্ "তাহলে বিয়েতে মাধু মত দেয়নি বল ." "তাই বই কি বাবু। বিয়ের প্রথম কথাতে সেই যে গো ধরে বস্‌ল আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না. তার চেকে তোমরা আমাকে মেরে ফেল তা আর এক দিনের তরেও পারাল না। ক্রিয়াকর্ম্ম ওকে যা করান হয়েছে তাত সম্পূর্ণ জোর করে। শেষে একান্তই না পেরে বল্‌লে কিনা 'তোমরা যদি এমনি ভাবে আমায় বলি দিয়েই সাধ পাও ত দাও আর আমি এতটুকু আপত্তি করবো না।' সে সময়ত আমিও ছিলুম বাবুর সমুখে, দেখিনু যেন দিদির আমার চোখ দুটী দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।...আসল কথাটা কি আর আমি জানিনে বাবু, দিদিমণি ত কজনের কাছে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন তোমার সাথে বিয়ে হওয়াই কিনা এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কর্ত্তা আর দিদিমা সেকথা ত উঠতেই দিলেন না। একটা অকুলীন বিলেত ফেরৎ ছেলের কাছে মেয়ে দে দিয়ে কুলের কলঙ্ক করব এই কি তোমরা বল ?

ঝিকে বিদায় করে দিয়ে ভাবছিলুম ওঃ কি ? সমাজের বুকে এমনি শত প্রকার অত্যাচার অবিচারের কথা স্মরণ করে নীরবে গন্ডারে পড়ল দুফোটা বড় বড় চোখের জল।(একটা ফুটন্ত ফুলের অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়বার পথ প্রশস্ত করা হল আর সেখানকার বড় কথা হল কুল। একটা পাপযাত্রী বৃদ্ধের পদে এমনি একটা মহৎ নবোৎফুল্ল প্রাণকে বলি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হল ধর্ম্মরক্ষা ও সুবিবেচনার নামে। নারীত্বের কথা মনুষ্যত্বের কথা উঠে পড়বার এতটুকু ফুরসৎ পেলে না।—সেখানে সবচেয়ে বড় হল বংশের সুনাম। শুনেছিলুম এই বিয়েতে মাধুর বাপের হাতে কিছু টাকাও এসেছে। কে বলবে সেটাই গোড়ার কথা নয় ? মেয়ে বেচে টাকা নিতে আমাদের গোড়া সমাজে ত আর বাঁধেনা ! অসহ্য বেদনায় হাত দুটো মাথার দিকে সবেগে প্রসারিত করে উঠে দাঁড়াইলুম।—কিন্তু উপায় কিছু ছিল না।

কমাস পরের কথা। কার কাছে জানিনা শুনতে পেলুম কদিন হল মাধুরী তাদের বাড়ীতে এসেছে। দেখা হওয়ার সাধ বড় ছিল না—খবরটা শুনে পুরাণো ব্যাপার গুলো স্মৃতি রশ্মি বাগে মনের মাঝে নাড়া দিয়ে উঠল মাত্র।

বিকালবেলা আমার কোঠা ঘরখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। মুক্ত জানালা পথে হঠাৎ নজরটা গিয়ে পড়ল ওবাড়ীর ভিতর দিকে চলে যাওয়া একটা ক্ষীণকায়া মূর্ত্তির দিকে। বেশ করে চেয়ে দেখলুম সে মাধুরী। সে যেন এক হারিয়ে যাওয়া লাবণ্যশ্রীর শেষ রশ্মিকণা। দেহের উপর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ-বিভা আর নেই। রুগ্ন চেহারাটাকে নিয়ে বেশ একটু ত্রস্তপদেই

সরে যাচ্ছিল।—ডেকে কথা বলবার অধিকার বা স্পৃহা কোনটাই ছিল না। ওর শুকিয়ে নিষ্প্রভ হবার কারণটা কতক বুঝতে পেরে মনে মনেই বললাম্ হায় পোড়া সমাজ! বসন্তের অম্লান কুসুমকে দলে পিষে এমনি করে টুটো করে দিতেও তোমার বাধেনা! আমার এই ঘরটীতে বসে এই মাধুরী একদিন আমার সাথে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনটাকে দেশের ও দশের জন্য বিলায়ে দিয়ে তার নারীত্ব বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিল—আমিও তা মনে প্রাণে সমর্থন করেছিলুম,—কিন্তু আজ তা কতদূর!

পিতৃগৃহে যেমনি হঠাৎ মাধুরী এসেছিল তেমনি আচমকা চলেও গেল। আসার খবরটা শুনেছিলুম যাবার খবরটাও পেলুম।···দেখা করত হয়েছে কিন্তু পরস্ত্রী বলে মুখের দিকে চাইতে আমার বাঁধ বাঁধ ঠেকছিল। নৈতিক চরিত্র বজায় রাখবার এমনি সব সংস্কারগুলিকে আমি সর্ব্বদাই ভক্তিনত ভাবে মেনে চলতাম্। যদিও আগের মত নির্ম্মল হাসির আলোকে 'অজয়দা' বলে কথা বলতে এলে মুখ ফিরে তাকে অগ্রাহ্য করার মত দুঃসাহস আমার ছিল না। কিন্তু থাক সে কথা। সে ভাব ত আর ও দেখায় নি! আত্মসংযম আর নিজের স্ত্রী মর্য্যাদা রক্ষা করতে এইটুকু আবরণ যদি তার দরকার হয়ে থাকে কি কাজ আমার তার সে অবরোধের বাঁধ ভেঙ্গে দেবার? আমিত আর তার এতটুকু সতীবিচ্যুতিচিত্ত কামনা করিনে!

আশা আকাঙ্ক্ষা কুচিন্তা দুশ্চিন্তা সব সবলে বিসর্জ্জন দিয়ে, ঠিক প্রবীন আত্মমগ্ন লোকটীর মত ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন সমভাবে পাত্রীর খোঁজে লেগে গিয়েছিলেন; সুশীল ছেলের মত তাদের এই বিশেষ ইচ্ছার পদে একদিন আমার অচলা ভক্তি শ্রদ্ধাও নিবেদন করে ফেললুম্। জীবনে প্রণয় নিবেদনের একটা ছোটখাট পালা একদিন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—এ সত্য, কিন্তু তাতে যদি অপর পক্ষের দৃঢ়চিত্ততা রক্ষা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি তবে পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক ব্যারিষ্টার হয়ে আমিই বা সে বাঁধন ছিন্ন প্রেমের বোঝা বয়ে মরব কেন? মানি সমাজের অন্যায় ভ্রুকুটীতেই আমার আশা-মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, কিন্তু তাই বলে আমার সেই একচিত্ততা বজায় রাখতে গেলে সমাজের অন্যায় নির্দ্দেশকেই কি মাথা পেতে নেওয়া হবে না। তার উপর অন্য একজনের পরিণীতা স্ত্রীর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে গিয়ে নিজের চরিত্রে কলুষতাই বা আমি বাড়াতে যাব কেন?—কিন্তু ব্যাপার দাঁড়ালো অন্যরূপ। হঠাৎ সেদিন মাধুরীর পল্লী আবাস থেকে এক চিঠি পেলুম, ক'দিনের ভিতর আমায় সেখানে যেতে হবে। আমাকে নাকি তার একটীবার খুব দরকার।

যে মিনতির ভাষায় পত্রখানা লিখা হইয়াছিল তাতে এই আহ্বান উপেক্ষা করার মত এতটুকু সুবিধা ছিলনা। তবু দু তিনবার না ভেবে পারলুম্ না। কে জানে এই চিঠি লেখার অন্তরালে কোন একটা গোপন ফন্দি রহে নাই! কে জানে এতে সেই পুরানো প্রীতিটা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেনা! কিন্তু তাই বা কি করে হয়, মাধুরীর ত সে রকম কোন ভাব দেখা যায়নি! ওসব দিকে জড়াতে হলে সেত আমাকে স্পষ্টই জানাতে পারত।

মেয়েলি হাতের কাঁচা অক্ষরে গাঁথা সেই চিঠিখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে বসে আকাশ পাতাল অনেক কথাই ভাবলুম্। বিবেকের সাথে ঝগড়া ঝাটী করে যা সযুক্তি মনে হল তা মাধুরীর এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া। সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি তাকে একটীবার কাছে পাওয়ার আনন্দে সম্মতি জানায়ে নেচে উঠল। নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করে বেশ বুঝলুম্ মাধুর অমিয় আকর্ষণ আজও আমার উপর পূর্ণ প্রভাব নিয়েই বিরাজ করছে। পত্রোত্তরে লিখে জানালুম আসছে রবিবার আমি তাদের বাড়ী যাব।

ওদের বাড়ী পৌঁছেই প্রথম পরিচয় যার সাথে হল, সে মাধুরীর পরমারাধ্য স্বামী হরিদাস গোস্বামী। দেখে কম বিস্মিত হলুম না যে তিনি সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে হরি নামক সেই মহাপ্রভুরই দাস। কপালে, বুকে, হাতে তিলক দিয়ে হরির সাথে তার নিবিড় সান্নিধ্যটুকু বিশেষভাবেই আঁকা ছিল। বেশ মোটাসোটা সদানন্দ পুরুষ। মস্তকে ও গোঁফে পক্ক চুলের শুভ্র হাসি। আমি আসব এ খবর

তার অজ্ঞাত ছিল না। বহির্বাটীর প্রকাণ্ড ঘরখানার একটা ফরাসের উপর তক্কা ঠেস দিয়ে পাঁচ ছয় জন দেনাদারের সাথে সুদের দর কষাকষি করছিলেন, আমাকে দেখে বেশ মিষ্টি কথায় অভিনন্দন জানালেন। এই লোকটীর বয়সাধিক্যের কথা সংসার বৈরাগ্যের কথা কিছু কিছু পূর্ব্বেই শুনেছিলুম। আজ সাক্ষাৎ পেয়ে নিঃসন্দেহ হলুম। হায় মাধুরী! তোমার উপর নিয়তির এ বিদ্রূপ পরিহাস কি করে এল!

তারপর অন্দরবাটীতে প্রবেশের পালা। হরিদাসবাবু প্রাঙ্গনের দিকে পা বাড়ায়ে মাধুরীকে উদ্দেশ করে ডেকে বললেন "ছোট গিন্নী, তোমার কামাখ্যা দা এয়েছেন।" পাঁচ ছয়টী ছোট বড় ছেলে মেয়ের মূর্ত্তি প্রাঙ্গনের উপর দেখা গেল, পরে শুনেছিলুম ওরা হরিদাসবাবুর পূর্ব্বে পরিণীতা স্ত্রীর সন্তান।

ঘরের দাওয়ায় উঠতেই ভক্তিনত মস্তকে যে পায়ের ধুলো নিতে এল সে মাধুরী। দেখলুম তাহার চেহারার কোনরকম উন্নতি এর মধ্যে ঘটেনি। এ যেন অন্তিম পথের চিরসন্ধানী যাত্রী।—মৃত্যুকে তিলে তিলে মুঠোর মধ্যে ডেকে আনছে। চোখদুটী আমার সজল হয়ে উঠ্‌ল। বিহ্বলের মত চেয়ে থাকা ছাড়া একটী কথা বলবার ক্ষমতা আমার ছিল না। প্রণামের কাজ সেড়ে উঠেই সে শান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল "যাও, ভিতরে গিয়ে বসগে," এ কথাটা বল্‌তে গিয়ে তার গলার স্বর বেঁধে আস্‌ছিল, এসত্যটা তখনই টের পেলুম, যখনই দেখ্‌লুম সে অশ্রুমোচনের জন্য দ্রুতপদে অন্য ঘরে আশ্রয় নিলে।

বাড়ীতে ঘর ছিল যথেষ্ট। রাত্রে খাওয়ার পর হরিদাসবাবু দক্ষিণদিকের ছোট কোঠাঘরটীতে ঢুকে আমার শোবার স্থান নির্দ্দেশ করে দিলেন। এমনি ধারা একটা জ্যোৎস্নার ধারা জানালা গলায়ে সে রাত্রেও মেঝের উপর ও বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ছিল। বাইরের শিশির স্নাত লতামণ্ডিত গাছগুলির দিকে চেয়ে থেকে ভাবছিলুম মাধুরীর কথা।—ওর হারিয়ে যাওয়া রূপলাবণ্য, তার অশিক্ষিত বৃদ্ধ স্বামী, অবাহুত কতটী ছেলেমেয়ের ভার। পল্লীজীবনের রাত্রি। কাজ কর্ম্ম সেড়ে তার সেই ১৭৮ বছরের সতীন মেয়েটীর সাথে মাধুরী যখন আমার খোঁজ নিতে ঘরে এসে ঢুকল তখন রাত ৮॥০টার বেশী হয়নি;

……অদূরেই একটা চৌকির উপর বসে পড়ে বাইরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল "তোমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে নাত?" আমি ঠিক সেই অবস্থায় থেকেই জবাব দিলুম "অসুবিধে হওয়ায় যোগারত আর কিছু রাখনি! যাক সে কথা এখন আমাকে ডাকবার প্রয়োজনটী একটীবার বল দেখি শুনি।"

মাধুরী আমার দিক হতে এ প্রশ্নের প্রতীক্ষায়ই ছিল। একটু হেসে বসে স্পষ্টস্বরে বল্‌ল "সত্য বল দেখি কামাখ্যা দা তোমাকে আমার কি দরকার তা কি তুমি জান না?" সংক্ষেপে জানালুম "কি করে জানব বল, তুমি ত সে সুযোগ আমায় এতটুকুও রাখনি! মাধুরী তেমনি শান্ত সুরে বল্‌ল—"কিন্তু সে দরকারকে যে আমি এতদিন কোন পাত্তাই দেই নি। আমি ভেবেছিলুম কামনাকে কামনার বস্তু থেকে দূর করে রেখে আত্মসংযমের ভিতর দিয়ে তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিব। কিন্তু আজ এই তোমার সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, সে গর্ব্ব-সাধনা আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এও বল্‌ব যে সে যদিনা আমি বাহ্যিক ভাবেও পারতুম্ তবে তার জন্য সুখের ঘরে আমার শূন্য পড়ত না।"

মাধুরীর কথার মানে করতে গিয়ে ভয়ে আমি শিহরিয়ে উঠলুম্। কতক্ষণের জন্য মুখে আমার কথা সরল না। তারপর অনেকটা আস্তে আস্তে বললাম "নিজ আত্মসংযমের গণ্ডি দিয়ে বাসনা কামনাকে দমন করে রাখ্‌তে পারোনি সে ত তোমার পরাজয়। কিন্তু পরাজয়ের কোন গৌরব নেই, তার ভিতর দিয়ে ত আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় না!" সহজ সংযত কণ্ঠে সে বল্‌ল "গৌরব নেই, সে আমি জানি, কিন্তু সে পরাজয়ের যথেষ্ট হেতু কি আমাকে ঘিরে রাখেনি যে তুমি আমাকে একথা বলছ? বাপ মায়ের অসঙ্গত খেয়াল আর সমাজের অত্যাচার অবিচার কি আজ পর্য্যন্ত তোমার দিকে আকৃষ্ট থাকার একটা সঙ্গত কারণ সৃষ্টি করে দেয়নি?"

নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে বাপ মা ও সমাজের নিগ্রহ যে কত বেশী পরিমাণে মাধুরীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে তা বোধ হয় আমার চেয়ে ভীষণ ভাবে কেউ অনুভব করে দেখেনি। মানুষ হয়ে এ অবস্থায় ঠিক হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব নাহলেও অস্বাভাবিক। কিন্তু তার মত আমাকে ত আর গা ঢেলে দিলে চলবেনা! তাই বললুম "কিন্তু সে আত্মসংযম যে তোমার চাই মাধু!" সে তেমনি সহজ সুরেই জবাব দিল "তোমার বোধ হয় জানা নেই যে তার জন্য যে প্রবল সাধনা আমি করেছি তা সম্পূর্ণ ঐকান্তিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ত জগদীশ্বর মানুষকে দেন নি?"

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জবাব দিলুম, কিন্তু আমার দিকে সে আসক্তি নিবেদন করে নিজ জিহ্বা কলুষিত করা ছাড়া আর ত কিছু লাভ নেই! তুমি হয়ত জান যে নীতি জিনিষটা কুসংস্কারই হউক আর অমান্যকর কিছুই হউক কোনদিন আমি তাকে ক্ষুণ্ণ করিনি; কখনও করবার অন্যায় স্পর্দ্ধাও আমার নেই। নিজের ভিতর বাসনা কামনার তুমুল ঝড়ের কথা স্বীকার করে আমি তোমার সামনে একথাই বলব—তোমার সাথে গড়ে উঠা যে বাঁধন একদিন নিষ্পেষিত হয়ে গেছে, লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়ে তাকে আর আমি আঁকড়ে ধরতে পারবনা।—তোমার দিক দিয়ে একটা দারুণ বজ্রাঘাত হলেও না। আর তার প্রতিকারের প্রয়াস পেয়ে বিয়েও একটা শীঘ্রই করে ফেলব।"

মুখ দিয়ে তপ্ত লৌহ শলাকার মত কথা কয়টা অপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হল সত্য কিন্তু ক্ষণপরেই নিজ হৃদয় তলিয়ে দেখলুম্ এতদূর অগ্রসর মনে প্রাণে তখনও আমি হইনি।

এতবড় একটা আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা সে চিরনিগৃহীতার ছিলনা। সেই জ্যোৎস্না কিরণে বিধৌত হয়ে তার গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছিল দারুণ ব্যথাগলা অশ্রুরাশি। মিনিট পাঁচ নীরব থেকে একটা বড় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে বল্‌ল "ছোটকাল থেকে তোমার নৈতিক চরিত্র আর দৃঢ়চিত্ততাই ছিল আমার অন্যতম আকর্ষণের কারণ। আমার কামনা বা আসক্তি এসব থেকে সরে দাঁড়াতে কোনদিন বলেনি আজও তোমাকে বলবেনা। তা সে আমার দিক দিয়ে যত বড় শাস্তিই না হউক।" কণ্ঠ তার নিমেষের জন্য কেঁপে উঠলেও বেশ সহজ করেই বল্‌ল "যে আত্মসংযম-হীনতার জন্য আজ তোমার কাছে আমার জিহ্বা কলুষিত বিবেচিত হল, তার যোগ্য প্রতিশোধ আমি একদিন নিজের উপর নিতেও এতটুকু পশ্চাৎপদ্ হবোনা।—তবে তোমার কাছে একটী মাত্র মিনতির দাবী আমি করতে চাই,—বল সেটা তুমি রাখবে?"

বলে—ফেলা দারুণ কথাগুলি মাধুরীর বুকে যে আঘাত দিয়েছিল তারপর আর কোন নূতন শেলাঘাত করবার দুঃসাহস আমার ছিলনা। তাই একটু শান্ত সুরে উত্তর দিলুম "তোমার মিনতির দাবী যদি আমার নৈতিক চরিত্রকে ছাপিয়ে না উঠে তবে আমি শ্রদ্ধার সহিত তার সম্মান রক্ষা করব।"

ব্যথা বিমলিন বড় বড় চোখ দুটী আমার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে সে বল্‌ল "তবে প্রতিজ্ঞা কর এজীবনে বিয়ে করে আমার স্মৃতির, আমার একনিষ্ঠ ভালবাসার এতটুকু অসম্মান তুমি করবেনা।"

বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো আমার ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল, তথাপি সম্মতি সূচক ভাবে মাথা নড়ায়ে বিবেকের সত্য নির্দ্দেশে হাঁ কথাটা উচ্চারণ করতে হল। সেই জর্জ্জরিতাকে পুনরায় আহত করে তাকে তার শেষ সাধ থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার আর আমার ছিলনা। চোখ মুছতে মুছতে আস্তে আস্তে সে ঘরের বের হয়ে গেল,—আর আমার জন্য পড়ে রইল ব্যথা বেদনার নিদারুণ অশ্রুঘেরা রাত্রির অপূরণীয় কয়েক ঘণ্টা সময়।

* * * *

কিছুদিন পরেই একদিন মাধুরীদের পাশের বাড়ীটিতে কান্নার রোল উঠতে শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম। মাধুরীর বাবা কিছু না বলে ছল ছল চোখে একটী চিঠি এনে আমার হাতে দিল। চিঠিখান

মাধুরীর স্বামী হরিদাস বাবুর লেখা। তার সংক্ষিপ্ত খবরটা এই দুদিন হল তার স্ত্রী মাধুরী সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিনা কারণে মৃত্যু বরণ করেছে।

ব্যাপারখানা অন্যের কাছে বিনা কারণে ঠেক্‌লেও আমার কাছে তার কারণটা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ল। চোখের জল সবেগে রোধ করে যখন নিজের ঘরে ফিরে এলুম তখন চারিদিকে এতটুকু আলোর রেখাও যেন আর ছিলনা।

আত্মপ্রতিশোধের ভিতর দিয়ে সুপবিত্র হয়ে মাধুরীর সেদিনকার মিনতির দাবী আজ আমার কাছে অলঙ্ঘ্য ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"নল বাসনা"র কবি গোবিন্দ কুমার।

এ জেলার নিভৃত পল্লীতে কত কত সাহিত্য সেবী জন্ম গ্রহণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু ধারাবাহিক কোন ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত না হওয়ায়, তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, "কুমার হর" প্রণেতা শরচ্চন্দ্র, "অশ্রুকণা" প্রণেতা গিরীশচন্দ্র, "নলবাসনার" কবি গোবিন্দ কুমার, "মানস কানন" প্রণেতা রুক্মিণী কান্ত, "দশাবতার" ও "ক্ষেমটকরী" রচয়িতা ব্রজনাথ, "প্রার্থনাশতক" ও "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" রচয়িতা ভক্ত কবি বিজয় নারায়ণ, "বিশ্ববিজ্ঞান" রচয়িতা রঘুনাথ, "আশাকাব্য", "রণরাঙ্গ" রচয়িতা মনিষী মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই এ জেলার নিভৃত পল্লীবাসী ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের জীবনী এবং রচিত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

অদ্যকার প্রবন্ধে কবি গোবিন্দ কুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাহার রচিত কাব্যের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। কবি গোবিন্দ কুমার এ জেলার ফুলপুর (বর্ত্তমানে হালুয়াঘাট) থানার অন্তর্গত শাখুয়াই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১২৯৯ সনের ৩১ শে আষাঢ়। সন্ধ্যাকালে জ্বর ও উদরাময় রোগে অকালে পরলোক গমন করেন, মৃত্যুকালে ২৬।২৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল, ইঁহার পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়, গোবিন্দ কুমারের পিতামহ ৺ গঙ্গাদাস শিরোমণি মহাশয়ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, এবং গোবিন্দ কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও কবিতা রচনাদি করিতে পারিতেন। তিনিও অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন, গোবিন্দ কুমার বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নের পর, চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনার স্পৃহা জন্মে, কোন অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইলে তিনি ঐ বিষয়ে কবিতা রচনা করিতেন। তাহার পরিণতিই "নলবাসনা" কাব্য। সেরপুর, চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালীন এই কাব্য রচনা করেন। ১২৮৯ সনে সেরপুর "চারুযন্ত্রে" এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় গ্রন্থের নামের নিম্নেই অতি সুন্দর একটী শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"অসমর্থ প্রযত্নোঽপি
সন্তোষং জনয়েৎ সতাং
পদে পদে প্রস্খলতো
বালস্যেবাটনোদ্যমঃ"।

গ্রন্থকারের স্বভাব অত্যন্ত বিনীত ছিল। পাঠকগণ উপরের লিখিত শ্লোক ও গ্রন্থকারের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা পাঠেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

আশা বলেই এই কঠোর সংসার ক্রিয়া, নির্ব্বাহ হইতেছে, প্রাণি মাত্রই আশার দাস, আমি ও আশাবলে, এই নলবাসনাকে জন সমাজে প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম না যে শত সহস্র উপহাস, আমার প্রতি তাকাইতেছে। বাস্তবিক আমি স্বর্গীয় যশঃ প্রসূনের সুরভি আঘ্রাণে আশা করি না। ইহা দ্বারা শিক্ষা ও উৎসাহ ভিন্ন অন্য কোন আশা নাই—এই পুস্তক আমার প্রথম রচনা, ইহার পদে পদে দোষ থাকা সম্ভব, ধীরগণ তাহা সংশোধন পূর্ব্বক উৎসাহ প্রদান করেন এই মাত্র প্রার্থনা।

পাঠকগণের কবির রচিত কাব্য পাঠের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য নল বাসনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা পাঠেই কবির প্রতিভার পরিচয় পাইবেন গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

হংসের প্রতি।

"কি কহিলে, হংসরাজ, নরেন্দ্র কাহিনী!
বহিলে কি সুধা-ধারা শ্রবণ বিবরে!
উচাটন মনঃ প্রাণ, অবশ এদেহ
প্রেমরসে; কাঁপিতেছে দুরু দুরু করি।
আঁকিলে হৃদয়-পটে, চিরকাল তরে
সে মধুর শান্ত মূর্ত্তি; কেমনে ভুলিব
সেরূপ মাধুরী! যাহা রাজিছে হৃদয়ে,
বিতরিয়ে অনুপম উজল কিরণ,—
শারদ কৌমুদী যথা সরসী-উরসে।
চির চিন্তা, চির ধ্যান, হইল আমার
সে চারু মোহন রূপ! ইষ্ট মন্ত্র সম
জপিব সে মধু মাখা—সুকোমল নাম।
হৃদয় কানন মাঝে, ধীরে ধীরে বহি
প্রেমানিল, অলক্ষিতে ফুটাইল আজি
মানস কুসুমরাশি; কে পারিবে বল
রাখিতে নিভৃতে ইহা; হংস কুলপতি!
ভানু-প্রেমে ভানুপ্রিয়া নলিনী সুন্দরী
যে বিমল-সুখ (আহা) লভয়ে মনেতে
পারে কি গোপনে তাহা রাখিতে কখন!
অমনি সে খুলি দেয় হৃদয়ের দ্বার।
বাহিরের চারু দৃশ্যে, বন্ধু জনে মম
নেত্র আর নাহি চায়; বাঞ্ছিত কেবল
হেরিতে সেচারু রূপ অঙ্কিত হৃদয়ে।
লজ্জাধীনা কুলবালা, পারিব কেমনে
প্রকাশিতে মুক্তভাবে, হৃদয়ের ভাব?
জানিনা কি পাপে হায়! পৃথিবী ভিতরে
সৃজিলেন বিশ্বপতি কামিনীর কুল;
কামিনীর বন্ধসম কামিনী হৃদয়,
সহসা স্খলিত হয়, পর জন আশে—
পরের লাগিয়ে মরে, পরাধীন প্রাণ,
চিরদিন; মনঃ কথা পারেনা কহিতে
পরজনে মরে যদি লজ্জার কারণ
শতাধিক্ হেন লাজে; প্রেমের অধিক
কিবা আছে প্রিয়তম এভব মণ্ডলে?
প্রাণ দিয়ে রাখি যারে; লোকলজ্জা ছার
তার তরে আচ্ছাদিব সেদিব্য আলোক?
কে পারিবে হেন কায? কে পারে ঢাকিতে
বসনে অনলরাশি, পোড়াইতে দেহ?"

এই কাব্যে ৭টী অধ্যায় আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক অধ্যায়ের কবিতাই অতি মধুর ভাব সম্পন্ন, এবং ললিত পদাবলীতে পরিপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায় "হংসের প্রতি।" দ্বিতীয় অধ্যায় "নিদ্রাভঙ্গের পর"। তৃতীয় অধ্যায় "মদনের প্রতি"। চতুর্থ অধ্যায় "চন্দ্র সন্দর্শনে সচকিতে।" পঞ্চম অধ্যায় "কোকিলের ধ্বনি শ্রবণে।" ষষ্ঠ অধ্যায় "পিঞ্জরস্থ শারিকার প্রতি।" সপ্তম বা শেষ অধ্যায় "বিলাস বনে কোকনিতম্বিনীর প্রতি।"

নিদ্রাভঙ্গের পর অধ্যায়ের প্রথমে লিখিয়াছেন :—

হায় সখি! কি দেখিনু নিশার স্বপনে,
শুনিয়ে ছিলেম যাহা হংসরাজ মুখে—
কেমনে বলিব হায়—কুলবালা আমি
লজ্জাবতী; কিন্তু সখি পারিনা রহিতে
ইচ্ছায় কে করে বল প্রলাপ বিকারে?
সে চারু-প্রশান্ত-কান্তি ভাবিয়ে হৃদয়ে;
শ্রান্তিকরা নিদ্রা-কোলে ছিলাম মগনা;
সখিরে—এ পোড়া প্রাণ সুধার প্রবাহে
ভাসিল; কে যেন আনি থইল হৃদয়ে
স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্ত রূপে সে নব পুরুষে।
সহসা মেলিয়ে আঁখি; আহা মরি মরি!
দেখিনু সে চারু মূর্ত্তি, যথা চকোরিণী
সতৃষ্ণ নয়নে হেরে, সুধা নিধিচ্ছবি।

প্রত্যেক অধ্যায়েই কবি এরূপ সুন্দর ভাব কবিতায়

প্রতি ফলিত করিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য অধ্যায় হইতে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

কবি গোবিন্দ কুমার এই অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং "চকোর দূত" নামে "মহাকবি কালিদাসে"র "মেঘদূত" কাব্যের অনুকরণে সংস্কৃত খণ্ড কাব্য প্রনয়ণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। * গ্রন্থখানা মুদ্রিত না হওয়ায় তাহার সংস্কৃত কাব্য রচনার বিকাশ সকলে দেখিতে পারেন নাই। দেশের দুর্ভাগ্য কবি গোবিন্দ কুমার জীবিত থাকিলে আমরা আরও তাহার অমিয় মধুর লিখা কবিতা দেখিতে পাইতাম। ৺কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জীবিত অবস্থায় কবি পরলোক গমন করিয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঐ গ্রামবাসী "যোগ ও বিযোগ" ও "বোধন" ও "প্রেম পুষ্পাঞ্জলি" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচয়িতা কবিভূষণ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে 'শোকোচ্ছাস' মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতেও গোবিন্দ কুমারের জন্য বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন, ঐ গ্রামবাসী "লৌহিত্য জ্ঞান দীপিকা" প্রণেতা সুপণ্ডিত ৺ব্রজকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয় গোবিন্দ কুমারের জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে এরূপ অল্প বয়সে এরূপ সুন্দর রচনা শক্তি দেখি নাই, গোবিন্দ কুমার জীবিত থাকিলে আমাদের গ্রামের এবং ময়মনসিংহের গৌরব সাহিত্য সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিত" বারান্তরে এ জেলাবাসী অন্যান্য লেখকগণের ইতিবৃত্ত প্রকাশের চেষ্টা করিব।

শিমুলজানি বিজয়া লাইব্রেরী } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
পোঃ বাজলা (ময়মনসিংহ) }

* শাখুয়াই গ্রাম নিবাসী সুপণ্ডিত ৺ দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গোবিন্দ কুমার যে "চকোর দূত" কাব্য প্রনয়ণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিখিয়াছিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে পাণ্ডুলিপি আছে কিনা অবগত নহি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে গোবিন্দ কুমারের প্রতিভার আরও পরিচয় পাইতাম। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রঃ লেখক।

প্রবাদের তথ্য।

[শ্রীদীন বন্ধু দত্ত বিদ্যাবিনোদ]

একটা প্রবাদ আছে—"বৈশাখের পদ্মপত্রে রাখিয়া ঘি ভাত খাইলে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়, শনি দূরে যায়।" প্রবাদটী শুধুই প্রবাদ; না উহার মূলে কিছু সত্য আছে তাহার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। খুব বেশী নয়—কোন কোন স্থানে আজও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মেয়েরা বৈশাখ মাসে শনি মঙ্গলবারে অথবা স্থল বিশেষে রবি বৃহস্পতিবারে মোট কথা পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া ছেলে পেলেদিগকে পদ্মপত্রে ঘি ভাত খাওয়াইয়া থাকেন। যে স্থলে পদ্মবন সহজলভ্য সেই সমস্ত স্থানেই এইরূপ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহার প্রচলন খুবই কম।

এরূপ প্রবাদ কেন, ইহার মূলে কি, কোথা হইতে এগুলি সমাজে কেন স্থান পাইয়াছিল? আমরা কেহই তাহার অনুসন্ধান করিনা। মেয়েলী আচার বলিয়া অন্ধের মত মানিয়া লই, অথবা খোঁজ খবরই করিনা। অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক, ওগুলিকে নেহাত গণ্ডগ্রামের মেয়েদের আচরিত কুসংস্কার বলিয়াই মনে হয়; স্থল বিশেষে ঐসমস্ত নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরোচিত ব্যবহার বলিয়া গালি বর্ষণ করিতেও শিক্ষিত সমাজ কোন শঙ্কা বোধ করেন না। অথচ মানিয়া লইতেছে আমার তোমারই ঠাকুর মা, দিদিমা মা বাপের পিসীমা...... ইত্যাদি। প্রাচীনারা আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়, নবীনা উহাতে মোটেই গা ঘেষেনা। একথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, অসম্বদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কারণত্ব কল্পনাই কুসংস্কারের মূল; কিন্তু অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বিনা বিচারে সকল পুরাণ কথাতেই কুসংস্কার আরোপ করা যে আবার প্রত্যবায়ের জনক নূতন আর একটী কুসংস্কার ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। নূতনের চার পেলা আর দুই এক খানা বিস্কিটকে সকাল বেলার বাল্য ভোগরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাচীনের ফেনা ভাত ঘি ভাত আর নুন ঘোলকে উপেক্ষা করিয়া

করিয়াই আজ ঘরে ঘরে মর্কট মাতৃকা। নবীনের যাহা কিছু সমস্তই ভাল আর প্রাচীনের সমস্তই মন্দ এইরূপ ধারণা অত্যন্ত দোষযুক্ত এবং অর্ব্বাচীনের বুদ্ধি। প্রাচীনে নবীনে মিশাইয়া বিচার পূর্ব্বক দেশ কাল পাত্র ভেদে যাহা শোভন তাহাই গ্রহণ করা জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। এইরূপ বিচার না করাতেই আমরা অনেক সত্য হারাইয়া ফেলিয়াছি—যাহা দেশের পক্ষে বস্তুতঃ উপযোগী ও উপকারী। একটু চিন্তা করিলেই উহার সত্যতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে দ্রব্যগুণ বিচার করিতে গেলে প্রাচীনকে একটু আশ্রয় না করিলে চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদে পদ্মের পত্র, পুষ্প, কেশর, মৃণাল, মূল ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের গুণ ও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এখানে তাহার পত্র ও মৃণাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পদ্মের নূতন পত্রের নাম "সংবর্ত্তিকা"। "সংবর্ত্তিকা নবদলং বীজকোশস্তু কর্ণিকা... ইত্যাদি।" এই সংবর্ত্তিকার অর্থাৎ নবপত্রের গুণ অনেক। পদ্মের নূতন পত্র—শীতল, তিক্ত, কষায় গুণ বিশিষ্ট এবং ইহা দাহ তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ, গুহ্যদ্বারের নানা প্রকার ব্যাধি ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারক।

"সংবর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহ তৃট্ প্রণুৎ।
মূত্র কৃচ্ছ গুদব্যাধি রক্তপিত্ত বিনাশিনী॥"

আবার শাস্ত্রীয় ভোজন পাত্র নির্ণয় বিচারে দেখা যায় যে, পদ্মপত্রে ভোজন বেশ হিতজনক।

"পদ্মপত্রে ভবেৎ পুষ্টি হবিষ্যাশী তু পুণ্যবান্।"
(মৎস্য সূক্ত-তন্ত্রে)

ইহার অর্থ এই পদ্মপত্রে হবিষ্যান্ন করিলে পুষ্টি ও পুণ্য হয়। এই দুইটী কথা মিলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়-বৈশাখ মাসে নূতন পদ্মপত্রে ঘি ভাত খাইলে যে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা অমূলক নহে। পদ্মপত্রে যে সকল গুণ আছে, তাহাতে দেহ সাধারণতঃ নিরাময় থাকিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

শীতকালে পদ্মের পাতাগুলি মরিয়া যায় বসন্তের শেষভাগ হইতে কিছু কিছু করিয়া নূতন পাতা গজাইতে থাকে। বৈশাখ মাসে পাতাগুলি পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট ও সতেজ হয়; সুতরাং বৈশাখের পাতা গুণ বিষয়ে অন্যান্য কাল হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাতে গরম ভাত ঢালিয়া দিলে ভাতের গরমে পাতার কতক সারাংশ বাহির হইয়া ভাতের সঙ্গে মিশে। ঘৃতসহ তাহা সেবন করা আর শাস্ত্র মত পদ্মপত্রের রস পান করা যে বহু পরিমাণ এক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার মতে বৈশাখ মাসে প্রতিদিনই পদ্ম পত্রে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা উচিত। অন্ততঃ পক্ষে ছেলেপেলেদিগকে গরম ঘৃত সহ পদ্মপত্রে গরম ভাত খাইতে দিলে নিশ্চয় তাহাদের দৈহিক অমঙ্গল দূর হইবে এবং দেহটী নিরাময় থাকিবার সাধারণ বীজ অঙ্কুরিত থাকিবে।

মৃণাল—গ্রীষ্মকালে পদ্মের মৃণালের রস সেবনও উপকারজনক। পদ্মের মূলদেশ হইতে সাদা বর্ণের নাল বাহির হইয়া মাটির নিচ দিয়া কতকদূর যাইয়া আবার গাছ হয়। এই ভাবে পদ্মবনের বিস্তৃত ঘটে। সেই সাদা সাদা নাল গুলির নাম মৃণাল। মৃণাল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যবর্দ্ধক, গুরু ইত্যাদি এবং ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষি প্রশমক।

মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহ্র জিদ্গুরু।

সচরাচর মৃণালের রসই খাইয়া থাকে। উহার ছাবা ফেলিয়া দিয়া শুধু রস খাইলে গুরু বা দুষ্পাচ্য হয় না। ছাবা শুদ্ধ খাইলে গুরুপাক হয়। অল্প পরিমাণে রস সাক চিনি বা মধু সহ খাইতে হয়। একবারে অধিক পরিমাণে রস খাইতে নাই তাহাতে একটু কফবৃদ্ধি হইতে পারে। একবারে অধিক পরিমাণে যে জিনিষ খাওয়া যায় তাহাতেই অপকার ঘটে। বস্তুতঃ পদ্মপত্রে ঘি ভাত খাওয়া এবং সহ্যমত অল্পাধিক পরিমাণে মৃণালের রস পান করা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যে হিতজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। যে দেশে যাহা জন্মে দেশ কাল পাত্র ভেদে সেইদেশ জাত তত্তৎ পদার্থগুলি দেহ পালনে শুভকরী, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই কথাটা মনে থাকিলে গৃহীজীব সুস্থদেহে নিশ্চয় দীর্ঘায়ু হইতে পারে এবং অল্পেই বা সামান্য

দোষেই দেহকে রোগ গ্রহণ করিতে পারেনা। এই ভাবে ক্ষুদ্রকে জড়াইয়াই মহত্তের পূর্ণ বিকাশ। ক্ষুদ্রই এই মহান বিশ্ব বিকাশের মূল এবং সর্ব্বক্ষণ তদ্দ্বারাই নিয়মিত।

সাহিত্য ও জীবন।

[শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

সাহিত্য ও জীবনের এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল সংসর্গ অর্থাৎ জাতির জীবনের গতির প্রত্যেকটি পদচিহ্ন সাহিত্যের বুকে অঙ্কিত থাকে। জাতির সুখ, দুঃখ, আশা, গৌরব, ভয় ও দুর্ব্বলতা, প্রত্যেকটির অনুভূতি সাহিত্যের অতি সূক্ষ্মভাবগ্রাহী বুকে স্পন্দন জাগায়। সমাজ ব্যতীত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রতি যুগের, প্রতিদেশের, সাহিত্যের অন্তর তলাইয়া দেখিলে সেই দেশের, সেই যুগের নরনারীর ভাব ও চিন্তা অতি সহজেই চোখে পড়ে।

এখন কথা হইল সাহিত্যে আশা উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত। যদি সাহিত্য জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি হয় তবে তাহার নিকট ইতিহাস অপেক্ষা অধিক কিছু পাইতে পারি না। ইতিহাস ও সাহিত্যের তফাত এইখানে—ইতিহাস গড়িয়া উঠে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘকে কেন্দ্র করিয়া—আর সাহিত্য গড়িয়া উঠে সাধারণ নরনারীর জীবন কেন্দ্র করিয়া। সেখানে বিশিষ্টের স্থান আছে বটে কিন্তু হিসাবে নহে, মানুষ হিসাবে। আর এক পার্থক্য এইখানে, ইতিহাস বাহিরেই ঘুরিয়া বড়ায়, অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তর তলাইয়া দেখিবার অবসর ও উদ্দেশ্য তাহার নাই। সাহিত্য অতি ঘরের ব্যাপার। ইতিহাস জাতীয় জীবনের হিসাব নিকাশ; ইতিহাসের নায়ক নায়িকার প্রখর প্রভায়, সাধারণের জীবন চোখে পড়ে না, কিন্তু সাহিত্য রজনীর স্নিগ্ধ আকাশ, প্রত্যেকটি নক্ষত্রই আপন আপন আলো বসাইয়া জ্বলিতেছে—অবশ্য অগণিতের মধ্যে শুধু কয়েকটিই চোখে পড়ে।

যেদিন "প্রথম প্রভাত উদয় হইল গগনে" সেইদিন হইতেই মানুষ মনের কথা ও ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে ব্যাকুল। মানুষের আদিম সাহিত্য তাহার শৈশবের একান্ত সরলতার পরিচায়ক, জগৎ তাহার কাছে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, মহিমা ও বিস্ময়ের আকর। তাহার জীবন ছিল প্রভাতের রাঙা অরুণ আলোর মতই সরল ও মধুর। প্রকৃতি ও তাহার মধ্যে অকপট সখ্যের সম্বন্ধ ছিল। প্রকৃতি ও মানবে ব্যবধান অতি সল্প ছিল। সেই শিশুমানব সরলচিত্তে আপনার অজ্ঞাতসারেই যেন সে গান গাহিয়াছিল—তাহাতে আমরা পাই অন্তরের বাহ্য বিকাশ ও জগতের সহিত সম্মিলন। কিন্তু ইহার মধ্যেও মানুষের একটা নিজস্ব গৌরব। তাহার অন্তর অন্ধকার চায়না—তাই সে জীবনের আরম্ভেই মহাজ্যোতির পূজা আরম্ভ করিল।

যুগবিবর্ত্তনের সাথে সাথে মানুষের মন বাহির ছাড়িয়া ভিতর লক্ষ্য করিল। প্রকৃতিকে জয় করিবার ইচ্ছা হইল তাহার প্রবল। সখ্যের বন্ধন টুটিয়া গেল, শাসক শাসিতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বোধন হইল মানবের জয় গানে।

আধুনিক সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বাহ্য প্রকৃতি আমাদের জীবন হইতে যতটুকু বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে সাহিত্যে ও সেই বিচ্ছেদের লক্ষণ দেখাদিয়াছে। কবি প্রকৃতিকে ভালবাসেন, তাহার অন্তরের ভাষা বুঝিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃতির আপন হইয়া নহে, সেই সংসারের জ্ঞান ও বুদ্ধি লইয়া। প্রকৃতি আর আলাদা নহেন আমাদের ঘর সংসারেরই একজন। কিন্তু ভয় হয়, হয়ত বা ভবিষ্যতে প্রকৃতি তাহার এই অধিকার টুকুও হারাইবেন। মানুষ সৌন্দর্য্যের পূজারী। মনো-বিশ্লেষণ যে দিন সাহিত্যের কার্য্য হইল সেইদিন অবশ্য সৌন্দর্য্যে বিচারের কথা উঠে নাই। সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রেরণাই ছিল মনের আঁধারে, কাঁটার পাশে যে সুন্দর ফুলটি অস্ফুট রহিয়াছে তাহাকে কলাকৌশলে ফুটাইয়া তোলা। প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্য রুচি যেমন ছিল পবিত্র সৃষ্টিও ছিল তেমনি স্বাভাবিক। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যে সাহিত্যে কেবল চেষ্টাকৃত নিখুঁত সৌন্দর্য্য

সমাবেশ করা হইয়াছে তাহার প্রভাব মানব মনে অমর হইতে পারে নাই। মানব প্রকৃতি সনাতন। Animality ও rationality মানব প্রকৃতির মৌলিক উপাদান। একটি একান্ত পার্থিব। অপরটি এই পৃথিবীর হইয়াও যেন কোন সুদূরের সহিত সংবদ্ধ। মানুষ কোন দিনই একটির অপেক্ষা অপরটিকে অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারে নাই। এই পৃথিবীকে সে খুবই ভালবাসিয়াছে। সুতরাং এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ভোগ করিয়া বাঁচিতে হইলে কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। সাহিত্য মনেরই ছাপ। যে সাহিত্যে মানবের দুইটি ধর্ম্ম অকপট ভাবে অঙ্কিত আছে সেই সাহিত্যই একটু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। মানুষের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রুচি আছে তাহা সুন্দর ও কুৎসিতের নিরপেক্ষ সংমিশ্রণ হইতে সৌন্দর্য্য সন্ধান করিয়া লয়। কুৎসিতও একান্ত সরলতা ও সৎ সঙ্গের ফলে পাঠকের মনে গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে। শ্বেত ও কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশে কাহারও ক্ষতি হয় না। একে অপরকে ফুটাইয়া তোলে। ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ধর্ম্ম।

বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাসের যে এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল তাহাতে প্রাচীনের প্রতি একটা ভীষণ বিদ্রোহের ছায়া অতি নিবিড় হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে এমন কি মানুষ এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই বিদ্রোহ-ভাবের মূলে অনেকের মতে হেতু আছে, আবার কাহারও প্রাণ প্রাচীনের প্রতি কঠোরতায় দুঃখে টন্‌টন্ করিতেছে। সাহিত্যেও সেই বিদ্রোহের ছায়া অবশ্য পড়িবে। এখন তাই সমস্যা সাহিত্যের ধর্ম্ম কি হইবে, জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকু এবং কিরূপ হওয়া উচিত। এই সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এইখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে রাষ্ট্র এবং সমাজ যেমন যুগে যুগে নব নব রূপ পায়, সাহিত্যও সেইরূপ যুগে যুগে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টার আগে দেখা যাউক সমাজ জীবন ও সাহিত্যের মাঝখানে দেনা পাওনার সম্বন্ধ কতটুকু। প্রথমেই আমরা দেখিয়াছি জীবন ব্যতীত সাহিত্যের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তবে সমাজ সাহিত্যের নিকট কি কতটুকু দাবী করে তাহা আলোচনা করা যাউক। অনেকের মতে সাহিত্য হইবে জীবনের পথ নির্দ্দেশক। তাহার প্রধান কাজ সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের আদেশ প্রচার। আবার অনেকের মত এই যে সাহিত্য বস্তু প্রধান হইতে পারিবে না। তাহা হইবে এক মোহময়, অপূর্ব্ব এক কল্পলোকের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। বাস্তব জীবন কবির কল্পনা হইতে চির নির্ব্বাসিত। প্রথম অভিমতটীর বিচার করিলে দেখিতে পাই যে সাহিত্যের জীবন অতি সীমাবদ্ধ। তাহা কখনও বিশ্বজনীন হইতে পারে না, অমরত্বও দাবী করিতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ত ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছে সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে আজ যাহা সত্য কাল তাহার মূল্যই থাকিবে না। দ্বিতীয় মতটী যাহা বলিতে চায়, তাহা জীবনের পক্ষে একেবারে ব্যর্থ। মানুষ যাহা কল্পনা করে তাহা মাত্র জীবনের প্রতিবিম্ব। এমন কি সে ভগবানকেও নিজের মূর্ত্তিতে কল্পনা করে, তাহাতে নিজের সুখদুঃখ, আনন্দ ও অশ্রু আরোপ করে। বিগত যুগে কবি যাহা কল্পনায় অতি রমণীয় করিয়া আঁকিয়া ছিলেন। আজ এই বিজ্ঞানের যুগে অবশ্য তাহা পাঠকের কাছে ব্যঙ্গের মতই মনে হইবে।

আধুনিক পাঠক হয় ত প্রাচীনের সরলতার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া সেই কল্পনাকে সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহা তাহার মনে রূপ-কথার পরীর রাজ্যের মতই কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারেনা। তবে প্রাচীন সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের মূল্য এই, যে তাহা সেই জীবনের শিশুসুলভ সরলতার পরিচায়ক। এই দুই মত হইতে এই সাধারণ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সাহিত্যে যুগোচিত আশা ও আকাঙ্খা স্থান পাইবে, সৌন্দর্য্য হইবে তাহার প্রকাশ; কিন্তু এক বিরাট জাতীয় জীবন থাকিবে তাহার মূলে। তৈল ও সলিতা আলোর জীবন ও অবলম্বন; কিন্তু তাহাদের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ সত্ত্বেও আলো অনেকখানি

আলাদা। এই সব বিভিন্ন মত থাকিতেও আমরা হয়ত এই বলিতে পারি, সাহিত্য হইবে মানবের চরিত্রের একটা দর্পণ। কাল ও দেশ, সমাজ ইত্যাদি তাহার পরিবেষ্টনী। আগেই আমরা দেখিয়াছি, মানব চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব অন্য কোন কিছু একযুগের বা একদেশের সাহিত্য সারা পৃথিবী জুড়িয়া স্মরণাতীত কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি করিয়া সুদূর অতীতের সাহিত্য আজ আমাদের নিকট প্রিয়? তার কারণ একটা ছোট উদাহরণেই বুঝা যাইবে। সবাই দর্পণে আপন আপন মুখ দেখিতে ভালবাসে—সে মুখ গৌর হউক বা কাল হউক। শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্য এই জন্য আমাদের প্রিয়, যেহেতু তাহাতে দেখিতে পাই আমাদেরই অতি পুরাতন মুখের একটু হাসির রেখা, দুঃখের অশ্রুর একটী অক্ষয় দাগ, প্রেমের গাঢ় রক্তিমরাগ, শুনিতে পাই সেখানে বিরহদগ্ধ হৃদয়ের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। ডারুইনের বিবর্ত্তনবাদ যদি সত্য হয়, তবুও ভয় নাই। আমরা সুদূর ভবিষ্যতে যদি অতিমানবত্ব লাভ করি, তবে আমাদের এযুগের প্রকৃত সাহিত্য তার মূল্য হারাইবেনা। তখন হয়ত ইহা আমাদের নিকট মনে হইবে শিশুকালের অর্থহীন হাসির মতই। হয়ত তখন বয়োবৃদ্ধ অতি মানবের মনে শৈশবের স্মৃতি মনে পড়িবে, হয়ত অজ্ঞাতসারেই তাহার হৃদয়দেশ হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস উঠিবে।

এখন দেখা যাউক জীবনের সাথে সাহিত্যের কতটুকু মিল থাকিবে। মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যজগতে এক অভিনব চিন্তার হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে, সেই হাওয়া অনেকের মতে নূতন জীবনের দূত, আবার অনেকের মতে বর্ত্তমান সমাজ ও ধর্ম্মের মৃত্যুরই সূচনা। আধুনিক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মতে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রকৃত সাহিত্যের বিকৃতি—যেমন পবিত্র বসন্তোৎসবের বিকৃতি চিৎপুর রোডের হোলির মাৎলামি। আধুনিক সাহিত্য পাঠ করিয়া এই ভাবটী হয়ত অনেকেরই মনে আপনি উঠিতে পারে। অনেকে আবার বলিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ এ যুগের, তাঁহার মন প্রাচীন সংস্কারের হাত এড়াইতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্তমত সত্য হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে মনে যে ভয় হয় তাহা কি একেবারে ভিত্তিহীন? সাহিত্যের উদ্দেশ্য অনাবিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আধুনিক সাহিত্যের সারবত্তা আলোচনা করিলে অতি সহজেই একটী বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বৈশিষ্ট্যটি এই—যাহা কিছু নীচ সমাজে বা রাষ্ট্রে, তাহারই জীবনের অগীত-পূর্ব্ব-গীতি আধুনিক সাহিত্যে শুনিতে পাই। দরিদ্রের ভাঙ্গা ঘরের জীবনের করুণ ইতিহাস, পতিতের জীবনের আলোক এবং আঁধার আধুনিক সাহিত্যের উপর অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকদের কেহ এই সাহিত্যে পতিতোদ্ধারকে একটু অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানুষের স্বাভাবিক শ্লীলতা যে বৃত্তিটীকে চাপিয়া রাখিতে চায়, সাহিত্যে সেই বৃত্তিটীকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের নজীর এই যে আমরা যাহাকে পাশবিকবৃত্তি বলি তাহা মানুষের পক্ষে যাহা আমরা সুবৃত্তি বলি তাহার চেয়ে কোন ক্রমেই কম সত্য নহে। অতএব চরিত্র বিকাশের মধ্যে উভয়েরই স্থান হইতে পারে। এই আদর্শ নিয়া এমন অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে সাহিত্য লক্ষ্মীর কমলবনে ভ্রমর গুঞ্জণের পরিবর্ত্তে কর্দ্দমছড়াছড়ি ও বিকট চীৎকারই খুব বেশী। এই মতবাদী সাহিত্যিকরা ছাইগাদা হইতে রত্ন খুজিতে যাইয়া, উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, কাঁদা ঘাঁটাই সার হয়। আধুনিক সাহিত্যের একটা বিশেষ লক্ষণ একটা বিরাট অতৃপ্তি, অসন্তোষ এবং দারুণ হাহাকার। এই pessimistic ভাব পূর্ব্বোক্ত ভাবটীর সহিত মিলিয়া এক অপরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই ধরণের সাহিত্যের মধ্যে যাহা আমাদের বেশী পীড়া দেয়, তাহা এই যে উহার প্রতি কথায় মানুষের পরাজয়ের কথাই মনে পড়ে। মানুষের গৌরব কি পরাজয়ে না জয়ে? সাংসারিক এবং মানসিক সংগ্রামে মানুষ কি নিয়তই পরাজিত হইতেছে? কখনই নহে। মানুষ কখনই এত অসহায় নহে। আধুনিক সাহিত্যের লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসহায় নরনারী

আমাদের সহানুভূতির চেয়ে কি ঘৃণার উদ্রেক অধিক করেনা? পাঠকও হয়ত মানুষের পরাজয়ে প্রতি পদে পদে লজ্জিত হন। আমাদের মনে হয় সাহিত্য মানবের জয়গান ব্যতীত কিছুই নহে। মনে রাখিতে হইবে হোমারের বীণা বাজিয়াছিল মানবের জয় যাত্রার তালে তালে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্য জাতির জীবনের সত্য ইতিহাস। আমরা যেমন সাহিত্যের গতি অনুসরণ করিতে করিতে সভ্যতার আদিতে পৌঁছিতে পারি—আমাদের ভবিষ্যতেরাও যখন বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্যে আমাদিগকে খুঁজিবে, তখন হয়ত তাহাদের মন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিবে। অবশ্য এই ধারণা সংস্কৃত রুচি সঙ্গত।

আমরা দেখিয়াছি সাহিত্য ও জীবনের সম্বন্ধ কতটুকু। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য ও লক্ষণ। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ অবশ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সকল সত্যই সাহিত্যের আসরে স্থান পাইতে পারেনা। সাহিত্যে থাকিবে শুধু নরনারীর জয়গীতি ও সরল জীবন বিবৃতি। তাহাতে হাসিকান্নার স্থান আছে—কখন?—যখন হাসিতে মুক্তার ফুল ফোটে ও অশ্রুতে অম্বর মুক্তা ঝরে; ফুলের সৌরভে ও মুক্তার আলোতে নরনারী এক মহিমময় রূপ ধারণ করে। মানুষ গৌরবের কোলে জন্মিতে চায়, বাঁচিতে চায়, মরিতে চায়। সেই তাহার আনন্দ। সাহিত্যেরও মহত্ত্ব সেইখানে—সে জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবের উজ্জ্বল ছবি। এই মহত্ত্বে মানুষ নীচতা, দীনতা ভুলিবে; গৌরবে তাহার শির উচ্চ হইবে, বুকে অফুরন্ত আশা জাগিবে, আলোক সম্পাতে সে চির দেদীপ্যমান হইবে। সংসারের সকল বিষ ছানিয়া যে সাহিত্যরূপ অমৃত উঠিবে তাহাতে সে অমর হইবে। এই সাহিত্যেরই কল্যাণে তাহার জীবনের সকল কণ্টক ধ্বস্ত করিয়া এক অনুপম অক্ষয় আনন্দফুল ফুটিবে।

পুস্তক পরিচয়।

স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গে:—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মূল্য ৷৷০ আনা।

এস, কে, লাহিড়ী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ বাবু একজন প্রবীন সাহিত্যিক, উচ্চ শিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক নূতন কথা শুনিবার আশা করি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি স্যর গুরুদাসের ধারাবাহিক জীবন চরিত নহে। চরিত্রে ও ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে, স্যর গুরুদাস একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এই পুস্তকে স্যর গুরুদাসের বৈশিষ্ট ফুটাইয়া তুলিবার ও প্রয়াস হয় নাই। ইহাতে স্যর গুরুদাসের সহিত পদ্মনাথ বাবুর আলাপ পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। গ্রন্থে গুরুদাস যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবর্ত্তক ইহা আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে। গুরুদাসের জীবন চরিত লেখক যদি ইহা হইতে কোন সাহায্য পান তবে ইহার মুদ্রণ সার্থক হইবে।

নিবন্ধ নিচয়:—অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল প্রণীত মূল্য এক টাকা। লেখক বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা একত্র গ্রথিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। "সৌরভে" ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধানতঃ সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষভাবে একটা আন্দোলন এবং আলোচনা চলিয়াছে। আমাদের দেশে আদি কবি বাল্মিকী হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই সাহিত্যের একটী সনাতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া

আসিয়াছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের নূতন আদর্শ আমদানি হওয়ায় এদেশে একটী নূতন দলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা কলা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই সাহিত্যিকের একমাত্র উদ্দেশ্য এই মত প্রচার করিতেছেন। নরনারীর যৌন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াই তাহারা কলার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইব্‌সেন ও বার্ণাডশর বঙ্গীয় শিষ্যগণ অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের আবহাওয়া কলুষিত ও পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছেন। গুরু মন্ত্র উপলব্ধির অভাবে ও শক্তিহীনতার দোষে শিষ্যগণ এদেশে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। এই গ্রন্থে লেখক অতিশয় দক্ষতার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শের দোষগুণ বিচার করিয়াছেন। লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌সেনের অনেক শিষ্যই গুরুর কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াই তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং তরুণ সাহিত্যিকদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, পড়িলে উপকৃত হইবার আশা আছে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব প্রকাশ করিবার নৈপুণ্য ও বেশ আছে।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে এ জেলার গৌরব নবাব নবাবআলি চৌধুরী সি, আই, ই, আর ইহ জগতে নাই। গত ৩রা বৈশাখ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। নবাব সাহেব বঙ্গবাসীর একজন সাধক ছিলেন। তিনি "সৌরভের" একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন। কিছুদিন হয় তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পর হইতে সাহিত্য সেবা ছুটীয়া গিয়াছে এবং আমার সময়ও নাই। যাহা হউক অবসর মত ভবিষ্যতে মাতৃভূমির গৌরব এবং আমার একান্ত আদরের "সৌরভে" প্রকাশার্থ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইব।" হায় সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য সংবাদ।

২০শে বৈশাখ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ময়মনসিংহ সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগামী সংখ্যায় তাঁহার অভিভাষণ "সৌরভে" প্রকাশিত হইবে।

বৈশাখ হইতে "আলিয়া" নামে একখানা মাসিক পত্র এই নগর হইতে বাহির হইতেছে। আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সৌরভের লেখক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ মহাশয় "দক্ষিণা" নামক ছেলেদের জন্য তিন অঙ্ক একখানা নাটক প্রকাশ করিয়াছেন।

সৌরভ-

স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর
বাহাদুর সি, আই, ই।

সপ্তদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬। চতুর্থ সংখ্যা।

অভিভাষণ

[অধ্যাপক—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল্]

আপনারা সকলেই জানেন এই বিস্তীর্ণ ময়মনসিংহ জেলায় অনেক প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে—অনেক ঐতিহাসিক মালমসল্লার খনি এখানে রহিয়াছে, অনেক সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও এ জিলায় হইয়াছে। তার সঙ্গে এটাও বোধ হয় আপনাদের অনেকেরই জানা আছে যে, এখানে অনেক রকম অনৈতিহাসিক, অসাহিত্যিক এবং অবৈজ্ঞানিক—এমন কি, বে-আইনী ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে। তার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভণিতা করিতেছি।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানের চাষারা এক সময়ে বড় দুর্দ্দান্ত ছিল। শোনা যায়, পথিকের উপর তারা নানা রকম উপদ্রব করিত। যথা, কেহ সাইকেলে যাইতেছেন, তাঁহাকে আটকাইয়া বলা হইত, "পথিক, নামিয়া আবার চড়িয়া দেখাও ত, তোমার এই সয়তানের চরকাটায় কি করিয়া উঠিতে হয়। অথবা অশ্বারোহী কেহ সে পথে গেলে, তাহারও হয় ত পথ রোধ করা হইত এবং আরোহীকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আদেশ দিয়া অবরোধকারীদেরই একজন হয় ত কিছুক্ষণ ঘোড়াটাকে মাঠের ভিতর ছুটাইয়া লইত। এ সব অভদ্রোচিত এবং বে-আইনী হইলেও অসম্ভব ছিল না; এবং পথিকের তাতে কিছু অসুবিধা হইলেও তাকে নিজেকে কিছু করিতে হইত না বলিয়া কোন শারীরিক কষ্ট তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু এর চেয়েও অধিক লাঞ্ছনা পথিকের ভাগ্যে এ দেশে ঘটিত বলিয়া শোনা যায়। কখনও কখনও না কি পথিককে দিয়া বেগার খাটাইয়াও লওয়া হইত—যথা, কাহারও ঘাসের বোঝাটা বহাইয়া লওয়া কিংবা গরুগুলি বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া।

সকলেই জানেন, ইতর জন্তুরও সঙ্গীতবোধ আছে। তেমনই রাহাজানি করিত যাহারা তাহাদের মধ্যেও রসজ্ঞ ব্যক্তির অভাব হইত না। তাই, শোনা যায় কখনও কখনও নিরাশ্রয় পথিককে ধরিয়া তাহারা নাকি ফরমাইস করিত গান গাহিয়া যাইতে। যাঁহার গান গাইবার শক্তি থাকিত তাঁর মুক্তি পাওয়া কঠিন হইত না; কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, যাহার ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন তিন পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও ওদিকে ঘেঁসে নাই, তেমন একজনকে যদি হুকুম করা হইত গান 'গাহিয়া যাও' তাহা হইলে তার অবস্থাটা কি হইত! অথচ গান না গাহিলে যে তার মুক্তি নাই। "আমায় গাহিতে বলো না' সে কি শুধু ছলনা, ইত্যাদি কিছু বলিয়াই ত তার মুক্তি নাই। গান তাহাকে গাহিতেই হইত! সে গাহিত, আর ভাবিত কোন পরিচিত লোক যেন তখন সেখানে আসিয়া না পড়ে!

যে দেশের গীতিকা-সাহিত্য বিশ্বের আসরে পসার লাভ করিয়াছে, সে দেশের লোকের সঙ্গীতবোধ এবং রসজ্ঞতায় সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। আর তারা যে পথ-হারানো পথিককে ধরিয়া গান আদায় করিয়া লইত, সেটাও তাদের অতিমাত্র রসবোধেরই পরিচায়ক। আপনারা হয় ত এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই রসবোধ এ দেশ হইতে এখনও

দূর হয় নাই এবং এখনও এ দেশের পথে যারা পথিক হইয়া আসেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, হঠাৎ তাঁহারা বন্দী হইয়া যাইতে পারেন এবং মগধের বন্দী কিংবা রাজস্থানের চারণের মত একমাত্র গানই তাদের মুক্তির দাম হইতে পারে। যে দেশের চাষারাও এমনি করিয়া সস্তায় সাহিত্য সেবা ও সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া লইত, সে দেশের উচ্চ শ্রেণীর ভিতর সাহিত্য ও সঙ্গীত লিপ্সা যে প্রবল একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।' যদি প্রমাণ চান, দৃষ্টান্ত আমি নিজে। আমি যে আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেটা যে কয়েদী হিসাবে নয়, তাহা বলা শক্ত। আমায় যাঁরা গেরেফতার করিয়াছেন, তাঁরা জানেন আমি ছিলাম নিরীহ পথিক। তাঁদের রসলিপ্সার প্রশংসা করি, কিন্তু আমার মুক্তির যে দাম তাঁরা দাবী করিয়াছেন, সেটী কি আমার দিবার শক্তি আছে?

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"You can take a horse to the water but cannot make it drink" আর, ব্যবহারজ্ঞেরা জানেন, সব কাজেরই Specific performance আইনদ্বারা সম্ভব হয় না। কেউ যদি গান গাহিতে চুক্তি করে; অথচ সে চুক্তি রক্ষা না করে, তাহা হইলে এই চুক্তি ভঙ্গের জন্য যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারজন্য গায়কের নিকট হইতে আইন ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দিতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া গান করাইয়া দিবার শক্তি আইনের নাই। কিন্তু সেই শক্তি ময়মনসিংহের লোকের নিশ্চয়ই আছে, নইলে আমি আজ এখানে কেন? হয় ত জোর করিয়া সাহিত্য আপনার আমার নিকট আদায় করিতে ঠিক পারিতেন না, যদি এর ভিতরে আর একটী কারণ উপস্থিত না হইত। যে আপ্যায়ন ও সম্মান আমি আজ এখানে লাভ করিতেছি, সেটী ত অবহেলার বস্তু নয়! বিশেষতঃ যখন ভাবি, কতখানি অযোগ্যতা—কতখানি ক্ষুদ্রতা উপেক্ষা করিয়া এ ব্যক্তিকে আপনারা সম্মানিত করিতেছেন, তখন আমার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে—মন আমার আপনা হইতেই আপনাদের বশে আসিয়া যায়! এ ত কয়েদীর মুক্তির দাম নয়—এ যে কৃতজ্ঞের ঋণশোধ! ঋণ আমার শোধ হইল, ইহা আমি কখনই মনে করি না; কিন্তু পরিশোধের চেষ্টা না করিলে বোঝা যে আমার আরও বাড়িয়া যাইত! আমি কেবল এইমাত্র অনুরোধ করিতে পারি যে, যে গুণে আপনারা পথের পথিককে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন, সেই গুণেই আপনারা তাহার সকল ক্ষুদ্রতা, সকল তুচ্ছতা, সকল ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

সাহিত্য সভায় সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, একথা হয় ত সকলেই জানেন। শিল্পী যে একনিষ্ঠ সাধনার ফলে সৃষ্টি করেন, সেটী তপস্যার মত নির্জ্জনে অনুসরণের জিনিস। কিন্তু সৃষ্ট শিল্পের মূল্যের যাচাই হয় বাইরের জগতে। আমরা এখানে যাঁরা সমবেত হইয়াছি, তাঁদের মধ্যে অনেক সাহিত্য স্রষ্টা হয় ত আছেন; কিন্তু ঠিক এখানে বসিয়াই তাঁরা সৃষ্টি ক্রিয়ায় অগ্রসর হইতে পারিবেন না, একথা বলা চলে—এমন কি, এখানে না আসিলেও তাঁদের সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হইত কিনা তাহাও জানি না। সুতরাং এই প্রকারের সাহিত্য সভা যে সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে না একথা বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু অপরোক্ষ ভাবেও সেরূপ সাহায্য এসব সভা করে না, এমন বলা চলে না।

এপ্রকার সভা যে কেবল সাহিত্যিকদেরই হয়, তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক গবেষণায় যাঁরা নিযুক্ত থাকেন, তাঁদেরও ত এরূপ বৈঠক হইয়া থাকে। কিন্তু একথা কি কেহ বলিতে পারেন, যে, সে সব বৈঠকের ভিতরই গবেষণার সুবিধা হয় সব চেয়ে বেশী? তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এসব বৈঠক হইতে গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়। সাহিত্যেরও তেমনি এই রকম সাময়িক সভাসমিতি হইতে যথেষ্ট উপকার যে হইতে পারে, তাহাও বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

সাহিত্য সভা ও বৈজ্ঞানিক সভার ভিতর একটা পার্থক্য আছে, যাহা এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের বৈঠকে সাধারণতঃ তাঁরাই সমবেত হন, যাঁরা নিজেরা ঐ সব গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন; শুধু জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর সম্মেলনে ঐ প্রকার বৈঠক জমে না। কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চার দুইটী দিক আছে। একদিকে রহিয়াছেন যাঁরা সাহিত্যের স্রষ্টা অর্থাৎ কবি ও ঔপন্যাসিক প্রভৃতি; অপর দিকে থাকেন যাঁরা শুধু সাহিত্যরসপিপাসু কিন্তু শিল্পী নন—শুধু

উপভোক্তা কিন্তু সৃষ্টির শক্তিতে বঞ্চিত অথবা সে আয়াস করিতে অনিচ্ছুক। আমরা এখানে বিবেচনা করিতে চাই, শুধু উপভোক্তা অথচ স্বয়ং স্রষ্টা নন, এরূপ সাহিত্যিকদের বর্ত্তমান সম্মেলনের মত সম্মেলনের কি সার্থকতা আছে?

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাঁদের গবেষণার, ফল সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিয়া সমালোচনার সাহায্যে তাহার যথার্থ মূল্য যাচাই করিয়া নিতে কুণ্ঠিত হন না। সাহিত্যিকও তাহার সাধনার ফল সাধারণে প্রকাশ করেন—তাদের উপভোগের জন্য। কিন্তু তাঁদের এই শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য সমালোচকেরা যে মাপকাঠি ব্যবহৃত করিয়া থাকেন সেটী সব সময় তাঁদের মনঃপূত হয় বলিয়া মনে হয় না। Art connoisseurদের সঙ্গে artistএর মনের মিল সব সময় হয় না। স্রষ্টা বলিতে চান, যে, তিনি যা সৃষ্টি করেন সেটীর দাম তিনি যেমন জানেন আর কেউ তেমনটী বুঝিতে পারে না। কাজেই সমালোচক যদি তার অন্য মূল্য ধার্য্য করেন, তবে কলহ অনিবার্য্য। অথচ, সাহিত্যিক নিজে সাহিত্য সমালোচক, এমনটীও সর্ব্বদাই দেখা যায় না।

সাহিত্যিকদের এই অভিমানের ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাংলা দেশে অন্ততঃ, সাহিত্য শিল্পী তাঁহার শিল্পের উপর যে মূল্যের ছাপ দিয়া দেন, সেটীকেই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হুকুম করা হয়। সকলেই জানেন, এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বেও সাহিত্যের বাহন অর্থাৎ তাহার ভাষা নিয়া—সেটী সাধু ভাষা হইবে কি কথিত ভাষা হইবে, তাই নিয়া—অনেক মস্তিষ্ক ব্যয় হইয়াছে। এই যুদ্ধে কারা জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার এখানে করিতে চাই না; কিন্তু তখনও শুনিয়াছি সাহিত্যিকেরা দাবী করিয়াছেন যে সেই প্রশ্নের বিচারে তাঁদের রুচি এবং অভিমতই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি—এর উপরে আর কোন আপীল নাই। শ্লীল অশ্লীল অর্থাৎ কাব্য ও উপন্যাসে কতটুকু প্রকাশ্য আর কতটুকু নয়, তাই নিয়া তর্কের বেলায়ও প্রায়ই শোনা যায়, সাহিত্য শিল্পী তাঁর রুচিকেই বড় মনে করিতে চান।

সকলেই জানেন, Economic goodsএর মূল্য নির্দ্ধারণ ঠিক এই ভাবেই সব সময় হয় না। যিনি তৈয়ার করেন তিনি তাঁর পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের হিসাব করিয়া একটা দাম তাঁর জিনিসের ধরিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যে Consumer, যাঁর উপকারের এবং ব্যবহারের জন্য জিনিসটী সৃষ্ট হইয়াছে, সে যদি তাহা হইতে সেই উপকার না পায়, তবে সে উহার কোন মূল্যই দিতে চাহিবে না। Manufacturer বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারেন, তাঁর তৈয়ারী জিনিষ দ্বারা কি কি উপকার হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যবহার করিবে, সে যতক্ষণ না বুঝিবে যে উহাদ্বারা বিজ্ঞাপিত কাজ পাওয়া যায়, ততক্ষণ সে ইহার জন্য কিছুই দিবে না। অবশ্যই শিল্পী নূতন জিনিসের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নূতন অভাবেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন—নূতন নূতন প্রয়োজনের আবির্ভাবও মানুষের হয়। কিন্তু সেটী না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না মানুষ বুঝিয়াছে বস্তু-বিশেষ দ্বারা তার কি কাজ হইবে সে পর্য্যন্ত—সে বস্তুর দর সে কিছুই দিবে না। জিনিসের মূল্য নির্দ্ধারণের পক্ষে ব্যবহর্ত্তার রুচি ও প্রয়োজনও একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিস; সেটার কথাই শিল্পীকে সর্ব্বাগ্রে এবং বিশেষ করিয়া ভাবিতে হয়।

যাঁরা এদেশের বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাঁরা জানেন যে, জিনিস যে ব্যবহার করে সে জোর করিয়াও শিল্পীর কাছ হইতে তার পসন্দ মত জিনিস আদায় করিয়া নিতে পারে। স্বদেশী ও বয়কটের ফলে এদেশে এবং এদেশের বাইরেও যে নূতন রকমের জিনিসের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। এক্ষেত্রে ব্যবহর্ত্তা তার রুচি অনুসারে জিনিসের ফরমাইস করিয়াছে এবং সেই অনুসারে যথাসম্ভব কাজও আদায় করিয়াছে। ছোট খাটো জিনিসের বেলায় এমনটী আমরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। আমরা যাহা আহার্য্য হিসাবে ব্যবহার করি, আমাদের পাশের দোকানে সেই জিনিসেরই সরবরাহ থাকিবে। আমাদের দোকানী আমাদেরই পসন্দ মত পোষাকের আমদানী না করিয়া পারিবে না। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই খাটে।

কিন্তু সাহিত্যের বেলায় তেমনটী হয় কি? এখানে manufacturer এমনই একটা উচ্চপদের দাবী করিয়া থাকেন যে, consumer আর কিছু বলিবার পথ পায় না। শিল্পীরা যে শুধু আমাদের ভোগের জিনিস তৈয়ার করেন তা নয়, তার ভিতর কোন্‌টী ভাল মন্দ কিংবা কোন্‌টীকে

কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, সেটাও তাঁরাই বলিয়া দিতে চান।

বাংলা দেশে প্রকৃত Art cirticism খুব যে বেশী আছে, এমন মনে হয় না। সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুইকে মিলাইয়া আমরা প্রায়ই মত গঠন করিতে চাই। বলা বাহুল্য, সেটা একটা প্রকাণ্ড ভুল। তাজমহলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সময় কেহ যদি জানিতে চাহেন, এর কারিগরেরা জাতিতে কি ছিল, ত হা হইলে আমরা তার সম্বন্ধে কি মনে করি? কবি কিংবা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইলে তাঁর জীবনের সহিত পরিচয় আবশ্যক; কিন্তু তাঁর সৃষ্ট শিল্পের ভাল মন্দ বিচারের পক্ষে সেটা জানার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া ত মনে হয় না।

এই সত্যটা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কালিদাস কিংবা ভবভূতি নিজেদের সৃষ্টির ভিতরে এমনি ভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছেন যে, তার বাইরে যে তাঁদের একটা জীবন ছিল, এমন পরিচয় খুব অল্পই মিলে। কাব্যটি পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়াই তাঁরা সরিয়া পড়েন। আজ প্রত্নতাত্বিক গবেষণা করিতেছেন, কালিদাসের বাড়ী নবদ্বীপ ছিল না উজ্জয়িনীতে কিন্তু কালিদাসর পাঠকেরা এতকাল ধরিয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। আমরা একথা বলিতে চাই না যে কবির সম্বন্ধে তার পাঠকের কোন ঔৎসুক্য থাকা উচিত নয়; বরং সেটা না থাকাই আমরা অস্বাভাবিক মনে করিব। আমরা শুধু এইটিই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, লেখকের সামাজিক পদ মর্য্যাদা অথবা আর্থিক অবস্থা অথবা তার ব্যক্তিগত জীবনের তেমনই আর কোন বিষয়ের উপর তার লেখার মূল্য নির্ভর করে না। ইংরেজ লেখক Addison তার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এক স্থলে এই নিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, অনেকেই কোন বই পড়িবার আগে জানিতে চান লেখক স্ত্রী না পুরুষ, বিবাহিত না অবিবাহিত, কালো না ফরসা ইত্যাদি; এবং সেই অনুসারে তাঁরা সে বই পড়িবেন কিনা স্থির করেন। এপ্রকার বিচার পদ্ধতি যে আমরা একেবারেই অনুসরণ করি না, এমন নয়।

কিছু দিন যাবৎ বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে যে নূতন ধরণের সমালোচনার পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছে তাতে বরং এইটিই হইয়াছে প্রধান প্রণালী। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, তার জীবনের দূঢ় রহস্য, কল্পিত অথবা বাস্তব নানা প্রকার ছোট খাটো ব্যাপার, কোথায় সে গল্পচ্ছলে কার কাছে কি বলিয়াছিল এই সব নিয়া ঘাটাঘাটি করিয়া তার লেখার মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা কিছু অদ্ভুত নয় কি? অথচ সেটা যে ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন।

একথা আমি বলিতে চাই না যে, কবির জীবন এমনই একটা বস্তু যার সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধিৎসা আমাদের হওয়া উচিত নয়। আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, তাঁহার কার্য্যের অভিব্যক্তি বুঝিবার পক্ষে তাঁহার জীবন জানা যতটা প্রয়োজন, কাব্যের মূল্যের জন্য সেটা জানা মোটেই প্রয়োজন নয়। ভাল কবি হইলেই ভাল মানুষ হয় না। বড় উকীল হইলেই তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র হইবেন, এরূপটা ত আমরা কখনও ধরিয়া লই না। কেহ যদি ভাল উকীলও হন এবং লোক হিসাবেও ভাল হন, তবে তাঁকে আমরা ডবল শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁর কোন চরিত্র দোষ সত্বেও যদি উকীল হিসাবে তিনি বড় হন, তবে কোন বুদ্ধিমান্ মক্কেলই তাঁকে মোকদ্দমা দিতে অস্বীকার করিবে না। তেমনি কোন কবির জীবনটা যদি আমাদের পছন্দ নাও হয়, তবু সেই হেতুতেই তাহার কাব্যও আমরা বর্জ্জন করিব কেন, তা ত জানি না। শিল্প এবং শিল্পীর জীবন এ দুয়ের ভিতর আমরা এমন একটা অদ্ভুত সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া নিতেছি যে, তাহা বাস্তবিকই উপহাস্য। মদ যে বেচে সে কখনও মাতাল হয় না—তা হইলে আর তার ব্যবসা চলে না। ময়রার যদি মিঠাইয়ে লোভ বেশী থাকে, তবে তার ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করা উচিত। দেখা যায়, সাহিত্যের বেলায় ও অনেক সময় তেমনটা ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অসৎ সাহিত্য যে লেখে চরিত্র তার তত অসৎ নয়, এবং পক্ষান্তরে চরিত্রের কোন সাফাই দেওয়া চলে না, এমন লোকেও সৎ সাহিত্য রচনা করিতে পারে। অনেক সময় অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়া কতকটা শান্ত হইয়া আসে। সুতরাং নাড়ী ধরিয়া যেমন লোকের বাপের নাম বলা যায় না, তেমনি বই পড়িয়া গ্রন্থকারের চরিত্র সম্বন্ধে কোন মত

গঠনের চেষ্টাও না করাই ভাল। আমি কোন পক্ষবিশেষকে দোষী করিতে চাই না। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আজ বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গণে যে যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সেটা কে ব্যঙ্গ করিবার সময় আসে নাই? ব্যক্তিগত জীবনের কেহ আলোচনা করিতে চায়, আমি তাতে আপত্তি করিব না; কেননা, এর একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলে আইনই তাতে বাধা দিবে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আলোচনাকে যাঁরা সাহিত্য সমালোচনা বলিয়া চালাইতে চান, তাঁরা যে ভুল করিতেছেন, সেইটা বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য—শুধু সাহিত্যই বা কেন সমগ্র শিল্পই—একটা সাধনার একটা উগ্র তপস্যার জিনিস। আর তপস্যার পক্ষে সংযমের মত জিনিস নাই, এ কথা এ দেশে অনেক দিন স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অথচ আজ এ দেশে অত্যন্ত পরিতাপের সহিত দেখিতে পাইতেছি যে সংযমটাকে সাহিত্যিকেরা অত্যন্ত inartistic—কলা শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন—মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধুই কি তাই? এমনি সাধারণ জীবনে যে সবগুলিকে আমরা গুণ মনে করিয়া থাকি; শিল্পীরা সেগুলিকে অনেক সময় তাঁদের শিল্পসেবার পরিপন্থী মনে করিয়া থাকেন? একটা দৃষ্টান্ত শুধু দিতে চাই, যদি আপনারা কিছু মনে না করেন। পুকুর চুরিটা এখনও উপকথায় রহিয়াছে যদিও কোনও কোনও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে নাকি তাহাও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু Research চুরিটা এদেশে মন্দ চলে না,—অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়া বাহবা নেওয়ার চেষ্টার দৃষ্টান্ত অনেকেরই হয় ত জানা আছে। সম্প্রতি আর একটী নূতন রোগ আমাদের দেখা দিয়াছে—সেটী কবিতা চুরি। ভাষান্তর হইতে অনুবাদ করিয়া চুরি করা ও চুরি—তবে, কবুল করিলে সেটা মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাণো মাসিক পত্রের ফাইল হইতে নকল করিয়া নবীন কবি যে নাম কিনিতে চান, সেটী ত আমার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হয়। অথচ এরূপ দৃষ্টান্তও ত রহিয়াছে।

সাহিত্যিকেরা অনেক সময় কেন বলিতে চান যে, তাঁদের মনে যখন যে ভাব জাগে কিংবা তাঁদের রসনায় যখন যে ভাষার আবির্ভাব হয়, তাহাই একটা ঐশী প্রেরণার ফল। অসংযত ভাব অসংযত ভাষায় প্রকাশ করাটা একটা বড় রকমের আর্ট এ কথাটা আজকাল অনেক সময় শুনি। যাহা মনে হয় তাহাই সত্য—এবং যাহা সত্য তাহাই সাহিত্য, সুতরাং সত্য ও সাহিত্যের মধ্যে সংযমরূপ কোন ব্যবধান থাকা উচিত নয়। এ প্রকার চিন্তাধারার ফলে বাংলায় যে সাহিত্য স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তার নমুনা দিয়া এই সভার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে চাই না।

সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের জীবনের সম্বন্ধ, সাহিত্যের সাধনা, এ সব বিষয়ের আলোচনা করা এখন বিশেষ ভাবে দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কবি ও ঔপন্যাসিকই সাহিত্য রাজ্যের একমাত্র মালীক কিনা, সেটী ভাবিবার সময় এখন আসিয়াছে; কেননা, এই দুইটী জিনিসের প্রাচুর্য্য আমাদের এত হইয়াছে যে, তার যাচাই করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, সকলেই বড় গলায় নিজের জিনিসের এত প্রশংসা করেন যে, পাঠকের পক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমরা যদি মাঝে মাঝে এই ভাবে সভায় সমবেত হই এবং এই সব বিষয়ে আলোচনা করি, তবে মনে হয় দেশের হাওয়াটা একটু পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমার মনে আছে, একবার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় একটা গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন, যা নিয়া কাগজে খুব আন্দোলন হয়। সেই উপলক্ষ্যে একজন অধ্যাপক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দেশে এমন একটা শিক্ষিত সমাজ নাই যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলটা কোথায় তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও আমাদের দেশে তেমনি একটা অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাঁরা কাব্য কিংবা উপন্যাস লেখেন তাঁরাই কলরব করিয়া সমালোচনার আসরও জমাইয়া তুলেন। সমালোচনার সুর এবং গৎ ও তাঁরাই বাঁধিয়া দিতে চান—অন্যের যেন এর ভিতরে আর বাক্যস্ফুট করিবার কোন অধিকার নাই।

পুরাণে শুনি, পুরাকালে যখন ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সদাচার হইতে লোক ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তখন নৈমিষারণ্যে ঋষিদের

ঘন ঘন সংসদ বসিত। সমাজের হিতচিকীর্ষু মহাপুরুষেরা যেখানে সমবেত হইয়া সমাজ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেন— সমাজ হইতে পাপ ও অধর্ম্ম দূর করিতে চেষ্টা করিতেন এবং মানুষকে সৎপথে চালিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। মনে হয়, আজ আমাদের সাহিত্যের নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে; অথবা লুপ্ত ও গুপ্ত তীর্থের মত কোথাও হয় ত তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেটী আজ আমাদের উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। যে জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা আজ সাহিত্যকে কলুষিত করিয়া রহিয়াছে—তাহা দূর করিতে হইলে এমনি করিয়া পূত চিন্তার নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। শিল্পীদের শিল্পের দর কষিবার জন্য বিচারক গোষ্ঠী গঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই যে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, মনে হয় এই খানেই তার একটা বড় সার্থকতা রহিয়াছে। আমাদের এই আরম্ভ শুভমণ্ডিত হউক, ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

"সরস্বতী শ্রুতিমহতাং প্রবর্দ্ধতাং। *

যৌবন প্লাবন।

(১৫)

(অধ্যাপক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

সেই যে কটক হইতে কতদিন আগে অরুন্ধতী এখানে আসিয়াছিলেন সেই আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের আনন্দ উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। যে অর্থ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই অর্থ কিছুদিন পরেই নিঃশেষ হইয়া গেল। তারপর আসিল তাহার জীবনে একটা ভীষণ সংগ্রামের দিন। শিশু কন্যাটীকে লইয়া তাহাকে কতই না বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র বাড়ী খানিতে দীর্ঘদিন কাটিয়া গিয়াছে। হরিচরণ কয়েক বৎসর অরুন্ধতীর এখানেই ছিল তারপর একবার দেশে যাইবার পরে আর ফিরিয়া আসে নাই। অরুন্ধতী যে তাহার রূপ ও যৌবনের অফুরন্ত আকর্ষণের মধ্যেও সমস্ত প্রলোভন ও অত্যাচারী পুরুষের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল তাঁহার নিজের অসাধারণ সংযম, পুরুষের প্রতি ঘৃণা এবং একজনের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা।

অরুন্ধতী কলিকাতার এই জীবনটা এই বাড়ীতেই কাটাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন সে খবরের কাগজে দেখিতে পাইল যে বালিগঞ্জে একটী মহিলা শিক্ষামন্দির আছে, সেখানে অনাথা মেয়েদের অর্থোপার্জ্জন করিবার যোগ্যতালাভ করিবার মত শিক্ষা দেওয়া হয়। মিসজে সি মুখার্জ্জি সেই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা।

অরুন্ধতী সাহসে ভর করিয়া একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতেই তিনি তাঁহাকে আনন্দে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন "তুমি যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ, এতে আমি বড়ই সুখী হয়েছি। বল মা কি তোমায় আমার করতে হবে ?" অরুন্ধতী তখন সেই স্নেহময়ী নারীর মহত্বের কাছে তার সর্ব্বপ্রকার অন্তরের বেদনার কথা প্রকাশ করিল সে মনে একটু সঙ্কোচ করিল না। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল তাহার কণ্ঠ বেদনায় রুদ্ধ হইয়া গেল। যশোদা দেবী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন।

মিস্ জে সি মুখার্জ্জির বাঙ্লা নাম যশোধা সুন্দরী। খুবই বড় লোকের একমাত্র মেয়ে। ছেলে বেলা যশোদাকে তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন, কিন্তু যশোদার মন কিছুতেই বিবাহ করিয়া সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহিল না। ধনীর একমাত্র সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যশোদা তাহার সমস্ত শক্তি নারী সমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিল। পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সুবৃহৎ প্রাসাদ তুল্য বাড়ী হইল যত অনাথা সহায়হীনা বিধবা নারীর আশ্রয় ভবন। মিস্ মুখার্জ্জি বিলাত ও ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেকটী নারী প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া সেখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া দেশের কল্যাণ কার্য্যে তাহার দেহ মন প্রাণ সমর্পন করিয়াছিলেন। এখন তাহার বয়স হইয়াছে, একদল শিক্ষিতা নারীকেও তিনি এই কার্য্যের ভিতর টানিয়া আনিয়াছেন।

* সাহিত্য সভায় পঠিত।

অরুন্ধতী এই নারীর কাছে স্নেহ ও যত্ন পাইয়া এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিয়া তাঁহার জীবনটাকে নানা দিক্ দিয়াই সংযত ও শ্রমশীলতার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন দিন নাই রাত্রি নাই সর্ব্বদা কল চালাইয়া, কোন বাড়ীতে গান শিখাইয়া কাহাকেও বা শেলাই শিখাইয়া দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল চলিয়া আসিয়াছেন। এখন তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দেহে শক্তি নাই, মনে বল নাই—যেন কে তাহার দেহের সমুদয় শক্তিকে সবলে পিসিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

অরুন্ধতী মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেন, যখন সে বেদনা উপস্থিত হইত তখন তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত। কলিকাতার অনেক বড় বড় চিকিৎসকও ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

একদিন এই বেদনা সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। দৈবাৎ সে দিন সেখানে অজিত উপস্থিত ছিল। অরুন্ধতী বেদনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। মিলিকে একটু সাহস করিয়া মাকে দেখিতে বলিয়া অজিত ডাক্তার আনিতে চলিয়া গেল।

অজিত যখন ডাক্তার লইয়া ফিরিল তখন অরুন্ধতী দেবীর সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া অজিতকে বলিলেন—"এখন আর কোনও উপায় নাই, একটা injection দেওয়া যায় এইমাত্র। ফল হইবে কিনা জানি না। "তবে আপনাদেরCasolation এইমাত্র!—অরুন্ধতী ইঙ্গিতে মানা করিলেন। ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—মিলি!

মিলি মায়ের বুকের উপর মা মা বলিয়া আসিয়া ঝুকিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন "চুপ কর মা, পৃথিবীতে মানুষ যখন খুবই আঘাত পায় তখন বিধাতা তাকে তাঁর কোলে টেনে নেন, আমি যাই · কোন চিন্তা নেই তিনিই তোমাকে দেখ্‌বেন।" অজিত! অজিতের দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল— ধীরে মৃদু স্বরে বলিল "কি মাসীমা" "আমি যাব, আর ধরে রাখতে পারবে না, ডাক এসেছে, মিলির যে কেউ নেই, কিন্তু কোনও উপায় নেই। ধীরে ধীরে শীর্ণ কম্পিত হস্তে মিলি তোমার বোন্, তাকে দেখো, রক্ষা কর, মিলি যেন কষ্ট না পায়।" অজিত কহিল—মাসীমা, ঈশ্বরকে সাক্ষি করে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি আপনার অনুরোধ আমি যতদিন বেঁচে থাকি মনে প্রাণে পালন করব। অরুন্ধতীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ জীবন ফুলটী কখন ঝরিয়া পড়িল—পশ্চিমের জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যাতারার উজ্জল জ্যোতিঃ তখন সে মুখের উপর বিমল দ্যুতি ফুটাইয়া দিয়াছিল, চাঁদ হাসিতেছিল। কোন্ জ্যোৎস্নালোকিত জ্যোতিঃ পথে সে চলিয়া গেল। কোথায় কে জানে! মিলি—মা—মা ও আমার মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শব দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অরুন্ধতী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আর হাত তুলিলেন না। (ক্রমশঃ)

কাম ও প্রেম

(শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ)

স্বার্থপরতাই জীবনের মূলতত্ত্ব। স্বার্থের সন্ধানেই আমরা জগতে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলেছি। Give & take এই হচ্ছে সমাজের মর্ম্মনীতি। ভালবাসা এ ক্ষেত্রে নেহাৎ কথার কথা মাত্র।

ভালবাসার উদ্ভব হয় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে। সেখানে কি পেলাম, তা বড় কথা নয়, কতখানি দিতে পার্‌লাম তাই মূল কথা। বৈষ্ণব গেয়েছেন,

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম

যেখানে মানুষ ভগবানের সত্তা দেখতে পেয়ে, তাঁরই প্রীতির জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, সেখানেই যথার্থ ভালবাসার উৎপত্তি।

যতই স্বার্থপর হই না কেন, হৃদয় গুহায়, আমাদের প্রত্যেকেরই সুপ্ত রয়েছে, এই কামগন্ধহীন ভালবাসা। সেই ভালবাসা উদ্বোধনের জন্য ভগবান্ আমাদের জীবনে এক একটা স্পর্শ দিয়ে যান কেউ সে স্পর্শ সচেতন হয়ে সন্ধানে তার অন্তরের নীরব গুহায় প্রবেশ করে, আর অধিকাংশ নরনারী অসবহিত ভাবে তা উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র কামনা ও স্বার্থের কলরবে জীবন অতিবাহিত করে। মরণের পথের

হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীরে জ্বলছে প্রেমের এক ভাস্বর অগ্নিশিখা। যে তার সন্ধান পায়, সে হোমাগ্নিশিখায় দেহ প্রাণ ও মন আহুতি দিতে পারে, পবিত্র সোম সুধা পানে সে হয় অজয় অমর।

তেনা কুড়ালিয়া।

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

আকারে প্রকারে চেহারা ছবিতে ইহারা কাঠ ঠোকরা বা কাঠ কুড়ুলির জ্ঞাতি ভাই। ইহাদের ঠোঁট কুড়ালিয়া পাখীর ঠোঁটের মতই প্রায় ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ। ঠোঁট সরু কিন্তু তেমন শক্ত নহে। উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ঠোঁটের সঙ্গে একই রেখায় সোজা আর একটী ঠোঁট মাথার উপরে ২॥ ইঞ্চি লম্বা। সহসা দেখিলে মনে হয় পাখীটির দুই দিকেই ঠোঁট। উপরের ঠোঁটটী বাস্তবিক পক্ষে তাহার মাথার ঝুঁটী। পাখী ইচ্ছা করিলেই ঝুঁটী বিস্তৃত করিতে পারে। তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়

এই পাখীর গায়ের রং শুক্‌না পাতার মত। তাহার উপর প্রত্যেক ডানাই ঈষৎ কালো ও সাদা ডোরা যুক্ত পিঠের বর্ণ একটু গাঢ়। লেজ বিচিত্রিত। লেজের দৈর্ঘ্য ৩।৪ ইঞ্চি মাত্র। সমগ্র পাখীটা ১২।১৩ ইঞ্চির বেশী নহে। ইহাদের ডানায় মাংস কম কিন্তু তেমন সবল নহে। দীর্ঘ সময় উড়িবার সামর্থ ইহাদের নাই।

মাথার উপরের রং গায়ের রঙ্গের মতই গাঢ় কিন্তু দুই গালের রং ফিকে। চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র গোলাকার এবং চঞ্চলতা শূন্য। ডানার নীচের দিকের পালক ছাইএর মত। বুকের পালক মেটে সাদাভ।

ইহাদের পালক গুলির মাথায় ঈষৎ কালো রেখা আছে সেই পালক গুলি সাজানো থাকায় মনে হয় যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কালো রেখা। এইরূপ তিনটী রেখা দুই পাশের দুই ডানার আকার পাখীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুচ্ছের পালক গুলির রং মেটে কালো মতন। পুচ্ছের উপরের পালক গুলির মাথা সাদা। নীচের পালক গুলির উপর ঐ সাদা অংশ রেখার মত দেখায়।

তেনাকুড়ালিয়ার পায়ে শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। অনেক সময় হাটু মাটিতে পাতিয়া বসে। এ জন্য ইহাকে কেহ কেহ লেটা কুড়ালিয়া বলে। ইহারা অধিকাংশ সময় মাটীতেই বসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা মাকড় ইত্যাদি ধরিয়া খায়। দীর্ঘ সরু ঠোট সরু গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া কেঁচো বা অন্যান্য ক্ষুদ্র পোকা ধরিয়া বাহির করিয়া খায়। পিপীলিকার গর্ত্তের সন্ধান পাইলে ইহাদের খুব আনন্দ হয়। গাছের গোড়ায় যে সব স্থানে ছাল ফাটিয়া উঠে তথায় ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া কীট ধরিয়া খায়। ঠোট প্রায় ১॥ ইঞ্চি লম্বা।

তেনা কুড়ালিয়া বড় গাছের শিকরের ফাঁক বা সেইরূপ নিরাপদ স্থানে খুব নীরব জায়গায় মাটীতে বাসা বানায়। ঘাস, খড়, লোম, পালক প্রভৃতি দিয়া সুন্দর করিয়া বাসা বানায়। সেইখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ডিম পাড়ে। ডিমগুলির রং ফিকে সাদা—তাহাতে মাঝে মাঝে গেরি মাটীর ছিটা দেওয়া। কাশীর কুলের মত বড় ডিম। এক সময়ে ২।৪টী ডিম পাড়ে। ১৫ দিন তা দেওয়ার পর ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ইহাদের ডিম ও বাচ্চার শত্রু নকুল, গোসাপ, সাপ, শিয়াল প্রভৃতি। এ সকল কারণে ইহাদের বংশ তেমন বাড়ে না।

এই পাখী গুলির গায়ে এক রকম বোঁটকা গন্ধ।

ইহাদের পায়ে সম্মুখ দিকে তিনটী আঙ্গুল। প্রত্যেকটী ১—২½ ইঞ্চি লম্বা। মাটীতে সর্ব্বদা ঘর্ষণের ফলে পেছনের আঙ্গুলটী প্রায় ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। হয় ত কয়েক পুরুষ পরে ইহারা তিন অঙ্গুলি বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহাদের দল ক্ষুদ্র। স্বামী স্ত্রী ছাড়া প্রায় কাহারো সাথে ইহাদের সাক্ষাৎ নাই।

এদের বিলাতী নাম হুপো।
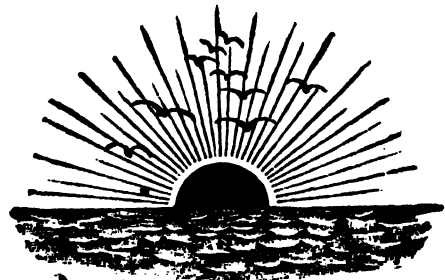
প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

(অযোধ্যা—কিষ্কিন্ধ্যা—লঙ্কা।)

(৺কেদারনাথ মজুমদার)

রামায়ণ ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার বিরাট মানদণ্ড। আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা; অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা। প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা হইতে সেই সুদূর প্রাচীনতম যুগে যে জ্ঞান-গরিমা বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে আজও ভারতবর্ষ জগতের জ্ঞান-গুরুরূপে পূজিত হইতেছে।

যে অযোধ্যা একদিন সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই আদি-সভ্যতার লীলা-নিকেতন অযোধ্যা কিরূপ সম্পদশালী ছিল, মহাকবি বাল্মীকি তাহা তাঁহার অমর তুলিকায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের সেই অতীত বিভব মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি বাল্মীকি অযোধ্যার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেননিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥ ১০
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমাতুলপ্রভাম্।
উচ্চাটালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥ ১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥ ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্। ১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্। ১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণায়ুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥ ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥ ১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥ ১৯ *

(আদি—৫ম সর্গ।)

* উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

"কোশল দেশে সরযূতীরে অযোধ্যা নগরী অবস্থিত। সেই নগরী বহু সুবিভক্ত রাজপথে সুশোভিত। রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ। এই সুদৃশ্য নগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিযোজন বিস্তৃত এবং বহু তোরণ ও কপাট-সমন্বিত। রাজপথগুলির উভয় পার্শ্ব পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণীতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে যন্ত্র ও অস্ত্রসমূহ শোভিত। কোন স্থলে শিল্পিগণের বাসস্থান। উন্নত-প্রাকার-শীর্ষে ধ্বজাবলি বায়ুবেগে উড্ডীন হইতেছে; প্রাকারের উন্নত স্থানে শত শত শতঘ্নী (কামান) স্থাপিত। নগরের স্থানে স্থানে উদ্যান ও আম্রকানন—তাহার চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত শালবৃক্ষশ্রেণী শোভিত। স্থানে স্থানে বধূদিগের নাট্যশালা। নগর চতুর্দ্দিকে গভীর-জল-পরিপূর্ণ-দুর্গ-পরিখা-বেষ্টিত সুতরাং দুর্গম এবং শত্রুরক্ষিত।

"নগরীর কোন স্থানে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, গর্দ্দভ, প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। কোন স্থানে সামন্ত রাজগণের বাসভবন। কোন স্থানে বিভিন্নদেশবাসী বণিক্সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। কোথাও রত্ন-প্রাসাদ সমূহ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথায়ও সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোথায় বা বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহরাজি অবস্থিত।

"নগরী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধনধান্য-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরসতুল্য সুস্বাদু-পানীয়-জল-শালিনী। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব-সমূহ ধ্বনিত হইতেছে। ইত্যাদি

এই অমরাবতীতুল্যা অযোধ্যাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি।

মহাকবির এই বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ অনুভূত হইবে। প্রাচীন ভারতের সেই বিশাল রাজধানীর দৈর্ঘ্য ৯৬ মাইল ও প্রস্থ ২৪ মাইল ছিল।* ইহার পরিমাণ ফল বর্ত্তমান সময়ের একটি বৃহৎ জিলার সমান। এই রাজধানী দুর্গম দুর্গ ও জলপূর্ণ সুগভীর পরিখা-বেষ্টিত ছিল।

অযোধ্যার কতখানি স্থান প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, রামায়ণের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে তাহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় না।

আদিকাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গের—

"সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।"

—শ্লোক হইতে দুই যোজন পরিমাণ স্থানই প্রকৃত অযোধ্যা বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই দুই যোজন স্থানই সম্ভবতঃ দুর্গম পরিখায় ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল।

এই প্রাচীর কি উপকরণে নির্ম্মিত ছিল, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। তৎকালে প্রস্তরের ও ইষ্টকের প্রচুর ব্যবহার ছিল, তাহা উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতেও জানা যায়; সুতরাং ঐ দুই সামগ্রীর সমন্বয়ে বা ইহার কোন একটির দ্বারা যে এই সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।‡

এই প্রাচীরের উর্দ্ধ দেশে স্থানে স্থানে শতঘ্নী অস্ত্র সমূহ (কামান) * স্থাপিত থাকিত। দুর্গরক্ষার্থ আধুনিক কালেও এইরূপ প্রণালীতে কামান রক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজধানী "কবাট ও তোরণবতী" ছিল। রাজধানীর কয়টি বহির্দ্বার ছিল, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই। গ্রন্থের

* মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আইন-ই' আকবরিতে অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In ancient times city is said to have measured 148 coss in length and 36 coss in breadth. Upon shifting the earth which is round this City small grains of gold are sometimes found in it. The town is esteemed one of the most sacred places in antiquity."—H. Blockman

† ঐতিহাসিক হুইলার তাঁহার History of India (Ramayana) গ্রন্থে অযোধ্যার প্রাচীন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His (Dasarath's) palace was magnificent and resplendent, but in discribing the walls the Brahmanical bard has indulged in a simile which furnishes a glimpse of the reality. They were so tall that the birds could not fly over them and so strong that no beast could force its way through them. From this it is evident that the walls could not have been made of brick or stone; for in that case the attempt of a beast to force his way through them would never have entered the mind of the bard. In all probbability the palace was surrounded by a hedge which was sufficiently strong to keep out wild beasts or stray cattle."—অর্থাৎ "দশরথের রাজপ্রাসাদ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু পুরীর প্রাচীর বর্ণনায় কবি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রকৃত সত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কবি লিখিয়াছেন) "প্রাচীরগুলি এত উচ্চ ছিল, যে পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিত না, এবং এত দৃঢ় ছিল যে কোন পশুই তাহার ভিতর দিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না।" কবির এই উক্তি হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, অযোধ্যার এই প্রাচীর কখনই ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরের নির্ম্মিত ছিল না। যদি তাহা হইত, তবে পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইবার অলীক কল্পনা কখনই কবির মনে প্রবেশ করিত না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ বংশবৃতি বেষ্টিত ছিল—অবশ্য খুব মজবুত বেড়া ছিল—তাহা ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারের পশুই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিত না।

হুইলারের রামায়ণ-জ্ঞান ভ্রান্তিসঙ্কুল; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত জানিতেন না। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট রামায়ণ ও মহাভারত শ্রবণ করিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে কিরূপে রামায়ণ হইতে এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীর এত উচ্চ ছিল যে, পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িতে পারিত না, এত দৃঢ় ছিল যে, বন্য পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না; এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব আমরা মহাকবির বর্ণনায় দেখিতে পাইতেছি না। আদ্য রামায়ণে প্রাচীরের উল্লেখই অতি অস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; "উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্।" এই শ্লোক হইতে রামায়ণের টীকাকার রামানুজ প্রাকারের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের আর কোন স্থানে অযোধ্যার প্রাকারের উল্লেখ নাই। দুর্গ-পরিখার উল্লেখে লিখিত আছে "দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।"

* শতঘ্নী—যাহাদ্বারা শত সংখ্যক জীব একেবারে নিহত বা আহত হয় এইরূপ অস্ত্র। ইহা আধুনিক কামান না হইলেও কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত কামান জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা হইতে নগরের চারিদিকে চারিটি দ্বার বলিয়াই অনুমান করা যায়। দ্বারগুলি বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমে "বৈজয়ন্ত দ্বার"-পথে ভরত রাজগৃহ হইতে আসিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ;—

"দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রবিশাচ্ছ্রান্তবাহনঃ।"

নগরী প্রশস্ত রাজপথে সুবিভক্ত ছিল। এই রাজপথ গুলি প্রতিদিন জল-ধারায় সিক্ত ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত থাকিত। সময় সময় ধুপ, চন্দন এবং অগুরু গন্ধেও রাজপথ-গুলি আমোদিত করা হইত। এইরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় দুর্গন্ধ নাশের জন্যই হইত। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রাজপথসমুহে দীপবৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহাতে আলোক প্রদান করিয়া রাজধানীতে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা হইত। রামাভিষেকের উৎসব-দিনে রাজপথে এইরূপ আলোক প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমন-শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ ॥ ১৮
(অযোধ্যা ; ৬ সর্গ।)

রাজপথের উভয় পার্শ্বে পণ্যবীথিকা। ঐ সকল পণ্য-বীথিকায় নিশ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক, পট্ট বস্ত্র, কৌষের বস্ত্র ইত্যাদি শোভা পাইত। (অযোধ্যা – ১৭ সর্গ)

রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণের অস্থায়ী বাসভবন ছিল। এরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়েও প্রত্যেক সভ্য দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সামন্ত রাজগণ যে সকলেই অযোধ্যায় বাস করিতেন, তাহা নহে। তাঁহাদের বাসভবনে প্রতিনিধিগণ থাকিয়া রাজধানীর প্রত্যাহিক বিবরণ স্ব স্ব প্রভুদিগকে জানাইতেন।

রাজধানীর এক দিকে উদ্যান। উদ্যানে গুপ্ত গৃহ ও বধু নাট্যশালা ছিল। নাট্যশালায় নাটকাভিনয় হইত, ইহা বলাই বাহুল্য।

রাজধানীর ইহাই সাধারণ বর্ণনা। ইহার পর ব্যক্তি-বিশেষের পৃথক পৃথক আবাসবলীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং চিত্র রামায়ণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার দ্বারাও প্রাচীন রাজধানীর সভ্যতা-সম্পদ প্রকটিত হইবে। আমরা পাঠক-গণকে লইয়া ক্রমে রাজধানীর সেই সকল বিচিত্র গৃহ ও কক্ষসমূহের চিত্র প্রত্যক্ষ করিব।

ঐ যে অদূরে শরৎকালীন নিবিড়-মেঘ সদৃশ এবং কৈলাশ শৃঙ্গোপম প্রাসাদ-শিকর দেখা যাইতেছে, ইহাই অযোধ্যার রাজাভবন-

"তৎ পৃথিব্যা গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।"

এই ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজভবন অষ্টাধিক বৃহৎ খণ্ডে বা কক্ষে বিভক্ত। প্রথম কক্ষে সভাগৃহ। রাজগৃহে প্রবেশ করিতেই সুবিশাল দ্বার। এই দ্বার "রাজদ্বার" নামে পরিচিত। রাজদ্বার সশস্ত্র দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এই রাজদ্বার এত বিশাল যে, ইহার মধ্য দিয়া আরোহিসহ সুবৃহৎ হস্তী ও রথ অনায়াসে গমনাগমন করিত।

প্রথম কক্ষের পর দ্বিতীয় কক্ষ। এই কক্ষ যজ্ঞশালা। রাজ্যাভিষেক-দিনে এই দ্বিতীয় কক্ষে জন-সাধারণ সমবেত হইয়া অভিষেক-ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করিতেন এই কক্ষ পর্য্যন্ত অন্তঃপুর-চারিকাগণ আগমন করিতে পারিতেন।*

অতঃপর তৃতীয় কক্ষ বা মহল। তৃতীয় কক্ষ পর্য্যন্ত অশ্ব-সংযোজিত রথ গমনাগমন করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কক্ষের দ্বারগুলি ধানুকিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিত। রামের রথ তৃতীয় কক্ষে যাইয়া পঁহুছিলে রাম রথ হইতে অবতরণ করিয়া ৪র্থ ও পঞ্চম কক্ষ পদব্রজে অতিক্রম করতঃ শুদ্ধান্তঃ-পুরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চম কক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

শুদ্ধান্তঃপুরে রাজমহিষীগণ বাস করিতেন। এই শুদ্ধান্তঃপুরে রাজ অনুচর ও কিঙ্করগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তথায় নপুংসক ও ধাতৃগণ কার্য্য করিত (অযোধ্যা --১৬ সর্গ)

শুদ্ধান্তঃপুরও বহু কক্ষে বিভক্ত ছিল। এই বহু কক্ষ মধ্যে আপাততঃ দুই শ্রেষ্ঠা মহিষীর দুইটী কক্ষের উল্লেখ রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজা দশরথ রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ প্রিয়তমা পত্নীদিগের নিকটে জ্ঞাপন করিতে অন্তঃপুরে যাইতেছেন।

এই অন্তঃপুর মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর।

ইহা লতাচিত্রিত মনোহর গৃহ, অশোক ও চন্দন-বৃক্ষ-শোভিত ; স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্ম্মিত বেদী শোভিত। অদূরে ক্রৌঞ্চ ও হংসরবে প্রতিধ্বনিত সরোবর স্থানে স্থানে স্বর্ণ ও গজদন্তের আসন। বিবিধ ফলপুষ্প সম্বলিত শুক-ময়ূর-

কুঞ্জিত অটবিশ্রেণী ‡ ইহাই ভরত জননী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর

এই অন্তঃপুরের গৃহ-চূড়ায় উঠিয়াই মন্থরা উৎসবময়ী নগরীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া রামাভিষেকের সংবাদ অবগত হইয়াছিল। সুতরাং এই অন্তঃপুরের সৌধাবলী যে দ্বিতল ত্রিতল বা সপ্ততল ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।*

কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের পরেই অন্যান্য মহিলাগণের বাস-মহল। এই মহলে বোধ হয় দশরথের কোন কোন স্ত্রী বাস করিতেন। এই কক্ষের বিশেষ উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়না। অন্তঃপুর অষ্টম কক্ষ। এই অষ্টম কক্ষে রাম-জননী কৌশল্যা বাস করিতেন। সুমন্ত্র রামকে বনে রাখিয়া আসিয়া এই প্রকোষ্ঠে রাজা দশরথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

"স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পশ্যৎপাণ্ডুরে গৃহে॥" ২।৫৭।২৪।

এই অষ্টম কক্ষের দ্বার বৃদ্ধ মহিলাগণ কর্তৃক রক্ষিত হইত রাম বন গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যখন জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন দ্বাররক্ষী বালিকা ও বৃদ্ধাগণ যাইয়া কৌশল্যাকে রামের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল।

এই অন্তঃপুরে যুবতী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের ন্যায় বিচিত্র লতা-পুষ্পে চিত্রিত গৃহাদি ছিল কিনা তাহার উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ স্থানে কয়েকটি অতিরিক্ত গৃহ ও দেব-গৃহ ছিল।

এই প্রকোষ্ঠের গৃহগুলিও দ্বিতল, ত্রিতল বা ততোধিক উচ্চতল বিশিষ্ট ছিল। এই প্রকোষ্ঠ-প্রাসাদোপরিস্থিতা রামধাত্রীর নিকট হইতেই মন্থরা রামাভিষেকবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, কৈকেয়ীর ও কৌশল্যার প্রকোষ্ঠদ্বয় যে পাশাপাশি ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

অষ্টম প্রকোষ্ঠেই যে অন্তঃপুর শেষ হইয়াছে, এরূপ মনে করা যায় না। রাজা দশরথের তিন শত পঞ্চাশ জন পত্নী ছিলেন। এই সাড়ে তিন শত পত্নীর প্রত্যেকের দুই একটি করিয়া পরিচারিকাও ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ না হইলেও পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ছিল। সুতরাং এই রাজ অন্তঃপুর যে একটি সুবিশাল অন্তঃপুর ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজ-প্রাসাদ ও রাজ-অন্তঃপুর ব্যতীত রাজকুমারদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ ভবন ছিল। রামায়ণে রামভবনের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

ঐ যে অদূরে --

মহাকপাটপিহিতং বিতর্দ্দিশতশোভিতম্।
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মনিবিক্রমতোরণম্॥ ৩১
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্।
মনির্ভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩২
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্।
গন্ধান্ মনোজ্ঞান বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা॥ ৩৩
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দ্দদ্ভি র্বিরাজিতম্।
সুকৃতেহা মৃগাকীর্ণং সুৎকীর্ণং ভক্তিভি স্তথা॥ ৩৪
মনশ্চক্ষুশ্চ ভুতানামাদদত্তিগ্মতে জসা।
চন্দ্র ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্॥ ৩৫

(অযোধ্যা ১৫ সর্গ)

ইহাই রাম-ভবন। পাঠক মহাকবির এই বর্ণনা হইতে রাম-ভবনের বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাম-ভবনও শুদ্ধান্তঃপুরসহ চারি-কক্ষ-সমন্বিত ছিল।

ইহাই প্রাচীন আর্য্য ভারতের রাজধানীর চিত্র। এই চিত্র যে অতিশয় উক্তি দোষে দুষ্ট নহে, একথা আমরা বলিতে পারি না। কবি-কল্পনার মধ্যেও বাস্তবের আভাস ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে; সমসাময়িক জাতির ও সমাজের আচার, ব্যবহার, রুচি ও সভ্যতার চিহ্ন প্রকটিত হয়। সেই আভাস ও চিহ্নই জাতীয় সভ্যতার পরিচায়ক। তাহার দ্বারাই জাতীয় সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইবে।

‡ লতাগৃহৈ শ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পাকাশোক শোভিতৈঃ।
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাবৃতম্॥ ১৩
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্।
দান্তরাজতসৌ বর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ। ১৪

* অযোধ্যায় সপ্ততল গৃহ ছিল, তাহা রাজধানীর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং, তাহা রাজ অন্তঃপুরে ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতেছে।

অভিশপ্ত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন)

বাদসার প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে, সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত, বহু স্থান বিস্তৃত কারাগার,—দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাংশের কারাগৃহে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামিগণ বন্দী থাকিয়া, কঠিন শাস্তি ভোগ করিত! বায়ুসম্বন্ধশূন্য-তমসাবৃত সেই সমস্ত ক্ষুদ্র কক্ষগুলি, দিবাভাগেও বন্দীদিগের ভীতি উৎপাদন করিত।

উত্তরাংশের কারাকক্ষগুলি সাধারণ বসতবাসের উপযোগী করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত অথচ বাদসার কোপ দৃষ্টিতে নিপতিত, দুর্ভাগাগণ সাধারণতঃ এই অংশে বন্দীরূপে বাস করিত। এই সমস্ত বন্দীদের তত্ত্বতালাপের ভার খোদ বাদসাই গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহারি আদেশ অনুসারে—তাহাদের বসন, ভূষণ ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করা হইত।

বেলা তিনটা বাজিয়াছিল,—গ্রীষ্মকাল, চারিদিক নিস্তব্ধ, বাতাস যেন থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিকণাবর্ষী গভীর তপ্তশ্বাস মোচন করিয়া,—অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। এমনি সময়ে আমিনা ধীর পদ বিক্ষেপে, উত্তরাংশের কারাগৃহের সম্মুখীন হইল। তাহার উৎসাহ দীপ্ত নেত্রের সম্মুখে, বিশ্বজগত যেন একটা আনন্দ নাট্য অভিনয়ে পরিণত হইয়াছিল! পার্শ্বে ধূলি সমাকীর্ণ রাজপথ,—তৎপার্শ্বে উচ্চাবচ প্রাসাদ শ্রেণী, সম্মুখের বাগানে ফুলফল ভারাবনত—পাদপরাশি,—সকলই যেন আজ আমিনার নিকট মঙ্গলচ্ছবিবৎ প্রতিভাত হইতেছিল।

আমিনা সাহঙ্কার বিজয়োৎফুল্ল নয়নে, প্রহরীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ সংন্যস্ত করিয়া, চাপা মৃদু হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিল "তোমার নামখানা কি প্রহরি!"

প্রহরী এতক্ষণ, একখানা সুতীক্ষ্ণ তরবারি স্কন্ধে ফেলিয়া, কারাগৃহের তোরণ দ্বারের সম্মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে, পায় চারি করিতেছিল। সহসা রমণীকণ্ঠের করুণ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেই, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এবং আমিনার প্রতি চক্ষু ঘুরাইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক উত্তর করিল "বেগম সাহেবা!—এই নফরের নাম,—তাজমল হোসেন।"

তাজমলের বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চান্ন বৎসর। দেহ অনেকটা স্থুল, বর্ণটি ঘনকৃষ্ণ, মস্তকের সম্মুখ দিক কেশশূন্য। সম্মুখের দুইটি দন্ত, চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। জীবন সংগ্রামে তাজমল এক দরিদ্র গৃহস্থের বিধবা রূপসী কন্যাকে "নিকা" করিয়াছিল। পত্নী হামিদার বয়স এখন চল্লিশের কোঠায়।

আমিনা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল 'তা বেশ, সংসারে আর কে আছে তোমার?"

তাজমল মস্তক নত করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করে উত্তর করিল "বিবি,—একটি কন্যা ও চারি বছরের একটি পুত্র ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই আমার।"

আমিনা সহানুভূতি সূচক ভঙ্গিতে বলিল "সারাটি দিনই ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিয়ে যাচ্ছ,—তোমার সংসার কে দেখে?"

তাজমল আবেগ উথলিত ভারি গলায় উত্তর করিল "খোদা কোন প্রকার চালিয়ে দেন,—আমি ক্ষুদ্র নফর, আমাদের সুবিধে বলে কি থাক্‌তে পারে। তবে......।"

আমিনা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "তবে"—কি—তাজমল?"

তাজমল হোসেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "বেগম সাহেবা! আমি চার চারটি ছেলে হারিয়ে,—এই শেষ বয়সে, একটি ছেলে পেয়েছি। সে আমার কাছেই সর্ব্বক্ষণ থাক্‌তে চায়, তার কথাগুলি বড়ই মিষ্টি, তার কথা শুন্‌লে, সকল কষ্টের ভিতর ও আমাকে একটা শান্তি এনে দেয়! এ ক'দিন হল, আমি সে সুখে বঞ্চিত হয়েছি। ভোর পাঁচটা হতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করে ঘরে ফিরে দেখি, ছেলে ঘুমিয়ে আছে। সারা রাত্রিই সে ঘুমিয়েই কাটায়। বাদসাকে এবিষয়ে জানিয়ে ছিলুম, তিনি হেসে বললেন,—এসব মিথ্যা মায়ার খেলা তাজমল! কে কা'র সংসারে? আচ্ছা বেগম সাহেবা! বাদসা সাহেব কি এসব মায়ার বাঁধ কাটিয়ে ফেলেছেন?"

আমিনা কঠিন উপহাসের সহিত, একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া, তীব্রকণ্ঠে বলিল "তা নয় তাজমল! খোদ বাদসার সুখের জন্য দুনিয়া খাটছে, মায়া টায়া তাঁ'র কিছু আছে বলে ঠিক জানা যায় নি—তবে তাঁ'র কোন উদ্বেগ অশান্তির কারণ হলে, তিনি পৃথিবীকে রসাতলে পাঠিয়ে,

তবে ক্ষান্ত হন। চিরদিনই ছোটর রক্তে বড় তাজা হচ্ছে, ছোটর দুঃখ কষ্ট, বড়র দেখার নিয়ম আছে বলে, তাঁরা মেনে নিতে চান না। ছোটর দুঃখ দেখে বড় যদি এতটুকুন দমে যেত, তবে ছোটরা অনেকটা শান্তি পেতে পারত। প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যই বাদসাকে নিয়োজিত করেছেন—খোদা! কিন্তু তা'ত হচ্ছে না। তা' হলে কোন দুঃখই থাকত না—কারো।"

তাজমল হোসেন একটা বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "তা অনেকটা ঠিকই বটে, এ নিয়ে আমার মত গরীবের মাথা ঘামানো একেবারে নিষ্প্রয়োজন। আচ্ছা বেগম সাহেবা! এই দু'টি যুবক যুবতীকে এমনি করে কারাগারে পুড়ে, বাদসা সাহেবের কোন্ মতলব সিদ্ধি হতে পারে? সাহাজাদাকে বিয়ে কত্তে চায় না, তবু জোর করিয়ে মত করালে, একে দাম্পত্য প্রণয়ের কোন আশা যে থাক্‌তে পারে, এ ত আমার একেবারেই মনে হয় না। আহা! কি খাসা এদের চেহারা, দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়।"

আমিনা অসীম আগ্রহ মথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল "এদের তুমি দেখেছ?"

তাজমল হোসেন দৃঢ় স্বরে বলিল "রোজই দু'বার করে দেখছি এদের. কি চেহারা ছিল, চিন্তায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে! কত কি ভাল ভাল আহারীয় দেওয়া হচ্ছে, সবই প্রায় পড়ে থাকছে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, খেতে ইচ্ছে হয় না, ক্ষুধা মোটেই নেই! আহা! এত চিন্তায় কি ক্ষুধা থাক্‌তে পারে! দুই পাশাপাশি কক্ষে দু জনা বাস কচ্চে, একটা দেয়ালে এদের দুজনারে ভিতর অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। দু'জনাই মিলনের জন্য অসীম আগ্রহে দিন কাটাচ্ছে! আমাকে তা'রা কত অনুরোধ করে, সাহসে ত আমার কুলয় না! সর্ব্বক্ষণ দু'জনা সেই দেয়ালের গায় মুখ রেখে, চখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, হায়! খোদা! কেন এদের এমনি করে পুড়িয়ে মারছ?" বেগম সাহেবা, এদের অবস্থা যদি দেখতে, তবে চোখের জল রাখতেই পারতে না।"

তাজমল হোসেনের উক্তিতে আমিনার চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। একটা বুক ফাটা হাহাকার নীরবে তাহার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। অতিকষ্টে আত্মগোপন করিয়া, ভাবিতে লাগিল, এ শুভ সুযোগে হাত ছাড়া কত্তে পারা যায় না, প্রহরীকে ভয় দেখিয়ে, কাজ হাসিলের পথ করে নিতে হবে! বাদসার পক্ষ টেনে, সামান্য মোচড় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, অতঃপর আমিনা প্রকাশ্যে বলিল "দেখ তাজমল, বাদসার কথার অবাধ্য হওয়াটা যে গুরুতর অপরাধ তা হয় ত তুমি জান,—এরা অবাধ্য হয়েছে বলেইত শাস্তি ভোগ করাতে বাধ্য করেছে। বাদসার কাজে এসব মন্তব্য প্রকাশ করা, তোমার পক্ষে খুবই দোষনীয়! তুমি না বাদসার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী!—এ সব মন্তব্য তোমার মুখে শোভা পায় না।"

তাজমল হোসেন একেবারে থতমত খাইয়া গেল। তাহার তেজগর্ব্ব স্মিতমুখ অকস্মাৎ দারুণ নৈরাশ্যের মেঘে অন্ধকার হইয়া গেল। একটা অগ্নিগর্ভ তপ্তশ্বাস মোচন করিয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করে, কাতর অনুনয়ে কহিল "বেগম সাহেবা! তা গরীবের কথা ধরবেন না, আমরা মুখ্যু লোক,—কি যে বলে ফেলি মাথামুণ্ডু, তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না, এ বিষয়ে বাদসা সাহেব কোনই অন্যায় করেন নি।"

আমিনা একগাল হাসিয়া, রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে, বলিতে লাগিল "তাজমল! তোমার কথায়, বিদ্রোহীর ভাব যেন প্রকাশ হয়ে পাড়ছে, আমি বাদসাকে যদি এ সব কথা বলে দি'—তখন তোমর উপায় কি হবে?"

তাজমল হোসেন, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া আমিনার চরণ-যুগল ধারণ করিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিল "ক্ষমা কত্তে হবে এ নফরকে, গর্দ্দানাটা আমার বাঁচিয়ে দিতেই হ'বে আপনাকে, আমার মাথার ঠিক ছিল না. কি বলতে কি বলে ফেলেছি, বাদসা সাহেব এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পার্‌লে, আমার গর্দ্দানা রাখবেনই না! আমার মরণ হলে, স্ত্রী পুত্রের কি উপায় হবে বেগম সাহেবা? দোহাই আপনার, আমাকে এবার মাপ কত্তেই হবে,—প্রাণ থাক্‌তে আমি আপনার অবাধ্য হব না" বলিয়া তাজমল হোসেন চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

আমিনা তাজমলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একেবারে মুসড়িয়া পড়িল, শেষে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল "আচ্ছা এবার

ক্ষমা করা গেল ভবিষ্যতে এমন কথা আর মুখে এন না।”

তাজমল হোসেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল “আমার একথা বলা ঘাট হয়েছে, আমি আপনার ছেলে, শত অপধাধ করলেও, ছেলে মার নিকট ক্ষমা পেতে পারে।”

আমিনা একগাল হাসিয়া বলিল, যাক্ সে কথা, আচ্ছা তাজমল, এই কারারুদ্ধ যুবক যুবতীকে দেখবার একটা উৎসুক্য আমার খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে, তুমি যদি একটুকুন সাহায্য কর, তবে দেখবার সুবিধে হতে পারে। তোমার কি মত?”

তাজমল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল “কারো ভিতরে যাবার হুকুম নেই একেবারে,—বেগম সাহেবা”।

আমিনা দৃঢ় স্বরে বলিল “তাত জানি,—তবু বল্‌ছি তুমি সাহায্য কর্‌লেই হতে পারে, মাত্র পনর মিনিট কাল আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আস্‌ব। কোন বিপদের আশঙ্কা নেই তোমার। কি বল?

তাজমল ভাবিতে লাগিল,—যদি নিষেধ করি,—তবে আমার উপর খুবই কষ্ট হবে,—তার ফলে বাদসার কোপ দৃষ্টি আমার ঘাড়ে চেপে বস্‌বে। পনর মিনিটের বিষয় ত, বাদসার আসবার সম্ভাবনা নেই এখন। অতঃপর জড়িত কণ্ঠে বলিল “আপনার অবাধ্য আমি কথনও হতে পারি না, এই দরজার চাবি নিন,—পনর মিনিটের মধ্যেই ফিরে আস্‌লে,—কোন বিপদে নাও পড়তে পারি।”

আমিনা চাবি গুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া—ত্বরিত পদে তোড়ন দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল॥

আমিনা সম্মুখের একটা রুদ্ধ গৃহের অর্গল মোচন করিয়া মতিয়াকে দেখিতে পাইল। মতিয়া সেই সময় নত মস্তকে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ আলোক সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইতেই, আমিনাকে দেখিতে পাইল। মতিয়া উন্মত্তা অধীরবৎ ত্বরিত গতিতে ছুটিয়া আমিনার গলা জড়াইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যেন আজ কান্নার সপ্ত সমুদ্র তুফান ছুটিয়া চলিল। এক ভীতিপূর্ণ আশঙ্কার হাহাকার যেন তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। হায়! একি বিড়ম্বিত অশান্ত জীবন।

আমিনা অনড় অবস্থায় মতিয়ার গলা ধরিয়া কতক্ষণ কাঁদিল, —শেষে সামান্য প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল ‘বোন্! এ—ত কাঁদবার সময় নয়ই! কাল তোমাদের বিচার হবে, আজ রাত্রির ভিতর যা’ হয় একটা কিছু না কর্‌তে পার্‌লে, আর রক্ষা নেই,—এখন ধৈর্য্য সহকার আত্মরক্ষার চেষ্টা কত্তে হবে, অধৈর্য্য হইলে মুক্তির আশা নেই। তোমাদের রক্ষার জন্যই আমি এতবড় বিপদ সঙ্কুল পথে পা বেড়িয়েছি। আমার প্রাণ বিনিময়ে—তোমাদের রক্ষা কত্তে পারলেও, আমার চেষ্টা সার্থক মনে কর্‌ব.—আমার এ কাজের পরিণতি যে কি তা খোদা বল্‌তে পারেন। আমার সাথে বেড়িয়ে এস,—আমি যা বলব তাই কত্তে হবে। মতিয়া নীরবে আমিনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

আমিনা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, মতিয়াকে সহ ভিতরে প্রবেশ করিল। আলোক সম্পাতে দেখিতে পাইল, হোসেন সেঝের উপর, উপুর হইয়া পড়িয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমিনা অস্থির হইয়া পড়িল। অনতি বিলম্বে হোসেনের হস্তধারণ করিয়া,—সম্মুখে দাঁড় করাইল এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া দিল। হোসেন আমিনা ও মতিয়াকে সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়া একেবারে কিম্ভূত কিমাকার হইয়া গেল। সে যেন ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখিতেছে, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, চক্ষুদ্বয় দুই হাতে রগড়াইয়া ফেলিল! ক্রমে মোহ কাটিয়া গেলে, একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে, আনন্দে তাহার প্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। শেষে আমিনার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল “মা! একি সত্য—তুমি এসেছ?

সেই “মা সম্বোধনে আমিনা উন্মাদিনীর মত সকল ভুলিয়া—বাৎসল্যরসসিক্ত কম কণ্ঠে অমৃত ধারার ন্যায় ঝরাইয়া দিল—“বাবা” পরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিল। শেষে কোমল কণ্ঠে বলিল “বাবা! ঠিকই এসেছি আমি—তোমাদের সাহায্য কর্ত্তে। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার শক্তিতে যতটুকুন কুলায়, তা প্রাণ দিয়েও কর্‌ব। সবই খোদার ইচ্ছে, কাল তোমাদের যা কিছু একটা হয়ে যাবে—যা কিছু প্রতিকার আজ রাত্রির ভিতরই কর্ত্তে হবে।—তুমি পুরুষ,

পুরুষের পক্ষে বিপদে ধৈর্য্য হারান উচিত নয়। অসীম শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা কর—খোদা অবশ্য সহায় হবেন। আমি কয়েক মিনিটের জন্য এসেছি। মতিয়াকে এখানে রেখে যাচ্ছি, দ্বার বন্ধ করে চলে যাব। আবার এক ঘণ্টা পর আমি আসব। তোমাদের এ রাত্রিতেই এখান হ'তে পালাতে হ'বে। সময় সংকীর্ণ,—আমি এখন যাই।" বলিয়া আমিনা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহির হইতে উভয় কক্ষের দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া, আমিনা চলিয়া গেল।

আমিনা চলিয়া গেলে,—হোসেন হর্ষ বিস্ময়ে ছুটিয়া আসিয়া, মতিয়াকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল,—সঙ্গে সঙ্গে মতিয়ার প্রাণের ভিতর এক অসীম উচ্ছ্বাস উদ্দাম বেগে ছুটিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে এত আনন্দ উচ্ছ্বাস তাহার সহ্য হইল না! মতিয়া একরূপ মুচ্ছিতা হইয়াই হোসেনের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার চৈতন্যের উন্মেষ হইল। মতিয়া হোসেনের গলা জড়াইয়া, অনিমেষ নেত্রে হোসেনের মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহার মুখ মণ্ডল আনন্দের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। তাহার একান্ত ইপ্সিতের অতুল্য সুন্দর মুখের দিকে আনত নেত্রে অনেক্ষণ চাহিয়া রহিল! তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া একটা আর্ত্তধ্বনী, আপনাকে ফাটাইয়া দিবার জন্য তাহার ভিতরটাকে নির্দ্দয় ভাবে, পীড়ন করিতে লাগিল। মতিয়ার মন প্রাণ এক মুহূর্ত্তে যেন, গুরু গুরু মেঘ ডম্বর রোলে, উৎকণ্ঠিতা উর্দ্ধনেত্র চাতকীর মত, গভীর তৃষ্ণা বিমানের উন্মত্ত আগ্রহে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া উঠিল। তাহার আশা নিরাশার বিপুল সংঘাত তাহার বুকের মধ্যে চকিত বিজলীর সঘন স্ফুরণের মতই, মুহুর্মুহু স্ফুরিত হইতে লাগিল।

হোসেন অতি কষ্টে আত্মস্থ হইয়া দেখিল—দুইখানা কোমল মৃণাল বাহু তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আর দুইটি সজল নীলোৎপল নয়ন হইতে অসীম-স্নেহ করুণার অমৃতধারা ঝর্‌ঝর্ ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রুদ্ধ অশ্রুর জমাট বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া লইল। কয়েক মুহূর্ত্তে এই ভাবে কাটাইয়া দিয়া, উভয়েই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। হোসেন মতিয়ার মুখখানা আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া ডাকিল "মতিয়া!"

মতিয়া আত্মহারা হইয়া প্রত্যুত্তর করিল "কি প্রিয়তম!"

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া হোসেন বলিল "এখন কি করা যায়? কিছুই যে ঠিক করে উঠতে পাচ্ছি না।"

মতিয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিল "এ যে ভয়ানক সমস্যা! বিবাহের সপক্ষে মত দিলে, তোমাকে পাবার আশা আর ত থাকবে না। এক আত্মহত্যা ছাড়া আমার মুক্তি নেই! যদি অমত প্রকাশ করি তবে, আমার চক্ষের উপর, তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর্‌বে, কি ভয়ানক সংকল্প! তোমার রক্তে মৃত্তিকা ভেসে যাবে, আর আমি তা স্বচক্ষে দেখে, বেচে থাক্‌ব? হায়! বিধাতা কি সমস্যায় আমাকে এনে দাঁড় করালে।" বলিয়া মতিয়া হোসেনের বুকে মস্তক রাখিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "ছিঃ কেঁদ না, কাঁদবার ত অনেক সময় রয়েছে, কাঁদাই যে আমাদের একমাত্র সম্বল! মতিয়া! আমি গরিব, সামান্য প্রজা বৈ ত নই,—আমাকে লাভ করার জন্য কেন তুমি, এমনি ভাবে, আপনাকে অসীম অশান্তির ভিতর টেনে নিয়েছ। তোমাকে আমি পাই, সে কপাল নিয়ে আমি জন্মাইনি! বেগম হবার প্রলোভন ত কম নয়, কেন তুমি সামান্য একটা স্মৃতির অনল বুকে করে, সেই ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, পদদলিত কর্ত্তে চাইছ! আমার মত ক্ষুদ্র প্রজা, বাদসার বিদ্রোহী সেজে ক দিন টিক্‌তে পার্‌ব? তোমাকে সুখী হতে দেখলে, আমার খুবই আনন্দ হবে। তুমি বিবাহে মত দিয়ে, জীবনের ধারা ফিরিয়ে নাও, এতেই আমি সুখী হ'ব।"

মতিয়া হোসেনের প্রতি নির্ণিমেষে তাকাইয়া বলিল "যে দিন তোমার সাথে প্রথম দেখা হল, সেই মধ্যাহ্নের শুভ্র সুন্দর স্মৃতিটুকুন কোন দিনই মুছে ফেলতে পারব না। তারপর যৌবন পদ্মের কোরকের উপর সেই শান্ত-স্নিগ্ধ রশ্মিপাত, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মুদিত কোরকগুলি কেমন করে যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার স্মৃতি মনে পড়লে, রক্তের তালে তালে, নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে, প্রাণের ভিতর এক অভিনব সাড়া এনে দেয়, তা'ত মুছে ফেলা চলে

না! যে জিনিষ শব্দ গর্জ্জনে আপনাকে প্রকাশ করে, তা' সুধু সকলকে সাবধান করে দেয়! সুধু মাত্র রেখা পাতে, অন্তরের শিরা উপশিরায়, সুকুমার হিল্লোলে, যা মৃদু কম্পন জাগিয়ে তোলে, সেটাই বুকে অধিক দাগ বসিয়ে যায়! প্রেম বল, ভালবাসা বল, এমন একটা কিছু আকাঙ্ক্ষার শত-ধারায় মথিত হয়ে যখন অন্তরে জেগে উঠেছে, তখন তাকে কৌস্তভ মণির নয়ন ভোলান আলোর মতই আকৃড়ে ধরে থাক্‌ব, এ অধিকার সহজে ত ছাড়া যাবে না! ভালবাসা তুচ্ছ নহে! সেও সাধনা, অশ্রুজল সাপেক্ষ, তাতে নিষ্ঠুরতার আঘাত নেই, কিন্তু বজ্রের কঠোরতা রয়েছে! স্মৃতির অনল তুমি সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চাইছ? তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরকার সন্ধান নিতে পারতে,—তবে দেখতে, কত বড় একটা পবিত্র তন্ময়ত্বে আমার অন্তর অধিকৃত হয়ে আছে! তার নিকট সুখ ঐশ্বর্য্যের মোহময় প্রলোভন, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ! অমত প্রকাশ কর্‌লে তোমার জীবন নষ্ট হবে, সেই একমাত্র আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়েছি। যদি তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পাত্তুম, তবে দেখিয়ে দিতুম, ভালবাসার তন্ময়ত্বের নিকট, মৃত্যুর দংশন ভীতি, কত সামান্য, কত তুচ্ছ! যে দিন এ ভাবের সুতো কাটার পালা শেষ হয়ে যাবে, সে দিন যেন পর পারে যাত্রার জন্য বিন্দু দ্বিধার সঞ্চারও না হয়, এই আশীর্ব্বাদই তুমি——।" কথা শেষ না হইতেই মতিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া স্বয়ং বাদসা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সক্রোধ কটাক্ষে, ভ্রূকুটি বদ্ধ আরক্ত মুখে, একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন শত তীব্র জ্যোতিতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে ছিল! সেই দীপ্তি যেন তাহাদের উভয়কে দগ্ধ করিয়া পোড়াইবার জন্য শিখা বিস্তার করিতেছিল!

আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তের ন্যায়, উভয়ে চমকিয়া উঠিল। উভয়ের মুখে ভূতাহতের মত আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মতিয়া আলুথালু বেশে ছুটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। হোসেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, নত মস্তকে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। উভয়ের দেহই একটা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

(ক্রমশঃ)

ভবিষ্যতের সমাজ

(শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্. এ. বি, এল্.)

অতি প্রাচীন কালে জগতের স্থানে স্থানে নানা সময়ে মহিমান্বিত যে সকল জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই প্রবীণ মিশর, প্রাচীন বেবিলন, প্রাচীন এসিরিয়া বাসিদের বংশধরগণের অস্তিত্বও এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথায়ই না গেল পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত সুশিক্ষিত সৌন্দর্য্য ও বলের উপাসক শৌর্য্যবীর্য্যশালী স্বদেশপ্রাণ প্রাচীন গ্রীক জাতি, কোথায় মহাপরাক্রমশালী রোমান জাতি, তাহাদের প্রবর্ত্তিত সমাজ, সভ্যতা? প্রাচীন ফিনিসিয়া, কার্থেজ কোথায়? কোথায় সব? এখন সে সকল প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

কেবলমাত্র পূর্ব্বকালের দুইটী জাতি এখনো যদিচ নিতান্ত দীনাবস্থায় তাহাদের বহুকালের প্রথা ও জীবননীতি, চালচলন, সমাজ ও সভ্যতা অটুট রাখিয়া বিরাজ করিতেছে—প্রাচীন চীন ও প্রাচীন হিন্দুজাতি। চীনের কথা বলিবার দরকার নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ও এশিয়ার নানাস্থানে কত সাম্রাজ্য ও সভ্যতা আবির্ভূত হইয়া অবশেষে আকাশে শব্দের মত বিলীন হইয়া গেল। খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া জল স্রোতের মত দুর্ব্বার বেগে প্রবেশ করিয়া শক্, ও হুন্, গ্রীক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি কত সময় কত জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বলবিক্রমে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে তাহার শান্তিময় বক্ষ তোলপাড় করিয়া তুলিল। মুসলমান ও হিন্দুতে ছয় শত বর্ষেরও অধিক কাল সংঘর্ষ চলিয়া ছিল; জ্ঞানালোচনা তৎপর বৃদ্ধের সঙ্গে নব বলদৃপ্ত অশিক্ষিত যুবকের সংগ্রাম—প্রথম ধাক্কায় বৃদ্ধের পড়িয়া যাইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় ধরাশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, বৃদ্ধ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যুবকই পিছাইয়া যাইতেছে, শেষে এমন অবস্থাও আসিয়া দেখা দিল যে সে বৃদ্ধেরই পদানত হইবার উপক্রম। এই সন্ধি স্থলে আর এক নূতন যুবক-জাতি আসিয়া সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হইল; তাহা না হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে

আবার হিন্দুরাজত্বে ও হিন্দু সভ্যতার অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী ছিল, এবং ইহাও খুব সম্ভব হয়তো ইসলাম কালে তাহাদের কলেবরভুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব লোপ করিতে বাধ্য হইত।

(২)

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারত ইতিহাসের মহাস্মরণীয় বৎসর। সেই সময় ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং তাহার পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসর কাল ভারতবাসীর ভাগ্যনিয়ন্তারূপে অবস্থান করিতেছে। বয়সে হিন্দু অপেক্ষা কত ছোট, কিন্তু তাহার বিক্রমে বুদ্ধিমত্তায় শুধু ভারতবর্ষ নয়, জগতের চতুর্থ ভাগের অপেক্ষাও অধিকাংশ স্থান তাহার পদানত। দেখিয়া মনে হয়, বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের খাল নদীতে সচরাচর দৃষ্ট ছোট ছোট ষ্টীম-লঞ্চের পিছনে বাঁধা মস্ত মস্ত বোঝাই করা পাটের নৌকার মত বিশালবপু ভারতবর্ষকে যেন সে হিড় হিড় করিয়া পশ্চাতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

মুসলমান ও ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত বিজয়—উভয়ের মধ্যে অগাধ পার্থক্য। মুসলমান যাহা করিয়াছিল, তাহা প্রায় একপ্রকার গায়ের জোরে—হিন্দুর মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সে পারে নাই। কালে মুসলমান পাঠান মোগল সম্রাট দেশ প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতি ভাষা ভাব অনেকাংশে অলক্ষিতে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকোচিত বাইরের জাঁকজমক লইয়াই মজিয়া রহিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল ও দিল্লীর দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, স্বর্ণের ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি অতুল্য অট্টালিকা ও সামগ্রীতেই সে সাম্রাজ্যের চরম পরিণতি দৃষ্ট হয়। মোগল কি পাঠান বাদশাহদের জ্ঞান চর্চ্চার দিকে কখনও তেমন প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই—সমস্ত দেশ তখন এক নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল। এক সময় অবশ্য অন্যত্র—ভারতে নয় মুসলমানদের মধ্যেও প্রভূত জ্ঞানের চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতে তাহাদের পক্ষে ঐ জিনিষটা যেন এ পর্য্যন্ত তেমন ধাতে সহিয়াও সহে নাই। নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় যে জাতির জ্ঞানালোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকিয়া জগতের নানাস্থানের লোককে জ্ঞান আহরণের জন্য যুগে যুগে আকর্ষণ করিয়াছিল—মুসলমানের সংঘর্ষে আসিয়া সে জাতির কি দুর্দ্দশাই না উপস্থিত হইয়াছিল! প্রদীপ্ত আলোর দিকে ধাবমান মক্ষীকার ন্যায় পূর্ব্বাপর হিন্দুর প্রাণ জ্ঞানের দিকে বদ্ধদৃষ্টি, অমৃত অভিলাষী হিন্দু আত্মা এই জ্ঞানামৃত লাভের আশায় পূর্ব্বাপর কি তপস্যাই না করিয়াছে! জ্ঞান ও ধর্ম্মে হিন্দুর পার্থক্য নাই,—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানই, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই জ্ঞানামৃত সংগ্রহের জন্য স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সে বিষয় বিরাগী সন্যাসী সাজিয়াছে—জ্ঞান যোগী বাল্মীকি, ব্যাস, জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য কোথায় তুলনা ইঁহাদের? মুসলমান যুগে নানাদিক হইতে এই জ্ঞানার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাও প্রাচীন শাস্ত্র ও তলপি, তল্পা নাড়িয়া চাড়িয়া নিংড়াইয়া যে কিছু জ্ঞানরস সে পান করিতেছিল, তাহারই কল্যাণে পুষ্ট হইয়া হিন্দু মরিয়া ও মরিল না। জ্ঞানের সম্মুখে অজ্ঞানতা, আলোর সম্মুখে আঁধার কতদিন অজ্ঞানতা গর্ব্বভরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? জ্ঞানের অভাবেই মুসলমান হিন্দুর নিকট অবশেষে পরাস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল!

(৩)

কিন্তু ইংরাজ যেমন বাইরের, তেমন জ্ঞানের বলে বলীয়ান্, যেমন শক্তি; তেমন তাহার বুদ্ধি! জগৎজয়ী দুর্দ্ধর্ষ, মহাশিক্ষিত ইংরাজ জাতি! প্রথম অবস্থায়, বাহির ও ভিতর, দেহ ও মন—সর্ব্বদিক হইতেই সে হিন্দুকে পূর্ণরূপে পরাভূত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, তাহার বিশ্ববিজয়-ব্যাপারও ভারতবর্ষে চরম সীমায় উপনীত হইয়া প্রাচীন বৃদ্ধের সংঘর্ষে আসিয়া শেষ দশায় উপস্থিত হইয়াছে; ধীরে ধীরে ভারত তাহার নিজ কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়াইতেছে ও ইংরাজী সভ্যতা তাহার ধাকায় হটিয়া যাইতেছে—ভারতের সভ্যতা ইংরাজী সভ্যতাকে উদরস্থ করিয়া নিজ অঙ্গীভূত করিতেছে ও নিজ অন্তর্নিহিত বেগে বিকশিত হইতেছে, ইংরাজ ভারতে ভারত কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য প্রভাব জয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে। এমনও দিন গিয়াছে, যখন লর্ড মেকলের দাম্ভিকতাপূর্ণ ঘৃণা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক উক্তি A shelf of good European Library is worth the whole literature of India and Arabia ইয়ুরোপের কোনও শ্রেষ্ঠ পাঠাগারের এক তাক্ বই, গুণে ভারতবর্ষ ও আরবের

সমস্ত সাহিত্যের সমকক্ষ—ভারতবাসী মহাসভ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের নিতান্তই অপদার্থ ও হীন মনে করিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের শিক্ষা, আচার, রীতি-নীতির প্রশংসায় এ দেশবাসী তখন পঞ্চমুখ ছিল। দেশের কবি তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের তীব্র আলোকে চমক-লাগা চোখে পথ বিপথ ভুলিয়া সেক্সপিয়ারকে জগতের ও কালিদাসকে কেবলমাত্র ভারতের কবিস্বরূপে সম্বোধন করিয়া দেশবাসির নিকট সুতীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির জন্য মহা-প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাসের তুলনায় সেক্সপিয়ার? কি আছে এমন সেক্সপিয়ারে, যাহা অনন্ত অভিলাষী মানবের আত্মার আকাঙ্ক্ষার খোরাক জুটাইতে পারে? কোথায় বা তুলনা মহাকবি ভবভূতির? মহাকবি বিদ্যাপতির সমকক্ষ কোথায়? কোথায় পাণিনির? ষড়দর্শনের? শকুন্তলার, রামায়ণ মহভারতের? উপনিষদ ও বুদ্ধবাণীর? জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতের তুলনায় ইংল্যাণ্ড! স্যার উলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার, বেণ্টলি, কোলব্রুক, ফারগুসন্, হেভেল, স্মিথ প্রভৃতির গবেষণার, কল্যাণে চোখের ধাঁধা, মনের ধাঁধা ভারতবাসীর অনেকটা গিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছে সে একা পরিষ্কাররূপে জ্ঞানরাজ্যে জগতে তাঁহার দানের মূল্য কম নয়, এবং মোটের উপর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতিতে অভ্যুত্থিত নবীন জাতি সমূহ তাহার সঙ্গে তুলনায় কত নীচে। কার্য্যক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, যেখানে ভারতবাসী সুযোগ সুবিধা পাইতেছে, সকলকে ডিঙ্গাইয়া সর্ব্বাগ্রে সে স্থান গ্রহণ করিতেছে। এমন পতিত অবস্থাতেও যে জাতির মধ্যে রামমোহন, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের মত মনীষীগণের আবির্ভাব হইতেছে কোন্ দেশের তুলনায় সে দেশ নিকৃষ্ট মনে হইবে?

(৩)

মুসলমান যেমন তাহার ইসলাম ধর্ম্ম লইয়া হাজির হইয়াছিল, ইংরাজ ও তেমন তাহার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম আনিয়াছিল। প্রথম প্রথম রাজানুগৃহীত নবালোকদীপ্ত জগৎজয়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য জাতির গৃহীত ধর্ম্মস্বরূপে তাহা এ দেশ-বাসীর দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। কত লোক পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের পতাকা তলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যে শান্তি, সুখ, আনন্দের জন্য তাহারা দৌড়াইয়া গিয়াছিল, প্রাণের যে ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বাইবেলে তাহা তাহারা পায় নাই। ফলে, তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে কতজন আজ প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের বক্ষের মধ্যে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! ইহার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম মূলতঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত, দর্শন ও ধর্ম্মে হিন্দুর চক্ষে কোনও পার্থক্য নাই পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম বা ইসলাম, যতটা না জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটা গোঁড়ামির উপর। গোঁড়া খ্রীষ্টান ব্যতীত এই বিজ্ঞানের যুগে কে বিশ্বাস করিবে, এক ধীবর পুত্র দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলামে ক্রশে আবদ্ধ অবস্থায় প্রাণ হারাইয়া সমস্ত মানবজাতিকে চিরকালের জন্য ত্রাণ করিয়া গিয়াছেন? গোঁড়া মুসলমান ছাড়া কে বিশ্বাস করিবে গেব্রিয়াল নামক স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব ও মহম্মদের সঙ্গে তাহার জল্পনা কল্পনা? গোঁড়ামীই এ সব কল্পনার ভিত্তি, কিন্তু তাহা ত্যাগ করার উপায় নাই; তাহা হইলে ধর্ম্ম যে থাকে না; নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে চলা—কয়জনের সাহস আছে তেমন? খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দর্শনের একবারেই স্থান নাই, ইসলামেরও তদ্রূপ। ইসলামের কিন্তু একটী বড় গুণ আছে সমদর্শিতা, ভ্রাতৃত্বের ভাব, জাতবিচার শূন্যতা। এই গুণে আকৃষ্ট হইয়াও সময় সময় মুসলমানের কাছে পরাস্ত হইয়া অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজ ভারতে প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এ সবেরই অভাব, তাই ইহা চলিল না; দর্শনে পুষ্ট তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হিন্দুর চক্ষে বাইবেল বা কোরাণের কোন মূল্য নাই—দুইই দুটা নিরক্ষর লোকের মনোকল্পিত উক্তির সমষ্টি। জ্ঞানান্বেষী হিন্দু তাহাদের অনুসরণ করিবে কেন?

কিন্তু ইংরেজ তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের শুধু বাইবেল গ্রন্থ লইয়াই এদেশে উপস্থিত হয় নাই। বাইরের কামান, বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র ও বাইবেলের সহিত সে আর একটী জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিল—একটী মহাবিস্ফোরক - যাহার নাম পাশ্চাত্যদেশে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের আক্রমণে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখা দিন দিনই কঠিন হইয়া উঠিতেছে

প্রাচীন সংস্কারের দুর্গ—জাতিভেদ, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বও প্রাধান্য, দেব-দেবীর পূজা, স্ত্রীপরাধীনতা, অস্পৃশ্যতা, সমুদ্রযাত্রা বন্ধন, যে সব নিয়ম নীতি, আচার পদ্ধতিকে এতকাল মহাসভ্যজ্ঞানে হিন্দু আকড়াইয়া ধরিয়া ছিল, এবং যে সকল তাহার ধর্ম্মের, সমাজের মূলভিত্তি—আর যেন অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না, দিনের দিন প্রাচীরের নানাদিকে ফাটল দেখা দিতেছে, চারিদিক দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু ধর্ম্মের নাভিঃশ্বাস উপস্থিত হইবার উপক্রম। কিন্তু ইহাতে দুঃখের কোনও কারণ নাই। সত্য যাহা তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে; না করিয়া উপায়ও নাই, কালে গৃহীত তাহা হইবেও ইহা সত্যের ধর্ম্ম। মানুষেরই প্রাণী মধ্যে একমাত্র অধিকার দিনের দিন অন্ধকারকে পশ্চাতে ফেলিয়া আলোর দিকে অগ্রসর হওয়া; সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাতেই মানব-আত্মার আনন্দ, মানবত্বের পুষ্টিসাধন, জাতির পূর্ণতা-প্রাপ্তি। জ্ঞান চর্চ্চাই, সত্যের সন্ধান করাই যে হিন্দু সভ্যতার, তথা ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা।

(৫)

জ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান! এক সময় এ দেশেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সে পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী প্রায় সাত শত বৎসর কাল ভারতের তামস যুগ। এক্ষণে আবার ইংরাজের অনুগ্রহে জ্ঞান আহরণের নানা সুবিধা-সুযোগ হইয়াছে, হিন্দুর শক্তি এবং প্রতিভাও নানদিক দিয়া বিকশিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিয়া তুলিতেছে।

ইয়ুরোপে তিন শত বর্ষের অধিক কাল হইতে বিজ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার ফলে সেখানকার ছোট বড় কত নগণ্য জাতি নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া জগৎ জোড়া প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বত্রই আচার পদ্ধতি চালচলন পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখারে যাইতেছে, মুর্খতা আর কতদিন জ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধেজয়ী হইবে? বিবর্ত্তন বাদের প্রচলনের সঙ্গে এবং বায়লজি, এ্যান্থ্রপলজি, প্রভৃতি নূতন নূতন শাস্ত্রের অভ্যুদয়ের কল্যাণে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে অন্যান্য অসংখ্য জীবজন্তুর মত মানুষও একটা জন্তু বিশেষ মাত্র, তাহাদের একটু উন্নততর অবস্থাতেই তাহার জন্ম এবং ইহাও এক্ষণে সর্ব্ববাদি সম্মত নগণ্য বানরই তাহার আদি পুরুষ, বৈবস্বত মনু বা আর কেহ নয়। ভগবান তাহাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া ফরমাইস দিয়া তৈয়ার করান নাই, বিশেষ কোনও আদরের পাত্রও নয় সে, অন্যান্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গের মত সেও অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিবর্ত্তন ক্রিয়ার ফলে আবির্ভূত হইয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়ের ঈদৃশ উক্তি নির্জলা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আর ভগবান্ স্বয়ং? এতদিনের সেই অতি বৃদ্ধরও যে আর সংবাদ তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোনও বিজ্ঞানাগারেই ভগবানের স্থান নাই, তাঁহাকে বাদ দিয়াই সমস্ত বিজ্ঞান অগ্রসর হইতেছে। কথিত আছে নেবুলার থিয়োরীর প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত ল্যাপলেস তাঁহার Exposition of the universe নামক মহাগ্রন্থ নেপোলিয়ানকে উপহারস্বরূপ দান করিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই জগতের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু কই, ঈশ্বরের নামতো কোথাও দেখা গেল না মুঁসে ল্যাপলেস! ল্যাপলেস তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি তো কোথাও অমন অপ্রমাণিত অনুমানের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন মনে করি নাই। অবিনশ্বর আত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা যে সব ধারণার উপর হিন্দুর মূল ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত তাহাদেরও অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তবে এত যুগ যুগ ধরিয়া বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে গহ্বরে গুহায় সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী সাজিয়া কাহার পূজা ও ধ্যান করিল হিন্দু? মায়া মরীচিকার মত সব, বিজ্ঞানের আলোকে দেখা যাইতেছে সবই কল্পনা প্রসূত, সত্য সম্পর্ক বিরহিত। জগতে অবিনশ্বর কিছুই নাই, সমস্তই এক পরিবর্ত্তনরূপ মহানিয়মের অন্তর্গত সবই প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোথায় আত্মা, পরমাত্মা, কোথায় ভগবান? কে ইহাদের সন্ধান পাইয়াছে?

যতই দিন যাইতেছে যতই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে কি প্রকার সব কুসংস্কারের উপর সকল সমাজ বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই সব কুসংস্কার বাদ দিয়াই ভবিষ্যতের সমাজ গঠিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগ পতিতের উত্থানের যুগ। এ যুগের সর্ব্বত্রই প্রথম সমস্যা—দরিদ্র সমস্যা, নির্যাতিতের সমস্যা। পতিত পদ দলিত দরিদ্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া যে অত্যাচারী ধনী তাহাকে না না প্রকারে প্রপীড়িত করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া অসহনীয় জীবন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সঙ্গে সমান আসনে উঠিয়া বসিবার অধিকার দাবী করিতেছে। কারণ, বুঝিতে পারিতেছে সে এতদিন পরে বিজ্ঞানের আলোকে, জ্ঞানের আলোচনায় সেও ধনী—একই জীববংশের মানববংশের অন্তর্গত একই প্রকার রক্ত মাংসে গড়া তাহাদের উভয়ের দেহ এবং এক সমাজে থাকিতে হইলে উভয়েরই সমান ভাবে বাঁচিবার বড় হইবার অধিকার। ধনীকে নীচে নামিতে হইবে। দরিদ্র উপরে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে এক সাম্যের আসনে সমান অধিকার সম্পন্নের মত স্থান পাইবে ইহাই বর্ত্তমানের কাম্যাবস্থা এবং এদিকেই নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া সমস্ত সভ্য দেশের জননায়কগণ সমাজকে চালিত করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় ধনী দরিদ্র কি ভয়াবহ সংগ্রামই না চলিতেছে সর্ব্বত্রই সমাজ যে দ্রুতগতিতে কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা কি আর বলিতে হইবে?

ভারতে দরিদ্র সমস্যার সঙ্গে অস্পৃশ্যতা রূপ আর এক মহাসমস্যা জড়িত। ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত জাতিভেদই এই সমস্যার মূলীভূত কারণ। সকলেই বুঝিতেছে, জাতিভেদ অন্তসার শূন্য দেশের মহাঅমঙ্গলকারী প্রথা, কিন্তু তথাপি ছলে বলে কলে কৌশলে বাক্যের ছটার প্রভাবে মহাত্মা গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়াগায়ের অর্দ্ধ শিক্ষিত পুরোহিতটী পর্য্যন্ত ইহার সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর। মুখে মুখে স্বদেশভক্তগণ যতই কেননা ভ্রাতৃত্বের 'দরিদ্র নারায়ণ সেবার মহিমার গুণ গান না করিয়া বেড়ান্। কিন্তু যাইতেই হইবে এই শূন্য জঘন্য প্রথাকে যাইতেই হইবে। মিথ্যা আর কতকাল বিরাজ করিবে ?

(ক্রমশঃ)

মেয়েলী সঙ্গীত

(বিবাহ পর্ব্ব)

[শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়]

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত এ জেলার প্রাচীন পল্লী সাহিত্য সম্পদের অন্যতম নিদর্শন। গ্রাম্য কবিদের যে অনুপম কবিত্ব প্রতিভা পালাগান রচনায় পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এই সকল খণ্ড গীতিগুলিতেও তাহার সমুজ্জ্বল বিভা বর্ত্তমান। আর সেই হিসাবে দেখিতে গেলে পালাগানগুলির মত সাহিত্যের আসরে একদিন ইহাদের সমাদরও অবশ্যম্ভাবী। অশিক্ষার ভিতর অপূর্ব্ব রচিত এই সকল গীতাবলীর ভিতর দিয়া একদিকে যেমন মানব জীবনের সনাতন সাহিত্য সৃষ্টির পিপাসা সঞ্চারিত হইয়াছে অপরদিকে তেমনি ইহাদের সহায়তায় দেশের সমাজতত্ত্ব ও আচার বিচারের পক্ষে কালের গণ্ডী এড়াইয়া ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়া থাকার সুযোগ ঘটিয়াছে।

বাঙ্গালা হিন্দুদের প্রায় সর্ব্বপ্রকার উৎসব ও পর্ব্বগুলিতেই কমবেশী পরিমাণে মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। তবে মূলতঃ বিবাহ সঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। আর বাঙ্গালী জীবনের এই পরম শুভানুষ্ঠানের শতপ্রকার ক্রিয়াকলাপের প্রায় প্রত্যেক স্তরেই অবস্থা ও সময়োচিত ভাবজ্ঞাপক মেয়েলী গীতি শুনিতে পাওয়া যায়।

ঘটনা ও অবস্থানুযায়ী স্ত্রী-পুরুষের সত্যিকার মনোভাব ও আশা আকাঙ্ক্ষার যথাযথ বিশ্লেষণই যেমন এই সকল গীতিকার উদ্দেশ্য তেমনি নানাপ্রকার আদর্শ নরনারী ও দেবদেবীর নামাকরণের সহিত সর্ব্বপ্রকারের শুভবিধানেই ইহার চরম সার্থকতা।

হিন্দু বিবাহের অনেকগুলি পর্য্যায় বা স্তর আছে। যথা মঙ্গলাচরণ, পানখিল, তেল কাপড় অধিবাস, কালরাত্র, শুভরাত্র, বধূঘড়া প্রভৃতি। আর এই সকল শুভানুষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মেয়েলী সঙ্গীতগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

—মঙ্গলাচরণ—

হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে প্রাথমিক ব্যাপার হইল মঙ্গলাচরণ। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের ভিতর কথাবার্ত্তা অনেক

পরিমাণে পাকা হইলে এই অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মেয়ের বাড়ীতে বরপক্ষের আগমনে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের ভিতর একটা ছোটখাট আহার বিহারই মঙ্গলাচরণের প্রধান ক্রিয়া। ঠিক এই সময়টীতে যে সকল মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে তাহাতে সামাগত স্ত্রী-পুরুষদের আমোদ প্রমোদের উল্লাস ধ্বনিত হইয়া থাকে।

(১)

ভাগ্যবতী কন্যার মা।
পণ্ডিত পাঠাইলা না॥
পণ্ডিতে বলে কন্যার মা দেশের ব্যাভার জান না।
পণ্ডিতেরে বসতে দেও সিংহাসন।
ঝারি ভরি গঙ্গার জল, তাতে ডাব নারিকল।
বাটা দেও খিলপান।
পান পানির কার্য্য নাই—কওগো সীতার পিতার ঠাঁই
কওখাইন সীতার বিয়ার যৌতুক।

(২)

পাত্রী দেখার পর বরের বাড়ীতে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হইয়া থাকে। ইহাতে আছে সুকৌতুক জিজ্ঞাসা, আর তাহার বিষদ উত্তর।

কও কও পণ্ডিতরে বউয়ের কুশলরে।
বউ কেমন রূপের মুরলী
আটন বউয়ের দেখলাম গো
খঞ্জন গমন গো।
রইছুন বউ ময়ূরের পেখম ধইরা।
হাত বউয়ের দেখলাম গো আলেতার ফুল গো।
মুখ বউয়ের দেখলাম গো পুন্নমাসীর চান।
দন্ত বউয়ের ডালুম্বের বীচি॥
নাক বউয়ের দেখলাম গো জামাইর হাতের বাঁশী গো।
কান বউয়ের ডুমেরার কুলা।

—পানখিল—

মঙ্গলাচরণের ঠিক পরেই পাত্র-পাত্রী উভয়ের বাড়ীতেই এই উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রতিবাসীদের ভিতর পান, চিনি, সন্দেশ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া লোকের শুভাকাঙ্ক্ষা আকর্ষণ করাতেই ইহার মঙ্গল প্রচেষ্টা নিহিত। এই সময়ের গীত-গুলি শুভকার্য্য উপলক্ষেএকটা সমবেত হাস্যরসের উপাদান।

(১)

পুরবাসিগণ সুপারী কাট গো নারীগণ।
আইস আইস আইস মিলি—আইসা দাও পান খিলি
যার হস্তে সোণার কাটারী, সে আইসা কাটে সুপারী

(২)

এই সময়ের স্ত্রী আচার একটী গীতিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

চল সব নাগরী মিলি শুভদিনে শুভক্ষণে
করি গিয়া পানখিলি।
উত্তম সাইলের চাউলে পিটালি বাটিয়া
বিচিত্র আলিপন দিব উঠান ভরিয়া॥

পানখিল হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টীতে পাড়া প্রতিবেশী রমণীরা প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলায় পাত্রগৃহে (পাত্রিগৃহেও এইরূপ) আসিয়া একত্র হয় অবস্থা এবং সময়োচিত নানারকম গীতাবলী গাহিয়া থাকে এই সঙ্গীতগুলি সাধারণতঃ জাতীয় আদর্শ স্থানীয় পবিত্রনাম নরনারীদের বিবাহ ব্যাপারের কথা লইয়া রচিত। যথা—কালিন্দীর বিয়া, শকুন্তলার বিয়া, কৌশল্যার বারোমাসী, শিবের বিবাহ, চণ্ডির বিয়া, দুর্গার বিয়া, রাধার বারোমাসী প্রভৃতি। এই গীতগুলি আমাদের হাতে বর্ত্তমান থাকিলেও স্থানভাবে পূর্ণাকারে উল্লেখ করা অসম্ভব। কেবলমাত্র মনোনীত কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করা গেল।

(১) শিবের বিয়া

চল রঙ্গ দেখি গিয়া—
আট বছরের গৌরীরে শঙ্করে করে বিয়া।
পুব মুখে রইছেন শিব গো বাঘ ছাল পরিয়া
পশ্চিম মুখী হিমালয় গো গোরীকুলে লইয়া।
... ...
মাইয়া দান কইরা বাপে ফুরাইল দায়
জ্বালাইয়া তুষের আগুন দিল মায়ের গায়।

(২) কৌশল্যার বারোমাসী

মাঘ না মাসেতে রামরে বনেবাসে যায়
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায়।
রাজা অইতা রাজ্য লইতা মনে ছিল সাধ
কেকই মা পাষাণী অইয়া ঘটায় পরমাদ।

আহা পুত্র রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন
কেমনে রইলা বনে তোমরা তিনজন।

(৩) দুর্গার মেয়ে প্রতিক্ষা

অগ্রাণ মাসেতে দিনার গৌরী কৈলাসপুরেতে
গিরিজায়া আন উমা সদাশিবের গৃহেতে।
স্বপ্নে দেখছি সোনার গৌরী আঙ্গিনায় আইসাছে
'মা'বুল 'মা বুল বইলে
মায়ের নিকট বইসাছে।

—তেল কাপড়—

বিবাহের পূর্ব্বদিন বরেরগৃহ হইতে পাত্রীগৃহে ভাবী বধূর জন্য অতীব সমারোহে যে নানাপ্রকার উপহার (অলঙ্কার, সাজসজ্জা ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি পাঠান হয় তাহাকে তেল কাপড় কহে। রাধা সংবাদ, মেয়ে সাজানি প্রভৃতি তেল কাপড়ের প্রধান সঙ্গীত।

(১) রাধা সংবাদ

কৃষ্ণ বলে শুনগো দুতি করি নিবেদন।
রাধাকুঞ্জে গিয়া দুতি রাখ এ জীবন॥
তুমিত চতুর দুতি শুনেছি শ্রবণে।
রাধা আমার প্রিয় পবিত্র সর্ব্বলোকে জানে॥
একে রাধা ভাগ্যবতী ভৃগুমানের ঝি।
বচনে না আইসে রাধা করিবান কি॥
বচনে না আইসে রাধা করিও স্তবন।
তবু যদি না আইসে রাধা ধরিও চরণ।
তবেও যদি না আইসে রাধা নেও আমার মালা।
রাধিকা জিজ্ঞাসা করলে কইও দিছে—চিকণ কালা॥
শ্যাম অঙ্গের মালা লইয়া দুতীর গমন।
রাধিকার মন্দিরে গিয়া দিল দরশন॥
তোমার লাগিয়া শ্যামে না খায় অন্নপানি।
তোমার লাগিয়া শ্যামে ত্যজিব পরাণি॥

(২) মেয়ে সাজান

ধরহে রাজবালা এনেছি মালা।
সুচিকণ মালা পর গলে।
হায় জুড়াক জীবন।
মালতী ফুলে গাঁথছি মালা।
পরে কি না পরে কালার মন॥

(৩) রাধা সংবাদ

ভ্রমর কইওরে কালিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায় গো জ্বলিয়া।
সারা নিশি জাগিয়া থাকি পুষ্পের শয্যা লইয়া।
আজ আসবে কাল আসবে বলে গিয়াছিল বলিয়া।
কেন যে আসিল না কৃষ্ণ কি দোষ জানিয়া।
মথুরাতে কুব্জা পেয়ে রইয়াছে ভূলিয়া।
শ্রীরাধিকার মনের দুঃখ যায় কারে দেখিয়া।

—অধিবাস—

বিবাহের পূর্ব্বদিন বরের পাত্রীর সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় থাকার সময়েটীই অধিবাস। অধিবাসের সময় বরকে হলদি গিলা প্রভৃতি দিয়া পুরনারীরা সুষ্ঠুরূপে স্নান করাইয়া গান ধরে। জামাই যাত্রার ক্রিয়াকর্ম্মও ঐ দিন সম্পন্ন হয়।

(১) কামানি (বা শৌচ ক্রিয়া)

আনার সোণার চানরে কামাইতে
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
পাও ভালা কাম'ও নাপিত,
পায়ের দুই নউখরে।

(২)

জয় জয় রবে চল সখি সবে,
আজ রামের গন্ধ অধিবাস।
বসাইয়া রামেরে—ডাক দাও শীলেরে,
কামাইতে রামের হাতে।
বসাইয়া রামেরে ডাক তার মায়েরে
হরিদ্রা দিতে রামের গায়েতে
বসাইয়া রামেরে আন তার ভগ্নীরে।
গামছা দিতে তাহার কান্ধেতে।

(৩) জামাই যাত্রা

বরের শ্বশুড় বাড়ী যাওয়ার সময় এই সঙ্গীতগুলি গীত হইয়া থাকে। এখানে শিবের বিবাহ যাত্রা উল্লেখ করা হইয়াছে।

(নন্দীরে) সাজ শীঘ্র করি যাইতে হবে
গিরিরাজ ভবনে
আন বাঘাম্বর দেও সত্বর পরনে
আন সিদ্ধের ঝুলি ভস্ম রুলি
মাখিব বদনে।

— বিবাহ—

অধিবাসের পরদিন রাত্রিতেই বিবাহ। ঠিক এই দিনের ক্রিয়াকর্ম্ম ও স্ত্রী আচার নানাপ্রকার। বাড়ীর সমবেত নারী পুরুষ সমস্তই কাজে ব্যস্ত থাকে, আর একদল নারী গীত গাহিবার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ভোর হইতে রাত পর্য্যন্ত প্রায় সব সময়ই গীত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গীতগুলি পর্য্যায় ক্রমে গ্রথিত থাকে। বিবাহের দিন অনেক সংখ্যক মেয়ে লোক মিলিয়া ঘাটে জল ভরিতে যায়। পিছনে বাজনা হইতে থাকে আর তারা গান গায় :—

(১) জল ভরা

জলের ছলে কদম তলে
দেখ্যা আসি শ্যাম রায়।
মেঘের বরণ কালশশী
হৃদয়ে জলে দিবা নিশি।
চল দেইখে আসি অদর্শনে প্রাণ যায়।
গিয়াছিলাম উদয় কালে
ঠেক্যা রইলাম নদীরকূলে
চল শ্যামকে দেইখে আসি অদর্শনে প্রাণ যায়।

(২)

বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে শুনি
গৃহে রইতে পারি না।
মধু মধু যায় শুনা বাঁশী তার করি মানা।
মন্দ কইব গুরুজনা॥
সখি তোরা কর গো মানা এ যন্ত্রণা আর সহে না
পাগল বদন হেরি রাধের কল্পনা।

(৩)

যে যাবে সে যাও গো জলে আমরা না যাব জলে
যাইতে যমুনার জলে সে কালা কদম্ব তলে
আখিঠাঁরে আমায় বলে ধর মালা পর গলে।

(৪) বিবাহের গান

সাজিলা গফুর চন্দ্র বিনোদ রশিয়া।
কত কোটি চন্দ্র জিনি আসিল নদীয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার নামাইল জোর মন্দির ঘরে।
কোলে কইরা লইয়া গেল মিলন মন্দিরে।
বিয়ার মণ্ডলে যখন নিল বিষ্ণুপ্রিয়া।
চন্দ্র আসিল যেমন মেঘ আগ্রা দিয়া।
এবে ত গফুর চন্দ্র রূপে মনোহর।
বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে গন্তর হইয়াছে পাগল।
নয়ানে নয়ানে যখন অইল দরশন।
কটাক্ষে হরিল গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মন॥

(৫) সীতাদান

জনক নরপতি মন হরসিতে
রামচন্দ্র বরে দান করেন সীতা
নানা আভরণে সুসাজন সাজাইয়ে
লইয়া গেল সীতা রাজ সভার মাঝে।
নানা বাদ্য বাজে তার মাঝে,
উলুধ্বনি দিল রমণী সমাজে।

—শুভরাত্র—

বিবাহের পরে শুভরাত্র। ইহা বরকন্যার মিলন রজনী। এই সময়ের গীতগুলিতে পাত্র-পাত্রীর তৎকালীন মনোভাব বিশ্লেষণের সত্যপ্রয়াস দেখা যায়।

(১)

বন্ধু তুমি রজনী প্রভাতে কেন আইলে
আমার কুসুম শয্যা হইল বাসি
ফুলের মালা দাও ফেইলে।
তুমি তরু আমি লতা
আমায় ছেড়ে ছিলে কোথা।
আমি মন আগুনে দগ্ধ হয়ে ঝাপ দিব সেই অনলে।

(২)

সখি রাত্রি হইল ভোর
আসলনারে চেঙ্গরা বন্ধু নিদয় নিঠুর॥
ফালাইয়া পানের শিরা বানাইছি চুক।
খাইল নারে চেঙ্গরা বন্ধু নিদয় নিঠুর॥

যার কুঞ্জেতে গেছলা বন্ধু
তার কুঞ্জেতে যাও।
আমার শয্যায় বন্ধু না বারাইও পাও।

(৩)

মান করিও না কমলিনী মানের কার্য্য নাই।
অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে বসিয়াছেন রাই॥
নানা মতে পুষ্প দিয়া সাজাইলাম বাসর।
পথপানে চাইয়া রইলাম না আস্‌ল নাগর॥

—বধূবরা—

তারপর কন্যা সহ বরের নিজ গৃহে প্রত্যাগমনেই বিবাহ ব্যাপারের বর্ত্তমান পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় একদিকে কন্যার জননী অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া নিজ মেয়েকে বিদায় দেয় আর অপরদিকে সমুজ্জ্বল হাস্যোল্লাসের সঙ্গে বর জননী পাত্র-পাত্রীকে সমারোহের সহিত বরণ করিয়া নেয়। এই সময়ের সঙ্গীতগুলিতে পাশাপাশি ভাবে দুইটী করুণ ও আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত্ত প্রকটিত হইয়াছে।

(১) কন্যা-প্রবোধ

মাগো সীতা স্বর্ণলতা মায়ের কথা
রাইখো মনে
যাইয়ে শ্বশুড় ঘরে আপন ভাবিও সর্ব্বজনে।

(২)

এইখানে নামাওরে কুমার
এইখানে নামাও পালকি।
এইখানে থাকিয়ারে কুমার
মায়ের কান্দন শুনি॥

(৩) বর বধূ বরণ

কি কর রামের মাগো গৃহেতে বসিয়া।
তোমার রামচন্দ্র আসে জানকী লইয়া।
আরবার বল আমি শুনিব শ্রবণে।
বাইর অইল কৌশল্যা গো ধান্য দুর্ব্বা লইয়া।
ধান্য দুর্ব্বা চিনি সন্দেশ লইল হাতে হাতে।
বর বধূরে ঘরে লইল দুর্ব্বা লয়ে মাথে।

পরিশেষে বক্তব্য এই বিবাহ ব্যাপারে মেয়েলী সঙ্গীতের সংখ্যা অনেক। আমরা কেবল কতিপয় গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

সাহিত্যিকের পত্র।*

বান্ধবকুটীর ঢাকা—
২৩শে শ্রাবণ।

চির স্নেহাস্পদেষু—

আজ দুই তিন দিন হইল আপনার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনার কাছে লিখিবার সহস্র কথা আছে। দুই ছত্রে কি লিখিব? আপনি আমার পরম স্নেহাস্পদ সুহৃৎ। আমার চিত্ত তর্পণের জন্য আপনি কতই করিতেছেন। অথচ আমি আজ পর্য্যন্ত আপনার কিছুই করিতে পারি নাই, ইহা আমার বড় দুঃখ। আপনার সেই বৃহৎ পুস্তক * * সাহেবের হস্তগত হইয়াছে। আমি ভরসা করি তিনি আপনার উপকার করিবেন। তিনি সম্প্রতি ঢাকায় নাই। ঢাকায় আসিলে আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিব।

আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। আমি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দুইখানি অভিনন্দন পত্র পাইয়া বড়ই সংবর্দ্ধিত হইয়াছি। একখানির স্বাক্ষরকারী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং আট দশটি সুপরিচিত পণ্ডিত। আর একখানির স্বাক্ষরকারী সংস্কৃত কলেজের Principal শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত বাহুবল্লভ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ। একটা বৃদ্ধ বাঙ্গালের পক্ষে ইহার অধিক আর চাহেন কি? আপনাকে আমার এই উপাধির মুদ্রিত প্রতিলিপি দিয়াছি কি না স্মরণ নাই। যদি না দিয়া থাকি, তবে লিখিবেন, এক সেট পাঠাইয়া দিব। কোন দিন যে কিছু বাঙ্গালা লিখিয়াছিলাম পশ্চিমবঙ্গ হইতে ইহাই তাহার পুরস্কার।

আমি আপনাদিগের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা সূচক পত্র লিখিতে ইচ্ছা করি। শুনিলাম তিনি এম্, এ; এবং জাতিতে বৈদ্য ও সংস্কৃতে সুশিক্ষিত। তিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন কি না; এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কি না আপনি এ বিষয়ে আমাকে একটু বিবরিয়া লিখিবেন। নতুবা আমি একখানি ভাল পত্র লিখিবার সুযোগ পাইব না। কিন্তু,

সে পত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনি কল্যই তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বহু কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ধন্যবাদ জানাইবেন। ময়মনসিং যে আমার প্রতি এত অনুকূল ইহার মুখ্য কারণ আপনি। বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস আপনাদের পরিষদের সভ্য কি ? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য আপনাকে পরে জানাইব।

আপনাদিগের একটি শব্দ কমিটী গঠন করা উচিত; ঐরূপ কমিটী গঠিত হইলে আমি তাহার Corresponding member হইতে প্রস্তত আছি। কলিকাতার মূল পরিষদ আমাকে বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া বহুদিন হইতে সম্মান করিয়া আসিতেছেন। আপনারাও আমাকে বিশিষ্ট কিংবা শিষ্ট এইরূপ কোন একটা সভ্য করিতে পারেন।

বাঙ্গালা ভাষার বহু প্রচলিত শব্দ অভাগ্য পূর্ব্ববঙ্গের সৃষ্টি। ইহা আপনারা জানেন কি ? যখন Self Government প্রচলিত হয়, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন স্বতন্ত্র শাসন, বঙ্কিম বলিলেন আত্মশাসন, পূর্ব্ববঙ্গের এক বৃদ্ধ বলিল স্বায়ত্ত শাসন। বহু বাদানুবাদের পর পূর্ব্ববঙ্গের অনুকূলেই ডিক্রি হইল; এবং গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসন শব্দ গ্রহণ করিলেন। সহানুভূতি, বিরাট সভা, বাত কুক্কুট (weather cock) প্রভৃতি বহু শব্দই পূর্ব্ববঙ্গের। অল্প দিন হইল, এক সাহিত্যিক সাহেব এক পণ্ডিত লইয়া ঢাকা আসিয়াছিলেন এবং "Alphabetical Chart," "Kinder Garten" প্রভৃতি শব্দ লইয়া বিশেষ জিজ্ঞাসু হন। তাঁহাকে বলা হইল। প্রথমটির বাঙ্গালা নাম "বর্ণপট", ২য় টির বাঙ্গালা নাম "কুমার কানন" তিনি এই দুই নূতন শব্দই পাইয়া শতমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং ঐ দুই শব্দই পুস্তকের নামে ব্যবহার করিবেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থ পত্রে গবেষণা করিলে এইরূপ শত শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের সৃষ্টি বলিয়া ধরা পড়িবে।

আমি এখন চলনমুখ। আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করুন ইহা আমার প্রার্থনা। ভগবানের কৃপায় আপনার মঙ্গল হউক।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

পাওয়া-নাপাওয়া

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দত্ত মজুমদার।

নিউ মার্কেটে ছোট ভাই বোনদের জন্য উপহারের জিনিষ কিনিতে কিনিতে, সুবীরের দৃষ্টি পড়িল ওই ধারের ভদ্রলোকের সঙ্গের কিশোরীটির উপর মেয়েটিকে তাহার বেশ পছন্দ হইল। সুন্দর কোন কিছু পাইলে সকলেরই সাধ হয়। সুবীর ভাবিল, এই মেয়েটিকে পাইলে তাহার জীবন সার্থক হয়!

সুবীরের সব জিনিস কিনা হইয়া গেল; তবুও সে বাসায় ফিরিবার চেষ্টা করিল না।

কিছুক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ধরিয়া একখানা কারে উঠিয়া বসিলেন। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি হর্ণ টিপিয়া স্টার্ট দিল। সুবীর হতাশভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—হঠাৎ পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া কারখানার নম্বর টুকিয়া লইল।

* * * *

দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া সুবীর বলিল, "আমি এখন বাড়ী যাবনা, তুমি একাই যাও দাদা।"

"বন্ধ হয়ে গেল, তবু বাড়ী যাবিনা কেনরে ?"

বেশ গম্ভীরভাবে সুবীর বলিল, "এই—পরীক্ষার বছর, এখন যে কয়দিন এখানে থাকা যায়, তাই লাভ। পুজোর একদিন আগে গেলেইতো যথেষ্ট।'

"হাইকোর্ট কবে বন্ধ হয়ে গেল! শুধু তোর জন্যেই এদ্দিন অপেক্ষা করেছি; আর এখন হঠাৎ বলিস্ কি না যাবি না! না, সে আর এখন হয় না। বরং পুজোর পরই এসে পরিস্।'

সুবীর ভাবিতেছিল, সেই নম্বর নিয়া মেয়েটীর খোঁজ করিবে। কিন্তু যত গোল বাধাইল তাহার দাদা সুধীর। সে দাদাকে একটু ভয় করিত, কাজেই দ্বিরুক্তি করিতে আর সাহস পাইল না।

* * * *

শয়নকক্ষে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া চৌধুরী মহাশয় বেশ নিশ্চিন্ত মনে গড়-গড়ার নলটা টানিতেছেন। এমন সময় হাসিমুখে আসিয়া স্ত্রী বলিলেন, "একটা কথা আছে।"

পৈত্রিক জমিদারীর একমাত্র মালিক হইয়াও চৌধুরী মহাশয় শেষ বয়সে সুখে কাল কাটাইতে পারিতেছেন না। সুযোগ্য পুত্র সুধীর সবে হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি পুত্রকে বিবাহে রাজী করাইতে পারিতেছেন না; ইহাই তাঁহার কষ্টের একমাত্র কারণ!

স্ত্রীর কথা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় উদাসভাবেই বলিলেন, "কি কথা বল?"

"খুব সুখবর এনেছি, এখন আগে বল আমায় কি পুরস্কার দিবে।"

একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "খুব সুখবর সত্যি নাকি! আচ্ছা আগে বল, যাই হোক্ কোন কিছু না হয় নিবে।" সুধীর যে বিয়ে করবার রাজি হয়েছে।"

বিজয়ার দিনই চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা রওনা হইলেন। হাতে যে প্রস্তাব ছিল, তাহা হইতেই যে কোন একটা পছন্দ করিয়া কার্ত্তিক মাসেই বিবাহ শেষ করিতে মনস্থ করিলেন।

অনেক বছর পর সেদিন হঠাৎ ট্রামে চৌধুরী মহাশয় বাল্যবন্ধু রমেশ বাবুর সাক্ষাৎ পাইলেন। অনেকক্ষণ আলাপ সালাপের পর ট্রাম আসিয়া হাজরা রোডের মোরে থামিল। রমেশ বাবু বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ড্রইং রুমে বসিয়া উভয়েই বহুদিনের সঞ্চিত গল্প-ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। আধ ঘণ্টা খানেক পর রমেশ বাবুর মেয়ে রেবা দুই ডিশ খাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চৌধুরী মহাশয় তাহার রূপ দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন। তিনি রেবাকে দুই চারিটী প্রশ্ন করিয়া বেশ খুসী মনে খাবারে মনোযোগ দিলেন।

চৌধুরী মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, এই রকম একটি মেয়ে ঘরে আনিতে পারিলে বেশ হয়। তিনি কথায় কথায় সুধীরের সঙ্গে রেবার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রমেশ বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি একেবারে পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

* * * *

সুধীর বিবাহ করিয়া নববধূ সহ বাড়ী ফিরিল। বর রওনা হইবার আগের দিন, দোতালার সিঁড়িতে পিছলাই পড়িয়া সুবীরের মাথা অনেকখানি ফাটিয়া যায়। কাজেই সে বিবাহে যাইতে পারে নাই।

দোতালার ছোট একটি কক্ষে শুইয়া সুবীর ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু চোখে আর ঘুম আসে না। তাহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল—শুইয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। অগত্যা সে জানালা দিয়া অসীম আকাশের নীলিমার দিকে চাহিয়া মানস-তুলিতে নিজের আশা-নিরাশার চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিল।

সুবীরের ছোট বোন রমা পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল—"মেজ্‌দা, দেখ কেমন সুন্দর বৌদি এসেছে।" সুবীর রেবার দিকে চাহিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল! এ যে সেই, যাহার মূর্ত্তি এই কতকদিন সে অনবরত ধ্যান করিতেছে! সুবীর রেবার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

সুবীরের এই অবস্থা দেখিয়া রমা হো-হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুবীরের তখন চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রেবাকে বসাইয়া বলিল, "বৌদি বড় মজা—তোমাকে নিয়া একটা উপন্যাস সৃষ্টি করে তুলেছি প্রায়, তুমি কিন্তু আমার অনেক আগেই পরিচিত।"

"তোমার উপন্যাস খানা খুলেই বলনা ভাই, একবার শুনি!"

সুধীর তখন আগাগোড়া সব বলিল। তাহার কথা শুনিয়া রমাত হাসিয়া খুন! বৌদি কিন্তু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া তবে ছাড়িল। সুবীর শুধু বলিল, "যাই হোক্ তবুতো তোমায় কাছে পেলুম; গল্প করে সময় কাটবে বেশ।"

মেঘে ঢাকা বাদল রেতে

(শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত)

মেঘে ঢাকা বাদল রেতে তোমার দেখা পাই!
চমকে যখন ছুটে বেড়াও তুলনা তার নাই!
বন, কাননে তরুর শাখে, আকুল প্রাণে পাখী ডাকে,
মনের বাঁশী কেঁদে ওঠে তোমারি গান গাই।
কত সুর প্রাণে বাজে, মিলন রেতে নূতন সাজে,
একা অকূল আঁধার মাঝে আপন ভুলে যাই!
প্রাণের বাঁধন তোমার সাথে, জীবন মরণ তোমার হাতে
এপার ওপার হারায়ে ফেলে সুধু তোমায় চাই!
মেঘে ঢাকা বাদল রেতে তোমার দেখা পাই।

চাঁদ ও রাহু।

(শ্রী—————————শর্ম্মা)

রাহু কহে, চাঁদ তব উজ্জ্বল প্রভায়,
হীন আমি; নহিহীন শক্তি প্রতিভায়,
তার পরিচয় পাবে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
তোমায় গ্রাসিয়া মম ঘুচা'ব জঞ্জাল।
চাঁদ কহে, কেন রাহু কর পণ্ডশ্রম,
আমায় গ্রাসিতে পার; হ'বে না হজম।
ফলে লাভ আরো গ্লানি বাড়িবে বিস্তর,
বিশ্ব জুড়ে দিলে গাল চণ্ডাল বর্ব্বর।
বীজ গত ফলে ফল বৃথা হিত কথা,
নিম বীজে লিচু ফল আশা করা যথা।
শুনে রাহু ক্রোধে জ্বলে, মুখে অট্টহাস,
পে'য়ে চাঁদে স্বকবলে বলে করে গ্রাস।
হাহাকার করে সবে ধরা অন্ধকারে,
নিষ্প্রভ বিশ্বের আলো চণ্ডালাত্যাচারে।
ক্ষণ পরে রাহু মুক্ত চাঁদ প্রকাশিত,
যে চাঁদ সে চাঁদ রাহু চণ্ডাল ঘৃণিত।

সংগ্রহ

ঘুমায় না :—আয়ার্ল্যাণ্ডের কিনসেল নামক স্থানে মাইকেল ম্যাককার্ট নামক একব্যক্তি ঘুমটাকে সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং সে ঘুম একেবারে ত্যাগই করিয়াছে বলিলে চলে। তাহার মতে ঘুমটা একটা স্বভাবের দোষ মাত্র। সে বলে—"আমি মাসে মাত্র পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঘুমাই। আমি কখনো হাই তুলি না। কখনো ক্লান্ত হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। লোকের আয়ু এত কম যে, তাহা ঘুমাইয়া নষ্ট করা সঙ্গত নহে। জীবনে আমার কখনো গুরুতর অসুখ হয় নাই।" সে এক রুটীর দোকানে কাজ করে এবং না ঘুমাইবার ফলে যে সময় পায় সে সময় শিকার করিয়া বেড়ায়।

কলিকাতায় টিউব রেলওয়ে

যাহাতে ভূগর্ভপথে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কলিকাতায় আসা যাওয়া করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বহুদিন হইতে কলিকাতা সহরে একটী টিউব রেলওয়ে স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। রেলওয়ে বোর্ড এজন্য মিঃ লাইডান নামক বিলাতের একজন বিশেষজ্ঞ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারকে কার্য্যোপযোগী একটা "স্কিম" ঠিক করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। ইনি গঙ্গা নদীর নিম্নদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক লালদীঘিতে একটী ষ্টেশন করিয়া হাবড়ার দিকের সমস্ত সহরতলীকে এই সুরঙ্গপথে এবং শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যে সকল সহরতলীতে যাওয়া যায়, সেগুলিকেও সুড়ঙ্গপথে কলিকাতার সহিত বৈদ্যুতিক রেল সংযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। আফিসের সময় প্রতি দুই মিনিট অন্তর ট্রেণ চলিবে। এই সুড়ঙ্গ খনন ও তন্মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক রেলওয়ে স্থাপন ব্যাপারে পাঁচকোটীর অধিক অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া এই বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লেজ বিশিষ্ট শিশু ঃ—বানর মানুষের আদিপুরুষ ছিল এই কথা শিক্ষা দেওয়ায় টেনিসের এক গুরুমহাশয় দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ প্রদেশের নক্সভিল নামক স্থানে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার একটা লেজ ছিল। লেজটি ৭ ইঞ্চি লম্বা। উহা কাটিয়া জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

দক্ষিণা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

দক্ষিণা বিদ্যালয়ের ছেলেদের অভিনয়োপযোগী করিয়া রচিত স্ত্রী চরিত্রবিহীন নাটক। একলব্যের গুরু দক্ষিণার কাহিনী নিয়া পুস্তকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভাষা ঝরঝরে ভাব উচ্চাঙ্গের। একলব্য, দ্রোণাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের লিপিকুশলতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুন্তলীন প্রেস,

সপ্তদশ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩৬। } পঞ্চম সংখ্যা ।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

(৺কেদারনাথ মজুমদার)

(২)

সাময়িক উন্নতি ও রুচি একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে সময় উত্তর ভারত সভ্যতার পূর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য সমাজে ও উত্তর ভারতের সভ্যতার এবং রুচির স্রোত ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছিল।

উত্তর ভারতে যখন রাজা দশরথ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের কিষ্কিন্ধ্যা নামক স্থানে অনার্য্য রাজা বালী প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক বলবুদ্ধিতে অরণ্য-চর অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগকে শাসন করিতেছিল।

বিলাসিতা উন্নতির ও সভ্যতার লক্ষণ। যে জাতি যত উন্নত ও সভ্য, তাহার বিলাসিতার মাত্রা তত প্রবল। অসভ্য বর্ব্বর জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বল্কল পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, গিরিগহ্বরে পরিত্যাগ করিয়া কুটীরের অনুসন্ধানে ফিরে; ভূশয্যা উপেক্ষা করিয়া পর্য্যঙ্কের জন্য লালায়িত হয়; স্বাভাবিক খাদ্য ফলমূলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত আহার্য্যদ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহা ক্রমোন্নতির লক্ষণ। কিষ্কিন্ধ্যার অসভ্য সমাজ তখন আর্য্য ভারতীয় সমাজের অনুকরণে এইরূপভাবে বিলাসিতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

কিষ্কিন্ধ্যাবাসী এই সময় বল্কল পরিত্যাগ করিয়া কার্পাস বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত, ভূমি-শয্যা ও বৃক্ষ-কোঠর-বাস ত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্কের ব্যবহার করিত। তখন ইহারা আর্য্য সমাজের অনুকরণে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের রাজধানীর গঠন-প্রণালী হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

কিষ্কিন্ধ্যা একটি পর্ব্বত-গহ্বর। পর্ব্বত গহ্বর কিষ্কিন্ধ্যা অনার্য্য রাজা বালীর রাজধানী—ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা সাধারণ পর্ব্বত-গুহা নহে; একটি সুবৃহৎ দ্বার-বিশিষ্ট, কাঞ্চন-ভুষিত যন্ত্র ও ধ্বজাবলাসমাকীর্ণা পুরী। *

কিষ্কিন্ধ্যার প্রবেশদ্বার অতি বৃহৎ। গুহা রত্নময় এবং কুসুমিত-কানন-সমন্বিত। গুহার পরস্পর নিকটবর্ত্তী হর্ম্ম্য এবং হর্ম্ম্য প্রাসাদমালার দ্বারে দিব্য বস্ত্রপরিহিত সশস্ত্র বানর-সৈন্য অবস্থান করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। চারিদিক অগুরু ও চন্দন গন্ধে সুবাসিত। পথসমূহ মৈরেয় মধুগন্ধে আমোদিত। প্রাচীর গাত্র বিচিত্র স্ফটিক ও মণিখচিত। পাঠক, ঐ দেখুন, লক্ষ্মণ সেই বিচিত্রদ্বার অতিক্রম করিয়া কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। লক্ষ্মণ

* ———তদা কাঞ্চনভূষণাম্।
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীম্।
(কিঃ ১৪।৬)

ক্রমে সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন-শোভিত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। (কিঃ—৩৩)

লক্ষণ অন্তঃপুর-দ্বারে উপনীত হইয়া সুর-তাল-লয়-সম্পন্ন সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং উত্তম মালা ও বেশভূষা সম্পন্না সুন্দরী প্রমদাগণকে দেখিতে পাইলেন। (কিঃ—৩৩)

ইহাই অনার্য্য অৰ্দ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, কিষ্কিন্ধ্যার চিত্র। এই চিত্র অস্বাভাবিক নহে। কিষ্কিন্ধার বর্ণনা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, কিষ্কিন্ধ্যা একটী পর্ব্বত-গহ্বর এবং সুগ্রীবের গুপ্ত বিলাসকক্ষ ও আভ্যন্তরীণ গুপ্ত স্থান। লক্ষ্মণ যে সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশ ও গহ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে; কেন না, লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া গুপ্ত অন্তঃপুরে যাইতে যাইতে পথে অন্যান্য বানর-গণের বাসস্থান (গৃহ) ও গিরি নদী সকল দেখিয়া গিয়াছিলেন। (কিঃ—৩৩)

কিষ্কিন্ধ্যায় অনেক প্রাসাদ ও প্রাচীরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিন্ধ্যমেরু গিরি প্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈক ভূমিভিঃ।"

এইগুলি পর্ব্বতের স্বাভাবিক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদাকার গুহা ও প্রস্তর-প্রাচীর। এই সকল প্রাচীর ও গুহা-প্রাসাদের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এগুলি সুবর্ণ, স্ফটিক ও মণিময় ছিল। অসভ্য অরণ্যচরদিগের পক্ষে রত্নসংগ্রহ দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

দাক্ষিণাত্যের বানর-সমাজ তখন এইরূপ আর্য্য সমাজের অনুকরণে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিল।

যাঁহারা ইলোরা, অজন্তা প্রভৃতি গুহাবলীর বিচিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদ-প্রাচীর কল্পনানেত্রে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন।

এইবার আমরা অনার্য্য পূর্ণ সভ্যতার চিত্র প্রত্যক্ষ করিব। সেই অনার্য্য পূর্ণ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি লঙ্কা। লঙ্কার অনার্য্য সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ও বিলাসিতার পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ॥ ১৬
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজ শোভিতাম্॥ ১৭
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপংক্তি বিরাজিতৈঃ। সুঃ ২

ইহাই লঙ্কা। হনুমান দূর হইতে এই লঙ্কা দর্শন করিলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি এই লঙ্কাকে "কনক লঙ্কা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কনক লঙ্কা দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত একটি নগরী, ত্রিকূট পর্ব্বতের শীর্ষদেশ সংস্থাপিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত।

আমরা কবির লেখনী-মুখে বর্ণিত লঙ্কার বর্ণনা সংক্ষেপে এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

লঙ্কার চারিদিকে চারিটি দৃঢ় কপাটবদ্ধ বৃহৎ দ্বার। দ্বার সকলের মধ্যদিকে বাণ, শিলা ও শত শত লৌহময় শতঘ্নী স্থাপিত রহিয়াছে। পুরীর চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য স্বর্ণ প্রাচীর, প্রাচীরের পর ভয়ানক কুম্ভীরসমাকুল ও অগাধ বারিরাশি পরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার উপর চারিদ্বারে চারিটি সুপ্রশস্ত কৃত্রিম সেতু, এই কৃত্রিম সেতু প্রাকারোপরি যন্ত্রদ্বারা রক্ষিত, শত্রুসৈন্য কোন প্রকারে সেতুতে উঠিলে তাহাদিগকে যন্ত্র-সাহায্যে সেই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল পরিখাজলে নিমজ্জিত করা হয়। লঙ্কার নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ, বনদুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ এই চারি প্রকারের দুর্গ আছে। (লঙ্কা—৩)

নগরীর রাজপথসমূহ অতি বিস্তৃত ও প্রাসাদমালা শোভিত। সেই প্রাসাদাবলী সুবর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভ ও গবাক্ষ সকলে শোভিত। স্থানে স্থানে স্ফটিকাদি রত্নসমূহে খচিত সপ্তভৌম ও অষ্টভৌম গৃহ বিরাজিত। (সু—২)

নগর বেদীকাসমূহে শোভিত। বেদীকাসমূহ স্ফটীক, মণিমুক্তা, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি বিবিধ রত্নে জড়িত। বেদীর উপর কোথাও বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি শোভিত ছিল। প্রাচীরের কুট্টিমসমূহ মণিময়; উপরিভাগ রৌপ্যের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ। সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রালয়সমূহ স্থাপিত। (সু—৩)

রাজপথগুলি কুসুমাকীর্ণ, সেই রাজপথের পার্শ্বে হীরক-খচিত বাতায়নসমন্বিত বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার মেঘস্পর্শী

গৃহাবলী শোভিত। ইতস্ততঃ পদ্মাকার * ও স্বস্তিকাকার† গৃহসমূহ বিরাজিত। (সু—৪)

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে পানগৃহ, পুষ্পবাটী, চিত্রশালিকা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, দিবাবিহার গৃহ, রতিগৃহ, কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম ক্রীড়া পর্ব্বত, গুপ্ত গুল্ম, চৈত্যপ্রাসাদ, যজ্ঞভূমি প্রভৃতি বিরাজিত। লঙ্কার রাজগৃহও বহুকক্ষসমন্বিত ছিল।

ইহাই লঙ্কার সংক্ষিপ্ত চিত্র। অযোধ্যার ন্যায় লঙ্কারও বিভিন্ন গৃহের পৃথক পৃথক বর্ণনা আছে। কিন্তু লঙ্কার চিত্র অযোধ্যার চিত্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী

পাঠক এইবার রাবণের শয্যাগৃহের বিচিত্রতা অবলোকন করুন। রাবণের শয়নগৃহে স্ফটিক-নির্ম্মিত বিচিত্র বেদী। ঐ বেদী স্থানে স্থানে রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়। বেদীর উপর নীলকান্ত মণিময় পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কের পদসমূহ হস্তীদন্তে রচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত। পর্য্যঙ্কের উপর মহামূল্য আস্তরণ। সেই মহামূল্য আস্তরণের উপর সুচিক্কণ আস্তরণ আস্তীর্ণ। পর্য্যঙ্কের এক স্থানে উজ্জ্বলশ্বেত ছত্র—অন্যত্র বালব্যজনহস্ত অবিরাম ব্যজন করিতেছে। শয্যা বিবিধ সৌরভে সুবাসিত। অদূরে স্বর্ণ প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা জ্বলিতেছে।

লঙ্কার রাজপথগুলি ও শয়ন কক্ষের ন্যায় সমস্ত রাত্রি দীপালোকে আলোকিত থাকিত।

"তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগৃহৈঃ।"

এই আলোক তৈল প্রদীপের কি তাড়িতালোকের তাহার কোন উল্লেখ নাই। রাবণের শয্যাগৃহে বালব্যজন হস্তে সমস্ত রজনী অনবরত ব্যজন হইত। রামায়ণের টীকাকাররা ইহা যন্ত্রপুত্তলিকার কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঙ্কার প্রায় প্রতি স্থানেই যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যন্ত্রের সাহায্যে বহু কৃত্রিম পদার্থের নির্ম্মাণের উল্লেখও লঙ্কার বিভববর্ণনায় দেখা যায়। কৃত্রিমতা সভ্যতার উন্নত পর্য্যায়ের আর একটি লক্ষণ। ইহা ধর্ম্মোন্নত জাতির পক্ষে না হইলেও বিলাসোন্নত জাতির পক্ষে উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই।

লঙ্কায় বিচিত্র চিত্রশালিকা ব্যতীত একটি কৃত্রিম যাদুকর (museum) ছিল। ঐ গৃহের এক পার্শ্বে নানারূপ পুষ্প ও বৃক্ষলতাদিপূর্ণ কৃত্রিম শৈল, এক স্থানে বিচিত্র গৃহ, এক স্থানে উৎপলশোভিত কৃত্রিম সরোবর, কোথাও বৈদূর্য্যমণি-খচিত কৃত্রিম বিহঙ্গ—রৌপ্য ও প্রবাল নির্ম্মিত পক্ষী, রত্নময় ভুজঙ্গ, কৃত্রিম অশ্ব, স্বর্ণ ও প্রবাল খচিত বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গ। একস্থানে সরোবরে হস্তিসমূহ-অভিষেক-নিযুক্ত কমলার মূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল। এই যাদুগৃহের চিত্র অত্যুন্নত সভ্যতার নিদর্শন।

আমরা বাহুল্য বিবেচনায় লঙ্কার সভাগৃহ, সৈন্যাবাস, অপরাপর রাজপুত্রগণের বাসভবন ও অশোক বন প্রভৃতির উল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম।

লঙ্কার চিত্র বিলাসিতার ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ চিত্র প্রকটিত করিয়া দেয়।

যাঁহারা মোগল ঐশ্বর্য্যের ক্ষীণ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন —তাজমহল—মতি মসজিদ, সীসমহল—যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা লঙ্কার এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের ও বর্ণনার ক্ষীণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

ভবিষ্যতের সমাজ

(২)

(শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ বিএল্)

বর্ত্তমানের দ্বিতীয় সমস্যা নারী সমস্যা। জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার এতদিন পরে স্ত্রীলোক বুঝিতেছে, কি প্রকার ফাঁকি দিয়া, জোর জুলুম করিয়া পুরুষ এ পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য তাহার কৃতদাসী করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য কত মিথ্যারই না সৃষ্টি হইয়াছে; সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, আইনকানুন, বিধি-ব্যবস্থা, সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কি দৈহিক, কি মানসিক শক্তির পরিচালনে নিকৃষ্ট, পুরুষের সেবার জন্যই তাহার সৃষ্টি এ দেশের তো কথাই নাই। এই ব্যাপারে পুরুষের প্রাধান্য অটুট রাখিবার জন্য ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা, চিরবৈধব্য প্রথা, অবরোধ প্রথা—কত কি বিধিব্যবস্থার প্রচার হইয়াছে! স্বার্থান্ধ মূর্খদের হাতে স্ত্রীলোক জগতের মাতৃজাতি কতভাবে না লাঞ্ছিত হইয়াছে।

---

* পদ্মাকার গৃহ—দক্ষিণদ্বার রহিত পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দ্বারযুক্ত গৃহ।

† স্বস্তিকাকার গৃহ—পূর্ব্বদ্বাররহিত উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দ্বারযুক্ত গৃহ।

এবং এখনও হইতেছে। মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে পুরুষ স্ত্রীর দেবতা, শুধু ইহকালের জন্য নয়, পরকালের জন্যও তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা। পরকাল কি আছে? এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে সবই মিথ্যা। স্ত্রীলোক বিষয়বিশেষে পুরুষ অপেক্ষা তুলনায় নিম্নস্থানীয় হইলেও আবার কোন কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; অধিকতর দীর্ঘজীবী যে, তাহার দেহ পুরুষের তুলনায় তেমন অল্পে ভঙ্গুর নয়, বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ, এবং মনের দৃঢ়তাও তাহার অধিক। তাহার দুর্ভাগ্য তাহার দৈহিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া পুরুষ তাহাকে আপনভাবে বাড়িতে দেয় নাই। বিশেষ করিয়া, এই ভারতবর্ষে সতীত্বরূপ এক তরোয়াল সব সময় তাহার মাথার উপর ধরিয়া রাখিয়া স্ত্রীজীবন পূর্ব্বাপর মহা কষ্টকর ও অশান্তিদায়ক করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের সুখসম্ভোগের, সুবিধার জন্যই সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাকে বজায় রাখিতে হইবে, এবং এই মহাধর্ম্ম রক্ষা করাইবার জন্য তাহাকে নিরক্ষর বন্দিনীতে পরিণত করা হইয়াছে। সে জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত, সে বাইরের সূর্য্যালোক ও বায়ু—বনের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেরই যাহা উপভোগ্য—হইতে বঞ্চিত, সে অসূর্য্যম্পশ্যা। রুদ্ধ গৃহে স্বামীর কাদামাখা পায়ের ধোয়া জল খাইয়া, তাহার ভোগবিলাসের পুতুলস্বরূপে পরিণত হইয়া, স্বামীর পুত্রকন্যাগণকে প্রতিপালন করিয়া, স্বামীর সংসার চালাইয়া বৃদ্ধকালে স্বামীর পায় মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলেই তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহার নারীজীবনের পূর্ণতা। লেখাপড়ার তাহার দরকার নাই, জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কি পার্থক্য এ জীবনের সঙ্গে পশুজীবনের? কি বিকট বিসদৃশ আদর্শ! কিন্তু ইহাই ভারতের শাস্ত্রকারদের, বড় বড় মুণি ঋষিদের ব্যবস্থা যাঁহাদের বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও ভারতবাসী সন্ত্রস্ত, কোনও অবস্থাতেই নারীর স্বাধীনতা নাই। পৃথিবী ভরা এত স্ত্রীলোক, সংখ্যায় তাহারা পুরুষ অপেক্ষা কম নয়, অথচ পুরুষের অত্যাচারে, প্রতিবন্ধকতায় সন্তানের জন্মদান ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। যেন শুধু সন্তানের মা হওয়াতেই নারী জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা। মনুষ্য হিসাবে সন্তানের বাপ হওয়া ছাড়া আরও অনেক জিনিষ করিবার রহিয়াছে পুরুষের, এ সত্য সকলেই বোঝে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের বেলাতেই বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া দেখা দেয়। মাঝে মাঝে অগাধ আঁধারের ভিতর আলোককণার ন্যায় নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এখানে সেখানে দুই একটী মাত্র রমণীর দিব্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতেছে অথচ তাহাদেরই বংশধর ম্যাডাম্ কুরি, জর্জ্জ স্যাণ্ড, ম্যাডাম্ ডি ষ্টেইল, জর্জ্জ ইলিয়ট্, অহল্যাবাই, এ্যানি বেসেণ্ট! কি অপার শক্তি প্রতিভা সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া এই ভারতভূমিতে, যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষের অত্যাচারে বিনষ্ট হইতেছে! এই ব্যবস্থা, এই নারীদলন-ব্যাপার আর কতদিন চলিবে? সতীত্ব যজ্ঞে আর কতকাল স্ত্রীলোকের শক্তি সামর্থ বুদ্ধি ভস্মীভূত হইবে? পুরুষের সৎ হইবার দরকার নাই, হইলে ভাল, না হইলেও ক্ষতি নাই, যত সব ধর্ম্মের কঠোর ব্যবস্থা সহায়বিহীনা স্ত্রীলোকের জন্য। সর্ব্বত্রই, সকলেরই স্বাধীনতার দরকার বড় হইবার জন্য। বৃক্ষের পক্ষে মুক্ত আলো ও বাতাসের প্রয়োজন, খাঁচায় পাখীর সৌন্দর্য্য, স্বর বিস্মৃত হইয়া উঠে; রুদ্ধ কুটীরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ অল্পেতেই স্বাস্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে—শুধু ভারতের রমণীই কি গৃহাবদ্ধ অবস্থায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে? পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন, তা হৌক্ না কেন সে ব্যবস্থা পুরুষের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত অসুবিধা জনক। স্ত্রীলোকেরা এতদিনে এ সত্যটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে; ইয়ুরোপ এ্যামেরিকায় তাই তাহারা পুরুষের সঙ্গে সমান আসন পাইবার অধিকার দাবী করিতেছে ও ক্রমে ক্রমে পুরুষকে সরাইয়া নিজেদের স্থান করিয়া নিতেছে। এ্যামেরিকায় ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগে তাহাদের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতেই কি শুধু তাহারা জন্ম ধরিয়া পুরুষের পা ধোয়া জল খাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিবে? তাহা কি আর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইবে? যে দেশে সরোজিনী নাইডু ও সরলা দেবীর মত রমণী দেখা দিয়াছে, স্কুল কলেজ বিদ্যার্থীনী বালিকায় ভরিয়া উঠিতেছে—সে দেশে যে কোন্ দিকে চলিয়াছে, কে না দেখিতেছে?

(৫)

জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ মহাদৈত্য সকল প্রকার ভুয়া দেবতাকে ধরিয়া ধরিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে; ধনী দেবতা, ব্রাহ্মণ

দেবতা, পতি দেবতা সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি স্বয়ং ভগবানও বাদ যাইতেছে না। প্রাচীন সমস্ত কুসংস্কার জাতিভেদ প্রভৃতি, খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এবং সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জাতি ধীরে ধীরে নূতনভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। তাও বলিতে হইবে, 'মরিয়া না মরে রামের' মত শীঘ্র যে ইহাদের অন্ত হইবে তেমন সম্ভাবনা কম, কিন্তু ইহাও ঠিক, দু'দিন আগে আর পরে ইহাদের সরিয়া যাইতে হইবেই।

ভবিষ্যতের সমাজ! ভারতীয় সমাজ! কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে? যাই কেন না বলি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, অবনত মস্তক হইয়া তাহাদের শিক্ষা মানিয়া লইতেই হইবে; সত্য গৃহীত হইবেই, গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। আচার-পদ্ধতি, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ সমস্তই এই প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, হইবে। আমাদের অতি প্রাচীন বিধিব্যবস্থা পূর্ণরূপে আর চলিবে না, প্রাচীনগৃহকে নূতন সব খুঁটীদ্বারা সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই সাম্যের ভাব প্রচারিত হইতেছে, আমাদিগকেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধনী দরিদ্রে মিশিয়া কালে একাকার হইয়া যাইবে, সকলেরই বাঁচিবার, বড় হইবার, মানুষ হইবার সমান অধিকার থাকিবে; ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ থাকিবে না, অস্পৃশ্যতার পূর্ণ লোপ হইবে; জাতি-বিচার থাকিবে না; স্ত্রীলোক পূর্ণ স্বাধীন হইবে, ও সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ অধিকার সম্পন্ন হইবে,। ধর্ম্ম! সত্যের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহাও থাকিবে না। বিজ্ঞানের আক্রমণে সকল ধর্ম্মেরই শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে—ভগবান, আত্মা, পরমাত্মা, যে সকল মূল ধারণার উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সবই যে মানুষের ভুয়া কল্পনা! এই ধর্ম্ম লইয়া মানুষ কি করিবে? স্বর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, সব, সবই মিছা। সব ধর্ম্ম লোপ পাইতেছে, কিন্তু লোকের অলক্ষিতে নূতন ধর্ম্মেরও সৃষ্টি হইতেছে। এই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য সকল মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। এক মহা-সমদর্শিতার ভাবে ইহা অনুপ্রতিষ্ঠ হইবে ভগবান বা আত্মা, পরমাত্মার ইহাতে স্থান নাই। মানুষের: সকলের পক্ষে যাহাতে জ্ঞান, বাসস্থান, খাদ্য, ও পোষাক পরিচ্ছদ সমানভাবে অনায়াস লভ্য হয় ভবিষ্যতের সমাজের তাহাই প্রধান লক্ষ্য হইবে। খাঁটী প্রত্যক্ষ সত্যের উপর, কল্পনা কল্পনার উপর নয়, সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে—সকলের সুখবিধান ও উন্নতিই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সমাজের একদিকে ক্রোড়পতি, অন্যদিকে নিরন্ন নির্বস্ত্র দরিদ্র—এ অবস্থার অন্ত হইবে। কালে সমস্ত প্রচলিত ধর্ম্মই বিলুপ্ত হইবে, এবং তাহার স্থলে এক মানব সেবা, জীব সেবারূপ মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহুযুগের দরকার, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শি, জৈন, শিখ মিলিয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি হইবে এবং সেই জাতি ভবিষ্যতের জগৎব্যাপী বিশাল মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ভারতবাসী বলিয়া কোনও জাতি থাকিবে না, এ সব অর্থশূন্য মনগড়া ভৌগলিক চিত্রের উপর রচিত জাতির অস্তিত্ব আর কত দিন থাকিবে?

নানাদিক হইতে Parliment of men. Faderation of the world প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যাইতেছে। তাহা কি কখনো সম্ভবপর হইবে! রেলওয়ে, জাহাজ, মটরকার, এরিওপ্লেন, টেলিগ্রাফ, রেডিওগ্রাফি, বায়স্কোপ, গ্রামোফান প্রভৃতি কল্যাণে দূরত্বের বিনাশ সাধনের সঙ্গে জগতের সকল জাতির একে অন্যের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এক ভাব-ধারার আদান প্রদান হইতেছে, প্রতিনিঃশ্বাসে একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক মহামানবজাতি গঠনের সমস্ত সম্ভারই প্রস্তুত। কিন্তু এই জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে কি? একই প্রকার ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ভাই ভগ্নীজ্ঞানে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হইবে কি! মহাপুরুষগণের স্বপ্ন সফল হইবে কি! তাহা কি সম্ভবপর। মানুষ যে মহা হিংস্রক জন্তু—ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির পর্য্যায় ভুক্ত; ইহা বিজ্ঞানেরই বাণী। এমন হিংস্র জন্তু আর নাই, এমন স্বার্থলোভী, পরপীড়নকারী, হিংসুক, পর অনিষ্টকারী। সকল মানবের মিলন, এমন হিংস্রজন্তু সমূহের মিলন—অসম্ভব

ভারতবর্ষ! বুদ্ধ, অশোকের জন্মস্থান ভারতবর্ষ! এখান হইতে যে প্রেমের বাণী ন্যায়-সাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এক সময় অর্দ্ধ-এশিয়া কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানব সেবা জীব সেবারূপ মহা

মাঙ্গলিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি তখনও পূর্ণরূপে থামে নাই। বর্ত্তমানের জ্বালাময় সভ্যতায় সমস্ত জগৎ পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছে। ভবিষ্যতে বুদ্ধের মত আর কেহ কি এ—দেশে আবির্ভূত হইবেন না, যাঁহার আহ্বানে ও উপদেশে জগতের তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদীপ্ত মহাশক্তিশালী মানবসমাজ একত্রিত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ শক্তি উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইবে? ভারতবর্ষ হইতে কি ভবিষ্যতে নূতন শান্তি-সাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়া জগতের ভাবধারাকে নূতন ভাবে পুষ্ট করিবে না।

(৬)

প্রাচীন বৃদ্ধ ভারত! তাহার প্রাচীন হাড়ে নূতন বাতাস লাগিয়াছে; বহুদিন পরে আবার নূতন জ্ঞানামৃত পান করিয়া সে উঠিয়া বসিতেছে। এতদিন ধরিয়া সে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও সমুদ্রদ্বারা বক্ষিত হইয়া প্রায় একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাইতেছিল, কিন্তু এখনে আর সে-ভাবে চলিবার উপায় নাই। ইংরাজ তাহাকে টানিয়া আনিয়া বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে,- সেই স্রোতেই সে এখন ভাসিয়া চলিয়াছে ও ভবিষ্যতেও তাহাকে এই জগৎ-স্রোতের মধ্যে ভাসিয়া চলিতে হইবে। পূর্ব্ব সংস্কার অনেক, অনেক ত্যাগ করিতে হইবে, নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানানুমোদিত তত্ত্ব যাহা, গ্রহণ করিতে হইবে; প্রকৃত বিজ্ঞানই যে প্রকৃত ধর্ম্ম। নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত, সংস্কৃত না হইলে তাঁহার বাঁচিবার আশাই বা কৈ?

আমরা বাঁচিয়া আছি,--বহু যুগ হইতে বাঁচিয়া আছি। একদিকে ইহা আমাদের পক্ষে মহাগৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, অন্যদিকে লজ্জারও ব্যাপার। যে একান্ত রক্ষণশীল, নিজ কোটরে আবদ্ধ, সেই পরিবর্ত্তিত হয় না, কোনও প্রকারে আধমরা কীটের মত প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। আমরা কি প্রকৃত মনুষ্যের মত বাঁচিয়া আছি? শৃগাল, কুকুর, বিড়ালও তো আমাদের অপেক্ষাও দীর্ঘকাল যাবৎ বাঁচিয়া আছে। কি লজ্জা, দীনতা, দুঃখের কাহিনী বহন করিয়া আমরা একণে বিরাজ করিতেছি! জগৎ-শ্রেষ্ঠ জাতি রূপে বাঁচিতে হইবে। জগৎস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি আমরা চলিতে হইবে আমাদের। কোথায় এ-যাত্রার শেষ? ঠিক করিয়া কে বলিবে? মহাকবির কথায়,

জগৎস্রোতে ভেসে চল, যে যথা আছ ভাই!

* * * *

কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে!

ব্যাধি ও জীবাণু

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি,এল)

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাণীদিগের যত প্রকার ব্যাধি হয় তাহার অধিকাংশের কারণ এক এক প্রকার বীজাণু (microbe) ব্যাধির বীজাণু সমূহ এমন ক্ষুদ্র যে উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ সাহায্য ব্যতীরেকে কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতি সূক্ষ্ম বীজাণু সকল বায়ুর সহিত অবলীলা ক্রমে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ইহারা আমাদের চর্ম্মে বাস করিতেছে, বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইতেছে কিন্তু তবু আমরা ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন দশটা গাভীর দুগ্ধ পরীক্ষা করিলে অন্ততঃ একটার দুগ্ধে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। দুগ্ধ আমরা অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিয়া পান করি বলিয়া বীজাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য আমরা সচরাচর যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হই না। জলে ও মাংসে নানাপ্রকার ব্যাধির বীজাণু থাকে। ওলাওঠা নামক ভীষণ মারাত্মক ব্যাধিতে প্রতিবৎসর এ দেশের বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে অধিকাংশ সময়েই দূষিত জল হইতে এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়। জলে ওলাওঠার বীজাণু জন্মে। জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে এই ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত বীজাণুতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবধি চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এখন আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে যক্ষ্মা, ওলাওঠা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যাধি সকল বীজাণু

হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির বীজাণুর আকার আয়তন বর্ণ ও স্বভাব ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে এখন ব্যাধি নির্ণয় সহজ সাধ্য হইয়াছে এবং অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাত্মা লুইস পাস্তর বীজাণুতত্বের আবিষ্কারক। ইনি ফরাসী দেশের একজন অসাধারণ রাসায়ণিক পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাস্তর পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে রসায়ণের অধ্যাপক হইয়া পারিস নগরে গমন করেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল—জিনিস পঁচে কেন? সামান্য বিষয় হইতে জগতের অনেক মহৎতত্ব সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্যর আইজাক নিউটন আতাফল মাটিতে পতিত হইতে দেখিয়া উহার কারণানুসন্ধানের জন্য গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল।

জিনিস পঁচে কেন? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য পাস্তর অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পাস্তরের বন্ধুগণ মনে করিলেন পাস্তরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে নতুবা এমন প্রতিভাবান পণ্ডিত এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিবে কেন? কেহ পাস্তরকে বিদ্রূপ করিল; কেহ তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল।

পাস্তর কাহারও কথায় বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অটল বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহের সহিত জিনিস পঁচিবার কারণ নির্দ্দেশের জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় ফলে পাস্তর স্থির করিলেন জিনিস পঁচিবার কারণ জীবাণু।

নানাপ্রকার জীবাণু বাতাসের সহিত অদৃশ্যভাবে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পচন-শীল জিনিস উন্মুক্ত থাকিলে বায়ু হইতে জীবাণু প্রবেশ করিয়া উহাদের বিকৃতি সাধন করে। মাছ, মাংস এবং দুগ্ধ অত্যল্প সময়ের মধ্যে পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ সকল দ্রব্যে জীবাণু প্রবেশ করিতে না দিলে উহারা কিছুতেই পঁচে না। উত্তাপে জীবাণু সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি মাংস উত্তপ্ত করিয়া ফুটন্ত জলে ধৌত করিলেন এবং তৎপর তাহা একটী বায়ু-শূন্য শিশিতে পুরিয়া রাখিলেন। দীর্ঘকাল পরে দেখা গেল মাংস পূর্ব্ববৎ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা হইতে মাছ এবং মাংস নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য বাতাস শূন্য পাত্রে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইতেছে! জমান দুগ্ধ বায়ু শূন্য টিনের কৌটায় একদেশ হইতে অন্য দেশে রপ্তানি হইতেছে। নানাবিধ ফল ও চাটনি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ পাস্তরের আবিষ্কারের ফলে মানুষের কত সুবিধা হইয়াছে।

পাস্তর কর্ত্তৃক ব্যাধির কারণ ও তৎপ্রতিকার আবিষ্কারের ইতিহাস অতিশয় কৌতূহল জনক। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুটি পোকার চাষ ও রেশম প্রস্তুত করা ফ্রান্সের একটী প্রধান ব্যবসা ছিল। একবার হঠাৎ গুটি পোকার ভীষণ মড়ক দেখা দিল এবং রেশম ব্যবসায় অতিশয় ক্ষতি হইতে লাগিল। সেই সময়ে পাস্তর ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ণবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই মড়কের কারণ নির্ণয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। তিনি একদিন অণুবীক্ষণ দ্বারা একটী গুটি পোকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন উহার গায় অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম কীটাণু রহিয়াছে। পাস্তর স্থির করিলেন এই কীটাণুই গুটি পোকার ব্যাধির কারণ। তখন তিনি বীজাণু বিনাশের ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। তাহাতেই গুটি পোকায় মড়ক দূরীভূত হইল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে পাস্তরের মনে ধারণা হইল যে মানুষের ব্যাধির মূলেও বীজাণু রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইল।

পাস্তর এন্থ্রাক্স্ নামক এক প্রকার জ্বরের জীবাণু একটী সুস্থ ও সবল মেষের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়া দেখিলেন ঐ সুস্থ মেষের শরীরে এন্থ্রাক্স্ জ্বরের সকল লক্ষণ দেখা দিল। তখন তাঁহার ধারণা অধিকতর দৃঢ় হইল। তিনি ব্যাধির জীবাণু লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন উত্তাপে রোগের কীটাণুর কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস পায়। পাস্তর পূর্ব্বোক্ত এন্থ্রাক্স্ জ্বরের বীজাণু ২৪ ঘণ্টা উত্তাপে রাখিয়া একটী ভেড়ার দেহে

প্রবেশ করাইয়া দিলেন ; তাহাতে জ্বরের সামান্য লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইল। পনর দিন পর ১২ ঘণ্টা উত্তাপে রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর জ্বরের বিষ সেই ভেড়াটীর রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। আবার পনর দিন পরে এন্থ্রাক্সের কীটাণু উত্তপ্ত না করিয়া সাধারণ অবস্থায় সেই ভেড়াটীর দেহে প্রবিষ্ট করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। অন্য যে কোন ভেড়া সেই মারাত্মক বিষে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। আফিং খাইয়া যাহারা অভ্যস্থ তাহারা যে পরিমাণ আফিং খাইয়া আরাম বোধ করে সেই পরিমাণ আফিং খাইলে অন্যের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। সকল বিষ সম্বন্ধেই এই অভ্যাসের ফল এক প্রকার হইয়া থাকে।

ব্যাধির বীজাণু কোন বিশেষ বিশেষ প্রাণীর দেহে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্দ্ধিত হইতে দিলে ইহার তীব্রতা ইচ্ছানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। এই সত্যও মহাত্মা পাস্তুর আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষা দ্বারা তিনি ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কোন ব্যাধির নাতিতীব্র বীজাণু জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেই ব্যাধির লক্ষণ স্বল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যতে ঐ ব্যাধির মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই মহাসত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এখন ব্যাধির বীজ দ্বারাই সেই ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির টিকার মূলেও এই সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহাই Vaccination

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতি জন্তু দংশন করিলে ভীষণ জলাতঙ্ক রোগ জন্মে। পাস্তুরের আবিষ্কৃত অভিনব প্রণালী মতে চিকিৎসা করিলে এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের দংশনের ৪২ দিন পর জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। পাস্তুর সিদ্ধান্ত করিলেন, যদি দংশনের পর সেই রোগের জীবাণু সামান্য পরিমাণে দষ্ট ব্যক্তির শরীরে ৪২ দিন পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে কিছুতেই রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে না।

একবার এক কৃষকের পুত্রকে একটা নেকড়া বাঘে কামড়াইয়াছিল। পাস্তুর তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে বালককে জলাতঙ্ক রোগের টিকা প্রদান করিলেন। সেই বালকের দেহে আর রোগের লক্ষণ দেখা দিল না। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া চিকিৎসকগণ অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তখন হইতে পাস্তুরের চিকিৎসা প্রণালী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিলেন। পারিস নগরে পাস্তুরের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী রমণীয় বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম চিকিৎসার স্মৃতি স্বরূপে উহার সম্মুখে একটী কৃষক বালক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এই সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তিটী স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি পাস্তুরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা হইতেছে। কলিকাতা, কৌসলি ও শিলং এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু রোগী পূর্ব্বোক্ত হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়া এই দুরন্ত জলাতঙ্ক ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বায়ু ও ধূলির সহিত খাদ্য ও পানীয় জলের সহিত সর্ব্বদা নানা প্রকার ব্যাধির বীজাণু আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার তবুও আমরা পীড়িত হইতেছি না কেন ? ইহার কারণ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ করিবার একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তি প্রভাবে আমরা ব্যাধির বীজাণুকে পরাজয় করিতে পারি।

যতক্ষণ এই শক্তি প্রবল থাকে ততক্ষণ ব্যাধির আশঙ্কা নাই। কিন্তু এই শক্তি সকলের সমান থাকে না কিম্বা এক ব্যক্তির ও সকল সময়ে সমান শক্তি থাকে না। এই জন্য সুস্থ ও সবল ব্যক্তি সহজে রোগাক্রান্ত হয় না কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির সর্ব্বদা ভয়ের কারণ রহিয়াছে। আবার সবল ব্যক্তিও যদি আহার নিদ্রার অনিয়মে অথবা অন্য কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তবে তাহার দেহস্থ ব্যাধির বীজাণু প্রবল হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন বীজ কঠিন মাটিতে পড়িলে অঙ্কুরিত হইতে পারে না কিন্তু বারিপাতে ক্ষেত্র নরম হইলেই অঙ্কুরের উদ্গম হয়।

ব্যাধির বীজ সকল জীবদেহেই রহিয়াছে কেবল অনুকূল অবস্থা পাইলেই ইহার বিকাশ হয়।

ম্যাচনিকফ্ নামক একজন রুশদেশীয় পণ্ডিত সপ্রমাণ করিয়াছেন যে রক্তে দুই প্রকার কীটাণু আছে। এক প্রকার কীটাণুর রঙ্ শুভ্র অন্য প্রকারের রঙ্ লাল। এই শুভ্র কীটাণুর কাজ জীব শরীরে ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিতে না দেওয়া। তরল রক্তের সহিত বিচরণ করিয়া উহারা সর্ব্বদা দেহাভ্যন্তরে পাহারা দিতেছে। তাহাদের বেরাম নাই। শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিলেই ইহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধে। সংগ্রামে যদি রক্ত কীটাণুর জয় হয় তবে আর কোন চিন্তার কারণ নাই। ইহা দিগকে পরাস্ত না করিলে দেহে ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের শরীরের কোন ক্ষতস্থান উন্মুক্ত থাকিলে বায়ুস্থিত কীটাণু তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই সময়ে রক্ত কণিকার সহিত প্রবিষ্ট কীটাণুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহার ফলে ক্ষতস্থান স্ফীত ও উত্তপ্ত হয়। রক্ত কণিকার জয় হইলে ঘা অচিরে শুকাইয়া যায়। কিন্তু পরাজয় হইলে সেই স্থান পঁচিতে আরম্ভ করে এবং পুঁজ নির্গত হয়। তখন ঔষধ দ্বারা রক্তকীটাণুর সাহায্য না করিলে ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শিক্ষার মোহ

(শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্ত শাস্ত্রী)

যে কুসুম স্বকীয় স্বাভাবিক সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করে, মন প্রাণ প্রফুল্ল করে সেই কুসুম সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয়। আর যে কুসুম কি সৌরভে কি রূপে সর্ব্বপ্রকারে মানবের মন আকর্ষণ করে, শুধু আকর্ষণ নহে, আনন্দময় করে, অসুস্থ মনকে সুস্থ করে, সেই কুসুম বিশেষ ভাবেই সকলের কাম্য; দেবতার নিকটেও সেই জাতীয় পুষ্পের সমধিক আদর। যে সমস্ত দেশে সাকার দেবতার স্বীকার নাই সে সমস্ত দেশেও পুষ্পের আদর কম নহে। মানুষের মধ্যে যাঁহারা গুণে মানে ধনে শ্রেষ্ঠ তাঁহারাও পুষ্প উপহারে মুগ্ধ হন।

শিক্ষারও দুইটা দিক আছে। একটা ফুলের রূপের মতো বাহিরের দিক, অপরটা ফুলের সৌরভের মতো ভিতরের দিক্। যে শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৌরভ ময় করে, সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশের মনেই আনন্দ জাগাইয়া দেয়, সেই শিক্ষাই সুগন্ধি কুসুমের মতো সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। আর, যে শিক্ষার শুধু রূপ আছে, চাকচিক্য আছে, ঝলঝলায়মান বিলাস চাতুরী আছে সেই শিক্ষা কতিপয়ের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে বটে কিন্তু উহা সর্ব্বগ্রাহ্য নহে। পরন্তু যে শিক্ষার রূপও নাই গুণও নাই বরং নক্কার জনক বীভৎসতা আছে, প্রাণ নাশকর মাদকতা আছে, জাতি নাশকর নেশা আছে, তেমন শিক্ষা বিষময় পুষ্পের মতো সকলেরই বোধ হয় ত্যাজ্য।

আজ আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি লাভ ঘটিতেছে তাহা গুণে ভালো কি রূপে জম্‌কালো তাই নিয়ে সুধীমহলে আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; এবং আলোচনার সূত্রপাত নহে, ঘাত প্রতিঘাত ও আরম্ভ হইয়াছে। কাহারও মতে বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের দেশ কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি বা ধর্ম্মনীতি সকল নীতিতেই পিছাইয়া পড়িতেছে, অথচ কি আশ্চর্য্য! এতজ্জাতীয় আলোচনা-কারীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষানুগত বহির্বিলাসে মুগ্ধ। এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতা চায় না অথচ পাকে প্রকারে সেই শিক্ষাকে কিন্তু বরণ করিয়া নেয়। এই প্রকারের যে দ্বৈত মনোভাব তাহাতে সরল প্রাণ ব্যক্তিগণ প্রতারিত হন। শিক্ষার সংস্কার অনেকেই অনেক দিন যাবৎ চাহিতেছেন, বৈদেশিক শিক্ষারও নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু কৈ? এত আন্দোলন সত্বেও আমাদের দেশে দেশীয় রক্তমাংসানুমোদিত শিক্ষারও প্রচলন হইতেছে না।

৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত অপ্রিয় ছিল, এখন তাহাই প্রিয়রূপে দেখা যাইতেছে। নিত্য নূতন আধি, ব্যাধি, দীনতা, হীনতা, নানা ছন্দে নানা সুরে সমাজের সুস্থ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। যতই লোক শিক্ষার সংস্কার চাহিতেছে, সভ্যতার উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ততই যেন আমাদের দেশের হাব ভাব, রীতি নীতি, চাল চলন লোপ পাইতেছে। আচারে আহারে আকারে প্রকারে ভূষণে পরিচ্ছদে, ভাবে ভাষায় এমন কি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষামুগ্ধ আমরা প্রাচ্যের

সমস্ত অতীত, সমস্ত গৌরব, এমন কি সমস্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিজ্ঞান ভুলিতে বসিয়াছি। আমরা শিক্ষায় সংস্কার চাই, কিন্তু ভারতীয় চিন্তা, ভারতের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গড়া দিব্য অবদান আমাদের নিকট অগ্রাহ্য অশ্রদ্ধেয় অপাঙক্তেয়।

বাঙ্গালী যুবক, তথা ভারতীয় যুবক দলে দলে বি, এ, এম, এ পাস করিতেছে; ইহাদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত পদবী বাচ্য কি না সেই সম্বন্ধে অনেকেরই হয়ত সংশয় থাকিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত শিক্ষার বাহিরের দিকটাই লাভ করিয়াছেন, ভিতরের দিক নহে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত বিভাগের প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহারা কাব্যতীর্থ বা ব্যাকরণতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও যে সকলেই শিক্ষিত নামের উপযুক্ত তেমন কথা বলা চলে না। তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বি, এ এম, এ, ক্লাসের শিক্ষায় এবং প্রাচ্য পদ্ধতিতে কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি শিক্ষায় একটু তারতম্য আছে, একটু কেন, অনেক আছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে, স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ও শক্তির বিনিময়ে লব্ধ হয়, আর প্রাচ্য সংস্কৃত শিক্ষা বিনা পয়সায়, বিনা বেতনে লব্ধ হয় প্রাচীন কালের কাহিনী বরং না—ই বা বলিলাম, বর্ত্তমান কালেও অনেক সংস্কৃত অধ্যাপক ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞানে আহার ও বাসস্থানাদি দ্বারা ও শিক্ষা দান করেন। পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়, বাহ্য সভ্যতায় মুগ্ধ হয় পরন্তু আশানুরূপ উপার্জ্জন হয় না, এমন কি আদৌ উপার্জ্জনই হয় না, ফলে অনুশোচনায় দিন কাটে। পক্ষান্তরে আড়ম্বরহীন শিক্ষা প্রাপ্ত সংস্কৃত বিভাগের উপাধিধারিগণকে ইংরেজী গ্রাজুয়েটদিগের ন্যায় পাঠ্য-অবস্থায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইল অথচ হাজার টাকা উপার্জ্জনের পন্থা হইল না” এমনধারা অনুশোচনায় কাল কাটাইতে হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে কিন্তু বি, এ পাশের উপার্জ্জন এবং কাব্যতীর্থাদির উপার্জ্জন প্রায় সমান। মাসিক ২৫৲ ৩০৲। Unemployment Question যেরূপ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শিক্ষার প্রকার যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া মূলানুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

একটু উপরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যেসমস্ত প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবাসী শিক্ষার ব্যপদেশে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া বা না আসিয়া ভারতবর্ষকে কি দান করেন এবং বিদেশকেই বা কি দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ম্যাজিষ্ট্রেট বা ব্যারিষ্টার, নিদেন কেউ কেউ ফরেষ্টার বা এতজ্জাতীয় কিছু। কেহই কিন্তু মেঞ্চেষ্টর সাজিয়া আসিতে পারেন না, অর্থাৎ আমাদিগকে আর ভবিষ্যতে মেঞ্চেষ্টরে যাইতে না হয় তেমন কিছু কল কারখানা খুলিতে পারেন না। ভারত যে-তিমিরে সে--তিমিরেই থাকে।

অর্থনীতি হিসাবে ধন-সৃষ্টির তিনটী কারণ প্রধান; বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিষ্টার প্রভৃতি ধনের সৃষ্টি করিতে পারেন না, বরং সৃষ্টধন আত্মসাৎ করেন। পরন্তু বিদেশী শিক্ষায় বিমুগ্ধ তাদৃশ বিদ্বন্মন্যগণ বৈদেশিক প্রণালী-তেই সেই সমস্ত অর্থের ব্যয় করেন। ইঁহাদের মটর, চুরুট হ্যাট্‌কোট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন কি মনটী পর্য্যন্ত বৈদেশিক উপাদানে গঠিত, গৃহের মেজের সুবিস্তৃত কার্পেট, আলো আলনা, জুতা মোজা সমস্তই বিদেশী প্রথায় সংগৃহীত। জীবন বীমার হাজার হাজার টাকা, পরবর্ত্তী ওয়ারিশগণ লাভ করে বটে কিন্তু ঐ ওয়ারিশগণ যে কিম্ভূত কিমাকার হইবে তাহা পিতার জানা থাকে না। পক্ষান্তরে পিতার জীবিত অবস্থায় দেশীয় কোনও শুভ প্রতিষ্ঠানে বা সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের খবর বড় পাওয়া যায় না। অধিকাংশই যেন আপন লইয়া ব্যস্ত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে এই যে একটা দেশের ক্ষতি তাহা অনেক সুধী লোক বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। বিদেশে যদি যাইতেই হয় তবে এমন সঙ্কল্প করিয়া যাইতে হইবে, আমাদের দেশের যে কোন বড় অভাব যেন তাহার দ্বারা পূর্ণ হয়। ঐ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য অপর এক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যেন পরকীয় সভ্যতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে না হয়। এই প্রকারে এতদ্দেশের প্রধান দশটী অভাব যদি দশটী অশেষ মনীষা সম্পন্ন বিদ্বান বুদ্ধিমান্ ভারত যুবক করিতে পারেন বা পারিতেন তবে বোধ হয় বিগত অর্দ্ধ

শতাব্দীর প্রথম পাঁচ সাত বৎসরের ভিতরেই ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ইতিহাস রূপান্তর ধারণ করিত। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা হয় নাই। হইয়াছে কি ? শত শত সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক বৈদেশিক শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজ দেশকে ভুলিতে বসিয়াছেন, নিজের মাতাকে অবমাননা করিতে শিখিয়াছেন, এমন কি নিজের ভাষাকে পর্য্যন্ত Native tongue বা গ্রাম্যভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন। অথচ এমন শ্রেণীর লোকের মুখেই শুনা যায় সংস্কার চাই, সংস্কার চাই, শিক্ষার সংস্কার চাই ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষা চাই না, দেবভাষা চাই না, মাতৃভাষা মানি না, নিজের ধর্ম্ম জানি না।

বিদেশে গেলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না বা নূতন চক্ষু লইয়া আসা যায় না। কোনো কোনো রাজা মহারাজ বা তাদৃশ ধনী রাজ্য পরিচালন বা প্রজাশাসন পদ্ধতি শিখিবার জন্য ও নাকি বিদেশে যান অথচ দেখা যায় বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজেয় পৈতৃকজ্ঞানটুকুও হারাইয়া বসেন ; হয়ত বা সুচতুর ভায়রা ভাইদের বাগজালের ভিতরে আটকাইয়া যাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে স্বকীয় নির্বুদ্ধিতা রক্ষা করেন। অর্থাৎ এক বিলাত ফেরৎ অপর বিলাত ফেরতের চাতুরীতে প্রবঞ্চিত হন ; একটী দুইটী টাকা নহে, লক্ষ লক্ষ টাকা। এতাদৃশ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় লোক শিক্ষা কিরূপ হয় ?

অপর এক প্রবঞ্চনা অন্য দিকে। বড় বড় সভাতে বড় বড় বক্তৃতা হইতেছে ; বক্তা বড়, বক্তৃতা বড়, বিষয় বড়, লোকের শ্রদ্ধাও কম নহে, কিন্তু সময় সময় লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান নঞ্‌তৎপুরুষ সমাসে আবদ্ধ হয়, অশ্রদ্ধা অভক্তি ও অসম্মান ! দেশের টাকা লইয়া ছিনিমিনি, দেশের যুবক ক্ষেপাইয়া রিনিঝিনি আর দেশের সুস্থ শান্ত প্রকৃতিকে ঘা দিয়া সা-রে-গা-মা পা-ধা-নি। সাত রকমের সুর। একই মুখে নানা সময় নানা বোল।

নর ও নারী সমস্যা অপর এক দিক্। ভারতীয় নারীরা ভারতীয় রীতিনীতিতে শিক্ষিতা ও পরিচালিতা হইবে অথবা বিজাতীয় জাতীয়তায় স্বাধীনতালাভ করিবে, এই হইতেছে বৈদেশিক শিক্ষার অপর এক মোহজনক আন্দোলন। পক্ষপাতিতা পরিপূর্ণ এক দেশদর্শী ভগবান্ হয় নর না হয় নারী কেন সৃষ্টি করিলেন না এইরূপই বুঝি বিধাতার বিরুদ্ধে একপক্ষের অভিযোগ। এই অভিযোগ উভয়পক্ষ হইতে কেন উপস্থিত হয় না তাহাও আবার সঙ্কীর্ণচেতা স্রষ্টার জেরা বা cross.

বর্ত্তমান শিক্ষার মোহে তরুণ তরুণীদের অবাধ সম্মিলন, যুবক যুবতীদের একত্র সম্মিশ্রণ, কুমার কুমারীদের কৌমার্য্য রক্ষণ হইতেছে এবং ভারতের দারিদ্র্যনাশের নিমিত্ত বার্থ-কণ্ট্রোল (বা জন্মনিরোধ) চলিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে প্রায় পুরাপুরি পরীক্ষা চলিতেছে। এখন অবরোধ প্রথার কথাটী জন্ম নিরোধের ব্যথায় পর্য্যবশিত হইতেছে। অনেক পিতামাতাও নিজের পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবিবাহিতা বা বিবাহিতা রমণীদের সঙ্গে অবিবাহিত বা বিবাহিত যুবকদের সস্নেহ মেলামেশা স্নেহের চক্ষেই নিরীক্ষণ করেন অথচ মিস্ মেয়োকেও চক্ষু রাঙা করিয়া গালি দিতে ছাড়েন না। ছেলেরা যেমন আজকাল দেশীয় ছবিতে সৌন্দর্য্য না দেখিয়া বিলিতি বায়োস্কোপে প্রমত্ত, অভিভাবক-গণও তথৈবচ। ছাত্রগণ যেমন আজ জাতিগত আচার নিষ্ঠা ও শাস্ত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগী শিক্ষকগণও প্রায় তথৈবচ। অথচ সকলেই চায় সংস্কার। কোনও ছাত্র যদি বংশগত অভ্যাসের ফলে নিজেদের দেশের রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে চায় তবে শিক্ষকগণ বলেন ছ্যা ছ্যা, অভি-ভাবকগণও মনে করেন এই গেলো যা। এই সমস্ত দেশীয় সংস্কার যে সকলই কুসংস্কার এর ভিতরে কি ভাল থাকিতে পারে ? পাত্রীপক্ষ মনে করিবেন, না, এমন প্রকৃতির পাত্রের সঙ্গে মেয়ের যোটকতা করা চলিবে না, বরঞ্চ ব্রহ্মপুত্রের বর্ষার জলেই......ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ত্তমান শিক্ষার মোহ দেশীয় উকীল মোক্তারদের ভিতর যতদূর প্রকট হইতেছে অন্য কোনও সম্প্রদায়ে তত অধিক নহে ! দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা আজ ঐ উকীল শ্রেণী, অন্ততঃ তাঁহারা তাই মনে করেন। দুই একটী ব্যতিক্রম (exception) থাকিতে পারে বটে। জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইলেও ইঁহারাই আজ বদনে ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ, বচনে ব্রাহ্মণ। একান্নভুক্ত পরিবারের দায় ভাগ বা সম্পত্তি বিভাগ হয় ইঁহাদেরই আইনের বলে, বড় বড় রাজা জমি-দারদের দত্তক গ্রহণ বা পোষ্য রক্ষণ হয় ইঁহাদেরই বচন

চাতুর্য্যে; রহিমবক্স রামকুমার হয় ইঁহাদেরই ভাবমাধুর্য্যে পতিতা রমণী পাবনী হয় অথবা পাবনী পতিতা হয় উকীল বাবুদের জ্ঞান গম্ভীর্য্যে। ইঁহাদের বাক্য বাগীশতার বলে কেউ ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে বাঁচে কেউ বা অকালে ও অকারণে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে! ইঁহাদের অনন্ত ক্ষমতার গুণে দিন রাত্রি হয়, রাত্রি দিন হয়; সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হয়। অতএব ইঁহারা ব্রাহ্মণ নয়ত ব্রাহ্মণ কে? আমরা যে বলি ইঁহারা দেবতা। না না বিরুদ্ধ গুণ বিরুদাবলী ইঁহাদের চৈতন্য ময় বৃক্ষে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে।

কি সমাজে, কি বাহিরে, কি পল্লীতে, কি নগরে, মিউনিসিপালিটীতে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে, কাউন্সিলে কংগ্রেসে, হিন্দু সভায়, সর্ব্বত্র ইঁহাদের ব্রাহ্মণবৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় অথচ ইঁহাদেরই মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দা, যজ্ঞ সূত্রের নিন্দা জাতীয়তার অবমাননা। এমন না হইলে কি একত্র বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ সম্ভবপর হয়? বর্ত্তমান জগতে শাস্ত্রজ্ঞ উকীল, অর্থজ্ঞ উকীল, তত্বজ্ঞ উকীল। অথচ শিক্ষার মোহে আমাদের দেশের শাস্ত্র অর্থ ও তত্ব সকলই উপেক্ষিত, অবমানিত পদদলিত।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা স্বভাবজাত কানন কুসুমের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা টবের মধ্যে রোপিত কৃত্রিম পুষ্পবাটিকাকেই সমাদর করেন; পল্লীগ্রামের প্রকৃতির শোভা পরিত্যাগ করিয়া নগরীর গরিমাতেই গৌরবময় বোধ করেন। দেশের নাপিত, ধোবা, কামার, কুমার, মালী বৌ, কুলু বৌ কোন্ সুখে দিন কাটায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবার তত প্রয়োজন নাই, নিজের সুখে নিজে আত্মহারা, অথচ খুব তলাইয়া দেখিলে মনে হয় সহরে বাবুদের অপেক্ষা গেঁয়ে ভূতোগণ একেবারে দুঃখে দিন কাটায় না। দুঃখ শুধু এই, এদের জোয়ান দেহে যাঁহারা বিবিধ ব্যাধি ছড়াইয়া দিলেন, চিকিৎসার সময় তাহারা কেহই আগাইলেন না, আর দুঃখ এই পুঁথির পাতা উল্টাইয়া ইহারাও একটা কেষ্ট কি বিষ্টু হইতে পারিল না। কৃষ্ণত্ব বা বিষ্টুর লাভ করিলেই কৃষ্ণের বাঁশরী যে শুধু নগরের ঘরে ঘরেই বাজিবে, বনে বনে আর বাজিবে না তেমন কৃষ্ণত্ব ত কেহও চায় না।

হাঁ, পল্লী ছাড়িয়া নগরে আশ্রয় লইলে প্রকৃত স্বাধীনতা না হ'ক্ নানাদিকে মনগড়া স্বাধীনতা লাভ করা চলে। নাপিত ধোবা কামার কুমারের ন্যায় পৈতৃক গুরু পুরোহিত-দিগকে পরিত্যাগ করিলেও কোনরূপ বাধা পাইতে হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পণ, ব্রত পার্ব্বণ, পূজা অর্চ্চনা, অন্নপ্রাশন বিবাহ ইত্যাদি জাতীয়তাসূচক কার্য্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কাজেই পুরোহিত নিষ্প্রয়োজন। তবে গুরুর সেবা বাদ দিলে একেবারে চলে না, চক্ষু খোলে না, তাই গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই গুরুটী কেমন হইবে? যিনি অকস্মাৎ একদিন কোনও সুদূর দেশ হইতে আসিয়া অজ্ঞাত কুলশীলভাবে, স্বকীয় শক্তি প্রভাবে শিষ্যদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন, যাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে আর সাক্ষাৎ ছিল না, হয় ত বা যাঁহার নাম ও পূর্ব্বে জানা ছিল না তেমন এক ক্ষমতাবান্ পুরুষ গুরুরূপে নির্দ্ধারিত হইলেন। এই শ্রেণীর গুরুর আদেশ বা নিষেধে কিংবা মধ্যস্থতায় শিষ্যের কোনরূপ শাসন বা শাস্ত্র মানিতে হয় না। অহিন্দুর আচার, আহার হিন্দুর গৃহে চলিতে পারে, বেশেভূষায় গুরুদেরই মতো শার্ট কোট চশমা জুতা এমন কি পাঁচ টাকার ঘড়ী পর্য্যন্ত নিন্দনীয় হয় না, অথচ যখন তখন যেমন তেমন ভাবে উপাস্য দেবতার উপসনা চলে। ওদিকে বহুকালের স্বীকৃত গুরুদেব পরিত্যক্ত হন, নব্যশিক্ষার অভাবে দীক্ষাদানে বঞ্চিত হন। মোট কথা প্রতীচ্য শিক্ষার মোহে এখন আর বড় কেহ প্রাচ্য শিক্ষার পদ্ধতিতে, সামাজিক রীতিনীতিতে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। অধিকাংশই সমাজের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়াইতে গৌরব বোধ করেন। শিক্ষার মোহে এ-দেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাও দেখা প্রয়োজন। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও জাতীয় শিক্ষা ভারতবাসীর বিশিষ্টতা ছিল। শিক্ষার মোহে সংযম স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্রহ্মচর্য্য স্থানে অধৈর্য্য বা অধীরতা, জাতীয় শিক্ষাস্থানে বিজাতীয় দীক্ষা এবং স্মৃতির ব্যবস্থা স্থলে বিস্মৃতির অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে।

যৌবন

[শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী]

যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী কেন? দেখ্‌তে দেখ্‌তে নবীন দিনের শেষ রশ্মিটুকুও নিবে যায়! সব আশা ও উৎসাহ শিথিল হ'য়ে আসে, সব উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়। এমন কেউ আছ, বলতে পার প্রৌঢ়ের অন্তিম দশায় এসে যে যৌবনের সুবর্ণময় স্বপ্ন এখনও তোমার চিত্ত আকাশ রঞ্জিত ক'রে রেখেছে? এখনও দক্ষিণের সমীরণ হৃদয়-নিকুঞ্জে নব নব আশার মুকুল মঞ্জুরিত ক'রে যায়?

এ প্রশ্নের উত্তরে হাজারকরা নয়শ' নিরানব্বই জন প্রবীণের মুখে শুন্‌বে—"যৌবনের কথা ছেড়ে দাও ও মরীচিকায় বিভ্রান্ত হ'য়ে অনেক ভুল ভু'লেছি, অনেক ঠকা ঠকেছি,—পথ হারিয়ে পিচ্ছিল পথে গভীর খাদে পড়তে পড়তে কোনও মতে উদ্ধার পেয়ে প্রৌঢ়ের সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি বার্দ্ধক্যের শেষ আশ্রয়ে! যৌবনের কথা আর বোলো না ও বড় বিষম কাল! ওর জৌলস বড় চোখ ধাঁধানো—ও মায়ামৃগের পশ্চাতে যে ছুটেছে, সেই মরেছে!"

যৌবনের বিরুদ্ধে বার্দ্ধক্যের এ অভিযোগের রহস্য কি কেউ জান? যৌবন কি সত্যিই বড় বিষময়? যৌবন—যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়রাজি নতুন শক্তি নিয়ে বিকাশের পথে ছোটে—সমস্ত অন্তঃকরণ নবীন প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার আবেগ ও আনন্দ নিয়ে উন্মেষিত হ'য়ে ওঠে, দেহের ও অন্তঃকরণের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যখন পরিপূর্ণ, সুগঠিত, সমস্ত চেতনা যখন সুস্থ, জাগ্রত, পুলকিত—সেই পরম সুখময়, শান্তিময় ও মঙ্গলময় সময়কে আমরা বলি—অশেষ অকল্যাণের নিদান!

অকল্যাণ যৌবনের দান নয়;—যৌবনকে আমরাই অকল্যাণের পথে টেনে আনি! ভগবান্ আমাদের যে প্রতিভা ও শক্তি দিয়ে যৌবনের যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমরা তার অপব্যবহার করি—বার্দ্ধক্যের অনুশোচনা তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

যৌবনের জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম দেবতার দান;—আমরা তা' দিয়ে রাক্ষস পিশাচের পূজা করি। নিকৃষ্ট পাশবিক ভোগে ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ ক'রে ফেলি, অনর্থ চাঞ্চল্যে চিত্তের প্রসন্নতা হারাই, অত্যাচারে ব্যভিচারে প্রাণ হীনবীর্য্য ক'রে ফেলি! অকাল বার্দ্ধক্যকে আহ্বান ক'রে আনি—যৌবনের দুর্গতির মূলে দায়ী আমরাই!

যৌবন দেবতার দান;—এ জিনিষ দেবতার পায়েই সমর্পণ কর্ত্তে হয়,—যাঁর জিনিষ তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে হয়,—তা' হ'লে যৌবনের ভাণ্ডার আর খালি হয় না।

যৌবনের উৎস অক্ষয়;—এই সুধা স্রোতের সন্ধান যে ভিতরে পেয়েছে, সে যৌবনকে জীবিত রাখ্‌তে পারে, কালের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন ক'রে।

ব্যোম-বাণী

[শ্রীতারকনাথ ঘোষ]

সুপ্তি-মগন, বিশ্ব-ভুবন নিঝুম নিথর রাতি,
চিন্তা-মলিন, আঁখি নিদ্‌হীন, ব্যথিয়া উঠিছে ছাতি!
সমাজ নিগড়, কিবা গুরুতর, কঠিন বাধনে তার,
পঙ্গু অচল হিঁদু হীনবল—দুর্ব্বহ ধরা-ভার!
লক্ষ লক্ষ সদা বিপক্ষ প্রতিকূল মত ভজে,—
"পুনর্ব্বিবাহ বিধবার চাহ? সপ্ত পুরুষ মজে।"
আরো কত কথা, ব্যথা-ব্যাকুলতা, বুকে শেল সম বাজে!
কোথা সমাধান? অচল প্রমাণ, শত সমস্যা সাজে!
সহসা শিয়রে জলধর স্বরে, গরজিল কোন্ বীর?
নাহি হেরি কায়, বাণী ব্যোম ছায়, দৃঢ় গম্ভীর, ধীর!
"কর অবধান, হয়ে প্রাণবান্—"শাস্ত্র-বিধানমত,
পতিবিরহিতা হ'তো পরিণীতা—পুত্র-কামনা-ব্রত!
পতিহীনা সতী, ল'য়ে অনুমতি পূজনীয় গুরু পাশে,
স্বামী সহোদরে, অভাবে অপরে, ভজিতো তনয়-আশে!
মনুর বচনে ছিল প্রচলন, এ হেন নিয়োগ-প্রথা,
পুরাণের কাল, ছিল হেন হাল, নহে ত কথার কথা!
তা' হতে কি হীন, প্রথা বিমলিন, বাল-বিধবার কথা!
বিধির বিধান হয় না কি ম্লান সৃষ্টিতে বাধা দিয়ে?
গোলক-বিহারী, নিরখিলা নারী, জগত-জননী করি
তাই বুকে তাঁর স্তন্য-আধার—ধন্যা ধরণী ভরি!
সত্য ও ত্রেতা, দ্বাপরের নেতা, বিধান দিলেন যত
আচরি' কি তা'য় কলিকালে হায়, হিন্দু নিরয়-গত?
তিনটি যুগের, জন-মানবের, নরকে হ'লো কি বাস?
কলির হিন্দু, পুণ্যসিন্ধু?—নন্দন ফুল-রাশ?

যত জাতিদল, যা'বে রসাতল, বিধবা-বিবাহ-ফলে ?
হিন্দুর দল, পাবে ফুল জল, আত্মধ্বংস বলে ?
অকাল বিধবা, হইলে সধবা, লক্ষ হিন্দু বাড়ে,
থাকিতে সে বিধি, সবগুলো নিধি রে'গে বেগে টিকি নাড়ে!
হিন্দুই হীন, বাড়ে দিন দিন, জগতের জাতি-কুল
রুদ্ধ তাহার প্রবেশের দ্বার !—বে'র হ'তে পারে মুল !
শুদ্ধির নামে, মূর্দ্ধা তো ঘামে, উর্দ্ধে দু'চোখ ওঠে
শ্রদ্ধানন্দ, ছিলেন অন্ধ, বুদ্ধি ছিল না মোটে !
সতী-নিপীড়িতা, সমাজে পতিতা, দু'কূলে নাহিক থিতি !
গতি তার হায়, দেহ ব্যবসায়,—পাপপথ দুর্নীতি !
হিন্দু-অবলা ক্ষণেকে অচলা, সচলা তাঁদেরি জাতি,
পুরুষ প্রবল, সমাজে অটল, ব্যভিচারে বাড়ে ছাতি !
পতিতা অশেষ, পতিতের লেশ, সমাজে কভু কি হের ?
সমাজ-তুলের, আছে ঢের ফের, সেরকে ছটাক তের !
কর প্রচলন, শাস্ত্র-বচন, বিধবা-বিবাহ-তরে
পণ-প্রথাটার, কর ছারখার, নহিলে সমাজ মরে।
কর উচ্ছেদ, বল্লালী ভেদ ভিতর যাহার ফাঁকা !
রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বংশজ, কাপ, কুলীন গরিমা হাঁকা !
শতেক বিধান শত ব্যবধান, শতেক প্রাচীর ঘেরা,
হিন্দু-সমাজ, কারাগার আজ, হিঁদুরা কয়েদী সেরা !
ভিত্তির বল, গেছে রসাতল,—বদ্ধ প্রাচীরে সারা !
ভাই ভাই ভেদ, গেলো উচ্ছেদ—ধ্বংসের এটা কারা !
ভেঙে ফেল' দ্বার, কর' চুরমার, হাজার দেয়াল বাধা,
মুক্তির গান, গাহ' এক প্রাণ, এক সুরে গলা সাধা !
দেখিবে তখন, সবাই স্বজন, মিছে ভাণ, দলাদলি !
এক রাজপথে মুক্তির রথে, যাত্রীর গলাগলি !
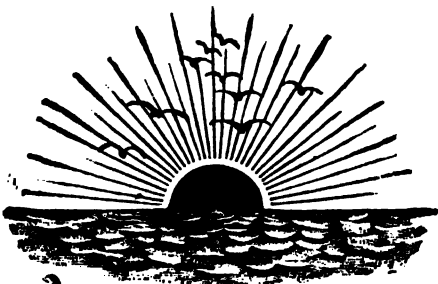
ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি *

[শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ]

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং কাশীদাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ যখন এই সকল কবিদিগের কল-কণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ময়মনসিংহের সীমান্ত প্রদেশ সেই সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে নারায়ণ দেবের সুমধুর কবিতায় তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তাহার পর চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষ অন্ধ কবি ভবানী দাস, মহা-ভারত রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী, ক্রিয়া যোগসার রচয়িতা অনন্ত দত্ত, কবি কৃষ্ণদাস, ভারতী মঙ্গল রচয়িতা রাজা রাজসিংহ, পদ্মপুরাণ রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস, ভাস্কর পরাভব রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ, দুর্গাপুরাণ, রচয়িতা জগন্নাথ দাস, মুক্তারাম নাগ, "দারাশেকোর" বঙ্গানুবাদক সদানন্দ মুন্সী চণ্ডীকাব্য রচয়িতা রামানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের অশেষ উন্নতি ও ময়মনসিংহ জেলাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল কবির কথা উল্লেখ করিলাম ইহারা সকলেই রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন। অদ্যকার প্রবন্ধে যে কবির কথা উল্লেখ করিব, ঐ কবি নিরক্ষর ! নিরক্ষর যে কবি হইতে পারে, ইহার জন্মের পূর্ব্বে এই ধারণা কাহারও ছিল না, এবং থাকিতেও পারে না। "নিরক্ষর কবি" কথাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার রচিত কবিতা লিখিয়া না রাখায়, ভাল ভাল কবিতাগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। একবার অনেক দিন হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত রামু সরকার তাঁহার রচিত ভাল ভাল কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখার প্রস্তাব রামগতি সরকারের নিকট করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রামগতি সরকার বলিলেন, "কুম্ভকারের হাড়ির দুঃখ কি," যখন প্রয়োজন হইবে তখনই কবিতা রচনা করিতে পারিবেন, লিখিবার প্রয়োজন কি ? এই ভ্রমে পড়িয়া রামু সরকার তাঁহার রচিত কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখেন নাই। এখন বৃদ্ধ বয়সে ভাল ভাল কবিতাগুলি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন ; যে ২।১টী বলিতে পারিয়াছেন, প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করা গেল।

* দিনাজপুর উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত।

জেলা ময়মনসিংহ পরগণে হোসেনসাহীর অন্তর্গত নান্দাইল থানার এলাকাধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৮ সনে মাঘ মাসে মঙ্গলবার শ্রীরামচন্দ্র মালী (রামু সরকার) জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺রামপ্রসাদ মালী, মাতার নাম রামমণি দাসী। উক্ত আউটপাড়া গ্রামে একটী কবির দল ছিল তাঁহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন ঐ দলে গিয়া গান শুনিতেন, সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল বালক সহ একত্রিত হইয়া ঐ সকল ছড়া পাঁচালীর আলোচনা করিতেন। ইহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, একবার যাহা শুনিতেন তাহাই অভ্যস্ত হইত। ইহার এরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আউটপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কবির গান ও ছড়া পাঁচালী রচনায় উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং মহাভারত, রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রস্তাবগুলি মুখে মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষাতেই কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত রচনা শক্তি জন্মিল। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য তাহার রচিত ভক্তি সঙ্গীত একটী ও ঈশ্বর বন্দনা প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

হরি বলে ডাকরে আমার মন
এল, নিকটে শমন তুমি কার আশায় বসিয়ে রয়েছ,
তোমার গণার দিন যে দিনে দিনে গত হ'ল তাকি টের পেয়েছ ॥

যাবে যদি ভব পারে বল কৃষ্ণ হরে হরে
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ
ঠেকে ভবের ফান্দে রামু কান্দে
ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ
এ দেহ থাকৃতে চেতন হরি বল মন
জীবনের ভরসা আর কি
যখন এসে শমন দিবে দরশন
তখন ঘোর হবে দুই আঁখি
যার জন্য খাট বেগারী তারা সব রবে পড়ি
একা পালাবে প্রাণ পাখি

তোমার ভবের কামাই ভবে রবে,
মন তোমায় দিলেই বা কি নিবেই বা কি।

আমি মূর্খ নিতান্ত ভ্রান্তে হই অশান্ত
শ্রীকান্ত জানি না কখন
সদায় করি দুশ্চিন্তে চিন্তা মণি করি চিন্তে
নিশ্চিন্ত মন থাকে না কখন
যার করিলে চিন্তে দূরে যাবে সকল চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তার কারণ
কে পারে তাঁহারে চিন্‌তে যে চিন্‌তে সে চিন্‌তে
আমার জন্ম গেল চিন্‌তে চিন্‌তে, চিন্‌তে পারিনে কখন
মুক্তিকর্ত্তা জনার্দ্দন এ ধন বিনে আর কি ধন
ত্রিজগতের মোক্ষধন চিন্তা কল্লে সে চরণ
মোক্ষধামে হয় গমন।
ত্রিজগতের তারণ কারণ যিনি হল কারণের কারণ
ক এতে কৃষ্ণ নাম লিখন আমি তা জানিনে কখন।
উদ্দেশ্যেতে নিবেদন করি প্রভু জনার্দ্দন
বিপত্তে মধুসূদন যা কর এখন ॥

ঈশ্বর বন্দনা

হে প্রভু জনার্দ্দন উদ্দেশ্যে করি নিবেদন
শ্রীচরণ পাবার আশার আশে:
পাপাশ্রিতে মতিচ্ছন্ন ভক্তি হয় না সে জন্য
মোক্ষ চরণ পাব আর কিসে
আমি মূর্খ ভক্তিহীনে পাবার আশা হয় না মনে
যদি তোমার দয়া গুণে পাই আমি দীনহীনে
কে আছ তুমি বিনে এ তিন ভুবনে
পাপী তাপী কতজনে উদ্ধারিলে নিজগুণে
কিঞ্চিৎ করুণা গুণে দয়া কর এ অধীনে
তুমি কৃষ্ণ ব্রজের বনমালী
আমি তোমার হতে ভক্ত
যে দিন হবে জীবন মুক্ত
কইরো মুক্ত বলে রামু মালী।

গুরু বন্দনা

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক দেহ
জীব উদ্ধারিতে ভবে আর নাই কেহ
সেই গুরুতে ভক্তি হয় না আমার আমার করি
কেবা আমার আমি বা কার জান্তে নয়কো পারি

কিসে হর অন্তে মুক্তি ভব পারে নাইকো যুক্তি
গুরু মুখে আছে উক্তি কর্ণে দিলেন নাম
সে নাম ভজিলে পরে যাওয়া হবে ভব পারে
শুদ্ধ হইবে পরিণাম।
অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অনুবাদ করি বাদে পড়েছি ঘোর বিপদে
তব পদে নিলাম শরণ॥

বিগত ১২৬৯ সনে শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় তারাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে শ্রীপঞ্চমী উৎসব উপলক্ষে প্রথম চণ্ডী ঘোষ সরকারের সহিত রামু সরকারের কবির গান হয়। চণ্ডী ঘোষ প্রশ্ন করিলেন ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ড ছিল, একমুণ্ড বিলুপ্ত হইল কেন? তদুত্তরে রামু সরকার বলিলেন:—

শিব হইলেন পঞ্চানন ব্রহ্মা হইলেন পঞ্চানন
এই বলে পঞ্চানন করিলে ভাবনা
সমান সমান হলে এই যে ভূমণ্ডলে বর্ণিবে যে
সমান দুজনা
আমার সমান ত্রিসংসারে এমন কে হইতে পারে
এই বলে ব্রহ্মারে বলিলেন পঞ্চানন
আমার বাক্য ধর এ বয়ান ত্যাগ কর
বলিলেন তখন।
ব্রহ্মা বলেন ত্রিপুরারি তোমার বাক্য ধরি
বয়ান কেন ত্যাগ করি এ বাক্য বলনা
তাতেই শিব রাগের ভরে একমুণ্ড ছেদন করে
কপালী নাম শিবের সেই কারণ॥

রামু সরকার, পাবনা জেলা নিবাসী বড় হরি সরকার, কৃষ্ণনগর নিবাসী চণ্ডীগোপাল সরকার, বিক্রমপুর নিবাসী ভৈরব মজুমদার, রামকানাই শীল, বরিশাল নিবাসী মথুর সরকার, বিধুভূষণ সরকার, ফরিদপুর নিবাসী মহিম শীল, মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরা নিবাসী কানাইনাথ, ভগবান দাস, শ্রীহট্ট নিবাসী গোলক মুন্সী, ময়মনসিংহের ৺বিজয়-নারায়ণ আচার্য্য, রামগতি শীল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির সরকারগণের সহিত কবিগান করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন।

রামু সরকারের দুই বিবাহ প্রথম পক্ষের পুত্র হরনাথ সে পৈত্রিক ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি হরনাথ পিতৃ গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

* ১৩২০ সনে দিনাজপুর উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল তখন ৺রামু সরকার জীবিত ছিলেন। কিছুকাল হইল উক্ত নিরক্ষর কবি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ময়মনসিংহের একটী প্রধান গৌরব নষ্ট হইয়াছে কবির মৃত্যুর পর এ জেলার প্রসিদ্ধ কবি ৺বিজয় নারায়ন আচার্য্য প্রায় প্রতি আসরে কবির গুণ কীর্ত্তন করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিশপ্ত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন)

হোসেনআলী ও মতিয়াকে কারারুদ্ধ করিবার পর হইতে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের ন্যায়, বাদসা সাহেব, প্রতিদিনই একবার করিয়া উভয়ের কারাকক্ষে প্রবেশ করিতেন এবং তাহাদের তত্ত্বতালাস করিবার ছলে, কৌশলে উভয়ের অন্তরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া আসিতেন। কক্ষদ্বয় পরিদর্শনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না,—কাজেই প্রহরিগণ সর্ব্বক্ষণই বাদসার আগমন প্রতীক্ষায় শশব্যস্ত থাকিত। সদালাপ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা বাদসা সাহেব সর্ব্বদাই, তাহাদের ভীষণ অবরোধ ক্লেশের অনেকটা প্রসন্নতা সম্পাদন করাইতে সচেষ্ট থাকিতেন।

বাদসা সাহেব অনেক সময়, কথা প্রসঙ্গে, মতিয়াকে বুঝাইয়া দিতেন,—সাহাজাদার সহিত তাহার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইবার ক্ষমতা জগতে আর কাহারও নাই। সুতরাং হোসেন আলীর সহিত তাহার বিবাহের চেষ্টা ও তৎপরতা কোন দিনই সাফল্য মণ্ডিত হইবে না! অনেক সুকৃতি ফলে, কাহারও ভাগ্যে বাদসার পুত্রবধূ হইবার সৌভাগ্য ঘটে। বাদসার পুত্রবধূই সময়ে বেগমের আসন অধিকার করিয়া থাকে;—তাহার প্রতিপত্তি, ভোগৈশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ এতটা লোভনীয় যে, স্ত্রীলোক মাত্রই উহা বরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এতবড় সৌভাগ্য-সুযোগ করায়ত্ব, হওয়া সত্বেও, স্বইচ্ছায় পদদলিত করার মত ছেলে মানুষী আর কিছুই হইতে পারে না।—

বাদসার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, অশান্তির অবসান ত হইবেই না, অধিকন্তু জীবন নাশের আশঙ্কাও রহিয়াছে!—মতিয়া সমস্ত কথা নীরবে শ্রবণ করিত, এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত!

সেদিন ভোর নয়টায় বাদসা সাহেব কারাকক্ষ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া, বিকাল বেলাও আবার হোসেনআলীর কারাকক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। কক্ষের ভিতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই দেখিলেন, হোসেন ও মতিয়া একত্র উপবেশন করিয়া, অপলক দৃষ্টিতে বাক্যালাপ করিতেছে! সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বাদসা সাহেব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন, অকস্মাৎ, অগ্নিতপ্ত সলিতাবৎ, আলোড়ন জাগাইয়া, মস্তক অধিকার করিয়া বসিল। রাগে, ক্ষোভে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাক্‌শক্তি হারা হইয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—এতবড় অসম্ভব ব্যাপার তাঁহার প্রাসাদের সীমানার ভিতর যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই! তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া, এমন দুঃসাহসিক কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে, এমন লোক তাহার রাজ্যের ভিতর থাকিতে পারে, তাহা তিনি অনুধারণা করিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া শ্লেষ প্রচ্ছাদিত কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া! ঠিক করে বল, কে তোমাকে এ কক্ষে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে?—বল, এ মুহূর্ত্তেই তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, প্রতিদ্বন্দ্বীতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কচ্ছি। এ কি? চুপ করে রইলে যে, এতে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই—মতিয়া!—তার নাম প্রকাশ করবে না?

মতিয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নীরবে মস্তক হেঁট করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। কোনই প্রত্যুত্তর করিল না।

বাদসা সাহেব পাঁচ মিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন পুনরায় হোসেন আলীকে প্রশ্ন করিলেন। হোসেন আলীকেও নীরবে থাকিতে দেখিয়া, তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া গেলেন। শেষে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে মতিয়াকে লক্ষ করিয়া বলিলেন "বল্‌বে না? বেশ্‌ আমি এখনই সমস্ত কথা বের করে নিচ্ছি, এ কক্ষ হ'তে তুমি এ মুহূর্ত্তেই বের্‌ হয়ে এস, অপরাধীর বিচার, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শেষ করে,—তবে ছাড়্‌ব।"

মতিয়া আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাদসা সাহেব হোসেনের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মতিয়ার কক্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিয়াও বাদসার আদেশে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! বাদসা সাহেব তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া! মনে রেখো, তোমাদের, যে পনর দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল, তা, আজ শেষ হইয়া গেল, কাল তোমাদের বিচার শেষ করে, একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেল্‌ব। রাত্রির ভিতর তোমার মতামত ঠিক করে, রেখো।—আমার আদেশ তোমাকে আবার শুনিয়ে দিচ্ছি আমার পুত্রবধূ হ'তে যদি তুমি স্বইচ্ছায় স্বীকৃত না হও, তবে তোমার চোখের সম্মুখে হোসেনের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, তোমার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার সূত্র একেবারে ছিন্ন করে দিব! এরপর তোমাকে আরও পনর দিন কারারুদ্ধ করে রাখবো! পনর দিন অন্তেও যদি তোমার মতের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তোমাকে জীবন্ত কবর দিয়ে, এ অভিনয়ের যবনিকা টেনে দোব। বুঝ্‌লে? আর যদি স্বইচ্ছায়, পুত্রবধূ হতে স্বীকৃত হও তবে তোমাদের দুজনার বিয়ে দিবে,—দৌলতের সহিত হোসেনের বিয়ে দিয়ে দোব। এই আমার সংকল্প,—এর ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘট্‌তে দোব না।' বলিয়া বাদসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কারারক্ষক তাজমহল হোসেনের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক তীব্রকণ্ঠে ডাকিলেন "তাজমল!"

তাজমল নত জানু হইয়া, বাদসাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়া উত্তর করিল "জনাব! খোদাবন্ধ!"

বাদসা সাহেব উত্তাপতপ্ত অঙ্গার খণ্ডের মতই, আরক্ত মুখে তীব্র কণ্ঠে বলিলেন "তাজমল! তোমাকে আমি একজন বিশ্বস্ত প্রহরী বলেই এতদিন জানতুম। তুমি এতবড় বিশ্বাসঘাতক, তা—ত ধারণা কত্তে পারিনি!"

তাজমল সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "খোদাবন্দ! এ নফর চিরদিনই আপনার বিশ্বস্ত ছিল, এখনও তা'ই আছে, বিশ্বাস ঘাতকের কোন কাজ সে কখনও করেনি, আজও করেছে বলে, জ্ঞানত তা'র মনে হয় না।"

বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিলেন 'তুমি ঘোর অবিশ্বাসী ও মিথ্যাবাদী! হোসেন ও মতিয়াকে এক কক্ষে বাস কত্তে কে সাহায্য করেছে? বল, ঠিক করে বল, এ কাজে তুমি সহায়তা করেছ কি না?'

তাজমল হোসেন বাদসা সাহেবের অভিযোগ উক্তি শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিল। এক অভাবনীয় বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বদন মণ্ডলে একটা ভিতি বিপন্নভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে একান্ত বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেগম সাহেবই এই অনুষ্ঠানের নায়িকা বলে মনে হয়, এখন উপায় কি? বেগম সাহেবের নাম প্রকাশ না করলে তা'র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেই! আর বেগম সাহেবাকে এর ভিতর জড়িত করলে, উভয়কেই একই প্রকার শাস্তি ভোগ কত্তে হবে। মেয়ে মানুষের প্রাণ সহজেই গলে যায় কি না, তাই পরিণাম চিন্তা না করেই তিনি এমনি কাজে হাত দিয়াছেন। তাঁর ত দোষ নেই এতে,—মানুষ মাত্রই তাদের অবস্থা দেখলে, এমন একটা না করে থাকতে পারে না। যাক্ আমার মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন তাঁহাকে জড়িত হতে দোব না। জীবনেত কখনও মা কে দেখবার সুবিধে ঘটেনি, শৈশবেই যে মাতৃহীন হয়ে ছিলুম! তাঁকে আমি 'মা' বলে ডেকেছি, না 'মা'র' নাম আমি বেঁচে থাকৃতে ও প্রকাশ হ'তে দোব না!

বাদসা সাহেব তাজমলকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া, শ্লেষ বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন "চুপ করে রইলে যে? বল, এ কাজ তবে তুমিই করেছ।"

তাজমল নিতান্ত বিনম্র ও বিষাদিত কণ্ঠে উত্তর করিল না, এ কাজ আমি করিনি।"

বাদসা সাহেব দৃঢ় স্বরে বলিলেন "কারাগারে প্রবেশ করে, এ কাজ তবে কে করেছে? তার নাম বল, তার উপযুক্ত শাস্তির বিধান কচ্ছি।"

তাজমল নতশিরে, করজোড়ে বলিল "বাদসা সাহেব! তার নাম আমি এখন প্রকাশ কত্তে অনিচ্ছুক।"

বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে, অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিলেন "তাজমল! তুমি এতবড় বিশ্বাসঘাতক? এর শাস্তি কি হতে পারে তা—তুমি—জান?"

ভীত, ত্রস্ত, অর্দ্ধমৃতবৎ তাজমল, কম্পিত বক্ষকে অধিক কম্পিত করিয়া উত্তর করিল "তা অনেকটা জানি। আমি বিশ্বাস ঘাতক নই, ভগবানের চক্ষে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কোন কারণে তার নাম প্রকাশ কর্ত্তে আমি অনিচ্ছুক।

বাদসা সাহেব অসীম তেজের সহিত বলিলেন "এত বড় সাহস তোমার! বাদসার আদেশ অমান্য কত্তে তুমি এতটুকুন কুণ্ঠাবোধ কর না? আচ্ছা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও! এখনি ঘাতক ডেকে তোমার দাম্ভিকতার প্রতিফল দিচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দুপুর বেলাকার জ্বলন্ত তপন, তখন শীতল হইয়া, পশ্চিমের নীল সাগরে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ডুবাইয়া দিয়াছিল। ধরণীর ম্লান মুখের পানে তখনও তাঁহার ক্লান্ত করুণ শেষ দৃষ্টিটুকুন লাগিয়াই রহিয়াছিল। সেই সময় আমিনা কিয়দ্দূরে, প্রাচীরের আড়ালে লুক্কাইত থাকিয়া, তাঁহাদের সমস্ত কথাই শ্রবণ করিল। বাদসাকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সহসা আমিনা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ডাকিল "বাদসা সাহেব!"

সহসা পথিমধ্যে আমিনার আহ্বান শ্রবণ করিয়া, বাদসা সাহেব তাঁর চলন্তগতি সংহত করিলেন এবং আমিনার মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন "এ সময় তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়ে,—আমিনা!"

আমিনা নম্রকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! বিশেষ জরুরী কাজেই, আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছি। আমার এ আহ্বান উড়িয়ে দিলে চলবে না।"

বাদসা সাহেব বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা! আমি এখন খুবই ব্যস্ত, তোমার অনুরোধ পরে রক্ষা করব। তুমি তোমার কক্ষে ফিরে যাও, আমি এক ঘণ্টা পরে যাব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

আমিনা জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সব কথা শুনেছি। আপনি যে

কার্য্য অনুষ্ঠানের জন এত ব্যস্ত, হয়েছেন, তা' কয়েক মিনিট পরেও সমাধা করলে, কোন ক্ষতির কারণ নেই। আমার কয়েকটি কথা আপনাকে শুনতেই হবে, এ অনুরোধ রক্ষা করবেন না, বাদসা সাহেব ?"

বাদসা সাহেব আমিনার দিব্যরূপিনী, প্রশান্ত ধীর মূর্ত্তির প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন "বল আমিনা! তোমার কি বক্তব্য—আমার সময় যে খুবই কম, তুমি ত ছাড়বে না, বল কি বলবে।"

আমিনা তেজব্যঞ্জক স্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি যা বলব তা খুবই গোপনীয় কথা, আমার শয়ন কক্ষে আপনাকে যেতেই হবে,—যা বলব মনে করেছি, তা প্রকাশ কর্‌বার স্থান এ নয়-ই।"

বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "আচ্ছা আমিনা! চল তোমার শয়ন কক্ষে। তোমার কি গোপনীয় কথা থাক্‌তে পারে, তা'ত ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না!"

আমিনা পর মুহূর্ত্তে বাদসাকে সঙ্গে করিয়া তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া উপনীত হইল। বাদসাকে একখানা আরাম কেদারায় বসাইয়া, স্বয়ং একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, শেষে জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! তাজমল হোসেন নিতান্ত নিরপরাধী। তা'র উপর এত বড় শাস্তির বিধান কর্‌লে,—আপনার মঙ্গল হবে না,—আপনার মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত যখন আমার শুভাশুভ নির্ভর করে, এ অবস্থায় আপনাকে এ কার্য্য হ'তে, বিরত করাতে চাচ্ছি।"

বাদসা সাহেব বিস্ময়সূচক দৃষ্টি আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া বলিলেন 'কি সে জান্‌লে তুমি, সে নির্দ্দোষী ? অপরাধীর নাম প্রকাশ না করাওত একটা গুরুতর অপরাধ।"

আমিন নিতান্ত সহজভাবে বলিল "অপরাধীয় নাম প্রকাশ না করে সে তাহার মহত্ব শতগুণ বিকাশ করেছে, নিজের প্রাণ দিয়ে যে অপরকে রক্ষা কত্তে চায়, তার স্থান মর্ত্ত্যে নয়ই। তাজমল একজন সামান্য চাকর, তা'র অন্তরের বল উপলব্ধি করে, আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গেছি। আমি ঠিক জানি, সে অপরাধী নয়, এ কার্য্যে সে অপরাধী নয়, এ কার্য্যে সে সহায়তা করে নি, এর বিন্দু-বিসর্গও সে জানে না! আপনার আদেশ প্রতিপালন করেছে মাত্র।"

বাদসা সাহেব সংশয় মথিত দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "আমার আদেশ প্রতিপালন করেছে ? সে কি বলছ ? আমি ত অপর কাউকেও কারাকক্ষের সীমানার ভিতর প্রবেশ করাতে অনুমতি দেই নি! এদের আমি গোপনে কারারুদ্ধ করে রেখেছি বাহিরের লোক কেউ এর ঘুণাক্ষরও জান্‌তে পারে নি।"

আমিনা নিতান্ত সহজ ভাবে, জড়িতকণ্ঠে বলিল 'বাদসা সাহেব! আপনি ভুল কচ্ছেন। আমাকে সর্ব্বত্র বিচরণের আদেশ আপনিই প্রদান করেছেন। এ মর্ম্মে সকলের নিকট আপনি হুকুম ও প্রচার করেছেন। এ কার্য্যের আমিই নায়িকা। আপনার আদেশ প্রতিপালন করেছে বলেই, আমি কারাকক্ষের প্রবেশ পথমুক্ত পেয়েছিলুম। তাজমল এতে কিসে দোষী বাদসা সাহেব ? আমিই ভিতরে প্রবেশ করে, এদের এক কক্ষে রেখে দিয়েছিলুম, দোষী আমি, তাজমল নয়! আমার অনিষ্ট হবে বলেই তাজমল আমার নাম প্রকাশ করে নি দেখুন এখন বাদসা সাহেব! তাজমলের অন্তর কত বড়, কত উঁচু।"

আমিনার স্বীকার উক্তিতে বাদসা সাহেব বিস্ময়াশ্চর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্ময়াভিভূতবৎ কয়েক মুহূর্ত্ত আমিনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "আমিনা! তুমি,—তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে সাহসী হয়েছ ?"

আমিনা বাদসার হাত ধরিয়া আসনে বসাইয়া বলিল "বাদসা সাহেব! আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নই—ই যা'র প্রাণ আছে, অন্তরে স্নেহ আছে, সে কখনও এমন কাজ না করে থাক্‌তে পারে না! বাদসা সাহেব! আমি স্বচক্ষে তা'দের অবস্থা দেখে, একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম, কী অসীম বন্ধনে এদের ছুটী প্রাণ বাঁধা রয়েছে, কী স্নেহময় তন্ময়ত্ব নিয়ে এরা মিলনের আশায় দিনের পর দিন কাটায়ে যাচ্ছে, বাদসা সাহেব! তা' যদি অনুভব কত্তে চেষ্টা কত্তেন, তবে এদের এই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য এতবড় অনুষ্ঠান কত্তে কখনও অগ্রসর হতেন না! সাহাজাদার সাথে মতিয়ার বিয়ে দিলে, সাহাজাদা কোন দিনই সুখী হতে পারবে না! এ দিকে দৌলতের অবস্থা ভীতিপ্রদ

হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা'ত আপনার চিন্তার অতীত বলেই মনে হয়! এর জন্য একদিন সকলকেই অনুশোচনা কত্তে হবে। আমি যা করেছি, তা' অন্তরের স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায়ই করেছি,—আপনার কোপ-দৃষ্টিতে পড়তে হ'বে এরূপ চিন্তা করার অবকাশ তখন পাই নি।"

বাদসা সাহেব ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ব'ললেন ' আমিনা! আমি এ রাজ্যের বাদসা, তোমার উপদেশ নিয়ে আমি রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা কত্তে ইচ্ছা করি না, এ বিরুদ্ধাচরণের ফল কি হবে তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ? তোমাকে আমি ভালবেসেছিলুম এখনও বাসি, তা'র জন্য মনে করো না, তোমার অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দেবো! সামান্য অপরাধে, আমি আজ ষোল বছর হ'ল আমার প্রাণ প্রতিমা, দলিয়া বেগমকে, ছয় মাস গর্ভাবস্থায়, জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে ছিলুম! আজও তাঁর স্মৃতি মনে করে, কত রজনী বিনিদ্রিত অবস্থায় কেটে দিচ্ছি। তোমাকেও এমনি একটা শাস্তি দিতে কণ্ঠাবোধ করব না! তাজমল দেখছি নিতান্তই নির্দ্দোষী, তা'কে আর তা'হলে কোন শাস্তি ভোগ কত্তে হবেই না!"

সহসা কড়কড় শব্দে বাজ হাঁকিলে মানুষের শিরায় শিরায় সেই ধ্বনি, যেমন কাঁপনের ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তোলে, বাদসার কথাগুলিও আমিনার শিরায় তেমনি ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তুলিল! আমিনার আরক্ত মুখ পুনশ্চ বিবর্ণতর হইয়া গেল! তাহার বক্ষ মথিত করিয়া নেত্র-অশ্রু-স্পন্দিত হইয়া আসিল! পাছে তাহার সেই দুর্ব্বলতাটুকুন ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে আমিনা, আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ স্খলিত বাক্যে, দৃঢ়স্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! বেগমের অভাবনীয় পরিণামের ইতিহাস আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। সে নৃশংস হত্যার ফলে, রাজ্যের অনেকেই আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে, শ্রদ্ধা বলে একটা জিনিষ, অন্ততঃ স্ত্রীলোকদের নিকট আপনি হারায়ে ফেলেছেন! বাদসার বেগম হওয়াটাকে এখন অনেকেই "মরণ নিয়ে খেলা করা" বলেই ধারণা করে! আমাকে জীবন্ত সমাধি দিবেন? এ-ই-ত আপনার শক্তি বিস্তারের শেষ সীমানা! বেশ, তজ্জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। খাঁচা বন্ধ পাখী বধ করে,—ব্যাধ যেমন কোন দিনই, কৃতিত্ব অর্জ্জন কত্তে পারে না,—অসহায়া স্ত্রীলোক বধ করে, যেরূপ বাদসার শক্তির উৎকর্ষতা কোন দিনই প্রমাণিত হ'তে চায় না! যা করেছি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি, ফল কি হবে তা'ত জানাই ছিল, আমি শক্তিহীন, প্রতিকারের সামর্থ কোথায়? তবু জানবেন, আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুকে বরণ করাটা খুবই শ্লাঘনীয় কাজ বলে মনে করি।"

বাদসা সাহেব তিরস্কারের সহিত উচ্চৈস্বরে বলিলেন "আমিনা! আমার ভোগ ও তৃপ্তির সামগ্রী সংগ্রহ করার পূর্ণ শক্তি আমার রয়েছে, এর বিপক্ষে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই বলেই,—রাজ্যের সকলেই মস্তক অবনত করে আমার আদেশ পালন করে থাকে! মতিয়াকে যখন পুত্রবধূ করবার বাসনা জাগরিত হয়েছে, তখন তোমার ঐ বক্তৃতার সূক্ষ্মতন্ত্রী ধরে আমি কখনও আপনাকে পরিচালিত কত্তে পারব না। যতটা আমি বুঝতে পেরেছি, আমার মনে হয়,—এদের বিবাহ ব্যাপারে তুমি আমার সহায় না হয়ে, হয় ত নানা বাধার সৃষ্টি করবে! এ অবস্থায় তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক্‌লে, এ বিবাহ অনুষ্ঠানের পক্ষে তুমি পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধক এনে দাঁড় করাবে! আজ হতে তুমি বন্দী, এ কক্ষেই তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে! এদিকের সমস্ত গোলযোগ থেমে গেলে, তোমার মুক্তি হবে! পরে আমার ইচ্ছা হলে, তোমাকে বেগমরূপে গ্রহণ কত্তে পারি, সে বিষয়ে তোমার মতামতের উপর নির্ভর করে চলার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

আমিনা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "আমি বন্দী? তাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই, তবে বাদসা সাহেব! এটা বিশেষ করে জেনে রাখবেন, -ভালবাসার রাজ্য স্নেহের-বন্ধনেই সুগ্রথিত, অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় না! জোড় করে বেগম করে নেওয়া'র ফলে,—প্রেমের অমৃতময় পীযুষধারা পান করবার সুবিধা কোন দিনই, কারো ভাগ্যে ঘটে উঠে না।"

বাদসা সাহেব তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দৃঢ় স্বরে বলিলেন "বাদসার নিকট সে সমস্তও অনায়াস-লব্ধ-বলে মনে হচ্ছে।" বলিয়া বাদসা সাহেব সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পর মুহূর্ত্তে বাদসার আদেশে, আমিনাকে, সেই কক্ষেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যিকের পত্র

শ্রীহরিঃ

বান্ধব কুটীর—ঢাকা।
২৯শে জুলাই, ১৯০৯

চিরস্নেহাস্পদেষু—

আমি ক্রমে আপনার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। দুইখানি পত্রই আপনার শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ। আজি এক সঙ্গে তাহার উত্তর দিতেছি।

আমি কল্য প্রাতে × × সাহেবের কাছে যাইব। আপনার ঢাকার বিবরণ সম্পর্কে কল্য তাঁহার কাছে আমি বহু কথা বলিব। তারপর আমাদিগের ভাগ্য।

আপনি ময়মনসিংহ শাখা সাহিত্য পরিষৎকে আমার শত ধন্যবাদ জানাইবেন। যদি আমার নিকট আপনারা Proceeding পাঠান, তাহা হইলে আমি আপনাদের সভাপতি মহাশয়কে পৃথক্ পত্রদ্বারা ধন্যবাদ জানাইব।

আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি সেই মূর্চ্ছার পর হইতে অতি ধীরে ধীরে সাবধানে চলিতেছি। প্রেসে একখানি পুস্তক দিয়াছি, তাহা লইয়া এক বেলা কিছুক্ষণ কার্য্য করি; অপরাহ্নে কদাচিত দুই একখানি পত্র লিখি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন, আমি যেন আমার পুস্তকগুলি সমাপন করিয়া যাইতে পারি। মনুষ্যের আগে চৈতন্য থাকে না; শেষে চৈতন্য হয় সময় হারাইয়া।

আমার প্রতি আপনার ভালবাসা অথবা ভক্তি অসীম। আমি প্রতিদানে কিছুই করিতে পারি না, ইহা আমার বড়ই দুঃখ। এখনও আশা আছে, ঈশ্বরের কৃপায় আরও কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিব, এবং প্রীতিস্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান হইব।

আপনি × × মহাশয়দিগকে এতদিনে জানিলেন, আমি তাহাদিগকে বহুদিন হইতেই জানি। তাঁহারা একবার আমার নিকট হইতে কিছু উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে হৃদয়ে বিদ্বেষ থাকে, সেখানে লোকে উপকারও গ্রহণ করে, ইহা আমি জানিতাম না।

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক কল্য রাত্রিতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। দেখিলাম এবার আমার প্রতি একটুকু অনুকূল। ইহা আপনারই যত্নের ফল।

আপনি আমার জীবন চরিতের কিছু কিছু বিবরণ চাহিয়াছেন। ইহা দিয়া কি করিবেন, আমাকে জানাইবেন, আমি সময়ে সময়ে কিছু কিছু লিখিয়া পাঠাইব।

মাঝে মাঝে আপনি পত্র লিখিবেন আপনার পত্র পাইলে একটুক্ আনন্দ বোধ হয়।

স্নেহাবদ্ধ আশীর্ব্বাদক—
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

পুঃ আপনার স্বাস্থ্যের কথা মাঝে মাঝে লিখিবেন।

শ্রীহরিঃ শরণম্　　ঢাকা
২৫শে বৈশাখ, ১৩১৬

চিরস্নেহাস্পদেষু—

প্রিয় কেদার বাবু,

এইমাত্র আপনার স্নেহপরিপূর্ণ দীর্ঘপত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পত্রের সঙ্গে পুস্তকের একটা প্যাকেট পাইলাম, তাহা এখন তক খুলি নাই। পত্রে আপনার শারীরিক কাতরতার বহু কথা লিখিত আছে। তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াই ফেরত ডাকে পত্রের উত্তর দিলাম। আপনি চিকিৎসার একটুক্ ভাল বন্দোবস্ত করুন। ইহাতে অর্থব্যয় হইলে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না; জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার হাতে অর্থ আসিবে। এ কথা আমার বাক্যের উপরই আপনি বিশ্বাস করিবেন। আপনার History of the Dacca District বিষয়ে আমি × × সাহেবের কাছে যত্ন করিতে ত্রুটী করিব না। আপনাকে অদ্যই আমি ঢাকা আসিতে বলিতেছি না। কিন্তু যখন আপনার প্রবৃত্তি হইবে, আপনি একটুকু পোষ্টকার্ড দ্বারা আমাকে সংবাদ দিয়া নিঃসঙ্কোচে "বান্ধব কুটিরে" চলিয়া আসিবেন। আপনাকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আপনার যদি ৫০বার আসিতে হয়, তবে বান্ধব কুটীরে আসিতে কোন সঙ্কোচ মনে করিবেন না। এ গৃহকে আপনার অকৃত্রিম আত্মীয়ের গৃহ মনে করিবেন। আর আর কথার উত্তরে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। আপনি যে যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি তাহা করিবেন। আমার হাতে আপনার যে যে কার্য্য আছে আমি তাহা যথাসম্ভব অনুষ্ঠান

করিতে ক্রটী করিব না। আপনার শরীর একটুকু সুস্থ ও সবল হইলে আমি ময়মনসিংহ যাইতে প্রস্তুত আছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাস্থ্য সম্মানের সহিত দীর্ঘজীবী হউন।

শুভাশীঃ
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীহরিঃ শরণম্।

ঢাকা---বান্ধব কুটীর।
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬

প্রীতিভাজনেষু--

আপনি ময়মনসিংহ গিয়াছেন অবধি আর আপনার কোন সংবাদ পাই না। কেমন আছেন, তাহা জানি না। এবারে আর পত্রাদিও লিখেন না। আপনার "ঢাকা জেলার ইতিহাস" সম্পর্কে আপনাকে আমার কএকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

অল্পদিন হইল, Romance of Eastern Capital নামে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। ঐ পুস্তকে বিক্রমপুরের বিস্তর কথা এবং সোণার গাঁয়ের বিস্তর কথা আছে। আপনি আপনার গ্রন্থে ঐ কথা নিবদ্ধ করেন নাই কেন? ঐগুলি যত্নপূর্ব্বক নিবদ্ধ করা উচিত। আপনার গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, ইহাই জানা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপনি আমার এ কথাটার উত্তর আমাকে সত্বর দিবেন।

পত্রোত্তরে আপনার কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

কিশোরগঞ্জে সাহিত্য সম্মিলন

[শ্রীভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী এম্, এ]

বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের দান ক্ষুদ্র নহে! ময়মনসিংহ গাথায়, কৃষক কবিগণ যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও কবিত্বের মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতের সাহিত্যে তাহা বিরল। যাহা হউক সে বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। তবে এখনও পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে অনেক নীরবে বাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কিশোরগঞ্জের পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলন আজ ছয় বৎসর তাঁহাদের মিলনের ক্ষেত্র হইয়াছে! নারায়ণদেব চন্দ্রাবতী বংশীদাসের স্মৃতি-জড়িত, কেদারনাথের মাতৃভূমি কিশোরগঞ্জ যে এ মিলনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৫ই ও ১৬ই আষাঢ় এই সম্মিলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। খুব অল্পদিনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সাহিত্যিক-মহাপূজা আশাতিরিক্ত সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন স্কুল-গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক উপস্থিত হইতে না পারিলেও পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলস্থ অনেক দরিদ্র বাণী সেবক মাতৃপূজায় যোগদান করিয়াছিলেন।

১৫ই আষাঢ় শনিবার অপরাহ্নে ৫ ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাগৃহ পত্রপুষ্প-শোভিত হইয়া বহুলজন সমাগমে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রথম সুগায়ক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায় বি, এল, মহাশয়ের নেতৃত্বে কতিপয় বালিকা বেদোক্ত "ওঁ পিতানোহসি' ইত্যাদি প্রার্থনাটি গান করিলে, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এর সমর্থনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মালা-বিভূষিত হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটি বিবরণ প্রদান করেন। জীবিত ও স্বর্গীয় সাহিত্যিকগণের নামোল্লেখ তিনি করিয়াছিলেন। এই প্রকার নামোল্লেখ অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য, তথাপি বলিতে হইবে সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে আর একটুক অবহিত হইলে ভাল হইত। কিশোরগঞ্জে বর্ত্তমানযুগে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ হয় "আর্য্য-গৌরব" হইতে তাঁহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরীর নামোল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এক যুগের ও পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী, অন্তঃপুর চারিনী হইয়া—স্ত্রী শিক্ষার বাহুল্য তখন ছিল না—"সতী-শতক" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরো অনেক নাম তিনি করেন নাই, এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কতিপয় নাম করিয়াছেন। যাহা হউক এই ক্রটিটুক বাদ দিলে অভিভাষণ মন্দ হয় নাই।

যাহা হউক, বঙ্গভাষার বর্ত্তমান কথা সাহিত্য সম্বন্ধে

তিনি যে সময়োচিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাহার বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। আমরা এইখানে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

* * * *

"বস্তুতন্ত্র সাহিত্য লইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তুমুল কলহের সূত্রপাত হইয়াছে। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের অন্যদিক লইয়া কলহ দেখিতে পাই না, কিন্তু নর-নারীর যৌন সম্মিলন প্রশ্ন লইয়াই যত অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যের বিরোধী ব্যক্তিগণ সমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া বলি, যে হাওয়া দিগন্ত হইতে ক্রমশঃ প্রবলতর বেগে বহিয়া আসিতেছে তাহার গতি সর্ব্বতোভাবে রোধ করার চেষ্টা ঐরাবতের জাহ্নবী তরঙ্গ রোধের চেষ্টার মত নিষ্ফল হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ঐ ঝড়ো হাওয়া আসিতে দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইবেন না। উহা যাহাতে কোনও পূতিগন্ধ বহন করিয়া আনিতে না পারে, শুধু তাহারই চেষ্টায় শক্তি প্রয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐই হাওয়া বহিয়া নিঃশেষ হইয়া যাউক; ইহকাল-সর্ব্বস্ব ভোগেচ্ছামূলক এই হাওয়া জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ ও কর্ম্মবাদী ভারতের হৃদয়ে কোনও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিবে না।"

"ইউরোপের মনীষা সম্পন্ন বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকগণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের শক্তিশালী লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহারা নরনারীর যৌন সম্মিলনের প্রশ্ন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইউরোপেও যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ সমুত্থিত হইয়াছে তাহা সুধী-সমাজ অবিদিত নহেন। ইউরোপের সামাজিক সমস্যায় ঐ যৌন সম্মিলনের প্রশ্ন পরীক্ষিত ও আলোচিত হওয়ার অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের আদর্শবাদী জীবাত্মা ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদী জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, ইহা স্মরণ রাখিতে আমি বস্তুতন্ত্রবাদিগণকে মিনতি করিতেছি। বঙ্গদেশেও সামাজিক দুর্নীতি অপসারণের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত বস্তুতন্ত্রবাদিগণ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখনী চালনা করিতেছেন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সাধু; তাঁহাদিগকেও আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যে রসের আলোচনা করিয়া বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় নির্ব্বিকার থাকেন এবং শুধু রসটারই ভালমন্দ বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করেন, সেই রসটারই যুবকযুবতীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে উঁহারা তাহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া নিজদেহে বিষক্রিয়া ঘটাইবার হেতু জন্মাইতে পারেন। এই যৌনসম্মিলন সম্বন্ধে লিখিত আধুনিক বস্তুতন্ত্র সাহিত্য হিন্দুর পারিবারিক বন্ধন, হিন্দুর সামাজিক পবিত্রতার আদর্শকে আঘাত করিতেছে; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ইহাতে যে দেশময় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

তথাপি যাঁহারা সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য এইরূপ সাহিত্য লিখিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সাধুতার জন্য তাঁহারা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কিন্তু একদল লেখক যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সম্ভোগকেই বড় বা বাধাবিমুক্ত করিতে চাহেন। ইঁহাদের নিন্দার শেষ নাই। যে সাহিত্য দ্বারা লালসা বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে বা পাপের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া উঠে, তাহা হলাহল অপেক্ষাও ভয়ানক। কিন্তু যে সাহিত্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে এবং পাপের প্রতি সহানুভূতি না জাগাইয়া পাপীর প্রতি সহানুভূতি জাগায় তাহা আদর্শবাদীই হোক বা বস্তুতান্ত্রিকই হোক, তাহা সাহিত্য-সমাজে বরণীয়।"

* * * *

সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, টি, মহাশয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণী পাঠ প্রসঙ্গে কয়টি সুন্দর ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক এই সম্মিলনী বর্ষে বর্ষে নূতন স্থানে আহূত হইলে সাহিত্যিক ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে এবং পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ ঘটে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই সম্মিলনীর মুখ-পত্ররূপে "ময়মসিংহ বার্ষিকী" অভিধেয় একখানা বার্ষিক পত্রিকা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হউক। প্রথম খণ্ডে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গুলির কার্য্য-বিবরণী থাকিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিবে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ও সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধাবলী। দুইটি প্রস্তাবই সমীচীন হইয়াছে। দুইটিকেই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের

প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি আগামী বর্ষে অপর কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এই সম্মিলনী আহ্বান করিবেন। গৌরীপুর, বাজিতপুরে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। নেত্রকোণার সাহিত্যিকগণও আহ্বান করিতে পারেন।

এই সভায় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সরসীবালা বসু ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশক এক প্রস্তাব গৃহীত হইলে, রচনা পাঠ আরম্ভ হয়। প্রথম শ্রীযুত দুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী "প্রাচীন ভারতে বিচার পদ্ধতি" শীর্ষক গবেষণামুলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার "অসীমহারা" নামে ছোট্ট একখানা কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা অরুণা দেবীর লিখিত "কথা সাহিত্যে চারুচন্দ্র" অভিধেয় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটীতে চারুবাবুর কথা সাহিত্যে উৎকর্ষ নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীমতী পূর্ণিমাপ্রভা রায়ের প্রবন্ধ "মুক্তির পথে", শ্রীযুত জানকীনাথ দত্তের কবিতা "সন্তাপিতা" শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কবিতা "শেষ চিকিৎসা", শ্রীযুত আবদুল খালেক ভূঞার "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য" পঠিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। লেখক নিরপেক্ষভাবে দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, এবং বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার মৌখিক অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণে সন্ধ্যাভাষার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস তিনি সুন্দররূপে প্রদান করেন। ভাষার লালিত্য, চিন্তাশীলতা ও বলার ভঙ্গীতে তাহা অনুপম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায় একটি সুমধুর গান গাহিলে সেইদিনের মত সভার কার্য্য ভঙ্গ হয়।

পরদিবস বেলা সাত ঘটিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায় "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে সভার উদ্বোধন করেন। সেইদিনও অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। শ্রীযুত গগনচন্দ্র রায়ের "দ্রোহী" শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র দাসের "রাষ্ট্রভাষা" পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়ের কবিতা "দেশের বাড়ী চল" ইত্যাদির নাম উল্লেখ যোগ্য। স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "যৌবন" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকান্ত চক্রবর্ত্তী "শরচ্চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধে উপন্যাস সম্রাটের বিশিষ্টতার কথা নিপুণভাবে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ "শিক্ষা ও সাহিত্য" চিন্তাশীলতায় ও শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রায়ের কবিতা "বঙ্গবন্দনা" ছন্দ সম্পদে অতুলনীয় হইয়াছিল। অতঃপর পাঁচ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ অসীমকুমার চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের 'নগর লক্ষ্মী' কবিতাখানা সুন্দররূপে আবৃত্তি করে। এই সময় সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুললিত স্বরে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা আবৃত্তি করেন। দেবেন্দ্রনাথের "মল" দ্বিজেন্দ্রলালের "সুখ মৃত্যু" রবীন্দ্রনাথের "ফাঁকী" সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তৎপর কিছু বাদানুবাদের পর শ্রীযুত সুধাংশুভূষণ রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের পথের দাবী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। অতঃপর সুরসিক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায় অতুলপ্রসাদের "আমরি বাঙ্গালা ভাষা" গানটী মধুর ভাবে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন ও তৎপর সভা ভঙ্গ হয়। সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ ইহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আগামী বর্ষে আশা করি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের অপর কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এই সম্মিলনটি আহ্বান করিবেন। তাহা হইলেই প্রকৃত সাহিত্যিক-মিলন ঘটিবে।

সহিত্য সংবাদ

আগামী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কলিকাতা ভবানীপুরে সরস্বতী পূজার সময় সম্পন্ন হইবে। এবার মফস্বলের সাহিত্যিকগণ স্বীয় আবাসে বাণীপূজায় অঞ্জলি দান করিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত।

কলিকাতা হইতে যথা সময়ে ব্লক আসিয়া না পৌঁছায় আমরা চৈত্র সংখ্যায় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্লক প্রদান করিতে পারি নাই। এই সংখ্যায় মুখপত্রে তাহা প্রদত্ত হইল।
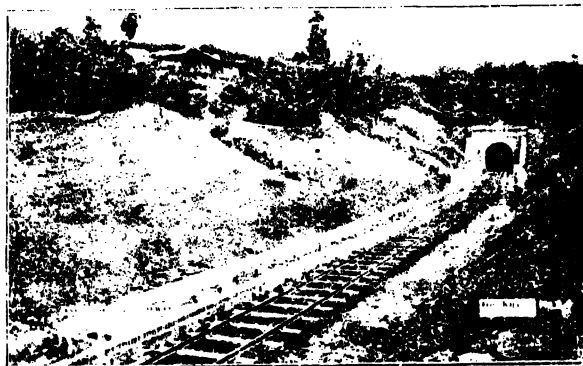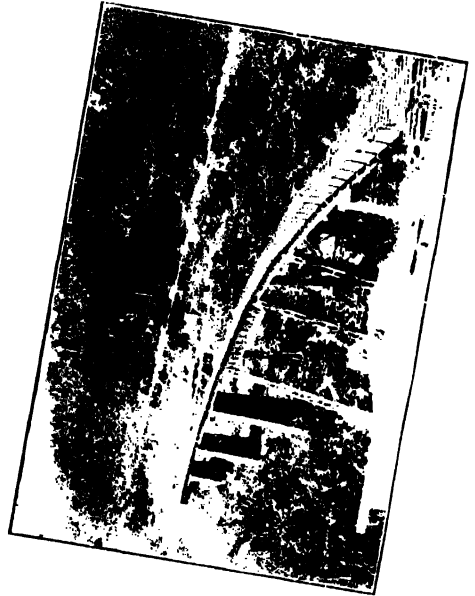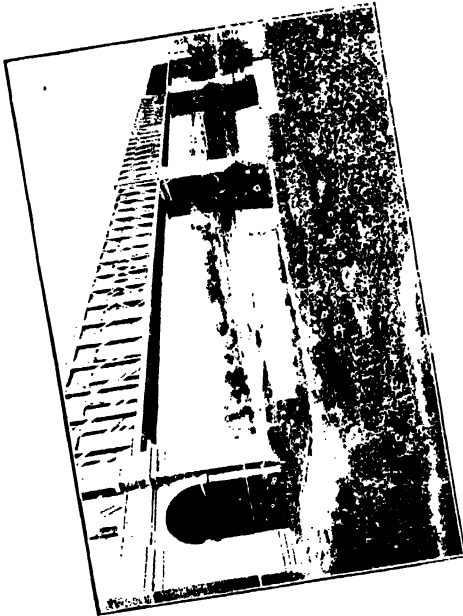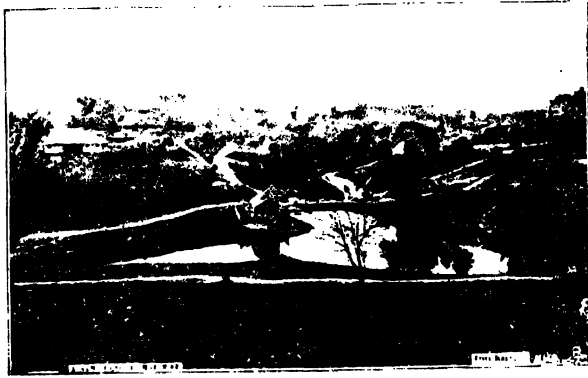
আসামের দৃশ্য।

সপ্তদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩৩৬। ষষ্ঠ সংখ্যা।

মুক্তির পথে

(শ্রীপূর্ণিমা প্রভা রায়)

মানব ছুটিয়াছে—সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছুটিয়াছে অনন্তের পানে—মুক্তির সন্ধানে। মানুষ জন্মিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই এক নূতন আলোকের সন্ধানে, এক মহান্ সাধনার উদ্দেশ্যে অনুধাবন করিতে চায়। জন্মিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই মানব-প্রাণে এক অজানাকে জানিবার, অচেনাকে চিনিবার স্পৃহা অঙ্কুরিত হয়। মানবের শিশু-প্রাণ, যখন বহির্জ্জগতের সকল প্রকার আবর্জ্জনার সংস্পর্শ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে, যখন তাহা কেবল এক অজানা আস্বাদের অনুভূতিতে আনন্দরসে পরিপ্লুত থাকে তখন হইতেই সে তাহার বিকাশের জন্য, উদয়ের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, ভবিষ্যতের আলোকের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। সুপ্তির মোহপাশ হইতে মুক্তির অমৃতস্পর্শ লাভের জন্য মানব-প্রকৃতির এই সহজাত অভিযান, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই যে অজ্ঞেয়কে জানিবার, অপরিচিতকে চিনিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি ইহাই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য, এখানেই উহার স্বাতন্ত্র্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে, নিত্য নূতনের সংস্পর্শে মানব প্রাণে এই অজ্ঞাতকে ধরিবার ক্ষুধা আরও বলবতী হইতে থাকে।

মানবের জ্ঞান পিপাসা অনন্ত। এই জ্ঞান-পিপাসাই মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। অখিলের সহিত মিশিতে যে অজেয় অতৃপ্ত বাসনা, তাহা একদিনে, এক যুগে, এক জীবনে পরিপূর্ণ হয় না; তাই যুগে, যুগে, মানুষ এক শাশ্বত কামনা লইয়া পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হয়। যতদিন না মানুষ তাহার ইপ্সিত কে লাভ করিতে পারে, অনন্তের বক্ষে আপনার 'শান্ত' স্বভাব কে বিসর্জ্জন না করিতে পারে, আত্মাভিমানকে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত না করিতে পারে ততদিন তাহার মুক্তি কামনার অবসান হয় না। ভারতের অতীতের ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠা, মুক্তিব্রতের পুণ্য গাথায় পূতোজ্জ্বল রহিয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকী, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, অত্রি প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণ মুক্তি সাধনা করিয়া মহামানবতার যে জীবন্ত-জলন্ত আদর্শ বিশ্ব-বাসীর সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই যথার্থ মুক্তি-সাধনার আদর্শ। ভারত তাহার সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভ্রান্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন অলক্ষ্যের পানে ছুটিয়াছে মুক্তির পথে ছুটিয়াছে কি? মানব প্রকৃতির যে মুক্তি পথের সহজাত বিজয় অভিযান তাহা কি এদেশবাসীর স্বভাব ধর্ম্ম হইতে সরিয়া যায় নাই? সে কথা কে বলিতে পারে? কেহ কেহ এই আধ্যাত্মিক মুক্তির কথায় বিরাগ ভাজন হইতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কে বাদ দিলে জীবনের অবশিষ্ট কি থাকে? যদি কেহ বলেন "আধ্যাত্মিকতা" মানুষের বহির্জীবনকে খাট করিয়া রাখে, বহির্জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিয়া তুলে, সে কথা স্বীকার করিতে পারি না। "আধ্যাত্মিকতা" অনুশীলন শীল ভারতীয়

আজিকার দৈন্যের ইতিহাসই ত ভারতের বড় ইতিহাস নহে। সে দিনের আধ্যাত্মিক ভারত, শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে কোন ক্ষেত্রেই বিশ্ববাসীর পশ্চাতে ছিল না, পরন্তু সে দিন তাহার স্থান ছিল বিশ্বের শীর্ষ দেশে। কিন্তু আজ, ভারত তাহার আদর্শ হারাইয়া বৈদেশিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আপনার প্রাণ ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাণ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া একটা জাতি কখনও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। জাতির জীবনী শক্তির উন্মেষ না হইলে বিশ্ব-সম্মুখে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। ভারতবাসী তাহার প্রাণধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া তার স্বাভাবিক গতি স্ফূর্ত্তি হারাইয়াই তাহার উদয়ের পথ, আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ ভুলিয়া বৃথা বাক্ বিতণ্ডায় শক্তির অপচয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহা জাতির জাগরণের শুভ লক্ষণ বুঝিতে পারি না। ইহাতে ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যতদিন ভারত আধ্যাত্মিকতায় স্থিরবিশ্বাসী ছিল, যতদিন ভারত আত্মার উন্নতি কামনায় যথার্থ মুক্তি পথের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, ততদিন বিশ্বরাজ্যে তাহার একটা বিশেষ সম্মান, বিশেষ স্থান, বিশেষ অধিকার ছিল, কর্ম্মক্ষেত্রে তখন বিশ্ব প্রসারী ছিল। ভারতের প্রতিভা তখন সর্ব্বতোমুখী ছিল। ভারত তখন জ্ঞানের বিমল ভাস্করে বিশ্বাকাশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত কিরণ বিকীরণ করিতেছিল! আজ ধর্ম্মহারা পথভ্রষ্ট জাতি হয়ত সে দিনের গৌরবময় কাহিনী স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনিতে পায়।

নদীস্রোত যেমন চিরদিন তার গতি পথে একভাবে চলিতে পারে না, মুক্তির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বুঝি ভারতীয় জাতি তাহার মুক্তির পথে, বিকাশের পথে, বাধা-প্রাপ্ত হইয়া অনন্তের সন্ধান হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে। অতীতের ইতিহাসে ভারতীয় নরনারী যে একটি সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ নিখুঁত সুন্দর ছবি আজিও আমাদের নয়ন-মনকে বিস্ময়োৎফুল্ল করিয়া তুলে তাহা বস্তুতঃই এক গৌরবময় চিত্র। বৈদেশিক সংঘাতে সে উজ্জ্বল চিত্র বিমলিন করিতে পারে নাই। আধুনিক ভারত সকল দিক দিয়াই আপনাকে হারাইয়া স্রোতের মুখে চলিয়াছে কে তাহার গতিরোধ করিবে? কতক পরানুকরণে, কতক আত্মবিস্মরণে, ভারতীয় জাতি অধঃপতনের মুখে পা দিয়াছে এই বিস্মৃতি এই আত্মদৈন্য তাহাকে পরিহার করিতেই হইবে নতুবা মানবের চিরবাঞ্ছিত মুক্তি-পথের সন্ধান সে করিতেই পারিবে না। অন্ধকার রজনী কাটিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ অরুণালোকে প্রদীপ্ত হইয়াছে, উষার নবীন আলো দিকে দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাখী তার কণ্ঠ খুলিয়া মুক্তির রাগিণীতে আকাশ বাতাস মুখর করিয়া তুলিয়াছে, ফুল তার সৌন্দর্য্যের ডালি লইয়া মুক্ত প্রাণের সুবাস বিতরণ করিতেছে, প্রভাত সমীরণ তার শীতলতা, সজীবতা বিস্তার করিতেছে। এ শুভ মুহূর্ত্তে ভারতকে জাগিতেই হইবে, মানবের চির অভীপ্সিত মুক্তির পথ দেখিয়া লইতেই হইবে। জাগিবার এ শুভ মুহূর্ত্তে ভারত জাগিবেই! জাতির সম্মুখে আজ বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র। কি দেশ, কি সমাজ, কি ধর্ম্ম সকল দিক দিয়াই আজ এক মহান্ কর্ম্মের সূচনা দেখা দিয়াছে। সকলকেই আজ কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। হয়ত নানাদিক দিয়া আজ জাতিকে সংস্কৃত হইতে হইবে। সংস্কৃত হইতে হইবে কিন্তু আপনাকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'রামকে' 'রাম রাখিয়াই সংস্কার করিতে হয় 'মরা' বানাইয়া নয়। ভারতকে সংস্কার করিতে হইবে ভারতেরই আদর্শে। ইউরোপে রূপান্তরিত করিলে ভারতের আত্মদৈন্যই প্রকটিত হইবে। ভারতীয় আদর্শ ও সভ্যতাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া জাতিকে আজ নূতনের "মহামিলন" এর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন "বিদেশ হইতে কতগুলি কথা আমদানী করিলেই সমাজ সংস্কার হয় না সে কথা যত উচুঁ দরেরই হউকনা কেন, তাহা সমাজের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। যে পথে চিরকাল আমাদের সমাজ সংস্কার হইত, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে।" সত্যই দেশ আজ শুনিতে চায় মরমের বাণী! বাহিরের ভূয়া কথায় দেশে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না—প্রাণের রাগিনী ধরা দেয় না। তারপর আজ আমাদের সম্মুখে ইউরোপ যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভোগের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে তাহাকে বরণ করিতে যাইয়া 'মরণ' কে ডাকিয়া আনা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইউরোপ যে জড়-বিজ্ঞানের

—ব্যক্তিগত ভোগৈশ্বর্য্যের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে এদেশের প্রাণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং তাহার অনুসরণে জাতির অকল্যাণ ঘটিবারই সম্ভাবনা। ইউরোপ যে জড় বিজ্ঞানের—ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় ভোগের অনুসরণ করিয়া জীবনের এক আদর্শ খাড়া করিয়াছে, তাহাতে ইউরোপকেই দ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে যাইতে হইতেছে, কাজেই বলিতে হয়, জাতিকে আজ পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়া জীবনী শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে হইবে! ভারতের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই; যুগে যুগে, ভারত তাহার আপন বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই—ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লব হইতে আত্মোদ্ধার করিয়াছে! এ যুগেও ভারত আপনার বৈশিষ্ট্য, আপনার স্বাতন্ত্র, রক্ষা করিয়া -- আপনারাই মন্ত্র-শক্তিতে আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হইবে। *

প্রতিভা ও তন্ময়তা

[শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়]

প্রতিভা ও তন্ময়তার ভিতর অনেক সময়ই একটী যোগসূত্র বর্ত্তমান। জগতের সর্ব্বপ্রকার মনীষীদের শতবিধ চরিত্র বৈশিষ্ঠের ভিতর ইহা অন্যতম। মানব জীবনের সাধনা ধারণা ও সত্য বিকাশের উপর তন্ময়তার প্রভাব যেমন কৌতূকাবহ তেমনি অপরিমেয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগপ্রবর্ত্তক সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ করিয়া ইহারই দান। ইহার ভিতর দিয়া মানুষ যে কোন বিষয়ের অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তার সত্যরূপ উন্মোচন করিয়া দেয়।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষী নিউটন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি তার সমস্ত সত্য-উদ্ভাবনের জন্য নিজ অনন্য সাধারণ তন্ময়-প্রবণতার কাছে ঋণী। তাহারই সম্মুখে একটী আতা বৃক্ষ হইতে ভূপতিত হইল আর তিনি আত্মভোলা হইয়া সত্যিকার কারণ নির্দ্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারই পতন ক্রিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই ঐকান্তিক তন্ময়তার ফল স্বরূপ উদ্ভাবিত হইল মধ্যাকর্ষণ শক্তি।

সক্রেটীসের জীবনেও এমনি একটা প্রভাব দেখা যায়। কোন একটা বিষয়ের যথার্থরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে তিনি তাহার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক দিবস সমভাবে আত্মমগ্ন হইয়া থাকিতেন। তন্ময়তার উন্মাদনায় এই সময়ের জন্য তাহার কোন প্রকার ক্ষুধা বা তৃষ্ণাবোধ থাকিত না।

প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ গেলাস্ রচনা ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে অব্যাহত থাকিতে ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে এই কার্য্যে রত হইয়া তিনি সন্ধ্যার অন্ধকার দর্শনে আশ্চর্য্য হইতেন, আর রাত্রের প্রথম মুহূর্ত্তে বসিয়া ভোরের কলরবে সচকিত হইয়া উঠিতেন। বস্তুতঃ তন্ময়তার ভিতর তাহার বাহ্যিক অনুভূতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ইতালীয় কবি দান্তের তন্ময়-প্রবণতা আরও বিস্ময়কর তিনি যে কোন বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহার মন কেন্দ্রিভূতভাবে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িত। চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহে শরীর ও মন যুগপৎ এমনি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত যে সংসারের অন্য কোন ব্যাপারে আর তার এতটুকু সম্বিৎ থাকিত না। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে সহরের রাজপথ দিয়া একটী বিরাট মিছিল বাহির হওয়ার কথা ছিল। অন্য সকলের মত কবিবর দান্তেও তাহা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন ও সুবিধার জন্য কোন পুস্তকালয়ের সুরম্য গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেইখানে হঠাৎ তিনি এমন একটী প্রিয় বই পাইয়া বসিলেন যাহা অনেক দিন যাবৎ তাহার অনুসন্ধানের জিনিষ ছিল। পর মুহূর্ত্তেই তিনি ইহা লইয়া পড়িতে বসিয়া গেলেন—এরপর তাহার কোন বাহ্য-জ্ঞান রহিল না। অপূর্ব্ব কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা বহিয় সুদীর্ঘ মিছিল চলিয়া গেল কিন্তু কবির ভিতর ইহার এতটুকু সাড়াও ধ্বনিত হইল না। বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দান্তকে মিছিলের কথা জিজ্ঞাসা করা হইল আর তিনি বিস্ময়সূচকভাবে মাথা নাড়াইয়া জানাইলেন "তোমরা সকলেই মিছিলের কথা বলাবলি করিতেছ কিন্তু আজত মিছিল বাহির হয় নাই।"

পণ্ডিত প্রবর আরিষ্টটল যখন দার্শনিক চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিতেন তখন তাঁর মনঃপ্রাণ সংসার জীবনের বাহিরে একটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিচরণ করিত। এই সকল আত্মমগ্ন মুহূর্ত্তে আত্মীয় স্বজনেরা প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও

---

* কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

তাহাকে জাগাইবার সাহস পাইত না। পরিচারক তাঁহার সম্মুখে কিছু খাবার রাখিয়া যাইত আর তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া কয়েক দিবস কাটাইয়া দিতেন।

আধুনিক যুগের একজন জ্যোতির্ব্বিদ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ইহা ঐকান্তিক তন্ময়তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। একদিন রাত্রিকালে তিনি নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত আকাশের দিকে চাহিয়া গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রির সেই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। গৃহের কয়েকজন লোক শয্যাত্যাগ করিয় মুক্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "তোমারা সবাই ঘুমাইতে যাও আমি আজও সকাল সকালই শয্যা আশ্রয় করিব।" তন্ময়তার প্রাবল্যে ভোর হওয়ার কথা তিনি জানিতেই পারিলেন না।

সুসঙ্গে শিকার

(মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি, এ বাহাদুর)

সুসঙ্গে শিকার, এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিরোধী, বস্তুতঃ সাধু সঙ্গে কেহ কখনও জীব হিংসার কল্পনাও করিতে পারেন না। কালক্রমে অহিংসার ক্ষেত্রে কি ভাবে জীব-হিংসার ভাব পুষ্ট হইয়াছে তাহা অপ্রাসঙ্গিক বোধে আলোচনায় বিরত হইলাম। কিন্তু সুসঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয়ও তৎসঙ্গে সুসঙ্গ নামের উদ্ভবের বিষয় উল্লেখ করিলে বোধ হয় পাঠক বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

বর্ত্তমান সুসঙ্গ গ্রামটী ময়মনসিংহ সহরের ৩৬ মাইল উত্তরে গারো পর্ব্বতের উপত্যকা দেশে "সোমেশ্বরী" নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। রাজনীতি ধুরন্ধরগণের হৃদয়ও যখন প্রকৃতির লীলা নিকেতন, ভারতের স্বভাব উদ্যান আসামের সৌন্দর্য্য একটী কোমল স্পর্শ বুলাইয়া যায়, তখন বাংলার প্রান্তস্থিত আসাম সীমানার ক্রোড়ে সুদূর বিস্তৃত হরিৎ ধান্য ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত, সুদৃশ্য গারো পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত, স্বচ্ছ-সলিলা, স্রোতবহুলা তটিনী বিধৌত, নয়নরঞ্জন স্থানটী যে সাধারণ মানব হৃদয় অকর্ষণ করে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

বাংলায় তখন রেল হয় নাই—মোস্‌লেম রাজত্বের বড় বড় রাজপথ দিগ্বিজয়ের সুবিধার জন্য, অথবা বাণিজ্যের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধযুগের প্রথম আত্মদ্রোহ সাম্‌লাইয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সবে মাত্র একটা ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়াছে—এবং তাহার পরই পুনরায় যখন উত্তর ভারত নবাগত ধর্ম্মস্রোতের ও রাজনীতির প্লাবনে উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সুদূর কাণ্যকুব্জ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ তনয় ৺ কামাখ্যা তীর্থ দর্শন মানসে এই দিক দিয়া যাত্রা করেন। ধর্ম্মপ্রাণতার কত বড় আকর্ষণ থাকিলেই না এই বিপদ সঙ্কুল কল্পনা ব্যক্তির হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে! সমাজ হৃদয় সুস্থ, সবল ও সজীব থাকিলেই ত সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধন কল্পে আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারে! যে দুর্নিবার আত্মপ্রত্যয়ের বলে আজ ব্যক্তির পর ব্যক্তি গৌরীশঙ্কর আবিষ্কারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করি-তেছে, সেই দুর্জ্জয় শক্তির প্রেরণায় নিঃস্বহায় ব্রাহ্মণ তনয়গণ জন-বিরল পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশের ভিতর দিয়া বাঞ্ছিত স্থানে যাইতে ছিলেন। তখন এতদঞ্চলের সমতলে, কতিপয় ধীবর মাত্র বসবাস করিত এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে দুর্দ্ধর্ষ গারোগণ বাস করিত।

কোনও রাজার সুশাসনে অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতের এতদঞ্চল তখনও আসে নাই। কাজেই ন্যায় এবং বিচারের স্থান ইহা ছিল না। গারোগণ তখন নর শোণিতে অস্ত্ররঞ্জিত করিয়া বদ্ধমানবের মুণ্ডে মালা ধারণকেই গৌরব মনে করিত! হস্তী হইতে শশক পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ, বিস্তৃত অরণ্যানীতে ব্রহ্মপুত্রের তটদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত ছিল। নিরস্ত্র কৌপীন-সম্বল অবস্থায় এইরূপ স্থানের ভিতর দিয়া বিচরণ করা কতদূর মানসিক শক্তির পরিচায়ক এই যুগে তাহা কল্পনার অতীত। বস্তুতঃ জাতির ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা ও আত্মপ্রতীতির ভাব জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জাতির কল্যাণ নাই। যাহাই হৌক্ এই কৌপীন-বস্তের ভিতর এক অসাধারণ তেজস্বী যুবক অত্যাচারিত ধীবর গণের কাতর প্রার্থনায় গারোপ্রধানকে বশীভূত করিয়া সাধু সঙ্গে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহারই নাম হইল "সুসঙ্গ" এবং যে স্থানকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্য বিস্তার আরম্ভ

হইল তাহাই হইল এ রাজ্যের রাজধানী, তাহারও নাম হইল "সুসঙ্গ," এবং সুসঙ্গের তটপ্রবাহিনী নদীর নামাকরণ হইল স্বীয় নামের অনুকরণে "সুমেশ্বরী"। বহুদিন স্বাধীন ভাবে হিন্দুর জ্ঞান গরিমা এতদঞ্চলে প্রচারিত করিয়া পূর্ব্বোত্তর ভারতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় "মুলুকে সুসঙ্গ" গারোপর্ব্বতের বলশালী সুবৃহৎ হস্তীর সংগ্রাহক বলিয়া দিল্লীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

আজকাল সুসঙ্গের জঙ্গল বলিতে "গারোহিলের পাদ দেশস্থ ময়মনসিংহের জেলার উত্তর পূর্ব্ব সীমানাস্থিত বনানীকেই বুঝিতে হইবে। অন্যূন পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে, সুসঙ্গ গ্রামের ২ | ৩ মাইল পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার সীমানা পর্য্যন্ত পাহাড়ের প্রান্তস্থিত সমুদয় ভূভাগ গভীর অরণ্যানী পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত বনানীর মধ্যে মধ্যে পাহাড় হইতে উৎপন্না খড়স্রোত তটিনীর অভাব ছিল না—জলের মধ্যে মধ্যেই ছোট বড় বহু বিল ছিল। অধিকাংশ জঙ্গল বাতা, ইঁকড়, নল, খাগ, তাড়া প্রভৃতি এবং কোথাও বা উচ্চ ভূমিতে নাতিদীর্ঘ বৃক্ষাদিপূর্ণ জঙ্গলও ছিল। তদ্ভিন্ন বিলগুলিতে ধান্য জাতীয় ঘাসের প্রাচুর্য্যই ছিল। যাঁহারা বাংলা এবং আসামের বন্যজন্তুর স্বভাবের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে সর্ব্বদা পর্ব্বতচারী জন্তু ভিন্ন অন্য সমুদয় জন্তুর আবাস ভূমি হিসাবে এই শ্রেণীর বনানী কিরূপ উপযোগী।

মনোরম বৃক্ষাদি বনের শোভা, কিন্তু এই শোভার বৃদ্ধি হয় নানা বর্ণযুত বিচিত্র পুষ্প, সুন্দর পক্ষী এবং মৃগাদি আরণ্য জন্তুরদ্বারা। পুষ্পিত বৃক্ষের প্রাচুর্য্য এতদঞ্চলের বনানীতে না থাকিলেও একটা নয়ন-স্নিগ্ধকর চিরশ্যামল রূপের জন্য এখানকার বনানীর একটা আকর্ষণ আছে এবং পক্ষী ও জন্তুর জন্য এই সমস্ত জঙ্গলের লোক-প্রসিদ্ধি এখন পর্য্যন্ত আছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও দলে দলে আরণ্য হস্তী গারো পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া সমতটের ধান খাইয়া সপ্তাহ কাল সুসঙ্গের প্রান্তস্থিত বনানীতে স্বচ্ছন্দ বিহার করিত। কিন্তু বিগত পঞ্চদশ বৎসর হইল এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এতদঞ্চলে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। ফলে, কোনও স্থান উচ্চ এবং কতক স্থান নীচ হইয়া যাইতেছে। ১৩০৪ সনের প্রলয়কারী ভূমিকম্পের পর হইতে সুসঙ্গের পূর্ব্ব দিকে অনেক বিল ভরট হইয়া আবাদ যোগ্য হইয়াছে। ফলে, অন্যান্য অঞ্চল হইতে বহুলোক আসিয়া জঙ্গল আবাদ করিয়া নূতন বসত করিয়াছে। এই কারণে সুসঙ্গ হইতে ১৫। ১৬ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে না গেলে এখন আর শিকার ভূমি পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, আজকাল শিকার অধিকাংশই "কুলুাকান্দা" থানার উত্তর ভাগে পাওয়া যায়। অবশ্য নিকটবর্ত্তী সাধারণ বনে কখনও কখনও ব্যাঘ্র এবং শূকর পাওয়া গেলেও ইহা শিকার ভূমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এ অঞ্চলের জঙ্গল আবাদ হওয়ায় শিকারের সংখ্যা স্বভাবতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার উপর বর্ত্তমানে অস্ত্র পাওয়ার অধিকার প্রদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট উদারনীতি অবলম্বন করায় বহুলোকের বন্দুক হইয়া গিয়াছে। বন্দুক থাকিলেই তাহার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। ফলে, বহু পশু পক্ষী অযথা অবৈধ ভাবে হত হইয়া নিঃশেষিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। আত্মরক্ষা এবং ফসল রক্ষার্থে আনিত বন্দুক প্রায় সর্ব্বদাই প্রাণী বধার্থ ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থকে আত্ম-রক্ষার্থেও ফসল রক্ষার্থে বর্ত্তমান যুগে আগ্নেয়াস্ত্র অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু অস্ত্রগুলি যাহাতে কেবলমাত্র এই কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে তজ্জন্য নাল কাটিয়া ছোট করিয়া দিলেই এই দুই কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হয়, অথচ অযথা পশুবধ কার্য্য ব্যবহৃত হইতে পারে না। শিকার যোগ্য বন্দুক কেবল মাত্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রে দিলেই সমিচীন হয়।

যে পরিমাণ গরু প্রতি বৎসর গোমড়কে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও এতদঞ্চলে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয় না। দুঃখের বিষয় গো রক্ষা কল্পে দেশের লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই এবং রাজ সরকারেরই বা সেরূপ মনোযোগ কোথায়? কীট ভুক্ পক্ষী বিনাশের সঙ্গে পতঙ্গ বৃদ্ধি হওয়ায় শস্যের পক্ষে অধিক হানিকর হইতেছে কি না তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস, বন্দুক সম্বন্ধে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিলে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে Private Reserve রক্ষা কল্পে সহায়ক আইন সৃষ্ট হইলে

এখনও এতদঞ্চল শিকারের একটী শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

সুসঙ্গের যে অঞ্চলকে এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে শিকারের স্থান বলা চলে, এবং সেই সকল স্থানে যে সমস্ত জন্তু পাওয়া যায়, তাহাদেরই বর্ণনা এবং তাহাদের স্বভাব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করাই বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য।

এতদঞ্চলে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিই শিকার করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর বিরাট আয়োজন সহকারে বহুবার এই দিকে শিকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অতিথিরূপে ভারতের ভূত পূর্ব্ব Commander in-Chief একবার "বাকলজোড়া" অঞ্চলে এক প্রকাণ্ড আরণ্য হস্তী শিকার করেন। অবশ্য এখন সে জঙ্গলের চিহ্ন মাত্রও নাই।

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত "শিকার কাহিনী" নাম দিয়া বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় শিকার সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকে এতদঞ্চলের শিকারের বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত "শিকার ও শিকারী" এবং কুমার জিতেন্দ্র কিশোরের "শিকার-স্মৃতি" পুস্তকেও এতদঞ্চলের শিকারের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ২|৪টী ইংরেজী পুস্তকেও এই দিকের শিকারের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র বাবুর পুস্তক শিকার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। ইংরেজী সাহিত্যে প্রত্যেক বিষয়ে কতই পুস্তক আছে যে বাংলায় তাহার তেমনি অভাব। সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে গিয়া যিনি যে ভাবেই সাহিত্যের অঙ্গপুষ্ট করেন তিনিই বঙ্গীয় সাহিত্যিকের বরেণ্য। জাতির তথা সাহিত্যের উন্নতির সময় প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েও জাতির সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই। সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণময় ইতিহাসের আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে জ্ঞাতব্য কোনও বিষয়ের আলোচনায় ভারতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই।

সেই সময়ে "সৈনিক-শাস্ত্র" সম্বন্ধেও পুস্তক লিখিত হইয়া গিয়াছে। সেই কালের "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" পুস্তকে মহামুণি পালকাপ্য কি পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতাই না দেখাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের জড়তার ফলে আমাদেরই দেশের জন্তুর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেন Dr. Evans! জ্ঞান এর গুণ অবশ্য কোনও বিশেষ দেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না; কিন্তু আমরা যে আমাদের দেশের জীব জন্তুর স্বভাবাদি সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই করিব না তাহারই বা কারণ কি?

পৃথিবীতে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্ত নাই--কিন্তু, সাধারণ জীব জন্তুর জীবনগতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকেই মানব জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চান না—অবশ্য জীবনে যাঁহারা Ethical hierarchy তে উন্নতর আদর্শ বাছিয়া লইয়া সেই আদর্শ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে যাঁহারা আলোচনার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান যুগে কেহ উপহাস করিবেন না এই ভরসাতেই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতে সাহস পাইয়াছি।

নানা অবান্তর কথার উল্লেখ করিতে যাইয়া বর্ত্তমানের শিকারের জঙ্গলের বিবরণ দিতে বিস্মৃত হইয়াছি; সুতরাং উপসংহারে সেই কয়টী কথার উল্লেখ করিয়াই মুখবন্ধ পরিসমাপ্ত করিব। *

এতদঞ্চলের বর্ত্তমানের শিকারের জঙ্গল প্রায়ই নিম্ন ভূমি জাত নল, তারা, মলুয়া প্রভৃতি। অনেক স্থানই "দলা" অর্থাৎ Marshy Land—অধিক ভার সম্বলিত জন্তু হাঁটিয়া গেলে মহা পঙ্কে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা। বর্ষাকালে প্রায় জঙ্গলই জলপূর্ণ থাকে—তখন ২|১ স্থান যাহা "জাগ্না" থাকে সেই খানে কতক জন্তু আশ্রয় লয়। শীতকালে প্রায় জঙ্গলই শুষ্ক হয়; কিন্তু অনেকগুলি দলা জঙ্গলও থাকিয়া যায়। পাহাড় অতি নিকটে থাকায় বর্ষার জন্তু পাহাড়ে আশ্রয় লয়; এবং শীতে সমতটের সহজ-প্রাপ্য আহার্য্যের লোভে নামিয়া আইসে। সমতটের অনায়াস লভ্য-ধানের লোভে মানুষ যেমন পাহাড়ে যাইতে চায় না সেইরূপ হরিণ, শূকর, মহিষাদি জন্তু ও ধান্যের সময় দলে দলে সমতটের বনানীতে আসে। সুতরাং এই স্থানের জঙ্গল একেবারে নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত জন্তুর সম্পূর্ণ অভাব একেবারে হইবে না।

* "সুসঙ্গে শিকার" গ্রন্থের মুখবন্ধ হইতে গৃহীত।

প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে স্থানীয় পরিবর্ত্তন হইলে জীব জন্তুর অবস্থানাদির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং, বর্ত্তমান দৃষ্টে অতীতের অভিজ্ঞতায় যতদূর সম্ভব বলা যাইতে পারে, তাহাই বিবৃত করা গেল। প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের সমস্ত গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে, সুতরাং ভবিষ্যতে আবার কোন উত্থান পতনের ফলে স্থানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিবে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিক কিয়ৎ পরিমাণ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিলেও আমাদিগের পক্ষে তাহা বলা সম্ভবপর নহে।

ভদ্রলোকের পক্ষে এতদঞ্চলের শিকার কেবম মাত্র হস্তী পৃষ্ঠে হইতেই সম্ভবপর। শীতকালে কোনও কোনও স্থানে হাঁটিয়া শিকারও সম্পূর্ণ অসম্ভবপর নহে। অসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি, বর্ষার শেষভাগে রাত্রিতে ধান ক্ষেতের ধারে বসিয়াও শিকার করে। কোনও ভদ্রলোক এতাদৃশ কষ্ট সহিষ্ণু হইলে প্রশংসার পাত্র।

সুসঙ্গের উত্তর সীমানায় যে কয়টী ক্ষুদ্র টীলা আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে হরিণ, শূকর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, হসুরা (Barkingdeer) প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই টীলাগুলি ও সময় বিশেষে শিকারের বিশেষ উপযোগী স্থান। এই সব পাহাড়ে beat করিয়া শিকার অত্যন্ত সুবিধা জনক।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে এখানকার শিকার-যোগ্য প্রধান প্রধান জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়াস করিব। ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক এই পুস্তকে অলোচিত জন্তুগুলির স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।
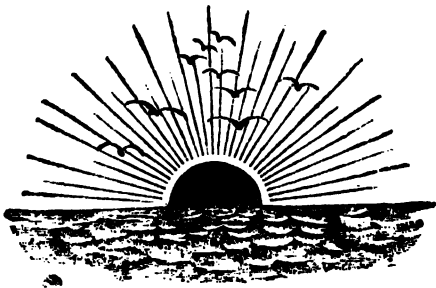
আয়ুর্ব্বেদে স্বাস্থ্য-নীতি *

(শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন)

এই সংসারে কেহ বা চায় অর্থোপার্জ্জন, কেহ আকাঙ্ক্ষা করে কামনার পরিপূরণ; কেহ বা করে ধর্ম্ম আচরণ, কেহ বা লয় মোক্ষের শরণ। ইহাদের যে কোনটি লাভ করিতে হইলেই সুস্থ শরীরের প্রয়োজন—

অতএবই "নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স শরীরস্য মেধাবী কৃত্যেম্ববহিতো ভবেৎ॥

নগর রক্ষাকর্ত্তা যেমন নগর রক্ষায়, রথী যেমন তাহার রথ রক্ষায় সতত মনোযোগী থাকে তদ্রূপ শরীরী অর্থাৎ মানবগণ সর্ব্ব বিষয়ে অবহিত হইয়া শরীর রক্ষা করিবেন।

মানব দেহে রোগ প্রবিষ্ট হওয়ার বহু কারণই বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রায়শঃ যে কয়টি কারণে মানব রুগ্ন হয় তৎসম্বন্ধে মহর্ষিদের মধুর বচন এই—

"অত্যম্বু পানাৎ বিষমাশনাচ্চ।
সংধারণাৎ মূত্র পুরীষয়োশ্চ॥
দিবাশয়া জ্জাগরণাচ্চ রাত্রৌ।
ষড়ভি প্রকারৈঃ প্রবিশন্তি রোগাঃ॥

অধিক জলপান, বিষম আহার, অর্থাৎ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ভোজনের সময় ও পরিমাণ ঠিক না রাখা ইত্যাদি; মল মূত্রের বেগ ধারণ, দিবা নিদ্রা, ও রাত্রি জাগরণ এই ছয় প্রকারে মানব দেহে প্রায়শঃ রোগ প্রবিষ্ট হয়।

দেশ কাল ও প্রকৃতি অনুসারে করণীয় বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অনুকূল বিষয় উপভোগে ইন্দ্রিয় ও মন সুস্থ থাকে। ইন্দ্রিয় ও মনের সুস্থতায় শরীর ও সুস্থ থাকে। সুস্থতাই সর্ব্ব সুখের নিদান। অতএব ইন্দ্রিয় ও মন যাহাতে বিকৃত না হয় সেই বিষয়ে মহর্ষিগণ প্রদত্ত কতকগুলি উপদেশ অত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। জগতে যাবতীয় প্রাণীই সুখান্বেষণে ব্যস্ত; সুতরাং সুখ সকলেরই কাম্য। সেই সুখ ধর্ম্মাচারণ ভিন্ন লাভ করা যায় না অতএব সকলেই সুখী হওয়ার উদ্দেশ্যে শরীরের ইষ্টজনক যাবতীয় সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন।

* জামালপুর সাহিত্য সভায় পঠিত।

"সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বোহিতচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥
"দেবগোব্রাহ্মণ গুরুবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যা নর্চ্চয়েৎ।

সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনা করিবে ব্রাহ্মণ গুরুসিদ্ধ ও আচার্য্যের অর্চ্চনা করিবে, গো পালন করিবে। বিশেষতঃ এই "ভিটামিনের" যুগে, খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল বিভ্রাটে খাদ্য সম্রাট গব্য সংগ্রহার্থ সকলের গো পালনে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গব্য যেমন রসনায় তৃপ্তিদায়ক তদ্রূপ শরীর পোষক মনের ও আনন্দদায়ক; গোময় গোমূত্র ম্যালেরিয়া ও কলেরার বীজাণু নাশক, পরোক্ষে জীবন রক্ষক শস্য বর্দ্ধক। বহু বিজ্ঞ ডাক্তারের মত উৎকৃষ্ট দধি দুগ্ধ ঘৃতে যে পরিমাণ ভিটামিন থাকে তাহাতে ইহা ব্যবহারে মানব শরীর সতত সুস্থ রাখিয়া তথা দীর্ঘ জীবন দান করিতে এরূপ খাদ্য আর নাই।

মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদদেশে নিত্য তৈল ম্রক্ষণ করিলে দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অটুট থাকে এবং অকালে কেশ পক্ক হয় না ও বাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রত্যহ কিংবা ঘন ঘন ক্ষৌরী হইবে না; ইহাতে চক্ষু ও দন্ত রোগের ভয়। তাই বোধ হয় আজকাল চশমা ও কৃত্রিম দন্তধারীর আধিক্য দেখা যায়।

মূত্র, দন্ত, উষ্ণীষ ও পাদুকা ধারণ করিবে। বাঙ্গালা দেশে উষ্ণীষ ধারণের প্রথা কেন যে নাই বুঝা কঠিন। সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পথ চলিবে। বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট প্রজনন অভাবেই আমাদের গৃহানন্দ বর্দ্ধক হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ সুস্থ শিশুর হাস্য কলরবে গৃহ মুখরিত না হইয়া অধিকাংশ লোকেরই মনে আশা ও আনন্দের পরিবর্ত্তে কৃষ, রুগ্ন, দুর্ব্বল শিশুর করুণ ক্রন্দনে নিরাশা ও নিরানন্দ বাড়িয়া চলিয়াছে।

এইরূপ অবস্থা দর্শনে অনেকেই মনে করেন—কাল বর্দ্ধিতা লাবণ্য ললামভূতা পূর্ণ যৌবন বিকশিতা বয়স্থা ষোড়শী যুবতী কন্যা বিবাহে এরূপ রুগ্ন ক্লিষ্ট সন্তানের জন্ম নিরোধ হইতে পারে। বস্তুত তাহা হয় না। সুস্থ পিতামাতার সন্তানই সুস্থ হইতে দেখা যায়। বয়োধিকার বিবাহে প্রায়ই যেন কতকগুলি রোগ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিষ্টিরিয়া, প্রদর, মৃগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি যান্ত্রিক, স্নায়বিক ও মানসিক রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে প্রসারলাভ করিতেছে দৃষ্ট হয়।

যৌবন তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা তরুণীগণ নিজ নিজ মনোজাত কাল্পনিক ভাবে ভাবিত হইয়াই স্নায়বিক বিকারে আক্রান্ত হইয়া পরে। ইহার ফলে নূতন সংসার কল্পিত নন্দন কাননের পরিবর্ত্তে ভীষণ নরক যন্ত্রণার নিলয় হয়। তাই কবি বলিয়াছেন—

যৌবন বালক কানে পশি এই কথা কয়।
আসিয়াছি আমি আর কারে তব ভয়।
সে সময় মনে হয় আমার সমান।
হয় নাই না হইবে গুণের নিদান॥

যদি এইরূপ কল্পিত সুখের শূন্যোদ্যান গঠিত করিবার সুযোগ না দিয়া, কল্পনা জাগিবার পূর্ব্বেই পাত্রস্থ করিয়া নৈতিক নিয়মিত জীবন যাপনের ধারায় তরলমতি তরুণী দিগকে রক্ষা করা যায়, তবে নানা মনোবিকার জনিত স্নায়ু ও যান্ত্রিক বিকার হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ সন্তান জনন উপযোগী জননী তৈয়ার করিতে পারা যাইতে পারে বলিয়া মনে করি। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি প্রামাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ও এরূপ ভাবাত্মক প্রমাণই দৃষ্ট হয়। মনে রাখিতে হইবে বিবাহ শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আধার নয়। যথোচিত সময়ে বিবাহ সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করে। তাই কিছুকাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর প্রতি-পরিবারে স্বর্গসুখ বিরাজিত ছিল। তদন্যথায় এখন সংসার নরক যন্ত্রণার নিলয়ে পরিণত হইতেছে। মনে রাখা সঙ্গত যে যথোচিত কালে ফলপ্রসূ বীজ রোপন করিলেই উৎকৃষ্ট ফসল জন্মে নচেৎ অকালে অপক্ক বীজ অথবা ফল প্রসবের উপযুক্ত বীজ রোপিত হইলেও ঐ বীজ নিজে নষ্ট হইয়া ক্ষেত্রকে মরুভূমিতে পরিণত করে। ক্ষেত্র অনুপযুক্ত হইলেও বীজ নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহ হওয়া মাত্রই জনক জননী হওয়ার অনুপ-যোগিতা সত্ত্বেও যাঁহারা সন্তান কামনা করেন এবং সংযম অভাবে অধৈর্য্য হয়েন তাহারাই বাঙ্গালী নির্দ্দিষ্ট তথা কথিত আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দিষ্ট বিবাহের নিন্দা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে নিরোগ থাকিবার যে ব্যবস্থা মহর্ষিগণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহারই একটিমাত্র শ্লোক উপহার দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

"নরোহিতাহার বিহার সেবী সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ
দাতা সমঃসত্যপর ক্ষমাবানাপ্তোপসেবীচ ভবত্য রোগঃ ॥

প্রদীপ বংশের অভিব্যক্তি

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এস্, সি, বি, টি)

প্রদীপ বংশ অতি প্রাচীন ও সুবিখ্যাত। পুরাণের গাত্রে এই বংশের বৃত্তান্ত অশোক স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বেদের গর্ভেও এই বংশের বৃত্তান্ত ভূগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় প্রোথিত রহিয়াছে। সুতরাং এই বংশ অতি প্রাচীন।

কত রাজ্যের উৎপত্তি, কত রাজ্যের স্থিতি, কত রাজ্যের ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতেছে। সাম্রাজ্য উঠিতেছে গড়িতেছে পড়িতেছে জল বুদ্বুদের মত; তাহার বিরাম নাই, সীমা নাই, সংখ্যা নাই। কিন্তু এই বংশের বিশেষত্ব এই যে যুগে যুগে এই বংশলতিকা ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। ইহার খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বংশ ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে।

সকল সভ্যদেশেই পুরাতত্ত্বের আলোচনা পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে। অস্মদ্দেশেও তাহার অসদ্ব্যবহার নাই। আমরা এই স্থলে এই সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন বংশের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের অবস্থাই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি না বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। বস্তুতঃ এই ইন্দ্রিয় পাঁচটী হইল জ্ঞানার্জ্জনের যন্ত্র বিশেষ। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু জ্ঞান লাভের ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের যেমন প্রধান সহায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পক্ষেও তেমনিই অত্যাবশ্যক।

প্রজ্জলিত ও স্বপ্রভাবিশিষ্ট বস্তু ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় অন্যান্য যাবতীয় বস্তুই কেবলমাত্র ইহাদের বর্ণ ও সত্বা আছে বলিয়া আমাদের গোচরীভূত হয় না। বস্তুটী থাকিলেই আমরা যে তাহা দেখিতে পাইব এমত নহে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হইতেই আলোকের তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া অনন্তের দিকে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যখন এই আলোক তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের ইথার নামক পদার্থের ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষু রন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন ঐ তরঙ্গ ফটোগ্রাফের কেমিরার ন্যায় চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত (retina বা) স্নায়ুবিশেষের উপর কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের নিকট ঐ বস্তুর সত্বা ও বর্ণ সম্বন্ধে সন্ধান লওয়াইয়া দেয়। যখন ইথারের এই তরঙ্গ প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইতে ক্ষান্ত হয়, তখন কোন বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিম্বা কোন বর্ণের জ্ঞান হয় না। তখন এক অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার।

ইথারের যে তরঙ্গপ্রবাহে আলোকের উৎপত্তি হয় এবং দৃষ্টিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয় তাহা সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ হইতে অবিরত ক্ষরিত হইতেছে। মানব সমাজের আদিম অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, উল্কাপিণ্ড ও নক্ষত্রগণই মানবের পক্ষে প্রদীপের কাজ করিত। অবশ্য জোনাকি পোকাতেও আলোকের অভাব যে কথঞ্চিৎ বিদূরীত না হইত একথা বলা যায় না সম্ভবত চকমকি (flint) প্রস্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে শিক্ষা করিয়া মানবজাতি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত করিয়া থাকিবে। তখনই মানব ইথারে আলোক তরঙ্গ উৎপন্ন করিতে শিক্ষা করিয়া ছিল।

সর্ব্বপ্রথম রন্ধনকার্য্যে ও উত্তাপ প্রদানে অগ্নি ব্যবহৃত হইত। হয়ত সময় সময় মানব পরিজন বর্গের সহিত অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে সময় অতিবাহিত করিত। কিন্তু দিন দিন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির যেমন উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল, দৃষ্টবস্তুর প্রতি তাহার লালসা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাহাকে ততই কঠোর হইতে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে হইল। সুতরাং দিবাভাগ কে কৃত্রিম উপায়ে পরিদ্ধিত করিতে তাহাকে যত্ন পাইতে হইল। অনেকে অনুমান করেন যে অপেক্ষাকৃত শীতল ও তমসাচ্ছন্ন অক্ষাংশে বসতি হেতু উত্তরদিকে অবস্থিত জাতি সমূহই অগ্নি প্রজ্জলিত করতঃ অন্ধকার দূরীভূত করিতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই জন্যই ইহারা এত দ্রুত সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়াই বোধ করি সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকিবে। তাহার অব্যাহিত পরেই বোধ হয় রজন সংযুক্ত তৈলাক্ত বৃক্ষশাখা মশালের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ইউরোপে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ও মশাল্‌চি বালক (link boys) এইরূপ মশাল দ্বারা নগরবাসিগণকে আঁধার রাত্রে পথ প্রদর্শন করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিত। সম্ভবতঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদয় লণ্ডন নগরে যত আলো না ছিল বর্ত্তমানে তথাকার পিকাডিলি রঙ্গমঞ্চেই (সার্কাস গৃহে) তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আলো আছে।

এরণ্ড, ভেরণ্ড বেরি, নারিকেল, বৈদ্যরাজ, তিসি, মূলা, সরিসা, তিল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ্য তৈল ও ভেক, শূকর, মৎস্য, ব্যাঘ্র, ছাগ প্রভৃতি প্রাণিজ তৈল, বসা, বা ঘৃতাদি দ্বারা মৃৎপাত্রে বা ধাতুপাত্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত আছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও স্কটলণ্ডে এই প্রকারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে মোমবাতি ও চর্ব্বির বাতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ল্যাম্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোমবাতি সম্বন্ধে একথা কতদূর সত্য বলিতে পারা যায় না তবে লেম্প ও মোমবাতি যে এক সময়ে পাশা পাশি চলিতে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে ফিনিসিয়ান জাতি চর্ব্বির বাতি ব্যবহার করিত। আর প্রাচীন রোমানগণও ধর্ম্মকার্য্যে মোমবাতি ব্যবহার করিতেন; হিন্দু দেবালয়েও মোম বাতির প্রচুর প্রচলন ছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের আর্গাণ্ড ছিলেন একজন রাসায়নিক পণ্ডিত। ডাক্তারি ছিল তাহার ব্যবসায়। আর্গাণ্ড ল্যাম্প আবিষ্কার করিয়া তিনিই ল্যাম্প রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনিও তাহার ভ্রাতা স্তম্ভাকৃতি সলিতা ও চিমনি আবিষ্কৃত করিয়া এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। এজন্য ইহারা জগতের সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভাবন কর্ত্তৃগণের অন্যতম বিবেচিত হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কেরোসিন তৈল আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে ল্যাম্পগুলি ধা করিয়া এক ধাপ উপরে উঠিয়া গেল। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে চর্ব্বির আলোর দশ হইতে বিশ শক্তি সম্পন্ন কেরোসিন ল্যাম্প নির্ম্মিত হয়।

বর্ত্তমানে আমরা যে ল্যাম্প ও চর্ব্বির বাতি ব্যবহার করিতেছি পুরুষানুক্রমিক চেষ্টার ফলে তাহা প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাথুরিয়া কয়লা হইতে একপ্রকার গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়া প্রদীপ বংশকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল। জন ক্লেটন নামক এক ব্যক্তি পাথুরিয়া কয়লা চুয়াইয়া চর্ম্ম বা রাবারের থলিতে পুরিয়া একপ্রকার গ্যাস বাহির করিলেন। এই গ্যাস বেশ জ্বলিত। কিন্তু উইলিয়ম মারডক নামক স্কটলণ্ডবাসী অপর এক ব্যক্তিই আলোর জন্য ইহা সর্ব্বপ্রথম রীতিমত ব্যবহার করিতেন।

বার্ম্মিংহামের নিকট Soho নামক স্থানের ঢালাইখানায় তিনি কাজ করিতেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহার কারখানা গৃহ এরূপ দীপমালায় উদ্ভাসিত করিলেন যে দলে দলে লোক তাহা দেখিতে আসিত। অতঃপর আরও অনেক বুদ্ধি বিশিষ্ট ও ক্ষমতাশীল লোক এই গ্যাসের আলোর উন্নতি বিধান করিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

অনতি বিলম্বেই লণ্ডন গ্যাস লাইট কোম্পানীর সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমানে পাথুরিয়া কয়লা হইতে নিষ্কাশিত গ্যাস দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার এনারভন ওয়েস্‌বা গ্যাসের আলোর রাজ্যে এক নবযুগ আনয়ন করিলেন। ৯৯ ভাগ থোরিয়ার সঙ্গে এক ভাগ সেরিয়া মিশ্রিত করতঃ কোল গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া তিনি যে আলো উৎপাদন করেন তাহা সাধারণ কোল গ্যাস হইতে ৬ গুণ বেশী আলো দিয়া থাকে।

আজ যে গ্যাস লাইট বিজলী বর্ত্তিকার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতে পারিতেছে তাহা কেবল ওয়েসবার আবিষ্ক্রিয়ার গুণে।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ডেভি (Humhpery Devy) ৫ হাজার দস্তা ও তামার সেল বিশিষ্ট ইলেট্রিক ব্যাটারি সহযোগে কাজ করিতে করিতে গ্রাফাইট নামক দুইটী কার্ব্বন

শলাকার সাহায্যে একটী আর্চ্চ লাইট প্রস্তুত করেন। ইহাই হইল ইলেট্রিক আর্চ্চ লাইটের জন্মদাতা বা আদি পুরুষ।

যাহা হউক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা কার্য্যতঃ বড় ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অতি মন্থরগতিতে এই আলোক বংশের উন্নতি বিধান হইতেছে বলিতে হইবে। ডায়নেমো উদ্ভাবিত হইলে পর লোকে যত ইচ্ছা ইলেক্‌ট্রিসিটি আয়ত্ব করিতে পারিতেছে। কিন্তু আর্চ্চ লাইটের শক্তি অত্যন্ত অধিক। তজ্জন্য রেল ষ্টেশনে, সার্কাস পার্টিতে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে প্রভৃতি সুবিস্তৃত স্থানের জন্য আর্চ্চ লাইটই অধিকতর উপযোগী।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বায়ু শূন্য কাচের ভাণ্ডে গ্রাফাইটস্ প্রভৃতি কয়লা জাতীয় দ্রব্যের শলাকা পূর্ণ করিয়া সোয়ন ও এডিসন বালব প্রস্তুত হয়।

দিনের পর দিন এই বালবগুলি ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে কার্ব্বনের স্থান Osmiun ধাতু, osmiun এর স্থানে tantalum এবং tantalum এর স্থানে tungster ধাতু দখল করিয়া বসিল। ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর আলো হইতে লাগিল। আলো দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল।

আরও কিছুদিন পরে বালবের (bulb) * ভিতর argen গ্যাস পুরিয়া তাহাতে tengsten দেওয়া হইল। ইহাতে আলো ৬ গুণ উজ্জ্বলতর হইল। এই ল্যাম্প আর্চ্চ লাইটকে পরাভূত করিতেছে। কেননা ইহার শক্তি ১০০০ হইতে ২০০০ বাতির শক্তির তুল্য।

১৫। ২০ বৎসরের মধ্যেই এই আলো যে কেবল ৬ গুণ উজ্জ্বলতর হইয়াছে এমত নহে; সস্তাও হইয়াছে। বর্ত্তমানে রাস্তা, ঘরবাড়ী, কারখানা ইত্যাদির প্রায় তাবৎই এই কৃত্রিম বিজলী বর্ত্তিকা দ্বারা উদ্ভাসিত হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কারণ প্রাচীন প্রথা মতে খোলা গ্যাসের আলোতে বায়ু দুষিত হইয়া থাকে।

জ্বালানি কাঠের পর চর্ব্বির বাতি ও ল্যাম্প,—তৎপর গ্যাস লাইট,—তৎপর বৈদ্যুতিক আলো বর্ত্তমানে বিজলী বর্ত্তিকায় টিপ দেওয়া মাত্র আলোতে উদ্ভাসিত হয়। এই রীতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এখনও আরও উন্নতি করিবার ঢের বাকী আছে। জোনাকি পোকা যে আলো দিতেছে তাহা সবচেয়ে নির্দ্দোষ কারণ ইহাতে উত্তাপ নাই কেবল আলোক আছে। আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি তাহার সব অংশই যদি আলোকে পর্য্যবসিত হইত এবং কণা মাত্রও উত্তাপ বিকীরণ করিতে না পারিত তবে আমাদের আলোও নির্দ্দোষ হইত। জোনাকীর আলোতে ultra-violet rays (যাহাতে চক্ষুর অনিষ্ট হয় এরূপ কিছু) নাই।

তৈল পুরাইলে যে শক্তি নিষ্কাশিত হয় তাহার ৩/১০০ ভাগ মাত্র আলো উৎপাদন করে। বাকী সব টুকুই উত্তাপ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইরূপ গ্যাস পোড়াইলে ৪/১০০ অংশ ও বিজলী বর্ত্তিকা হইতে ৭/১০০ অংশ শক্তি (energy) আলো প্রদানে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট তাবৎ শক্তিই উত্তাপ প্রদানে নিযুক্ত হয়। আর্চ্চ ল্যাম্পের ৫—১৫/১০০ অংশ এবং সৌরকরের ৩৫/১০০ অংশ মাত্র শক্তি আলোক প্রদান করে।

সুতরাং জোনাকি প্রভৃতি পোকা যে প্রণালীতে আলো উৎপাদন করিয়া থাকে তাহা প্রায় নির্দ্দোষ। আমাদের অগ্নি প্রজ্বলন প্রণালীর চেয়ে তাহাদের প্রণালী অনেক উন্নত। জোনাকী পোকার এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য সমুদয় সভ্য জগৎ এখন তৎপর হইয়া নিযুক্ত আছে। যদি সস্তায় জোনাকী পোকার মত স্নিগ্ধ আলো আমরা প্রস্তুত করিতে পারিতাম তবে আলোকের খরচ বর্ত্তমানে যাহা লাগে তাহার ১/১০০ ভাগ লাগিত। তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র লোকেও প্রায় বিনা ব্যয়েই তাহার জীবনের প্রায় সমুদয় আবশ্যকীয় আলো পাইতে পারিত। গবেষণার ফলে ২। ১ পুরুষের মধ্যে এইরূপ আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিকগণের এরূপ অনুমান।

* বায়ুশূন্য কাচপাত্র।

শান্তির বারমাসী

(শ্রীদেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ)

ইয়ত না কার্ত্তিক মাসে (আরে শান্তি) ধানে ভরে ক্ষীর
শান্তি কন্যার যৌবন দেখে আমার প্রাণটি না হয় স্থির
স্থির কর সাউধের কুমার (আরে) শান্ত কর মন,
কাউল্‌কা জলেরে যাইতে আয়ে অইব দরশন ॥
সোণার বাটায় কাষ্ঠরে গিলা (আরে কুমার) রূপার বাটায় তেল,
ধীরে ধীরে শান্তি গো কন্যা (আরে) জলের ঘাটে গেল।
জলভর যৈবতী কন্যা (আরে) জলে দিছ মন,
কাইল যে কইছ্‌ল্যাম কথা আছে নি স্মরণ।
আছে আছে সাউধের কুমার (কুমার আরে) আমার মনে লয়,
(হায়রে) পর্‌থম্‌ বয়সেরি (গো) যৈবন সু স্বামীর ধন।
ইয়মাস বাড়াইলে শান্তি (শান্তি আরে) না পুড়াইলে আশ,
নব রঙ্গ্‌ ছুরত (রে) লইয়া সাম্‌নে অগ্রাণ মাস।

অগ্রাণ না মাসেতে শান্তি দ্বিতীয়ার চান্‌,
দেখা দিয়ে রাখ গো শান্তি (আরে) নাগরের পরাণ।
অষুধ নয় সে জানিরে কুমার (কুমার আরে) মন্ত্র নয় সে জানি,
কি দিয়া রাখিবাম গো আমি নাগরের পরাণি ?
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

পৌষ না মাসেতে শান্তি পুষ্‌ব অন্ধকারী,
আজ্‌কার রাত্রিতে শান্তি (তোমার) যৈবন করবাম চুরি।
পার্‌বে পার্‌বে সাউধের কুমার (কুমার আরে) গায়ে আছে বল,
তোর গলায় কল্‌সী বান্ধ্যা আরে জলে ডুব্যা মর।
(আরে) দুয়ার বান্ধিয়া রে রাখ্‌বাম গজমস্ত হস্তী,
সঙ্গেতে জাগস্তরে রাখ্‌বাম আরে নবলক্ষ দাসী।
আরে পারিয়া মারিবাম্‌ লো আমি গজমস্ত হস্তী,
ডপাড়ে পলাইয়া যাইব আরে নবলক্ষ দাসী।
আরে তুমি অইও গাঙ্গের জলগো (শান্তি আরে) আমি আনবাম আড়ি,
সেই আড়ি গলায় গো বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি।
চাইর পর রাত্রির মধ্যে যে চুরার লাগাল পাই,
কান্‌ডা কাটিয়া গো আমি চণ্ডিরে বুঝাই।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

মাঘা না মাসেতে শান্তি (শান্তি আরে) দ্বিগুণ পরে শীত,
শীতল পাটী বিছাও আন্যা শিয়রের বালিশ।
শীতান্‌ বালিশ পৈতান্‌ বালিশ (হায়রে) বালিশ লই- লাম বুকে,
(হায়রে) আভাগ্যা দারুণ রে বালিশ (আরে) মুখে রাও না করে।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

ফাল্গুন না মাসেতে শান্তি রবির বড় জ্বালা,
আম ডাল ভরসা করে কুম্বিলমে বাসা।
ডিম্‌ পার বাচ্ছারে তোল তোল দুইলা ছাও,
বিধুকালে যথায় মরণ (আরে) তথায় চল্যা যাও।
ইয় মাস ইত্যাদি ...

চৈত্র না মাসেতে কুমার চাষায় বুনে বীজ,
আনত কডরায় ভইরা খাইয়া মরি বিষ।
(আর) বিষ খাইয়া মরতাম আমি জানত বাপে মায়,
তবু না সপিব যৈবন ভিন্ন পুরুষ ঠায়।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

বৈশাখ না মাসেতে কুমার (কুমার আরে) নবীন নালিতা,
(আরে) সকলেই যে তোলে শাক্‌ গো আমার আঙ্গিনস্থিত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া শাক্‌ গো ডাল্যা লইলাম পাতে,
আপন পতি নাই গো গৃহে হুইদ করবাম কাতে।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে কুমার গাছে পাক্‌না আম,
আপন পতি নাই গো বাড়ীতে খাইত গাছের আম।
আম খাইত কাডল্‌ খাইত (আরে) খাইত গাভীর দুধ
জোর মন্দির ঘর বইয়া (আরে) কৈত কৌতুক।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

আষাঢ় মাসেতে কুমার (কুমার আরে) গাঙ্গে নয়া পাণি,
(হায়রে) হাঁসা হাঁসি করে খেলা উজান নয় আর ভাটী।
সাকল্য জীবন রে হাসি (আরো) বনের পঙ্খী হইয়া,
সঙ্গে উড় সঙ্গেরে পর আপন পতি লইয়া।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

শ্রাবণ না মাসেতে কুমার (আর) জলে ধানের পারা,
অর্বুলার ডাউকের গো রায়ে (আমি) শরীর কর্‌লাম সাড়া।
শরীর করলাম্‌ সাড়া নারে পাগল করলাম্‌ শেষ্‌,
(হায়রে) এই অবধি ছাইড়া গো যাইবাম্‌ (আরো) চণ্ডী রাজার দেশ।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

ভাদ্র না মাসেতে কুমার (কুমার আরে) গাছে পাকনা তাল্‌,
(হায়রে) নারী অইয়া যৈইবন গো আমি রাখবাম কত কাল।
কত কাল রাখিবাম্‌ গো যৈবন লোকের বৈরী অইয়া।
ইয় মাস ইত্যাদি ... ...

আশ্বিন্‌ না মাসেতে শান্তি (শান্তি আরে) বচ্‌রের পরে শেষ্‌,
বিদায় দাও বিদায় দাও শান্তি যাইগো আপন দেশ।
(আরে) তুমি আইলা লক্ষ পুরুষ আমি কড়ার স্তিরি,
স্তিরি অইয়া পুরুষ বিদায় আমি কেম্‌নে করি।
ডাইল দিলাম চাউল দিলাম রসুই করে খাও,
জুর মন্দির ঘর দিলাম আরে শুইয়া নিদ্রা যাও।
(আরে) বার মাসের তের কথা (কুমার আরে) লওরে তবে গণিয়া,
এই গান বানাইয়া রে দিছে (আরে) জৈধর বাণিয়া।

কারুণ্য রসাপ্লুত গ্রাম্য সাধারণের রচিত এই বারমাসিগুলি তাহাদের প্রাণের গান, মিলন প্রয়াসী বিরহ বিধুর যুবক যুবতীর হৃদয়স্পর্শী কথোপকথন সঙ্গীতে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

করুণ রসাত্মক এই বারমাসী গীতে যদিও কোনরূপ ভাবাত্মক শব্দ সম্পদ পাওয়া যায় না, তবুও স্বর লালিত্য ভাগ্যবান্‌ কোন কোন কৃষকের মুখে এই গুলির মিষ্টতা বেশ পাওয়া যায়। ভাটী অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে এই গানগুলির সমাদর এখনও খুবই আছে। যাহারা এই গান শুনিয়াছেন তাহারা অন্ততঃ সুরের পক্ষপাতী হইয়াও ক্ষণকাল এই পালা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছি।

এই বারমাসী সঙ্গীত কোন একটা সত্য ঘটনা লইয়া রচিত। যখন যে গ্রামে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাই পল্লীবাসী রসিক তাহা গীতিকারে রচনা করিয়া দশের সম্মুখে বাহির করিয়াছেন। এই গুলি লোক পরম্পরায় গ্রামে গ্রামে প্রকাশ পাইয়া অদ্যাপি গীত হইতেছে। যদিও এই শ্রেণীর রচনাদ্বারা সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও গ্রাম্যকৃষক সম্প্রদায়ের ভিতর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি কিরূপ ছিল তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। নিরক্ষর কৃষকগণের প্রাণে সাহিত্যামৃতধারা ঝরণার মত আপনা আপনি গড়িয়ে পড়ত। এখনও ভাটী অঞ্চলে কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহা পৌরাণিক রীতি ধরিয়া সঙ্গীতে বাহির হয়। আমার সংগৃহীত ক্রমশঃ প্রকাশ্য কবিগানে টপ্পায় এবং নৌকা বাইচের সাড়িতে তাহা পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিতে বাসনা রহিল।

অভিশপ্ত

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোর ছয়টায়, প্রাসাদের সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত, অপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে, বাদসা সাহেব, বিচার সভা আহ্বান করিলেন।

সেই দিন ভোর হইতেই, আকাশপট, ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল! সূর্য্যের জ্বালাময় প্রচণ্ড লীলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মেঘের কালো অলক দান, দিগ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা প্রলয়ের চিত্র যেন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

বাদসা সাহেব বিচারাসনে উপবেশন করিলেন,—পার্শ্বে জন কয়েক, বিশ্বস্ত আমাত্যবর্গ, উৎকণ্ঠা চাঞ্চল্যে উপবেশন করিয়া দুইটি তরুণ তরুণীর, অভাবনীয় পরিণাম ফল চিন্তা করিতে লাগিল।

বাদসার দক্ষিণ পার্শ্বে, "ঘাতক" সুতীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান! প্রায় কুড়ি বছর যাবত সে ঘাতকের কাজই করিয়া আসিতেছে! বাদসার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যাইয়া সে কত শত মানবের শির ছিন্ন করিয়াছে,—তাহার ইয়ত্বা নাই! শত শত মৃত্যু-চিন্তা-বিক্ষুপ্ত—নর নারীর ভয়ার্ত্ত করুণ দৃষ্টি অবলোকন করিয়া,—তাহাদের তাজা রক্তে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, তাহার নৃশংস অন্তরে সামান্য অণুকম্পার ভাবও ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই! তাহার স্থির, শান্ত মুখ খানি উল্লসিত করিয়া, দাসানুদাসের মতই গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে, বাদসার হুকুম তামিল করিয়া আসিতেছিল! বাদসার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই তরবারির উত্থান ও পতন! পরক্ষণে রক্ত প্রবাহের অনন্ত প্লাবন!—কার্য্য শেষে,—সে প্রলয়াগ্নির মতই চণ্ডহাস্য করিয়া বধ্যভূমি পরিত্যাগ করিত! বিকট পূতিগন্ধময় মশান ক্ষেত্রে, তাহার তরবারি যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সকলকে জানাইয়া দিতে ছিল,—শক্তিমন্ত স্বাধীনচেতার খাম খেয়ালির উপর, চির দিনই জগত স্রোত ভেসে চলেছে, এমনি করে চিরদিনই ভেসে চল্‌বে!—অধীনতার পরিপূর্ণ ভোগ, এমনি করে রক্ত প্লাবনের ভিতর দিয়াই, বিলয়-অগ্নির ইন্ধন যোগাইতে থাকিবে।

বাদসার আদেশে, হোসেন ও মতিয়াকে, আনিয়া, বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। মতিয়া—মলিনা—দীনাতিদীনা ভিখারিণীর মতই, অনন্যসহায়, বিষন্ন মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! আপনাকে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে বিদ্ধ-বক্ষ-বিহঙ্গীর মতই গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল! তাহার সমস্ত দেহ ঘন ঘন কম্পনে প্রসারিত হইতে লাগিল! তাহার ললাট ও কর্ণমূল গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া যেন তাহাকে অগ্নি-দাহ জ্বালায় জ্বালাইয়া তুলিল।

হোসেন আলী যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের প্রাণহীন শবের মতই নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, সুষুপ্ত অন্ধকারের কৃষ্ণ আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া একটা মৃত্যু-শীতল নিস্পদ দেহ, কোন রূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মনে হইতেছিল, যেন একটা প্রবল বিতৃষ্ণায়, তাহার অসহায়-শুষ্ক-শ্রান্ত-মলিন মুখ খানা, প্রদোষ কালের সমস্ত বিষাদ ছায়া লইয়াই ফুটিয়া রহিয়াছে।

সুগভীর ঘৃণান্তরে উহাদিগের প্রতি নিঃশেষের কটাক্ষমাত্র নিক্ষেপ করিয়া, বাদসা সাহেব,—পারিপার্শ্বিক আমাত্য-বর্গের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পর মুহূর্ত্তে মতিয়ার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া শ্লেষপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন "মতিয়া! তুমি আমার পুত্রবধূ হইতে স্বীকৃত আছ? এই লোকজন সমক্ষে আত্মমত প্রকাশ করে, আমার বিচার কার্য্য শেষ কত্তে সহায়তা কর। তবে মনে রেখো, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি,—তোমার স্বীকার উক্তি ছাড়া, জোড় করে আমি এই উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হতে দোব না! আমাদের ধর্ম্মেও সেরূপ কার্য্য নিসিদ্ধ।"

প্রশ্ন শুনিয়া, মতিয়ার মনে হইল,—মাথার উপরের সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন, ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদের মতই মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল! সে যেন তাহারই রুদ্ধ চাপে, আহত রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া রহিয়াছে! তাহার চিন্তা, ধারণা, সহসা যেন রুদ্ধ-স্রোত নদী-সলিলের মতই, ধীর, স্থির,—তাহার জীবনী শক্তি সঞ্চারক রক্তের স্রোত যেন, বদ্ধ ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে! মতিয়ার ভূমি-ন্যস্ত দৃষ্টি আরক্ততর হইল! বহুক্ষণ সে, সেই একই ভাবে স্তব্ধ অসাড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার পর যেন প্রাণপণ বলে রুদ্ধ শ্বাসকে,

কোন মতে টানিয়া লইয়া, অবশ, অসাড় জিহ্বাকে স্ববশে আনিয়া ক্ষোভ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব!— ঘাতক দিয়ে আমার জীবন নাশ করেন, আমি স্বইচ্ছায় মস্তক পেতে দিচ্ছি! অনেক চেষ্টা করেও যে আমি মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারি নি! আমার মতের উপর নির্ভর করে,—এম্‌নি করে একজন নিরপরাধির জীবন নাশ কর্‌বেন? আমি আপনার পুত্রবধূ ··· ।" আর বলিবেন না। একটা অসীম অবসাদের তাড়নায়, মতিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল!

কয়েক মুহূর্ত্ত জল সিঞ্চনের পর, মতিয়া অনেকটা প্রকৃতস্থ হইল। বাদসা সাহেব নিতান্ত বিস্ময়াহত ভাবে, নির্ম্মমের মতই ক্রোধ বিরস কণ্ঠে বলিলেন "তোমার এমনি ধারা উত্তর শুন্‌তে আমি একেবারেই ইচ্ছে করি না। তুমি স্বীকৃত কি না তা-ই- স্পষ্ট করে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত কর; আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিচ্ছি, এ-রি মধ্যে তোমার মতামত জানাতে হ'বে। তবে মনে রেখো,—হোসেন আলীর জীবন মরণ তোমার চূড়ান্ত মীমাংসার উপর নির্ভর কচ্ছে!"

উক্তি শ্রবণ করিয়া মতিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ যেন তাহার নিকট, একাকার হইয়া গেল! জীবনের অসীম ব্যর্থতার ভীষণ নগ্নতা যেন, আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া, তাহার অন্তরকে খান্ খান্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল! রুদ্ধ বাষ্প চাপে, ভূগর্ভের মতই বিদীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল, ছিঁড়েও না অথচ কাঁটেও না, এমনি ধারা উৎকট যন্ত্রণার সহনাতীত তাপে সে দগ্ধ হইতে লাগিল! একটা নবোদ্ভব রোষে ও ক্ষোভে তাহার হৃদয়, প্রাণ, যেন ভীষণতর বিদ্রোহ হইয়া উঠিল! মতিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল! বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিলেন "কোন মত প্রকাশ করবে না তুমি? এতটুকুন বালিকার নিকট বাদসার ক্ষমতা, অক্ষমতায় পরিণত হবে? না—তা-ত- হ তে দোব না! যা সংকল্প তা' কার্য্যে পরিণত কর্‌বই, সামান্য মায়ার সংঘাতে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাতে দোব না!" অতঃপর বাদসা সাহেব হোসেন আলীর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিলেন "হোসেন! তুমি মৃত্যুর জন্যই এ মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হও,—ঘাতকের ঐ সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে, তোমাকে জীবনলীলা শেষ কত্তে হবে,—ইহাই বাদসার আদেশ।" বাদসা সাহেব পর মুহূর্ত্তে ঘাতকের প্রতি তাকাইয়া,—বলিলেন "ঘাতক! হুকুম তামিল কত্তে প্রস্তুত হও, আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই, তোমার কার্য্য সমাধা কত্তে হ'বে।"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া হোসেনের প্রশান্ত ললাট মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত শ্রীমণ্ডিত দেখাইল। আবার পর মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ জ্যোতিকে, করাল-দুশ্চিন্তা-মেঘ-কবলে যেন ম্লান করিয়া দিল! একটা গুরু ভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত, হৃদয় মন লইয়া হোসেন ক্রুদ্ধ ও ক্রুর কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! মতিয়া তা'র মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে, যা করা কর্ত্তব্য তা'র সব টুকুনই জগত সমক্ষে প্রকাশ করেছে! তা'র অন্তরের ভিতর অসীম স্নিগ্ধ স্বর্গের মিলন পুণ্যজ্যোতি যে, বিরাজমান ছিল, তা এতদিন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নি! মতিয়াকে খোদা এমনি উপাদানে তৈয়ার করেছেন, যা'র উন্মাদনা শক্তিকে প্রলুব্ধ করাতে, বাদসার অতুলনীয় সম্পদাভবন নিতান্তই হীন ও অপ্রতুল! মতিয়ার মত রমণীকে জীবন সঙ্গিনী কর্‌তে গিয়ে, এ ভাবে মৃত্যুকে বরণ করাও শ্লাঘণীয়! মৃত্যু সে-ত জীবনের শেষ পরিণাম! সকলকেই একদিন বরণ কত্তে হবে! এরজন্য ভীত শঙ্কিত হয়ে, অপরকে কর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট করবার মত কামনা চিরদিনই বর্জ্জনীয়! তবে বাদসা সাহেব! অন্তরে অনেক কথা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে—তা' ব্যক্ত করবার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিতে হইবে। এ আবেদনও কি মঞ্জুর কর্‌বেন না বাদসা সাহেব?

ভীষণ ঝটিকার সময়, উন্মত্ত-নদীর-তরঙ্গগুলি শ্বেতফেণা উদ্গীরণ করিয়া, সর্ব্বনাশী হাসির মতই, মুখ ব্যাদন করিয়া, যেমন ঘোর আবর্ত্তে পতিত ভয়ার্ত্ত আরোহী বর্গের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদকে ডুবাইয়া দিয়া, ক্ষুদ্র তরণীকে উন্মত্ত অধীরে অবলোকন করে, বাদসা সাহেব তেমনি জ্বালাময় অট্টহাসি হাসিয়া, অপ্রসন্ন ভ্রূভঙ্গীর সহিত বলিলেন "তোমার আবেদন মঞ্জুর করা গেল তবে বাদসার সম্মুখে সংযত ভাষায় যা বল্‌তে হয় বল্‌বে,— যদি রূঢ় বাক্যে কোন অবমাননা কত্তে

চেষ্টা কর তবে মনে রেখো, তোমার খুবই অকল্যাণ ঘটবে. —বুঝ্‌লে ?"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া—হোসেন ধৈর্য্যের বাঁধ হারাইয়া ফেলিল। একেবারে উন্মত্ত অধীরের ন্যায়, তীব্র কণ্ঠে, গভীর গর্জ্জনের সহিত বলিতে লাগিল "অকল্যাণ ?—সে-কি বাদসা সাহেব ? মৃত্যুকণে, তীক্ষ্ণ তরবারির নিম্নে দাঁড় হয়ে, আর কী অকল্যাণের ভয়ে, আমাকে ভীত কত্তে পারে ?—মৃত্যু দণ্ড হইতে, আপনার শক্তি বিস্তারের, শেষ ও চূড়ান্ত আদেশ। এই কয় মিনিট পরে আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ধূলায় লুণ্ঠিত হবে, রক্ত প্লাবান মৃত্তিকা ভেসে যাবে, আর আপনি তা' দেখে, আপনার অসীম শক্তির পরিমাপ উপলব্ধি করে, একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাবেন ! বাদসা সাহেব ! দুনিয়ার কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আপনার এ খাম খেয়ালী যথেচ্ছাচারিতা, চিরদিনই একইভাবে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাবে ? আপনি বাদসা,—কিন্তু খোদা দুনিয়ার সকলের বাদসা,—তাঁর অসীম বিধানের হাত কেউ এড়াতে পারে না, আপনিও পারবেন না। সেই শেষ বিচারের দিনের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন,—আপনার ভীষণ অত্যাচারের শাস্তি খোদা একদিন দিবেনই। যদি এ না হয়, দুনিয়ার মালিক যদি পক্ষপাত শূন্য না হন, তবে এ দুনিয়া মিথ্যা,—খোদা মিথ্যা ! তাঁ'র উপর লোক আস্থাহারায় পাপের স্রোতে অবিচালিত চিত্তে চিরদিনই গা ভাসিয়ে দিত ! ভীষণ অত্যাচারের কবলে পরে, কেউ আর প্রতিকারের আশায় প্রাণ খুলে খোদা ! খোদা তার নাম উচ্চারণ কত্ত না। মৃত্যু দণ্ডই ত আপনার ক্ষমতার চরম অত্যাচারের শেষ অস্ত্র ! এ দিয়ে আপনি পবিত্র প্রণয়ের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ, সংহৃত কত্তে চান ? —এ দিয়ে স্বর্গের পুণ্য কুসুমের মন মাতানো সৌরভ নষ্ট করে, পুতিগন্ধময় ব্যভিচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করাবার জন্য—প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে চাহেন ? বাদসা সাহেব ! মৃত্যু ! সে-ত একটা অবস্থান্তর মাত্র ! মতিয়া,—সে-ত আমার কাছে, চিরদিন আমার থাকবে, মৃত্যুর পর আবার আমাদের অভেদ্য মিলন হইবে,—সে দিন সে শুভক্ষণ ত বেশী দূরে নয়, সে অসীম মিলনের উপর বিপর্য্যয় আনয়ন করবার শক্তি বাদসার নাই,—সেই পুণ্য দীপ্তোজ্জ্বল কিরণ নির্ব্বাপিত করবার শক্তি বাদসার নাই,—বাদসার শক্তি, সামর্থ সেখানা অতি ক্ষুদ্র, নিতান্ত নগণ্য, নিতান্ত অস্তিত্বহীন। সে যে মিলন, তার ধ্বংশ নেই বিচ্ছেদ নেই, বিরহ ক্লেশ নেই ! পাছে শুধু অসীম তৃপ্তি, অসীম শান্তি, সে তৃপ্তিই সকলের কাম্য ! আপনাকে আর কি বুঝাব বাদসা সাহেব ? ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যা'রা স্বীয় স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে এক পা যেতে চায় না, পরের অন্তরের অসীম যন্ত্রণা যাদের অনুভব করবার শক্তি নেই, বিলাস নেশায় যা'রা ভরপুর হয়ে, যা'রা দুনিয়াকে একটা পুতি গন্ধময় নরকে পরিণত কচ্ছে তাদের নিকট আর কি বক্তব্য থাক্‌তে পারে ? আর কি আপনাকে বুঝাব বাদসা সাহেব ! আপনার অসীম মরুবক্ষের উপর ক্ষুদ্র জলধারার সৃষ্টি করার প্রয়াস যে নিতান্তই ব্যাকুলতা ! বাদসা সাহেব ! যে ভাবে জীবন যাপন কচ্ছি এর চেয়ে মৃত্যু কি অধিক বাঞ্ছনীয় নয় ? ভাই ঘাতক ! এস, এ মুহূর্ত্তেই আমার মস্তক ছেদন করে, অসীম উদ্বেগের অবসান করে দাও !" বলিয়া হোসেন আলী দ্রুত গতিতে ঘাতকের সম্মুখীন হইয়া, তাহার মস্তক নত করিয়া রহিল। ইহার পর বাকী রহিল তরবারির উত্থান, পতন, তা'পর সব শেষ ! ঘাতক বিবর্ণ মুখে তরবারি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বাদসার ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতে লাগিল ! বাদসা সাহেব মোহাবিষ্টের ন্যায় এক দৃষ্টিতে হোসেন আলীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

মতিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করিল। সহসা তাহার মুখ মণ্ডল আতপ শুষ্ক পদ্মের মত পরিম্লান হইয়া গেল। ভীত ত্রস্ত নেত্রযুগলে একটা উৎকট বেদনার তীব্র আকাশ জাগিয়া উঠিল,—বুকের ভিতর হঠাৎ বড় বেশী ব্যথা বাজিলেই হয়ত সেই রকম ভীত-ত্রস্ত ব্যাকুলতা দৃষ্টির ভিতর ফুটিয়া উঠে ! মতিয়া ছুটিয়া যাইয়া, হোসেন হোসেন আলীর আনত মস্তকের উপর স্বীয় মস্তক সংলগ্ন করিয়া অশ্রু জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব ! আমি আপনার পুত্রবধূ হলেম, এ নিরপরাধিকে, এমনি ভাবে হত্যা করবেন না, এ দৃশ্য যে কি ভীষণ, তা-ত আপনি ... !"

উপস্থিত আমাত্যবর্গ এতক্ষণ একটা অসীম উদ্বেগ বহ্নির তাপে জর্জ্জরিত হইয়া নত মস্তকে বসিয়াছিল !

তাহারা সহসা মতিয়ার স্বীকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, "মতিয়া! তুমিই ধন্যা! অমূল্য নারীরত্ন তুমিই।"

বাদসার আদেশে ঘাতক তাহার তরবারি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। দুইজন পরিচারিকা আসিয়া মতিয়াকে, অন্দর মহলে লইয়া গেল। বাদসা স্বয়ং হোসেন আলীর হস্ত ধারণ করিয়া, তাঁহার খাস কামরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাহাজাদার এবং দৌলতন্নেছার বিবাহের বার্ত্তা, বাদসার আদেশে চারিদিকে প্রচারিত হইল। মতিয়া ও হোসেনের বিষয় সমস্তই গোপনে রাখা হইল। পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় বিবাহের সময় নির্দ্ধারিত করা হইল এবং বিবাহ উদ্যোগে সকলেই, পরম উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিল।

বাদসার আদেশে, কাজি সাহেবকে ও ওস্তাদজী— বৈরাম আলীকে এ বিষয়ে কিছুই জানান হইল না। গোপনেই উদ্বাহ কার্য্য সমাপন করাইবার উদ্দেশ্যে, তাহা-দিগের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইল না।

(ক্রমশঃ)

বেহায়া নন্দা

(শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ)

(১)

ঢাকা শাখারি বাজারের নন্দা ছোড়া রোজ আসিয়া জমিদার স্বপতি বাবুর কুলগাছে ঢিল ছোড়ে। তাকে কত নিষেধ করা হইয়াছে, গুরুতর শাসনের ভয় দেখান হইয়াছে— কিছুতেই সে মানে না। দেখ না দেখ্ আসিয়া ঢিল ছুড়িয়া কুল নিয়া যায়। একদিন একটি ঢিল লাগিয়া জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া গেল, বাবু হুকুম দিলেন, আর অমনি দারোয়ান গিয়া তাকে পাকড়া করিয়া আনিল। নন্দা ভারি চালাক, নিমেষ মধ্যে সে আর এক হইয়া গেল। বাবুর নিকট গিয়াই সে কাঁপিতে লাগিল, যেন তার খুব ভয় হইয়াছে। কত তার কাকুতি মিনতি! বাবুর পায় ধরিয়া কাঁদ কাঁদ সুরে সে প্রতিজ্ঞা করিল কখনও ওরূপ কাজ করিবে না; যদি করে তবে দুই চোখ খায়; এই বলিয়া সে দুই হাতে তার চোখ চাপিয়া ধরিল। দুই এক ফোটা জলও যে তার গণ্ড বাহিয়া না পড়িল তাহা নহে। ছেলে মানুষ—তার এই কাতরতা দেখিয়া বাবুর মন গলিয়া গেল; তিনি এবার তাকে ছাড়িয়া দিলেন। এক পা দুই পা করিয়া আসিয়া নন্দা আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। সে দুই লম্ফে পুনরায় কুলগাছ তলা আসিয়া তীর বেগে আর একটি ঢিল ছুড়িয়া মারিল। ঝর ঝর করিয়া কতগুলি কুল পড়িয়া গেল, আর নন্দা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেগুলির সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। বাবু বাহিরে আসিয়া চোখ রাঙাইলেন। ছোড়াটা এক দৌড়ে সরিয়া গিয়া কুলের পোটলাটা বাবুকে দেখাইয়া মুখ ভেঙ্-চাইতে লাগিল। দরোয়ান আবার তাড়া করিল— কিন্তু এখন আর তাকে পায় কে?

(২)

দরোয়ান খুব হুসিয়ার। বাবুর কড়া হুকুম ছোড়াটা আর একদিন আসিলে তাকে ধরিয়া হাজির করিতে হইবে। নন্দার কিন্তু মোটেই চৈতন্য হইল না। সে আর এক দিন রাত ভোরে চুপি চুপি আসিয়া আবার ঢিল ছুড়িতে লাগিল দরোয়ানও ধীরে ধীরে আসিয়া তাকে পাকড়া করিল। এখন আর বাছাধন যায় কোথা?

"শুয়ারকা বাচ্চা, হারামজাত! তু রোজ রোজ আকে ঢিল ছোড়্তা কাহে? চল্, চল্ বেটা বাবুকা পাশ।"

নন্দা প্রথম অবাক হইয়া হা করিয়া একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন সে কত হাবা—কিছুই জানে না। পরে দরোয়ানের রুদ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া সে জিহ্বামূলীয় ও তালব্য উচ্চারণ বিহীন, প্লুতানুনাসিক ঢাকাই সুরে বলিল—

"কি? কি?— কে দিচে? কে দিচে? আমি বুজি? ঐত-কেষ্টা-ডিল মাইরা গেচে। ঐ যায় ঐ যায়;-দৌড়;- দৌড়—আরে বি গেলত;—যাও না;— এই কি? বেটা আহ্মক নাকি?"

"চুপ রও, হারামজাত। আজ নেহি ছোড়েগা। চল্ বাবুকা পাশ। দোস্রা দিন আকে তু বাবুকো গাল দে গিয়া।"

এই বলিয়া দরোয়ান তাকে টানিয়া নিয়া চলিল। জমিদার বাবুর নিকট গিয়াই নন্দা চীৎকার করিয়া বলিল—“বাবু, আমি না—আমি না। ঐত—কেষ্টা বেটা ইট মারিয়া গেচে।”

বাবু তাকে দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তার মুখে এক ঘুসি মারিয়া দিলেন। তারপর চাবুক হাতে করিয়া তিনি যখন তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—আজ আর রক্ষা নাই। অমনি সে কাঁদিয়া উঠিল, বাবুর পায় পড়িয়া তাঁকে ধর্ম্মের বাপ ডাকিল; আর কখনও ওরূপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

এবার কিন্তু বাবুর মন গলিল না। তিনি তার পিঠে নির্ম্মম এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিলেন। “অ—মাইল” বলিয়া নন্দা ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু তবুও ছাড়া ছাড়ি নাই; ক্রমে বাবু তার সর্ব্বাঙ্গে আরও কয়েক ঘা বসাইয়া দিলেন। নন্দা তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, উদরের ধন কুল গুলিকে তখনও সযত্নে অঞ্চলে অথবা উদরের মধ্যেই রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পারে কৈ? চাবুকের চুটেই সে অস্থির। কুলগুলি বারিধারার ন্যায় ঝর ঝর করিয়া তার অঞ্চল হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মুখের কুল দুইটিও অর্দ্ধ চর্ব্বিত অবস্থায় টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। পরে বাবু সরিয়া গেলে দরোয়ান গলা ধরিয়া তাকে বাহির করিয়া দিল। প্রাণ তার কিন্তু মোটেই আসিতে চায় না, তার অতি সাধের কুলগুলি যে সেখানে পড়িয়া আছে। বাহিরে আসিয়া সে ক্ষণকাল ঐগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সেগুলি পাবার আর কোন আশা নাই দেখিয়া সে ক্ষুণ্ণমনে এক পা এক পা করিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল।

খাজাঞ্চি বাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছেন। এই মার দেখিয়া তাঁর বড় কষ্ট হইয়াছে। নন্দা নিকটে আসিলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

“আহা! কি নিষ্ঠুরতা! একেবারে রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছে।”

শুনিয়া উপেক্ষার সহিত নন্দা বলিল,—“না, না,—ও বি রক্ত বি কিচ্ছ্‌ না। পেচ্‌ড়া বি আচ।”

নায়েব বাবুও নিকটে ছিলেন। তিনিও সহানুভূতির সহিত বলিলেন,

“আহা দাত দিয়াও রক্ত বাহির হইয়াছে।”

নন্দা এবার মহা বিরক্তের সহিত ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—

“আবে না।—ওরবি কিচ্ছ্‌না। দাত বি চুকাবি আচে।”

এই বলিয়া কুলগাছ তলায় যে কয়টি কুল পড়িয়া ছিল সে সেই কয়টি কুড়াইয়া লইল এবং একটি একটি করিয়া একাগ্রচিত্তে বেশ তৃপ্তির সহিত সেগুলি চিবাইতে চিবাইতে ধীর মন্থর গতিতে সে চলিয়া গেল।

খাজাঞ্চি বাবু সব দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া বলিলেন,

“ছোড়াটাত বড় বেহায়া।”

সাহিত্যের স্বরূপ

(শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বি, এ)

সাহিত্যসেবা—এ এক অতি বড় সাধনা। এ সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করিয়া ইহার অপরিপক্ক বীজ যাঁহারাই সংসারে ছড়াইবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহারাই যে ফলে সমাজকে পঙ্কিল ও কলুষিত করিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অপরিপক্ক হস্তে অঙ্কিত চিত্র কখনও কুৎসিৎ কখনও পঙ্গু কখনও বা বিভৎস হইয়া উঠে। সাহিত্যের আদর্শ ইহারা এমনি ভাবে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন,—তরুণের মস্তিষ্কে এমনি উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বপন করিতেছেন যে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে যতীন বাবুর মত আরও অনেকের হস্তে কড়া চাবুক সংস্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছে।

এই সাহিত্যসভার কথা প্রসঙ্গে আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন সাহিত্য জিনিষটা কি! সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়? অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্পর্দ্ধা আমার নাই আমার মত দীন লেখকের সে চেষ্টা করণও বোধ হয় পরিহাসেরই বিষয় হইবে। তথাপি অদ্যকার দিনে বন্ধুর ঐ প্রশ্নের আলোচনা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করিয়া সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য দুই চারিটী কথার আলোচনা করিতে সাহসী হইলাম। আমার

দুঃসাহসিকতা আপনাদের মত সুধীজনের কাছে অবশ্য মার্জ্জনীয় হইবে ইহাই আমার ভরসা।

সাহিত্যের সঠিক একটা সংজ্ঞা আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে কি না আমার জানা নাই তবে সাহিত্য বলিতে কি বুঝি তাহা বোঝান চাইতে সাহিত্য বলিতে কি বুঝি না তাহাই বোঝান মনে হয় কথঞ্চিৎ সহজ। "তাই নেতি" সংজ্ঞা দ্বারা সাহিত্যের স্বরূপ প্রথমতঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্য কোন বিশেষ রাজনীতি সমাজনীতি, যৌননীতি অথবা কোন শাস্ত্র কি বিজ্ঞান দর্শনের সমস্যা (Problem) সংসাধনের স্থান নয়। সাহিত্য bare Politics Sociology কি Sexusicgy হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ঐ সব নীতি কথা লইয়া অবশ্য সাহিত্য নিজকে গড়িয়া তুলে কিন্তু ঐ সব নীতি কথাই তাহার সর্ব্বস্ব নহে। যেখানে সর্ব্বস্ব দাঁড়ায় সেখানে সাহিত্য কখনও বা সংবাদ পত্রের Editoria হইয়া কি leader আখ্যায় পরিণত হয়। কখনও বা বিদ্যালয়ের নীতি কথা বলিয়া বিদ্রোপাত্মক হাসির উদ্রেক করায়। সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থান নিশ্চয়ই সাহিত্যে সুশোভন হয় না। পরিবারের বড় কর্ত্তার মত একজনের অবিরাম উপদেশ কি তর্ক কলহ সাহিত্যের খাটী পরিচয় নয়। সাহিত্য ইতিহাসও নয় যে ব্যক্তিগত জীবনের খুটী নাটী ঘটনার ধারাবাহিক পরিচয় সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে সাহিত্য ব্যক্তিগত জীবনের হুবহু ফটোগ্রাফ কখনও তোলে না। তাই বলিয়া সাহিত্য আবার আরব্যোপন্যাস ও নয় যে বাস্তবকে একেবারে বিদায় দিয়া সাহিত্য কল্পনার বেলুনে চড়িয়া একটা অসম্ভব সৃষ্টি করিবার জন্যই মানুষের মর্ম্মলোকে সে সর্ব্বদা ঘুড়িয়া বেড়াইবে।

তবে সাহিত্য কি? সাহিত্য অনেক উদার অনেক ব্যাপক। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যৌননীতি, ইতিহাস উপন্যাস সবই সাহিত্যের মধ্যে Immanent ভাবে (অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে) জড়িত আছে। সাহিত্য ঐ সবকে Transcend করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত সমস্যাকে ছাপাইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। সাহিত্যের রসে জগতের সমস্ত সমস্যা সরস, সতেজ, সুন্দর হইয়া মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

রস সৃষ্টি করাই সাহিত্য শিল্পীর বড় কাজ। সমস্ত সমস্যাই ফল্গুর অদৃশ্য ধারার মত দৃষ্টির অন্তরালে বিদ্যমান অথচ যে সাহিত্য তাহার রস সম্ভার দিয়া মানুষকে সমস্যার চাপ হইতে রক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধে দাঁড়া করাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত সেই সাহিত্যই খাঁটী সাহিত্য। জগতের সৃষ্টি সম্ভার যেমন শারীরিক বিলাসের উপকরণ তেমনি সাহিত্য মানুষের মানসিক বিলাসের উপাদান। সাহিত্য তাহার বিলাস দিয়া মানুষকে আত্মভোলা করিয়া রাখে। অভাব অভিযোগ প্রপীড়িত মানুষ যখন সংসারে কিছুতেই শান্তি পায় না তখন সে যদি সাহিত্যের দুয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করে সাহিত্য তাহাকে ক্ষণকালের জন্য নিত্যকার জীবনের দুঃখ বেদনা হইতে মুক্ত করিয়া দেয় সংসারের প্রাত্যহিক কলহ, হীনতা, তুচ্ছতা হইতে দূরে রাখিতে সক্ষম হয় জীবন ব্যাপী হা হুতাশ হাহাকার আর্ত্তনাদের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তির পূত গঙ্গা প্রবাহিত করিয়া দেয়। সাহিত্যই মনোরাজ্যে শান্তি প্রবাহ ছুটাইবার একমাত্র ভগীরথ। পাখীরগানে, নদীর কল্লোলে, বিরাট প্রান্তরে, বিশাল পর্ব্বতে, সুদূর আকাশে, শুষ্ক মরুতে রস সম্ভার আহরণ করিয়া সাহিত্য বিশ্বমানবের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা শিব, যাহা সত্য, যাহা সুন্দর তাহাই সৃষ্টি করে। এই সাহিত্য আমাদের বরণীয় কাজ আমাদের সহনীয় কর্ত্তব্য এবং আমাদের সৎ প্রবৃত্তির পরিপোষক হোক্। ইহার অপূর্ব্ব মহিমায় আমাদের আবর্জ্জনাময় জীবন ক্লেদমুক্ত হইয়া অপরূপ মাধুর্য্যে ও গৌরবে মণ্ডিত হউক্। এ মিলন মন্দির বাণীর অমৃত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত ও সাহিত্যের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হউক্। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন। *

মইষাল বন্ধু

(শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার বি, এ)

(পল্লী-গীতিকা)

শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থে যে সব যুবক যুবতীর প্রেমাখ্যান লিপিবদ্ধ দেখি, আমরা শুধু তাহাদেরই অন্তরের যথার্থ পরিচয় পাই। আমরা নয়ন ভরিয়া দেখি উদয়ন বাসবদত্তা বা তজ্জাতীয় উচ্চবংশোদ্ভূত যুবক যুবতীর প্রেমলীলার চিত্র; যাহা অমর কবির তুলিকার বিচিত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ভাবিতেও

* জামালপুর সাহিত্য সভায় পঠিত।

পারি না যে অশিক্ষিত অনাদৃত পল্লীকবিদের রচনায়ও এই প্রকার সুন্দর প্রেমচিত্র স্থান লাভ করিতে পারে।

আজও কত করুণ, প্রাণস্পর্শী প্রণয় গীতি পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে কৃষক কণ্ঠে বাজিয়া উঠে! এই সমস্ত গীতিকার আখ্যান বস্তুতে দেখিতে পাই কোন পল্লীবাসিনী তরুণীর মধুর পূর্ব্বরাগ, পর্ণকুটির বাসিনী অভিসারিকার অপূর্ব্ব প্রেমলালা কিংবা কোন বিরহ-বিধুরা নবীনার অশ্রুমাখা উচ্ছ্বাস। সুরের মাধুর্য্যে, পদের লালিত্যে এবং সর্ব্বোপরি একটা "মন প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার" অপকট ভাব পরিস্ফুটনে এই অমূল্য পল্লী-গীতি লহরী যাবচ্চন্দ্র দিবাকর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবে সন্দেহ নাই।

আজ আমরা এমনই একটী রসাল গীতিকার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইব যে গীতের অন্তরালে এক প্রেমময়ী তরুণী যেন মূর্ত্ত প্রাণবন্ত হইয়া আমাদের মানস চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

সরলা পল্লীবালা সে—"প্রেম" কথাটা পর্য্যন্ত কোন দিন শুনে নাই—কিন্তু এই নিরক্ষর যুবতীই অতীতের কোন এক পল্লীপথে তরুবীথিকার তলে দাঁড়াইয়া আপনার সমস্ত বিলাই দিয়া আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছিল ;—

মইষও রাখ মইশাল বন্ধুরে
ক্ষীর নদীর পারে
অরণ মইষে খাইল খেত গো
বাইন্ধা নিব তোরে রে
পরাণ কান্দে মৈশাল বন্ধু রে।

এই 'মইশাল বন্ধু'টি জনৈক মহিষ রক্ষক—বলিষ্ঠ দেহ শ্যামকান্তি সুন্দর যুবক সে—গায়িকা তাহাকে গোপনে গোপনে ভালবাসিত ; আজ ঘটনাচক্রে সেই গোপন প্রেম প্রকাশ পাইবার পথ পাইল। এক আরণ্য মহিষ কে (অরণ মহিষ) গৃহস্থের শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি করিতে দেখিয়া সে তার মইষাল' বন্ধুর বিপদ আশঙ্কা করিল। বুদ্ধিমতী পল্লী যুবতীর এই আশঙ্কা অমূলক নয় ; কারণ গৃহস্থ আসিয়া যখন এই বন্য মহিষটাকে দেখিতে পাইবেন না তখন সে নিশ্চয়ই মনে করিবে অনতি দূরে যে মহিষ রক্ষক বাস করে তাহার মহিষেই শস্য নষ্ট করিয়াছে। কাজেই শাস্তি দিবার জন্য বা ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য তাহার পরাণ বন্ধুরে বাইন্ধা নেওয়া' কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তরুণী বোধ হয় তখন মহিষ রক্ষককে সাবধান হইবার জন্য এই গীত গাহিয়া গজেন্দ্র গমনে জল আনিতে গিয়াছিল ; কিন্তু জল লইয়া ফিরিবার পথে দেখিল সে ক্ষেত্রস্বামী তাহার প্রিয়তমকে আটক করিয়াছে। যুবতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই দৃশ্য সে তার প্রণয়োচ্ছ্বাস কেমনে চাপিয়া রাখিবে? যাহা এতদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতেছিল আজ তাহা কূল প্লাবিত করিয়া সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত হইল। লজ্জা, ভয়, মান, অপমান কোন কিছুর বন্ধনই সেই স্রোতাবেগের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। বিপন্না নারী তাড়াতাড়ি কলসী ফেলিয়া ক্ষেত্রস্বামীর চরণে পতিত হইল এবং কাতর কণ্ঠে গাহিল :—

মাইরনা ধইরনা গিরস্তরে * (১)
হাতে না দিও দাঁড়
হাতের পৈছা বেইচ্চা (২) দিবান ত
অরুণ মইষের কড়ি রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

বন্য মহিষ গৃহস্থের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণার্থে সে তাহার 'হাতের পৈছা' বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রেমাস্পদকে বিপন্মুক্ত করিতে গিয়া সে আজ নিরাভরণা হইতেও কুণ্ঠিত নয়। এই যে ত্যাগ স্বীকার এবং প্রাণ ঢালা ভালবাসার সংবাদ উপরের গীতাংশদ্বয় হইতে পাইতেছি তাহার মাধুর্য্যকে পাড়গেঁয়ে বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না ; কারণ প্রেম যে স্পর্শ মণি!

* * * *

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিরূপে মিটমাট হইল তাহার ঠিক খবর আমরা রাখি না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অবলার কাতর অনুনয়ে, আকুল রোদনে পাষাণও গলিয়া যায়।

যাহা হোক ঐ ব্যাপারের মীমাংসা হইবার পর, দিনের পর দিন যায় রূপসী পল্লীবাসিনীর প্রেম পিপাসা বাড়ে বৈ কমে না। সে ভাবিল তাহার অন্তরের গুপ্ত-কথা যখন লোক জানা জানি হইয়া গিয়াছে তখন আর ইহা চাপা দিবার

* ১। গৃহস্থ ২। বিক্রয় করিয়া ৩। দিব।

বিফল চেষ্টা কেন? তবে আর লোকলজ্জার ভয় রাখিয়া কি হইবে? তাই একদিন মাঠের ধারে সে তাহার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিল। যৌবনময়ী তাহাকে আপন বাটীর পথ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া বলিল ;—

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু
এই না বরাবর।
উচা ভিটা কলার বাগ
পূব দুয়াইরা ঘর রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

তাহার পর বন্ধুকে সে কি বসিতে দিবে, কি খাওয়াইবে এবং কিরূপ আদর যত্ন করিবে পরের গীতাংশে তাহাই প্রকাশ করিল :—

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু
বইতে দিব পিড়া ;
জলপান করিতে দিবাম
শাইল ধানের চিড়া রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।
শাইল ধানের চিড়া নারে
বিন্নি ধানের খই
গাছে পাকা সপ্‌রি কলা
গামছায় বান্ধা দই রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

মইষাল বন্ধুকে সে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে কিনা, তাই সে গ্রাম-সুলভ সমস্ত উপাদেয় খাদ্যই বন্ধুর জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছে। প্রথমতঃ শাইল ধানের চিড়ার কথা বলিয়া পরক্ষণেই ভাবিল হয়ত এই জিনিষটা বন্ধুর মনঃপূত হইবে না। তাই পরপদে সে আপন ভুল সংশোধন করিয়া আরও উৎকৃষ্টতর খাদ্য বিন্নি ধানের খইএর কথা প্রকাশ করিল। গাছে পাকা সপ্‌রি কলা সব চেয়ে মিষ্ট এবং সুস্বাদু, খইএর সঙ্গে সেই কলাই দিবে। শুধু তাহাই নয়, সে নিশ্চয়ই জানিত যে "গব্যহীনং কুভোজনম্‌" তাই তাহার প্রিয়বন্ধুর জন্য দধির ব্যবস্থাও করিতে ভুলিল না। সেই দই আবার এত জমাট যাহা নাকি 'গামছায়' বাঁধিয়া রাখা যায়।

যুবতীর প্রত্যেকটী কথাই গভীর ভালবাসার পরিচায়ক ; কিন্তু যাহাকে এতগুলি কথা বলা হইল সে কেন একটী কথারও উত্তর দিল না—আমরা তাহার প্রাণের খোঁজ কেন পাইলাম না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসিতে পারে। প্রেমিকার এই মিলনোৎসবের নিমন্ত্রণে যুবকের মনেও যে প্রেমের প্রেরণা আসে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে যেন আজ নীরব কবি! এই অচিন্তিত সুখের উদয়ে সে আজ মৌন, গম্ভীর হইয়া রহিল ; একটী কথারও উত্তর দিতে পারিল না।

* * * *

রজনী দুর্য্যোগময়ী। কালো মেঘগুলা সমস্ত আকাশটার বুক জড়াইয়া ধরিয়াছে। মিলনাশার নেশায় দাদুরীদল যেন মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছে। কিন্তু এরূপ বাদলা রাতেই না জানি কে চোখের ঘুম চুরি করিয়া লইয়া যায়, ক্ষণে ক্ষণে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" প্রিয় মানুষটীকে মনে পড়ে। তাই বুঝি এমন দুর্য্যোগের রাত্রিও সেই মহিষ-রক্ষকের গুপ্ত অভিসারের পক্ষে কিছুমাত্রও বাধা জন্মাইতে পারিল না। প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুকে এমন রাত্রে সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত দেখিয়া নায়িকা বলিয়া উঠিল :—

মেঘ আন্ধাইরা (১) রাইত গো (২)
বাঘের বড় ভয়।
তুমি কেন আইলা বন্ধু
আমি গেলাম অর রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে॥

শুধু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নয়, তখন আবার জঙ্গল ভরা সেই গ্রাম্য ব্যাঘ্রেরও উপদ্রব ছিল। যুবতী বন্ধুকে জানাইল যে এত কষ্ট করিয়া না আসিয়া একটু অপেক্ষা করিলেই আপন ঘরে তাহার দর্শন পাইত। যুবকের এই দুঃসাহসের সে তো প্রশংসা করিতে পারে না ; সে যে স্নেহময়ী, ভয়শীলা, নিতান্ত কোমল হৃদয়া পল্লীবালা! বন্ধু ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইলে তাহার যে দুঃখের সীমা থাকিবে না! প্রণয়ীর জীবন তাহার নিকট অমূল্য ধন! তাহার কাছে নিজের জীবন অতি তুচ্ছ! তাই সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও বন্ধুর বাড়ী যাইতে প্রস্তুত ; কিন্তু তার 'মাথার কিরা'—বন্ধু যেন এমন রাত্রে ঘরের বাহির

না হয়। এইখানেই 'মইষাল বন্ধুর' পালা শেষ হইল। ইহার বেশী আমরা কিছু জানিতে পারি নাই, বোধহয় জানা আবশ্যকও করে না। এমন-ই কত প্রেমপুষ্প পল্লীর নিভৃত কোণে নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়াছে—এমন-ই কত পবিত্র-প্রণয়-প্রদীপ অন্ধকার পল্লী আলোকিত করিয়া আবার কখন নিবিয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার খবর রাখেন না। সুখের বিষয়, উপযুক্ত সাহিত্যসেবিগণকে এই সমস্ত পল্লী-গীতিকার সংগ্রহে সচেষ্ট দেখিতেছি।

ধ্যানের দেশ

(শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

ভবনে ভুবনে যে ভূমি-স্বর্গ খুঁজিয়াছি মনে মনে,
বিংশ বর্ষ যাহারে ধেয়ান করেছি সঙ্গোপনে,
এতকাল পরে পেয়েছি তাহারে,
স্তিমিত মনের মাধুরী মাঝারে,
পাতা ঝিকিমিকি পল্লী-কাননে ঝিল্লীমুখর রাতে
ভাতিল বুঝিবা শশীর শীতল রজত-রশ্মিপাতে!

কত হাসি-গানে, পাখী-কলতানে সুরের সূত্র ধরি'
যেতে সেই দেশে আধোপথে এসে আন-পথে ঘুরে মরি!
চেতনাবিলীন অতি উদাসীন
কেটেছে এমনি কত নিশিদিন,
কত বিদ্রূপ ব্যঙ্গবচন বিঁধেছে বাণের মতো!
ঘূর্ণাবর্ত্তে ভাঙেনি আবেশ, হইনি মর্ম্মাহত।

এতদিন পরে লভিনু যে-দেশ, যেথায় নিবসে হিয়া,
পারি না বুঝাতে বন্ধ্যা ভাষায় রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া।
পুলক-ব্যথায় সারা অন্তর
দীপশিখা সম কাঁপে থর-থর,
বলার চেয়েও হয়েছি কাতর না-বলার গুরুভারে;
যাই দুঃসহ আবেগে বুঝিবা মৃত্যুর পরপারে!

হেরিনু সেথায় সবি সুন্দর, চির-তারুণ্য রাজে!
স্বাস্থ্য-শোভন নরনারীগণ ঘোরে অকারণ কাজে।
নাহি হাহাকার ঘৃণা লাজ-ভয়,
সবি স্বাভাবিক মহাসুখময়,
বিরাজিছে চির-পূর্ণিমা রাতি, গান গেয়ে চলে সবে;
শরীরী সবাই, শরীরের ক্ষুধা ভুলেছে সগৌরবে!

সেথায় সকল যুগের গরিমা রূপবান্ রূপবতী
পরমানন্দে মগ্ন সবাই ঘেরিয়া মদন রতি!
জ্যোৎস্না-দীপিত দীর্ঘ দীঘিতে
করে জলকেলি হাসিতে হাসিতে,
শত অরুণিম লুলিত তনুয়া জ্বেলেছে অনল জলে!
কত অভিসারী করে পায়চারি পুষ্পিত তরুতলে!

শিসিছে দোয়েল, গায়িছে কোয়েল চির-বসন্ত-দেশে
মাথার উপরে 'বৌ-কথা কও' সুর যায় ভেসে ভেসে!
বধূরে পরায়ে বকুল-মালিকা
রহে মুখোমুখী প্রেমিক প্রেমিকা,
হেরি' সে সুষমা 'চোখ গেল' বলি' রব করিছে পাখী!
মানবের সাথে দেবতারা সেথা করিতেছে মাখামাখি!

নীপ চাঁপা বেলি বকুল চামেলি গোলাপ মহুয়া ফুলে
মৌমাছিগুলি ঝিমায় কেবলি, মধু-পান যায় ভুলে!
রূপসী-কপোলে কভু বসে আসি,
কখনো সরোজ-কমল-নিবাসী,
প্রজাপতি সব চেলি 'পরে বসি' মোহিনী করেছে নারী!
বন্য হরিণ ময়ূর অভয়ে চরিতেছে সারি সারি!

বস্তু-জগতে ধেয়ানের দেশ ভাতিল আঁখির আগে!
আত্মার হেন বাসভূমে যেন রহি প্রেম অনুরাগে!
চাহিনা ঈর্ষা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব,
মিটেছে মনের সকল সন্দ,
চির-সুন্দর দেশ থেকে আর ফিরিতে চাহি না কভু!
কাম কামনার কোলাহলে কেন কেবলি কাঁদাবে, প্রভু!

আমেরিকার পত্র

[বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামের দিনে আমদের দেশবাসী একজন মুসলমান যুবক কি ভাবে স্বাধীন দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনোপায় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে তাহা পাঠক পত্রে অবগত হইতে পারিবেন। পত্রের লেখা হইতে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা ও দ্রুত উন্নতিরও পরিমাপ করিতে পারিবেন। যুবক কি উদ্দেশ্যে ও কি প্রকারে স্বাধীন দেশে তাহার জীবন সংগ্রামের আয়োজন করিল তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকার আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া আমাদের অবস্থা কি, সকলেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সোঃ সঃ]

July 22. 1929.

মহামান্যবর সমাচার এই যে মহাশয় আমি আপনার আসিব্বাদে ঈশ্বর আমাকে মঙ্গল মতেই রাখিয়াছে আপনার মঙ্গল চাই পর সংবাদ এই আপনি আমার নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমি পাইয়াছি জানিতে পারিলাম আপনি আমেরিকা হাল অবস্থা জানিতে চান আমাদের ভারতবর্ষের লোক প্রায় ৩০০০ হাজর তিন হাজার লোক আমেরিকা আছে সব জিলার লোকই আছে আমরা আমেরিকার লোকের সঙ্গেই কাজ করি এবং তাহারা যে বেতন পায় আমরাও তাহাই পাই পরিশ্রমের কাজ করি মাসিক বেতন দুই শত টাকা হয় ইহাতে নিজের খরচ চালাইতে হয় আর বাসা বারা মাসিক ত্রিশ টাকা দিতে হয়। আর জানিবেন হোটলেও খাই এবং নিজে পাক করিয়াও খাই আর জানিবেন এই দেশে হিন্দু মুসলমানের কোন বিবিন্নতা নাই দুনিয়ার যত জাত আছে সবেই একত্রে বসিয়া খানা খাইতে হয় আর জানিবেন আমেরিকা ফ্রিরি দেশ সব বিসয়ে ভাল ফ্রিরি ইস্কুল লেখা পড়া শিখিতে বেতন লাগে না। পর সংবাদ শীতের দিন ভয়ানক ঠাণ্ডা তখন বড় কষ্ট আর জানিবেন আমাদের ভারতের লোক বিস্তান ও এই খানে আছে সবেই পরিশ্রমের কাজ করিতে হয় আর এই দেশের লেখা পরা চাক্রি বেশি মেয়ে লোকেই করে ইস্কুল শিক্ষক মেয়ে লোক বেশি আর আর আমাদের ভারতবর্ষের লোক প্রায়ই এই যায়গায় আসিয়া ইংলিশ লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং দিনে কাজ করি আট ঘণ্টা এবং রাত্রে ইস্কুলে দুই ঘণ্টা লিখিতে হয়, এই জুলাই মাসের শেষ আমার আমেরিকা ৫ বৎসর হইবে আর বের জানিবেন ৫ বৎসরে দেশে টাকা পাঠায়াছি পাঁচ হাজর পাঁচ শত এবং বেঙ্কেও হাজার টাকার বোজ আছে আর জানিবেন বেশি পরিশ্রমের কাজ করিতে পারিলে পঁচিশ টাকা দিন লোকে কামাই করে আপনি আমার ঠিকানা কি করিয়া জানিয়াছেন তাহা লিখিবেন যে ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছেন সেই ঠিকানায় ময়মনসিংহ জিলার আবদুল গনি নামক এক জন লোক মারা গিয়াছে তাহার ঠিকানা গ্রাম গণ্ডা এবং পোঃ সান্দি কোনা তাহার প্রায় সারে পাঁচ হাজার টাকার বোজ বেঙ্কে আছে তাহার সব সংবাদ আমি জানায়াছি তাহার বাড়ীতে এখন তাহারা টাকা পাইয়াছে কি না জানিতে পারিলাম না। এই দেশের টাকা হইয়াছে ডলর এক ডলরে দুই টাকা ছয় আনা হয় অধিক কি লিখিব আমি ভাল আছি আপনার মঙ্গল চাই আমার এখন এই নতুন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন ইতি শ্রীআবদুল কাদির।

Abdul Kadir 1769. 3 Rd, Ave. New york city N. Y. U. S. A.

পরলোকে গগনচন্দ্র হোম

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিগত ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে গগনচন্দ্র হোম মহাশয় তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। গগনবাবু কিশোরগঞ্জ মহকুমায় সুহিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ সহরে আগমন করেন তখন এই নগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন অত্যন্ত সজীব ছিল। তিনি এই নবধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তারপর যখন তিনি প্রকাশ্যে উক্ত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন তখন তাহাকে যে কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল এখনকার যুবকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এই সব সামাজিক নির্য্যাতন গ্রাহ্য না করিয়া তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন।

গগনবাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা গমন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি প্রাচীন মেটকাফ হলে অবস্থিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদলাভ করেন। পরে ঐ পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যে যোগদান করেন। এই কার্য্যে তিনি এমন দক্ষতা প্রদর্শন করেন যে অবশেষে ঐ আফিসের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন।

গগনবাবু ছাত্রজীবন হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথম হইতেই "সঞ্জিবনীর" একজন সেবক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইহা ব্যতীত "আলোচনা" মাসিক পত্রও সম্পাদন করেন। তিনি অধিক সময় "সঞ্জিবনীর" সেবায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক ও বাঙ্গালার সাহিত্যের একজন সুপরিচিত সেবক। আমরা পরলোকবাসী আত্মার শান্তি কামনা করি।

সৌরভ সঙ্ঘ

স্বর্গীয় কেদারনাথের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে "সৌরভ" বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারে যে কতিপয় অমূল্য ও স্বতন্ত্র রত্ন অর্পণ করিয়াছে তাহার বিচার বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক অবশ্যই করিবেন। এই অনন্যমনা সাহিত্য-সন্ন্যাসীর ছায়াতলে বসিয়া এ জেলায় একান্তে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যিক পরিবারটি কেদারনাথকে অবলম্বন করিয়া "সৌরভ সঙ্ঘে" রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষের মৃত্যুর পর নানা বিশৃঙ্খলার জন্য এই সঙ্ঘের কার্য্য শিথিল হইয়া পড়ে।

আমরা পুনরায় ভগবানকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সৃষ্ট সঙ্ঘটিকে পুনরুদ্বোধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের ইচ্ছা ময়মনসিংহে এখন একদল সুস্থ সবল চিন্তাশীল লেখক সৃষ্ট হউক্, যাহাতে ময়মনসিংহ তাহার বিশেষত্ব প্রদান করিয়া বিশ্বের দরবারে গৌরব রক্ষা করিতে পারে। শারদাগমের সূচনায় উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করি, সৌরভামোদী সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এ জেলার সাহিত্যানুশীলন প্রচেষ্টাকে সম্পদশালী করিয়া তুলিবেন।

নিবেদন—

পূজা সমাগত প্রায়। এখন দেনা পাওনা শোধ করিতে হইবে। সে জন্য গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা তাঁহাদের দেয় সাহায্য সত্বর পাঠাইয়া মাতৃভূমির সাহিত্য চর্চ্চায় সহায়তা করিবেন। নতুবা আগামী ভাদ্র ও আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরণ করিয়া সাহায্য মূল্য গ্রহণ করিব। বলা বাহুল্য ভিঃ পিঃ ডাকে ।০ আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

সৌরভ :—

দক্ষযজ্ঞে সতী

সপ্তদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৬। সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা।

জাগো, মা !

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(১)

আজ শরৎ-শোভা সুড়্‌সুড়ি দ্যায় মনের মাঝে, ভাই রে !
কাজ তফাৎ রেখে চাল্‌সে চোখে তাকাই শুধু বাইরে !
ভরা নদীর বুকে ছুটছে সুখে গান গেয়ে সব মাল্লা !
ধরা সবুজ রূপে প্রাণ কাড়ে মোর, বাড়্‌লো মনের পাল্লা !

(২)

তীরে কাশ্‌ফুলে ঢেউ উঠ্‌ছে দুলে, ভুল জাগে সেই নৃত্যে !
ধীরে জল ভরে' যায় পল্লীবালা তুফান তুলি' চিত্তে !
হেসে শিউলিকুসুম থল্‌কমল আর রঙন মাতে রঙ্গে।
ভেসে যাচ্ছি নভে জ্যোস্নারাতে সফেদ্ মেঘের সঙ্গে !

(৩)

তবু এত সুখের মধ্যে আমার আঘাত বাজে বক্ষে !
কভু ভুল্‌বো না গো, ভুল্‌বো না তা, বন্যা বহে চক্ষে !
যায়, দিনের পরে দিন চলে যায়, যাচ্ছে ক্রমে বর্ষ !
হায়, অতীত এবং বর্ত্তমানে কোথায় প্রাণের হর্ষ !

(৪)

তুমি পার্ব্বতী গো আস্‌ছ নিয়ে সব গরিমা গর্ব্ব !
চুমি তাই তো তোমার রাঙা চরণ, রইছি তবু খর্ব্ব !
কত রূপ দিলে গো, সেই দেমাকে ডুব্‌ছি পাপের পঙ্কে !
যত হীন মরণে ধুঁক্‌ছি মোরা কাম্‌-পিশাচের অঙ্কে !

(৫)

যেচে ধন দিতেছ, সেই ধনে খাই কেড়ে দুখীর অন্ন !
বেচে বাস্তুভিটে মর্‌ছে ছুটে, হায় কি মতিচ্ছন্ন !
কেন জ্ঞান দিলে গো রইতে কূপে ভেকের মতো বদ্ধ !
যেন কুয়ার মাঝে দুনিয়াদারী ! পাঁচিল্‌-ঘেরা অন্ধ !

(৬)

ভেবে দেখ্‌ছি মাগো মগজ্‌-ভরা দিলে কতই বুদ্ধি !
এবে ছল চাতুরী বাড়্‌ছে তাতে, আর হবে কি শুদ্ধি ?
ক্রমে লোপ পেয়েছে মানবতা, চল্‌ছে পাশব কর্ম্ম !
ভ্রমে যাচ্ছি নেমে অধঃপাতে হারিয়ে ফেলে ধর্ম্ম !

(৭)

ভবে মোদের মাঝে উঠ্‌বে ফুটে আর কি মনুষ্যত্ব ?
কবে পুণ্য-বলে কর্‌বো আদায় জাতির সকল স্বত্ব !
মাগো, প্রবঞ্চনার শ্মশান মাঝে রচতে পুনঃ স্বর্গ,
জাগো আবার তুমি বিরাট্‌ রূপে নিয়ে তোমার খড়্গ !

যুগ-প্রবাহ

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায় এম্, এ]

অতি আধুনিক চিন্তা-জগতে জগৎ-রহস্যে মানবের স্থান নিয়া দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই আন্দোলনের উন্মাদনা সম-সাময়িক যুগের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই স্পর্শ করিয়াছে। এমন কি, বিশেষ বিশেষ মতবাদ সম্বন্ধে জটিল বিতণ্ডার উদ্ভব হইয়া আলোচ্য বিষয় ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ যদি ভবিষ্যতের কাছে "rationalism"এর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তবে এই যুগ-প্রবাহে তাহার "intolerance" নামক প্রবৃত্তিটি পরিত্যাগ না করিলে চলিবে না। কারণ এই অসহিষ্ণুতা অন্ধতারই নামান্তর। আজ মানুষ তাহার নূতন দৃষ্টিদ্বারা তাহার নিজের ও পারিপার্শ্বিক জগতের স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত; সে এই জাগতিক বিবর্ত্তনের সংঘাত পরম্পরার মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য, আদর্শ, এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ "personal equation" বিরহিত, compromiseless অর্থাৎ রফাশূন্য এবং খাটি বৈজ্ঞানিক সত্য হউক—এই তাহার ইচ্ছা। ইহার পক্ষে বাধা অনেক, এবং প্রত্যেক যুগেই এই প্রকার বাধা উপস্থিত হইয়া মানবের স্বাধীন সত্যানুসন্ধিৎসাকে ব্যাহত করিয়াছে। য়ুরোপীয় রেঁণাসেস্ tradition এবং conventionএর আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া মনকে clean slateএ পরিণত করিতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও সরিষার ভূত গোড়ামির গলদ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। তারই ফলে বর্ত্তমান যুগের চিন্তা-ব্যাপারে হয়ত বা একটু অত্যধিক উগ্রতা পরিলক্ষিত হইতেছে, হয়ত বা একটু অতিমাত্রায় Scepticism অর্থাৎ সন্দেহ-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে। অজ্ঞতাজনিত আত্ম-সন্তোষ ভাবী বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন এমন কি নব নব গবেষণাকেও বর্জ্জন করিয়া চলিতে চাহে; কিন্তু তাই বলিয়া শান্তিকামী নীতিবিৎ সকল সময়েই ভাঙ্গনকে চাপা দিতে পারেন না। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে গোড়ামি বিবর্জ্জিত; এখানে আগে হইতেই unitarianism বা একমেবাদ্বিতীয়মের অবতারণা করিয়া বা কোনো accepted first principle এর দোহাই দিয়া সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করিবার আকাঙ্ক্ষা কম। এই যুগ প্রত্যেক তথ্যকেই সত্য বলিয়া মানিতে নারাজ। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা বা experimentএর যুগ। এখানে বিশেষ কোনো গবেষণা বা মতবাদকে মাত্র স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিলে অন্যায় জবর-দস্তি করা হইবে। তাহারা ভাল কি মন্দ সে বিচার এখন নয়। কালের কষ্টিপাথরে তাহাদের সার্থকতা অনির্দ্ধারিত থাকিবে না।

এখন কথা হইতে পারে মানবের এই স্বরূপ সন্ধানের আবশ্যকতা কি? তাহার প্রাত্যহিক জীবনে তাহাদের মূল্য কি? ইহার উত্তর,—মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবই এই। মানুষ বা তাহার সমাজের গঠন ও বর্দ্ধন রীতি প্রায় একই রকম। উভয়ের জীবনই ভিতর এবং বাহিরের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নিজের অজানিতে তিলে তিলে গড়িয়া উঠে। কিন্তু বিবর্ত্তন ক্রমানুসারে যেই মুহূর্ত্ত হইতে আত্মচৈতন্য বা Self-consciousess এবং Social self conscionsess জন্মলাভ করে তখন হইতেই এই পশ্চাৎ পর্য্যবেক্ষণা অর্থাৎ Retrospective viewএর সূচনা দেখা দেয়। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত যত রত্ন-সম্ভার সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের সকলের অফুরন্ত উৎসধারা এইখানে। দৃষ্টিতে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রশ্ন নিয়াই মানুষের জ্ঞান-নয়ন প্রথম উন্মীলিত হইয়াছিল, এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার শেষ প্রশ্নটি আজিও শেষ হয় নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য মানব-মনের মুকুর। তাহাতে তাহার প্রত্যেক প্রশ্ন, প্রত্যেক চিন্তা, উদ্বেগ, সন্দেহ, মীমাংসা নিশ্চিত ভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাহাদের ধারাবাহিক আলেখ্য পর্য্যালোচনা করিলে নিরপেক্ষ সমালোচক গোড়ামির আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া উদারতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

কিছুদিন হইল বার্লিনে আন্তর্জাতিক ছাত্র-সম্মিলনে জনৈক ছাত্র মনীষি বার্ণার্ড'শকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে ইদানীং তিনি মনুষ্যত্বে আস্থা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছেন কিনা।

তদুত্তরে তিনি বলেন "Who said, I had ever any"? যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ব্যক্তি বা জাতির উত্থান পতন, আর্থিক অবস্থা, এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যাহার নিজস্ব চিরন্তন কোন সংজ্ঞা নাই তাহার উপর আস্থা না থাকারই কথা বটে। কথাটা বিশেষভাবে অনুধাবণযোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর নিজের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চায় নিতান্তই তাহার সহজ প্রেরণার বশে। এই চেষ্টা তাহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সাধারণ action reactionএরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা সে সদা বিবর্ত্তমান বহিপ্রকৃতির ঘাত সংঘাতের সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয়-নিচয়ের এবং আশা আকাঙ্ক্ষার একটা সামঞ্জস্য সাধন করিতে চায়; কারণ এই সামঞ্জস্য না হইলে তাহার জীবন চলা ভার হইয়া উঠে। নিজের এবং জাতির রক্ষার জন্য ইহা নিতান্তই চাই বলিয়া এই রক্ষার চেষ্টা এত অবশ্যম্ভাবী, এত বিশ্বব্যাপী। আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তিদ্বারা দেশ-কাল-সীমাহীন অনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিকে (Indeterminate mass of external Nature) নির্দ্দেশ করিয়া, সংজ্ঞা দিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া তুলি। সেই হইতে নূতন লব্ধ বস্তু আমার হয়, আমি আমার আমিত্বদ্বারা তাহাকে আলোকিত করি, আবার সেই বস্তু আমার আমিত্বে সংযোজিত হইয়া আমার চৈতন্য জগতের প্রসার বাড়াইয়া দেয়। আমার এই define করিবার প্রবৃত্তি আমার প্রকৃতিগত সহজ সংস্কার। আমি আমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি বা মনন-শক্তি দ্বারা বহিঃপ্রকৃতি হইতে যতটুকু carve out করিয়া নিতে পারি ততটুকুই আমার জগৎ। আমার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ বাড়িয়া চলিতেছে, আমার আমিত্বকেও বাড়াইয়া তুলিতেছে। আমার চৈতন্যরূপী Search light এর নিক্ষেপ ক্রমানুসারে আমার আবিষ্কৃত জগতের পরিসর যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে ঠিক তেমনি নবালোকিত ভুবনও আমার সঙ্গে একীভুত (unified) হইয়া আমার আমিত্বের পরিধি বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এবম্বিধ জ্ঞানের সত্যাসত্যের চরম মীমাংসা করা অতীব দুষ্কর। সাধারণ চোখে অর্থক্রিয়াকারিত্বই তাহাদের সত্যতার প্রমাণ অর্থাৎ যেমন জলকে জল বলি তাহার পিপাসা-নিবারণ-সামর্থ্য দেখিয়া। কিন্তু জ্ঞাতাজ্ঞেয়নিরপেক্ষ ধ্রুব শাশ্বত সত্যের মূর্ত্তি কেমন তাহা আজ পর্য্যন্তও আমাদের জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত। এই কারণেই আমাদের জগৎ এত ভাবদ্বৈধতায় (conflict of tendencies) পরিপূর্ণ। এই অনন্ত কোলাহলের মধ্যে অন্ততঃ এইটা ঠিক যে কাল-প্রবাহ অতি খরবেগে নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে; তাহার গতি উদ্দাম এবং অপরিবর্ত্তনীয়। প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত প্রতিপলকে অতীতের গর্ভে লয় পাইতেছে, আবার ভবিষ্যতের দিকেও ঝুকিয়া পরিতেছে,—যেন একটা বিনি সুতার মালা, একটা ফুল অপরের গর্ত্তে স্থান লইতেছে, আবার নিজের গর্ত্তে পরেরটাকে গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা ক্ষণস্থায়ী সঙ্গম-ক্ষেত্র,—বর্ত্তমানের সঞ্চার মাত্র অতীতে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবে মহাকাল অনন্ত গতিবেগে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন, কেন, কি উদ্দেশ্যে কেউ জানে না। এই অতিক্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়াই সে মহাকালকে বিকৃত স্থূলরূপে দেখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যতক্ষণ সে মহাকালের স্থূল দেহ নিয়া ব্যস্ত ততক্ষণে স্রোত কোন্ দেশে বহিয়া চলিয়াছে কে জানে? প্রত্যেক যুগই এই গতিকে বাদ দিয়া স্থূল ও স্থাণুর উপাসনা করিয়া ঠকিয়াছে, এবং সভ্যতা আবর্জ্জনার জঞ্জালে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই গতিবেগকে অস্বীকার করে বলিয়াই এক-যুগ অন্য যুগের শাসক এবং সংরক্ষক হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে, একযুগের চিন্তাবীর অন্যযুগের সত্যদ্রষ্টা বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক যুগের প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা এবং সমাধান সম্পূর্ণই তাহার নিজস্ব। অন্যের তাহা dictate বা সমাধান করিবার চেষ্টা যেমন ভ্রান্ত এবং অসম্ভব, তেমনি যুগ বিশেষের তথ্যকে সর্ব্বকালের মনে করিয়া নজির দেখাই-বার চেষ্টাও একান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথম গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক থেলি বা প্রথম আর্য্যঋষির বেদ সংযোজনা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বার্গসো, আইনষ্টাইন, আলেক্‌জাণ্ডার বা রাসেল পর্য্যন্ত জগৎ ব্যাপার সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতের অভাব নাই।

তাহাদের সম্যক্ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও নয়। কিন্তু প্রকৃত কথাটী এই যে এই মত সংঘাতের ভিতর কোন বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত এবং চরম মনে করিয়া তাহাদেরই ছায়াপাতে সমসাময়িক চিন্তা জগৎকে বিচার করা যুক্তি সঙ্গত হইবে কিনা। সমালোচকের পক্ষে একদেশদর্শিতা মারাত্মক। তাহার ছুড়িকা ক্ষুদ্র বৃহৎ নূতন পুরাতন যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকেই কাটিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে অধিকারী, এবং এইখানেই তাহার প্রকৃত বিচার ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। স্বাধীন চিন্তার ফলে যদি ধর্ম্মের বনিয়াদ, নীতির প্রাসাদ এমন কি ভগবানের আসন পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলেও সত্যসন্ধ তাহার লক্ষ্য হইতে বিরত হইবে না। সমাজ-স্থিতির নামে গঠিত যে কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের আচার এবং অত্যাচারকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক জগৎ আজ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই দুই একটা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একথা অস্বীকার করিবার নয় যে ধর্ম্ম, নীতি বা ভগবান এমন কতকগুলি ধারণার সমষ্টি যাহা সংখ্যাতীত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। অবশ্য এজন্য উহাদের মানব-মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সূচিত হয় না। মাত্র এই যে, সমাজের সংহতি ও স্থিতির পক্ষে এই সংস্কারগুলি কার্য্যকরী বলিয়া তাহারা নানাবিধ বিরুদ্ধ ধারণার বিপক্ষেও কমবেশী টিকিয়াছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ধর্ম্ম, নীতি এবং ভগবান্ বারংবার দেহ ও রূপ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি বর্ত্তমানেও দেশকালপাত্র ভেদানুসারে তাহারা বিভিন্ন রূপধারী। ভগবানের প্রথম পরিকল্পনার গোড়ায় যে ভয় ও বিস্ময় নামক মনোভাব দুইটীর সংমিশ্রণ এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিৎগণ প্রায় একমত। নিজ হইতে অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ এবং বলীয়ান বহিঃপ্রকৃতির ভ্রূকুটীর কাছে অসহায় আদিম মানব আপনার রক্ষাকল্পে আপনারই অনুরূপ কিন্তু অসীম ক্ষমতাপন্ন, অফুরন্ত দয়াবান, কর্ম্ম ও ভক্তির আধার, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালনকর্ত্তা, অজর, অমর, অক্ষয় এক ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্ত্তা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট দেবতার সন্ধান বাহির করিতে অতীত ইতিহাসের বেশী দূরে যাইতে হইবে না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের সহিত মানুষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে শিখে এবং অলৌকিক কার্য্যকলাপের প্রতি তাহার বিশ্বাস কমিয়া যায়। এই কারণেই সভ্যজগতে অনেক উপ এবং অপদেবতার উপাসনা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার পরবর্ত্তীকালের বিশিষ্ট চিন্তাবীরগণ সমস্ত কার্য্য-জগৎকে একমাত্র মূলীভূত কারণের Expression বা প্রকাশ বলিয়াছেন। বিভিন্নকালে জল অগ্নি বা বায়ু সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অথবা প্রাচ্যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে অখণ্ড ব্রহ্মের প্রকাশ বলা হইয়াছে। যথা,— ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি যৎ যস্মাৎ সর্ব্বময়মাত্মা। সঃ যথা ঊর্ণনাভি স্তন্তুনা উচ্চরেদ্, যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদাত্মানঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। আবার আধুনিককালে রাসেল্ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রবর্ত্তিত মতানুসারে সৃষ্টির অন্তরালে উপরোক্ত জাতীয় কোনও সর্ব্বগ্রাসী এককসত্বা বিদ্যমান নহে। কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য সত্বার (ultimately unanalysable Entities) সংযোজনা ভেদে (transposition) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত গঠিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। এইখানে মন বা আত্মা কোনও কল্পলোকের নির্ব্বাসিত বা অভিশপ্ত অধিবাসী নহে। হয়ত বা তাহাদের কায়া-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, হয়ত বা তাহারা শরীরেরই ধর্ম্মবিশেষ যাহা কোন এক সুদূর অতীতে জীবনযুদ্ধে শরীরেরই পরিপূরকভাবে একটা New qualityর মতন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই হিসাবে Finalism একটা কথার কথা মাত্র। সৃষ্টির বা মানুষের সম্মুখে কোন বিশিষ্ট আদর্শ উপস্থাপিত নাই যাহার জন্য তাহাকে "ক্রন্দসী" "রোদসী" বলিয়া কীর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মানুষ বস্তুতঃই যেন উদ্দেশ্য এবং 'আদর্শ বিবর্জ্জিত। প্রতি মুহূর্ত্তের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সে তাহাকে form দিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে। তাহার প্রতি বর্ত্তমান জীবন অতীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এবং ভবিষ্যৎকে আমন্ত্রণ ও গ্রহণ করিয়া এক অভিনব ধারাবাহিকতা বা continuily র সূত্র

রচনা করিয়া চলিয়াছে। ইহাই তাহার প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনশীল "আমি"। তাহার অতীতের "আমি" বর্ত্তমান "আমিকে" গঠন করিতেছে, এবং বর্ত্তমান ভবিষ্যতের 'আমিকে' আকার দিতেছে। এই কার্য্যে সে ভিতর হইতে এক উদ্দাম ঠেলা অনুভব করিতেছে মাত্র। কিন্তু কোথায় চলিতেছে সে জানে না।

এই নূতন যুগের পরিবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধারণা সমষ্টির সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানেরও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। চরম সত্বার আদর্শ যেখানে অনির্দ্দিষ্ট সেখানে তাহার আনুসঙ্গিক উপসর্গের আদর্শও অবিসম্বাদিত থাকিবে না ইহা বিচিত্র নহে। ধর্ম্ম ও নীতির উদ্ভবের পূর্ব্বে Revenge, Blood-feud, Promiscuity প্রভৃতি অবস্থার কথা সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের অপরিজ্ঞাত নহে। মানুষকে যদি সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিতে হইত তাহা হইলে হয়ত বা ধর্ম্ম ও নীতির কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু ব্যষ্টির জীবনের পরম সার্থকতার জন্য তাহারই অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সমাজ ও সমাজবন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য একে অন্যকে সহ্য করিতে, অন্যের দাবী স্বীকার এবং প্রতিপালন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যষ্টির শাসনভার গোষ্ঠী গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশের সহিত "Eye for an eye, tooth for a tooth" নীতি উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতেছি যে সভ্যতা ক্রমশঃই অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইতিহাস সুস্পষ্টভাবেই একটি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে সমাজবিধির কোনও ব্যবস্থাই চরম বা চিরন্তন নহে। Monarchy Aristocracy ও democracyর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিনয় জগতে বহুবার হইয়া গিয়াছে। মতবিশেষের শ্রেষ্ঠতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজিও হয় নাই। সাম্যবাদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মতামতের অভাব নাই। এমন কি পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতম নীতিবেত্তা Aristotle ও মানুষের জন্য কোনো সার্ব্বজনীন নীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তিনি ধনী ও নির্ধন, aristocrat ও slaveএর মূলত: পার্থক্যের উপর তাহার সুপ্রসিদ্ধ Justice এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত দেশেই ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে এইপ্রকার অসার্ব্বজনীন বিভিন্ন পন্থা অনুসৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগেও ইহার উদাহরণের অভাব নাই। যেমন, স্বদেশের কল্যাণ সাধন সর্ব্বদেশে সকলকালে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিজিতের পক্ষে যে স্বদেশ-সেবা রাজদ্রোহিতারই সমতুল তাহা চোখ মেলিলেই দেখা যায়। আজ যে দিকে দিকে Carl marx-এর নীতির পতাকা তলে socialism, communism, bolshevism প্রভৃতি নব্য সমাজতন্ত্রবাদ গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা এই আদিম ও কৃত্রিম বিভিন্নতার বিরুদ্ধেই। মানুষ আজ মানুষের সহিত এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। অর্থের গৌরব আজ তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তাহারা আজ এক সমভূমিতে দাঁড়াইয়া একযোগে চলিতে চাহে, সকল অন্যায়ের টুটি চাপিয়া পৃথিবীতে সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইহারই মধ্যে নূতন করিয়া Bolshevik Ethics গঠিত হইয়া উঠিতেছে।

অপরদিকে যে প্রশ্নটি নিয়া আজিকার নীতি-জগতে তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও কোনো অকৃত্রিম স্বয়ংসিদ্ধ সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। Sexual moralityর গোড়ার কথা যে Sexual jealousy তাহা বর্ত্তমান জগতে অপ্রমাণিত নহে। যৌন সম্বন্ধের যে form আদিম যুগের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও অবিসম্বাদিত ও চরম নহে। বিবাহের প্রকৃতি দেশের জলমাটী, নর-নারীর সংখ্যা বৈষম্য, ও শিক্ষাদীক্ষার উপর যথেষ্ঠ পরিমাণে নির্ভর করে। Group marriage অর্থাৎ একদল পুরুষের একদল স্ত্রীলোককে বিবাহ খুব বেশীদিন হয় উঠিয়া যায় নাই। এখনও তিব্বত প্রভৃতি দেশে এক পরিবারের সকল ভ্রাতা একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের নীতিজ্ঞান ব্যাহত হয় না। প্রাচীন ভারতেও নানাবিধ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সেই যুগে নিয়োগ প্রথা নীতি বিগর্হিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইত না। বিধবা বিবাহও চলিত, পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহের ত কথাই নাই। স্ত্রীর স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য এবং সতীত্বের ধারণা Polygamous ও Polyandrous সমাজ-ভেদে বিভিন্ন রকমের ছিল। অবাধ

কায়িক-সংমিশ্রণ যৌন হিংসার আবর্ত্তে পড়িয়া যখন দৈব বিবাহে রূপান্তরিত হয়, সতীত্বের জন্মকথা হয়ত বা তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত বা প্রবলতর পক্ষ অপরকে সম্পূর্ণ নিজের আওতায় রাখিবার জন্য নীতিবাক্যের সুদৃঢ় বেড়া রচনা করিয়াছে। আজিকার জগৎ তাই নূতন করিয়া বিবাহ ও সতীত্বের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে—সতীধর্ম্মে ও পতিধর্ম্মে তাফাৎ কি ? পুরুষের বেলায় সদ্ধর্ম্ম প্রযোজ্য কি না ? স্ত্রী পুরুষের অবাধ প্রেম বৈধ কি অবৈধ ? এই সমস্ত সমস্যার উত্তরে বিভিন্ন প্রকারের গবেষণার উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বা morality কে নিছক convention এবং enlightened self-interest বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অপর কেহ নৈতিকতা এবং বিবাহের একত্রীকরণ সভ্যতার একটা বিষম ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"The confusion of marriage with morality has done more to destroy the conscience of the human race than any other single error" বিবাহ যে বেশীর ভাগ লোকে পছন্দ করে তাহার কারণ নাকি combination of maximum of temptation with maximum of opportunity" আজ নারী শুধু পুরুষের পছন্দসই খেলনা হইয়া থাকিতে পছন্দ করে না। "living by playing tricks for him" আর স্ত্রীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না।

উপরন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান তাহার গবেষণার ফল পুষ্পাদি দ্বারা নূতন নৈতিক মত সংগঠনের সহায়তা সম্পাদন করিতেছে। ফ্রয়েডিয়ানিজ্‌মের নাম আজ সভ্য জগতে কাহারও অবিদিত নহে। তাহাদিগের এবং পরবর্ত্তী নিয়ো-ফ্রয়েডিয়ান্‌দিগেব সিদ্ধান্তগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন যৌন নীতির (Sexual Ethics) জন্ম দিতেছে। মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত কার্য্যাবলী তাহার নিরুদ্ধ গ্রন্থির (repressed complexes) স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ মূলতঃ স্নায়বিক রোগগ্রস্ত (neurotic)। Libidoর সহজ প্রকাশেই জীবনের পরম চরিতার্থতা; কিন্তু বর্ত্তমান আট-ঘাট-বাধা কৃত্রিম সভ্যতাই ইহার পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা। মানুষ এইজন্য আদিম libido কে নিরোধ করিতে বাধ্য হয়, কাজেই তাহার বিকৃত কার্য্যাবলীর জন্য সে খুব বেশী দায়ী হইতে পারে না। অপরদিকে আমেরিকান নিয়োরিয়ালিষ্ট মনস্তত্ত্ববিৎগণ 'ব্যবহারবাদ' (Behaviourism) নামে এক নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাদের মতে মানুষ একটি প্রতিক্রিয়া পরায়ণ মেসিন্ ভিন্ন কিছু নহে, এমনকি প্রেম ভালবাসাও শারীর যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহাদের মুখপাত্র Prof. watson একান্ত স্পর্দ্ধার সহিতই আশা করেন যে শীঘ্রই জগতে এক নূতন নীতিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার নাম Behaviorist Ethics. তিনি তাহার ল্যাবরটরিতে চোর, বদমাইস বা প্রতিভাশালী, ইচ্ছামত সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আত্মবাদ বা পাপবাদ উভয়ই উঠিয়া যাইবে। মানুষ জন্ম সাধুও নয়, জন্ম পাপীও নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা 'conditioned' হওয়ার উপর নির্ভর করে। আসল কথা এই যে ধর্ম্মনীতি কোনো 'Ultimate good' বা চরম সত্যের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিবে না, পরন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজস্থ নরনারীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া চলিবে।

আজিকার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে এই জাতীয় জটিল সমস্যা একান্তভাবে দেখা দিয়াছে এবং সমুদয় চিন্তাশীল জগৎ নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত ইহাদিগের সমাধানকল্পে মনোযোগী হইয়াছে। এই বিভিন্ন 'স্কুলের' সিদ্ধান্তগুলি আজই বিচার করিবার সময় আসে নাই। কোনও বাঁধা-ধরা Presupposition অথবা গোড়ামির দোহাই দিয়া কোন মতকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা intellectual intolerence প্রকাশ করিবে মাত্র। আজকাল আমাদের দেশে এ বিষয় নিয়া মাতামাতি বৈধতা ও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় কিছুই হইতে পারে না। চিন্তা-জগতে এইপ্রকার impeachment অনেকটা অহেতুক ও অনাবশ্যক। যাহা নিতান্তই কুফলপ্রসূ তাহা সমাজের sanction অভাবে আপনিই খসিয়া পড়িবে।

সুসঙ্গে শিকার

[মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ]

শিকারের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গেলে অনেকেই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু, মল্লযুদ্ধ, ফুটবল খেলা, Dagger খেলা, লাঠি খেলা, Boxing প্রভৃতি ক্রীড়ার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গেলে যদি কাহারও আপত্তির কারণ না থাকে, তাহা হইলে শিকার সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম কেন হইবে, তাহা বুঝা যায় না। শিকার কিম্বা মল্লযুদ্ধাদি আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের সহায়ক নহে—ইহা গোড়াতেই স্বীকার করি—সুতরাং শিকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার উপহাসাস্পদ প্রচেষ্টা করিব না। শরীরকে কার্য্যক্ষম করিয়া রাখার পক্ষে যে সকল sports সহায়ক হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতির কারণ না হয় ও মানসিক আনন্দদায়ক হয়, সেই সকল sportsই মানব সমাজে আদরণীয় স্থান পাইয়া আসিতেছে। এই হিসাবে শিকারের স্থান অন্যান্য sports অপেক্ষা নিম্নে হইবার কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ এতাবৎ-কাল পৃথিবীতে যত প্রকারের sports উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শিকার একটী প্রধান। অবশ্য অতি আধুনিক Camera দ্বারা শিকারকেই আবার শিকারের রাজা বলা যাইতে পারে। ইহাতে Rifleএ শিকারের যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়, অধিকন্তু প্রাণীহত্যাজনিত অবশ্য-লভ্য গ্লানিটুকু আর থাকে না।

"মেদশ্চেদ কৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহ যোগ্যাং বপুঃ।
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ সচ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যা হি ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ॥"

শিকারের স্বপক্ষে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী স্মরণীয়।

যদি প্রত্যেকটী জন্তুর স্বভাবাদি সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেহ প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ হয়। আরণ্য পশ্বাদির স্বভাব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ফল, প্রণালীবদ্ধ ভাবে লিখিত বড় একটা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ২।৪টী পুস্তক যাহা পাঠ করিয়াছি, সেগুলিতে মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ফল অতি সামান্যই লক্ষ্য করা যায়—ইংরাজী লেখকগণের লিখিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই অনেক সময় পাওয়া যায়। ইহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইলেও জাতির কৃতিত্বের পরিচয় কমই পাওয়া যায়। আশা করি শিক্ষিত শিকারীর মনোযোগ এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালীর মৌলিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সকল জীবজন্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য আরণ্য পশুপক্ষীর স্বভাবাদি সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ মূলক বিশদ আলোচনায় বাঙ্গালীর অনেক বাধাও আছে।

এতদঞ্চলে শশক, বাঘডাঁস, বনবিড়াল, খাটাস, শৃগাল বৃহৎ সর্প, কদাচিৎ বর্ষাকালে কুম্ভীর, যজ্ঞশূকর, সজারু, প্রভৃতি নানা প্রকার ছোট ছোট জন্তু পাওয়া যায়। গারোপাহাড় অতি নিকটে থাকায় বন্য কুকুর, গবয়, এবং রিয়া, হঠাৎ কখনও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নানাজতীয় হাঁস, সারস শ্রেণীর পক্ষী, snife, বক জাতীয় পক্ষীর বটের, চোরস, পাঁচ প্রকারের ঘুঘু, দুই জাতীয় হরিকল, বন্য কুক্কুট, দ্রোণ, উল্লাময়ুর প্রভৃতি বহু শ্রেণীর শিকার যোগ্য পক্ষী পাওয়া যায়।

কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর সময়ে কেবলমাত্র সহজ লভ্য আমোদ আহ্লাদের জন্য বিলাসিতার কেন্দ্রস্থান সহর-গুলিতে না যাইয়া কোনও কোনও বৎসর প্রকৃতির লীলা নিকেতনের অনাবিল উৎসবে যোগদান করিলে একদিকে যেমন নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হইবে, অপর দিকে তেমনই প্রকৃতির সন্তানদের আনন্দের স্বাভাবিক বিকাশ ভঙ্গিমা দর্শনে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইবে।

Christmasএর ছুটীই শিকার Campএ যোগদান করিবার শ্রেষ্ঠ সময়।

শিকারে হত্যাব্যাপার সংস্পৃষ্ট থাকায় যদিই বা তাহা সকলের নিকট রুচিকর নাই হয়, তথাপি—

"..............নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্র করিয়া আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে..............." অনুভব করিতে

হইলে Shikar campএ যোগদান বাঞ্ছনীয় নহে কি?

"নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কা'রে
চলে যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে
শূণ্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয়, মুক্ত হস্তে আকাশে বাতাসে
ক্লান্তি নাহি জানে।"

প্রতি প্রভাতের নব ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিবার জন্য কোন প্রাণ না প্রলুব্ধ হয়? ইহার পর বনানীর সুপ্তি-মৌন স্বপ্নাবেশ মাখা কমনীয় ছবিটী যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কি তাপদগ্ধ ধূম-ধূলি-কোলাহলপূর্ণ দ্বিপ্রহরের সহরে সহজে ফিরিতে চাহিবেন? তারপর বেলা যখন বনানীর ছায়া দীর্ঘতর করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে, তখন--

"যেখানে দিনান্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হ'ল।"

সেখানে মুগ্ধপ্রাণ আপনা হইতেই স্রষ্টার চরণে নত হইয়া আইসে। অতঃপর—

"সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি"

প্রতিদিনের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দৃশ্য ত সহরের বাহিরেই দেখা যায়। নানাবিধ প্রাণ-মন-মোহনকারী ছবিই কি প্রকৃতির দিকে মানবকে আকৃষ্ট করে না? কিন্তু এরপর আসে—

"স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর.........সঘন অন্ধকার" অনন্ত আশঙ্কা-সমাকুল নিশাচর মুখরিত বনানীর উদ্বেগপূর্ণ রজনী। প্রকৃতির শান্ত-সমাহিত সুন্দর ছবি হয়ত সহরের বাহিরে গেলেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু, shikar campএ যোগদান করিলে অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অননুভূত পূর্ব্ব আনন্দের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের আস্বাদন যিনি না পাইয়াছেন তিনি আনন্দ এবং উৎকণ্ঠা মিশ্রিত এই জীবনের মাধুর্য্যের কল্পনাও করিতে পারিবেন না।

আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে বাংলার শান্তিময়ী প্রকৃতির নানা ছবি, সুস্পষ্ট-মোহন ভঙ্গিমায় বহু কবির অমর ভাষায় বর্ণিত দেখিতে পাই; কিন্তু নানা বিহগ-সরীসৃপ-মৃগ-শ্বাপদাদিসঙ্কুল অরণ্যের বর্ণনা তেমন পাই না। রবীন্দ্র-নাথের উষার ও সন্ধ্যার ছবিটীতে পাইবেন তাঁহার যে পদ্মাপারের ছবি। ইহাতে অবশ্য দুঃখপ্রকাশের কারণ নাই—বাংলার রূপ ত ইহার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই একটানা শান্তিভঙ্গকারী বড় জোর কালবৈশাখীর দুই একটা ঝড় ঝাপ্‌টার বর্ণনা পাই। কবি প্রতিভা প্রকৃতির মধ্যকার নিছক মোহন সুন্দর রূপটাই খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাব্যে প্রকাশ করিয়াছে—অসুন্দরকে বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু জীবন যেমন সকলের পক্ষে কাব্য এবং সৌন্দর্য্যময় হয় না—নানা দ্বন্দ্বে পূর্ণও থাকে; প্রকৃতির সমস্ত ছবি সেইরূপ কেবলমাত্র শান্তিময় সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইলে, প্রকৃতির অপর একটা বৃহৎ অংশই বর্জ্জিত রহিয়া যায়। বাঙ্গালার নদীর ধারের গ্রামে এই অংশের ছবিটা বড় একটা পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাই ঋতুচক্রের আবর্ত্তন ফলে ভীষণতা অথবা মাধুর্য্যের বর্ণনা থাকিলেও আরণ্য জগতের দৈনন্দিন মধুর এবং ভীষণ ছবি প্রায় পাই না বলিলেই চলে। যাহাও পাই তাহাও বোধ হয় প্রায়ই অসম্ভব কবিকল্পনা প্রসূত, বাস্তবতা বিবর্জ্জিত। রবীন্দ্রনাথের দুই একটী অনবদ্য সুপরিস্ফুটিত চিত্র, এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হইল।

অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু বাংলা ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে হইলে জংলীরূপের বর্ণনা বাদ দিলে চলিবে না এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করানর জন্যই এত কথার অবতারণা করা হইল।

এখন একবার প্রতিদিনের আরণ্য-জগতের জীবনযাত্রা কি ভাবে নির্ব্বাহিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিবার প্রয়াস করা যাউক। যথাযথ এই বর্ণনা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। বনানীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঠিক দৃশ্যটী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে অনেকেই যে এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার প্রলোভন সংযত করিতে পারিবেন না ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

যখন…"রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে অধোমুখে" দিগন্তে বিলীন হইবার উপক্রম হয়, তখন "কয়ার" (marsh partridge) রজনীর বিশ্রামাগার বনাগ্র হইতে অথবা বন্যকুক্কুট বৃক্ষচূড়া হইতে সগুনিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে প্রথম ধ্বনিতে বনানী মুখরিত করে। এই শব্দ শুনার পরই নিশাচর হরিণ, মহিষাদি যে যা'র মত দিবসের আশ্রয়-অরণ্যানী অভিমুখে ধীরমন্থরগতিতে ফিরিতে থাকে। কিন্তু, নিরীহ হরিণের নিশ্চিন্তে ভ্রমণের উপায় কোথায়? অদূরে কোথায় ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া আশঙ্কার অনুমান করিয়া স্তব্ধ সচকিত দৃষ্টি করিতেছে এবং নিজের আশু বিপদ না থাকিলেও স্বজাতীয়দিগকে বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে।

"As the dawn was breaking the Sambar belled
Once, twice, and again !"

মৃগ দম্পতীর কখনও বা শাবক সহ স্রোতস্বিনীর ধারা দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই একটী লতাবল্লরী অনাগ্রহ ভরে খাইতে খাইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ইহাই চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু, হঠাৎ ব্যাঘ্র --

"রুদ্র মেঘ মন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে——" হরিণীকে এইভাবে হত হইতে দেখিয়া সঙ্গী ভয়ার্ত্ত শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করে। প্রাণী জগতে এই সংহার ব্যাপার নিত্য দেখিয়া জন্তুগুলির মধ্যে মৃত্যু বিশেষ ছাপ দেয় না—দিলে হয়ত, অরণ্যের প্রাণী জগতে আনন্দের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইত না। আরণ্য জগতে হিংসা এবং শান্তি, মৃত্যু ও প্রাণ, ভয়ঙ্কর এবং স্নিগ্ধতা এক অপূর্ব্ব সন্ধি স্থাপন করিয়া বস বাস করে। তাই এক-দিকে যখন মৃত্যুর আর্ত্তনাদে বনভূমি অবসন্ন তখনই—

"পূরব-মেঘ-মুখে পড়েছে রবি রেখা
অরুণ রথ চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব॥"

কার মোহন কর স্পর্শে সমস্ত সুপ্ত প্রকৃতি যেন প্রাণের স্পন্দনে জাগিয়া উঠে। কবির ভাষায় এখনকার বনানী -

"জাগরণ-পূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন সমাজ।"

প্রভাতের অরণ্যানী যেন জীবন্ত প্রাণের সাড়ায় নাচিয়া উঠে। শীতের সময়কার কুয়াশার আবরণের অন্তরালে স্থিত বনানীর ভিতর হইতে কত অযুতকণ্ঠে প্রভাতী রাগিনী খেলিয়া যাওয়ায় কি এক অপূর্ব্ব মোহজালের সৃষ্টি হয়! এ কোন অজানা বংশীবাদক এই অপূর্ব্ব রাগিণীতে অনন্তকাল হইতে মানবের প্রাণ-মন মোহিত করিতেছে!

কুজ্ঝটিকার আবরণের অন্তরালে মুরগী জাতীয় পক্ষী শ্যেনের দৃষ্টি এড়াইয়া খোলা মাঠে আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। কুয়াসা অপসারিত হইতেই তাহারা ঝোপঝাপের অন্তরালে আহার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অপর দিকে নূতন রৌদ্রে শরীরকে একটু উত্তপ্ত করিয়া নিশাচর জন্তুগণ অরণ্যের ভিতর আশ্রয় লয়। ব্যাঘ্র ও রজনীতে হত শিকার যথা-সম্ভব ভক্ষণের পর পত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অরণ্য-বাসীকে তাহার অস্ফুট শব্দে সতর্ক করিয়া দিবা নিদ্রার ব্যবস্থা করিতেছ। এই সময়ে বিহগকুলের ভিতর আহার সংস্থান প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপার পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। এর ভিতর কিন্তু যোগ্যতমের জয় আর অযোগ্যের নিধন, প্রাকৃতিক জগতের এই মূলমন্ত্রের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

বারশিঙ্গা এখনও তাহার দিবাভাগের আশ্রয় খুঁজিয়া লয় নাই -- জঙ্গলের ভিতর "ঝরা" ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত। অদূরে ২।১টী Hog, deerকেও এ সময়ে দেখা যাইতে পারে, নবতৃণাহারে ব্যাপৃত। বন্য বরাহ-যূথ ধান খাওয়ার পর দ্রুতগতিতে তাহাদের পাশ কাটিয়া নিরাপদে বনানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। হরিণগুলি নির্ভীক ভাবে দুই একবার কৌতূহল ব্যঞ্জক দৃষ্টি তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিতেছে, কোথাও বা উদাসীন ভাবে নিজেদের আহারেই ব্যস্ত রহিয়াছে। এই দৃশ্য অধিককাল স্থায়ী হয় না—সূর্য্যতাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি পুনরায় অর্দ্ধসুপ্তির ভাব ধারণ করে। এই সময়কার আবেশময় তন্দ্রার ভাব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় কবি লিখিয়াছেন—

"…………যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।"

এই নিঝুম মধ্যাহ্নে কোথাও "শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে…" অথবা কুলুনাদিনী তটিনীর পার্শ্বস্থ ছায়া তরু-সমাসীন বিহগ বিহঙ্গিনীর পার্শ্বে বসিয়া অস্ফুট মধুর কূজন করিতে থাকে। কোথাও বা—

"………ছায়া তলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহণ করিছে ধীরে
বিমুগ্ধ নয়ন মৃগ……" আবার অদূরে জলের ধারে দুই একটী মাছরাঙ্গার সতর্ক আহার প্রচেষ্টা, অথবা কুরুবকের হঠাৎ অর্দ্ধসুপ্ত হংসপংক্তির উপর অতর্কিত আক্রমণে দ্বিপ্রহরের শান্তিরূপ নষ্ট হইলেও এ যেন দুঃস্বপ্নে নিদ্রা-ভঙ্গেরই রূপান্তর! কারণ পার্শ্বেই জলের কিনারায় বিশ্রামরত সারসের রূপটী মূর্ত্তিমান বিশ্রামের রূপ—

… … তৃণাঙ্কিত তীরে
জল কল কল-স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানী
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে … …

বস্তুতঃ "অরণ্যে সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে" প্রতি মধ্যাহ্নে কর্ম্মের অবসরে যে স্বপ্নবিহ্বল মধুর বিশ্রামের ছবিটী ফুটিয়া উঠে, তাহা কি এতই সহজ লভ্য?

পুনরায় অপরাহ্নের দিকে "রৌদ্রমাখান অলস বেলায়" অপূর্ব্ব উৎফুল্লতায় সমগ্রবনানী নাচিয়া উঠে। পাখিগণ আবার আহারের সংস্থানে ব্যাপৃত হয়—আবার কলরবে অরণ্য পরিপূর্ণ হয়।

এই সময়ে তটিনীর পার্শ্বস্থ ঝোপ ঝাপে দলে দলে পক্ষী উড়িয়া আসিয়া বসে—কিন্তু, হঠাৎ শ্যেনের আগমনে ভয়ার্ত্ত রবে সমস্ত পক্ষীর ঝাঁক এক যোগে উড়িয়া যায়। অরণ্যের জগতে প্রাণরক্ষার্থ অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ভাব পরিলক্ষিত হয়—এই যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীকেই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। বিহগকূজন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট হরিণ ছায়া সমাচ্ছন্ন ঝোপের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে ধীরে দু'এক গাছি তৃণাগ্র ভক্ষণ করিতে করিতে ইতঃস্তত অগ্রসর হয়—কখন বা জলপানের উদ্দেশ্যে জলেরদিকে অগ্রসর হয় (water pole এর দিকে যায়)। নারশিঙ্গাও ছায়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া জলের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময়ে সমস্ত জন্তু একবার জলপান কিম্বা অবগাহনের জন্য জলের দিকে যায়। এই সময়ে হয়ত কখন ঝোপের অন্তরালে—

"……………হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর" —লুক্কায়িত রাখিয়া মৃগাদির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শান্ত, নিরীহ হরিণের প্রাণনাশ করে—কোথাও বা শিকারী বৃক্ষান্তরাল হইতে বজ্র নির্ঘোষে ব্যাঘ্রের হিংসাতীব্র আনন্দপূর্ণ দৃপ্ত গরিমা নষ্ট করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিবার সুযোগ পায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্দুকের শব্দে, ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে, হরিণের আর্ত্তনাদে সমগ্র বনানী একযোগে ভয় ত্রাসের শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! সুখের বিষয়, অরণ্যবাসীর স্মৃতির অথবা কল্পনার উৎপাত না থাকায়, যেখানে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাণ্ডব ভীষণ মৃত্যুর লীলা প্রকট হইয়াছে, সেইখানেই ক্ষণকাল পরই শান্তির মহিমা বিরাজ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাই যখন সন্ধ্যারবি তাঁর শেষ মহিমার গৌরব সকলকে অনুভূত করাইতে করাইতে পর্ব্বত চূড়ায় চূড়ায় নানা বর্ণজাল বিন্যাস করিতে করিতে অন্ধকারের রহস্যজালে বিলীন হ'ন তখনকার শান্তির মোহন ছবি দেখিয়া হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। সন্ধ্যাগমে বিহগ গানে ঠিক পূজার উদাস রাগিণী বাজিয়া উঠে, তখনকার তটিনীর কুলুকুলু পূজারিণীর উলুধ্বনির মতই মনে হয়। উদার আকাশতলে ঝিল্লীরব-মুখরিত রহস্যমণ্ডিত বিচিত্রবেশে সন্ধ্যারাণীর ধীর পদক্ষেপে আগমন যেন চিত্তকে সৃষ্টি রহস্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরমুহূর্ত্তেই নানা অদ্ভুত বিকট ভয়াবহ শব্দের সঙ্গে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার যোগ থাকায় কেবলই মনে হয় জগতের রহস্যজালের কথা! চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত স্নিগ্ধ কাননের ভিতর মোহাবেশযুক্ত ভীতি থাকিলেও বন্য-জগৎকেও সম্পূর্ণ অপরিচিত ভয়ঙ্কর মনে হয় না, কিন্তু, বনানীতে—

"কালো রাতের কালী ঢালা ভয়ের বিষম বিষে"
মন যেন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে—নিজকে অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ হইতে থাকে।

এই ত গেল বনানীর জীবজন্তু সহ দৈনন্দিন রূপের

কথা। যে একবার এ রূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়াছে সে বলিতে বাধ্য হয়ঃ—

"But oh ! the free and wild magnificence
Of Nature in her lavish how doth steal
In admiration silent and intense
The soul of him who hath a soul to feel"
(Longfellow)

উপসংহারে ইহাই উল্লেখ করিব যে হত্যাকাণ্ড বাদ দিয়াও প্রকৃতির রসাস্বাদন করিবার সুযোগ যে থাকিতে পারে তাহা প্রতীচ্যের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বন্য জন্তুর আলোকচিত্র গ্রহণ ইহার একটী প্রধান উপায়। অবশ্য camera লইয়া শ্বাপদাদিসমাকুল অরণ্যানীতে ভ্রমণ করিলে Rifleএর ব্যবহার সময়ে সময়ে অপরিহার্য্য হইলেও এই ব্যাপারে প্রাণী বধের ভাব সংসৃষ্ট না থাকায় এইভাবে চিত্র সংগ্রহ শিকার অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষা এবং আনন্দপ্রদ।

যিনি সত্যকার শিকারী হইতে চা'ন তিনি অযথা প্রাণীহত্যা কখনও করিতে পারিবেন না। কষ্টসাধ্য শিকার করায় যেমন আনন্দ, অনায়াসলভ্য শিকার তেমনই অমনুষ্যোচিত। জঘন্যভাবে শিকার করিলে, শিকারীর বিশেষ লজ্জিত হওয়া উচিত।

বধের ভিতর হৃদয়ের এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখানই প্রকৃত শিকারীর কার্য্য। যে শিকারে বিপদ যে পরিমাণে অধিক, সেই শিকার সেই পরিমাণে প্রকৃত শিকারীর প্রিয়! বিপদকে ধীরতার সহিত বরণ করিয়া লইবার স্পৃহার ভিতর মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়। প্রকৃত শিকারীর শিকারে এইভাবে যথেষ্ঠ মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে। জিজ্ঞাসুর মন লইয়া যিনি shikar campএ যোগদান করেন তাঁর যথেষ্ঠ জ্ঞানোন্নতি হয়।

যিনি শিকার শিক্ষা করিতে চা'ন তিনি যেন প্রকৃত শিকারীর সহিত শিকার শিক্ষা করেন। কেবলমাত্র শিকারী নাম-ধেয় ব্যক্তির সহিত শিকার করিতে গেলে কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারা যায় না—পরন্তু, কেবলমাত্র ব্যাধবৃত্তি শিক্ষা লাভ হয়। ব্যাধবৃত্তি মানুষের শিক্ষার বিরোধী—সুতরাং ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

কাব্যিক হেঁয়ালি

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল]

নিছক গদ্যের রাজ্যে যেমন, রসাত্মক বাক্যরূপ কাব্যের কাননেও তেম্‌নি, একটানা বিচরণে মন বেচারী হাঁপিয়ে ওঠে। তখন তাকে এক গেলাস মনোরাজ্যের ঘোলের সরবৎ খাওয়ান দরকার হ'য়ে পড়ে,—এই সরবৎই ভবিষ্যতের সাহিত্যিক মহলে 'হেঁয়ালি' নামে পরিচিত হবে। সরবৎ মানে সরের মত, অথচ সরবতে সরের গন্ধও নেই। এদিকে আবার, বাজারের কেনা সরবতে ঘোল আছে একথা কোন রাসায়নিকের বাবাও বল্‌তে পারবে না, অথচ নাম 'ঘোলের সরবৎ'—যথা, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! তাহ'লে হেঁয়ালি ওরফে ঘোলের সরবৎ ওরফে পদ্মলোচনের নামমাহাত্ম্যটা আমাদের কাছে ধরা পড়লো।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলাই ভাল। ধরুন কাব্যে ন'টা রস আছে। অবশ্য আজকালকার রসশাস্ত্রকারগণ আরো দু'একটা নূতন রসের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন;—কিন্তু মানুষের মন এই ক'টী রসেই মজে থাকতে চায় না,—সে চায় নব রসের গণ্ডীর বাইরে আরো কিছুর আস্বাদন। মন রকমারির কাঙাল। এখন মুস্কিলের কথা হচ্ছে এই, রসশাস্ত্র যে সব রসের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ ক'রেছেন আমাদের মন তার বেশী কিছু সহজে কল্পনাও করতে পারে না। তা'হলেও এমন কোন কাব্য যদি মনের সামনে এনে হাজির করা হয় যা'তে মন শাস্ত্রীয় রসের আবছায়া পেলেও পুরা দস্তুর অনুভূতি পায় না, কথার ছন্দ আর যোজনা স্বাভাবিক মনে হ'লেও তার ভেতর কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, মন তখন দ'মে না গিয়ে বরং আনন্দই লাভ করে।

মন রসের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা জানবার জন্য তেমন ব্যস্ত নয়, সে চায় রসের উপভোগ। আর উপভোগ সব রকমেই হ'তে পারে, হাস্য রসের হাসিটীতে সে যেমন মেতে ওঠে, করুণ রসের দুঃখটীও সে তেমনি গভীর ভাবে অনুভব করে। সেই কারণে যে রসের নামটীই কেবল মনের জানা নেই। সেই রসটী যে সে অনুভব করে না এমন হ'তেই পারে না। আর রসাত্মক বাক্যই যেহেতু কাব্য, কাজেই এই শ্রেণীর

রস রচনাও কাব্যের সামিল না হ'য়ে যায় না। হেঁয়ালীকে আমরা এই হিসাবে কাব্য বলতে চাই।

যে হেঁয়ালি ধাঁধাঁর নামান্তর মাত্র যা শ্বশুর বাড়ীতে নবাগত জামাইকে কায়দায় ফেলে অম্লান বদনে কাণ মলা খেতে বাধ্য করে এবং যা'তে প্রয়োগকারীর জন্য যথেষ্ট আমোদ রসের বন্দোবস্ত থাকলেও জামাই বেচারীর দুর্ভোগ রসের অবধি থাকে না সে রকম হেঁয়ালির কথা আমরা বলছি না। আমাদের হেঁয়ালি হচ্ছে সেই জাতির কাব্য যা'তে সাধারণ কাব্যের বাইরের গঠন বজায় থাকলেও আর আর বিষয়ে সে সম্পূর্ণ আলাদা। পাঠকের মনে এই হেঁয়ালি বিভিন্ন রসের লোভ দেখায় অথচ কোন রসই উপভোগ করতে দেয় না, ফলে পাঠক মহা ফাঁপড়ে পড়েন; তিনি একটা কিছু পেয়েছেন মনে করেন অথচ কি পেলেন বল্‌তে পারেন না।

যা' হোক্ এই না পাওয়ার ভেতর কোন দুঃখ নেই কোন নিরাশ ভাব নেই। বালক ধ্রুব যখন পাগল হ'য়ে পদ্মপলাশলোচনের খোঁজে ছুটল, তখন যদি পদ্মপলাশলোচন হরির বদলে তার সামনে এক কাণা কেষ্ট এসে হাজির হ'ত তবে বোধ হয় বালকের বুক ভেঙে যে'ত আর সে অভিমানে ও দুঃখে আত্মহত্যাই ক'রে ফেল্‌ত। কিন্তু কাব্যরস পিপাসুর মনে কোন একটা বিশিষ্ট রসের আস্বাদ পাবার জন্য অমন ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে না। এমন কি কাব্য পড়বার আগে, কোন্ রসের অনুসন্ধান মিলবে তার কোন ধারণাই পাঠকের মনে আসে না। কাজেই দুনিয়াছাড়া অর্থাৎ রসশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার বাইরের কোন রস যদি কোন কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে তবে সেই কাব্য বেচারীকে নির্ব্বিচারে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

হেঁয়ালি এই শ্রেণীর কাব্য। এখন কথা হচ্ছে হেঁয়ালির অন্তর্নিহিত রসটির একটা নামকরণ করা যায় কি না? যে রস মনের মধ্যে যে ভাবটা জন্মায় সেই ভাবের নামেই রসের নাম ঠিক করবার রীতি। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায় একই কাব্য বস্তু রুচির বা বুঝবার ক্ষমতার তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রসের সৃষ্টি করে। যথা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা একদলের কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্য হেঁয়ালি আবার আর এক দলের লোক সে সব কবিতাকে সৌন্দর্য্যের চরম কল্পনা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের সেই,

"জানি, আমার পায়ের শব্দ
শুনতে তুমি পাও,
ব্যাকুল হয়ে পথের পানে চাও!"

কবিতাটী পড়ে অনেকে এর ভেতর উঁচু দরের আধ্যাত্মিক ভাবের সন্ধান পেয়েছিলেন আর হিতবাদীর সম্পাদক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রেগেই অস্থির হয়েছিলেন। এমনকি তিনি কবিকে ষণ্ড কবি আখ্যা দিতে ছাড়েননি। আবার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই কবি সম্রাটের স্তুতিগানে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কাজেই বুঝবার সামর্থ্য আর রসের অনুভূতি অনেকটা সময় এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে। আজ যা হেঁয়ালি কাল তাই জলের মত সোজা ব'নে যেতে পারে। কিন্তু সকল যুগেই কতকগুলি কাব্যরূপী বস্তু সাধারণের কাছে হেঁয়ালিই থেকে যাবে অর্থাৎ তার মানে বুঝবার বা তার ভেতরকার রস অনুভবের চেষ্টার ফলে মন হতভম্ব হয়ে পড়বে। এই হিসাবে হেঁয়ালি কাব্য রসের নাম হ'তে পারে হতভম্ব রস; আমরা চলিত কথায় একে ভ্যাবা চাকা রস বলিতে পারি।

একদল নব্য কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি নাকি কাব্যের সামিলই নয়। সাহিত্যিক দৈবজ্ঞেরা বল্‌ছেন এগুলি কোনকালেই কাব্যের আসন পাবে না। আর সমালোচকেরা বিদ্রূপের ছলে এই সব কবিদের লক্ষ্য করে বলেছেন "হে ভগবন্! এদের দোষ নিও না, এরা নিজেরাই জানে না এরা কি লিখছে, 'আমরা বলি মাভৈঃ!' তাদৃশ কবির দল, আশ্বস্ত হও। তোমাদের সুবিধার জন্য আমরা হেঁয়ালিকেও কাব্যের আসনে বসাব।

আমাদের এ চেষ্টাকে কেউ দুঃসাহসের কাজ মনে করলে ভুল করবেন, দেখুন যিনি কবি তিনি কাব্য পয়দা ক'রেই খালাস! পড়ে পড়ে পাঠকের মন উদ্‌ভ্রান্ত হউক, আর হেসে পেটে খিলই ধরুক বা আকুল কান্নায় চোখ অন্ধ হোক আর বৃদ্ধের শেষ বয়সের সম্বল যুবক পুত্রটী বিরাগী হ'য়ে বনে যাক অথবা ভয়ে পাঠকের হৃদ্‌রোগই

জন্মাক্, কিন্তু আদি, হাস্য, করুণ বা ভয় ইত্যাদি রসের অবতারণা করেছেন ব'লে কবির উপর কেউ খেসারতের দাবী করে না। এই যদি ব্যাপার হয় তবে হতভম্ব রসের কবির বেলা আলাদা নিয়ম হ'তে যাবে কেন, আর তাঁর নাম কবিদের নামের তালিকার বাইরেই বা থাক্‌বে কেন? সুতরাং কবিরা নিশ্চিন্ত মনে যত ইচ্ছা হেঁয়ালির সৃষ্টি করতে পারেন।

পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্য এখানে কাব্যিক হেঁয়ালির একটা নমুনা দেওয়া গেল। আমরা কবি নই, কোনদিন হ'বার আকাঙ্ক্ষাও রাখি না। তবে কি জানেন বন্যাপীড়িতদের সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমাদের রাসভকণ্ঠ বাঞ্ছারামকেও গান গাইতে হয়েছিল। পরোপকারার্থীয় অনেক সময়ই অসম সাহসে ভর করতে হয়।

নমুনাটী এই—

আজ, ভোরের আকাশ তলে কেন
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে হেন?
প্রদীপে প্রদীপে আলো,
সেই আলোতে ভাসলো কালো,—
কালো যমের জমকালো রূপ
দেখে আমার মনটী বিরূপ!
অথৈ জলের তরঙ্গে ঘোর
ধ্বস্‌ছে মনের কিনারা মোর।

আহা, যোজনের পথ দূরে যদি,
সরেই থাকে নিরবধি;
কিংবা আমার আশেপাশে
থাক্‌তে চায় সে, থাকুক্‌না সে!
শুধুই কেবল গণ্ডগোলে,
ভণ্ডামির এ মিথ্যা ভোলে
ভুলিয়েই যে দিবে ফাঁকি—
টের পেয়েছি সব চালাকি!

কেন, আমি কি তার মনের মতন
সাগর-ছেঁচা অরূপ রতন?
তাই যদি ঠিক হ'তো, রে ভাই,
মাথা গুঁজবার মিল্‌তো রে ঠাঁই!
হা হতোহস্মির কান্নাকাটি
করতো না মোর হৃদয় মাটি!
চলচ্চিত্রে খুঁড়ছি মাথা,—
নিমেষে ভোল ফিরায় ধাতা!
জেগেই অমন 'জ্ঞানের বাতি'
নিবিয়ে জাগি আঁধার রাতি।
আলোয় কালো কালোয় আলো
বল যাহাই লাগে ভালো,
আমার কি তায়, হয় বা যদি
নদীর জলে জলের নদী?—
বাইরে আছি বিশ্ব মায়ায়
ধার ধারিনা কারো ছায়ায়?

কেগো, জানতে চাহ, এই যদি হয়
বিশ্বরাজ্যে মোর পরিচয়,
কোন্ ভাঙনের তোড়ে আবার
ভাঙ্‌লো আমার মনের কিনার?
হায় দরদি, সঙ্গোপনে
শুনবে যদি, ভঙ্গ রণে
দিও নাকো, বসো কাছে,
বলছি যাহা হিয়ায় আছে।

দেখ, হৃদয়ের এক কিনারে হায়,
একটী পিণ্ড ঝুল্‌ছে মায়ায়,
অপর পাশে কেবল হাওয়া,
বৃথাই তাহার আসা যাওয়া!
পিণ্ড বলে বাতাস করো!
করেই না হয় তুমি মরো!
হাওয়া বল্‌ছে পিণ্ড ভায়া,
জোর বাতে যে টুটবে কায়া!

আবার, পাগলকরা দখিন বায়ে
মিল্‌ছে যখন দখিন বায়ে,
তখন দেখি পিণ্ড সাথে
সেই হাওয়া যে রঙ্গে মাতে!
এমন ধারা ভণ্ডামি ভাই,
বন্ধু, তোমার অজানা নাই!

করেছি সার তাইতে নীতি,—
আবাহনেই বিদায় গীতি!
উদার আকাশ যবে চোখ তুলে চায়,
বলে বাছা মোর কোলে আয়,
দুঃখে আমি ফিরাই আঁখি
বিশ্ব জোড়া কেবল ফাঁকি!
তাই ভাঙনের গানটী গাওয়া,—
মনের মাঝে ঝড়ের হাওয়া!
সমঝে নিও কেমন ঠেলা,—
আত্মারামের ভেল্‌কী খেলা!

অভিশপ্ত

[শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদের একটি সমৃদ্ধ প্রশস্ত কক্ষের সম্মুখে, উন্মুক্ত বারেন্দায়, সাহাজাদা একখানা আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া, ভরা ভাদরের পূর্ণ নদীর মতই, উচ্ছ্বসিত বক্ষে, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

দ্বাদশীর চন্দ্রের আলোকে, চারিদিক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়। অদূরে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ,—পার্ব্বত্য নদীটি, আঁকিয়া বাঁকিয়া, দুকূল ভাসাইয়া, জ্যোৎস্নার রজত ধারায় খচিত হইয়া, হীরক হারের মতই ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। তটিনীর সলিল সম্পৃক্ত শীতল নৈশ বায়ু, সাহাজাদার অঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া, তাহার শোণিত শিরায় প্রলেপ বুলাইয়া দিতেছিল।

সাহাজাদার অন্তর আজ অনেকটা আশ্বস্ত ও শান্ত। একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির মন মাতানো ভাব, তাহার ঢল ঢল মুখে, চোখে, মাখান রহিয়াছিল। বিজয় পূর্ণ আনন্দের একটা অসীম হর্ষচ্ছটায়, তাহার আশা-হত মলিন মুখখানা, এতদিন পরে, আজ সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সাহাজাদা নীরবে বসিয়া, ভাবিতেছিল,—মতিয়া সম্মতি-জ্ঞাপক উক্তির কথা! দু'দিন পরে আমি বাদসার আসনে উপবেশন কর্‌ব, দু'দিন পরে দুনিয়ার মালিক ত হ'ব আমিই! কাজেই মতিয়া বেগম হব্‌যর এত বড় প্রলোভন, পদদলিত কত্তে কিছুতেই সমর্থ হবে না! আগামী কল্য, এমনি সময়ে, মতিয়া তা'র ছোট্ট যুঁইফুলের মত সুন্দর সুমধুর হাসি-মাখান মুখখানি নিয়ে, আমাকেই স্বামীরূপে গ্রহণ কর্‌বে! আর আমি একটা পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর হয়ে, আমার অন্তরের প্রেমপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ে, কামনা ব্রততীরূপেই মতিয়াকে বক্ষে ধারণ করে, অন্তরের অসীম গ্লানির অবসান কর্‌ব। মতিয়াকে সেই ত কয় মিনিট মাত্র দেখেছি, সেই কয় মিনিটের স্মৃতিই আমাকে মসগুল করে রেখেছে! মতিয়া রূপসী, বিদুষী, নম্রকম্র, দৌলত তা'র তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্যা! মতিয়ার জন্ম,—বাদসার ভোগের জন্যই, আর দৌলত,—হোসেন আলীর মত দরিদ্রের কণ্ঠ-হার হবারই উপযুক্তা। রূপসী নব-যৌবনা মতিয়ার সঙ্গই যে আমার একান্ত ইপ্সিত, একান্ত বাঞ্ছিত! বল প্রয়োগে সেই হতভাগিনীকে, ভগ্ন-ক্রীড়নকের মতই অবস্থান্তর ঘটাইয়া, সে যে তাহাকে কামনা পরিতৃপ্তির উপাদান ছাড়া, অন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারে নাই, তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল! এবং তজ্জন্য সে আপনাকে এতটুকুন স্বার্থপর ও মদান্ধ বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছিল না।

সাহাজাদা যখন মতিয়ার স্মৃতিতে একান্ত আত্মহারা, ঠিক এমনি সময়ে দৌলতন্নেছা, ধীর মন্থরগতিতে সাহাজাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—এবং রক্তশূন্য বিবর্ণমুখে, লজ্জার ঈষৎ উত্তপ্ত আরক্ত আভা বিচ্ছুরিত করিয়া, যেন কেমন অভিভূতবৎ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল।

দৌলতন্নেছার অযত্ন রক্ষিত, কেশপাশ বন্ধন মুক্ত! উহারই কয়েকটি ক্ষুদ্র গুচ্ছ, শিথিলীভূত ভাবে, তাহার, বিকশিত শতদল পদ্মের মতই, অপরূপ কমনীয় মুখের আশে পাশে, যেন লুব্ধ ভ্রমরের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার আয়ত বিশাল নেত্রদ্বয় বিস্ময় ও আশঙ্কাচ্ছায়ায় মথিত। অসীম অভাবনীয় উত্তেজনায় বক্ষোবাস মুহুমুহু কম্পিত হইতেছিল। তাহার অসম্বদ্ধ বেশবাস, উত্তেজনার ঘনশ্বাসে, অনেকটা স্খলিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। তাহার জ্যোৎস্নার মত সুগৌর মুখ কান্তি, যেন অগ্নিতাপতপ্ত বস্তুর ন্যায়, লোহিতাভা ধারণ করিয়াছিল।

সাহাজাদা সহসা সচমক চকিত কটাক্ষে দৌলতন্নেছার প্রতি তাকাইয়া, পর মুহূর্ত্তেই মস্তক নত করিল। শত অপরাধীর মতই শঙ্কাকুলচিত্তে যেন কয়েক মিনিট নীরবে

বসিয়া রহিল। শেষে বিস্ময় স্তব্ধ নেত্র, দৌলতের চোখের উপর সংন্যস্ত করিয়া, কৌতূহলমাখা করুণকণ্ঠে বলিল "দৌলত! কি মনে করে এ সময় এলে?"

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দৌলতন্নেছা যেন মুসড়িয়া পড়িল। একটা জ্বালাভরা অসীম অস্বস্তির সংঘাতে, তাহার অন্তরটা যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। শেষে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন একত্র জড় করিয়া, দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "প্রিয়তম! এরূপ প্রশ্ন আজ তোমার নিকট নূতন শুন্‌লেম, আরও অনেক দিন ত আমি এমনি সময়ে এসেছি কৈ তুমি ত কোন দিনই এতটা থতমত খেয়ে, এভাবে প্রশ্ন কর নি! মানুষ যখন অভাবনীয় বিপদে পড়ে—উদ্ধারের পন্থা খুঁজে বের কত্তে পারে না, তখন সে সামান্য একটা সূক্ষ্ম-তন্ত্রী শেষ অবলম্বন করে, বিপদ স্খলনের, শেষ চেষ্টা করে থাকে! আমারও আজ সে অবস্থা, আমিও একটা মিথ্যা আশায় হয় ত—তেমনি কিছু কত্তে অগ্রসর হয়েছি। মনে মানছে না, তাই আজ মান, অভিমান বিদায় দিয়ে, তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে সাহসী হয়েছি। তুমি সবই জান,—তবু এমনি ধারা প্রশ্ন করার অর্থ,—আমার মনে হয়, উত্তপ্ত অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করে, তার প্রচণ্ড তাপ বর্দ্ধিত করার প্রয়াস ছাড়া,—আর কিছু নয়ই! এতে যদি তুমি তৃপ্তি পাও,—তাও মনে করব তোমার অসীম দান,—মাথা পেতে নিবই!"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "দৌলত! আমাকে ক্ষমা কর। পূর্ব্ব স্মৃতি সব ভুলে যাও, বাবা যেভাবে আমাদিগকে পরিচালনা কত্তে চাইছেন,—তাইত মাথা পেতে নিতে হ'বে। এর ব্যতিক্রম ঘটাবার উপায় নেই ই। তবে মিছামিছা কেন,—এম্‌নি ভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট কচ্ছ? হোসেন আলী সুপুরুষ,—বিদ্বান লোক। সৎপাত্রেই তোমাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার দৃঢ় অভিব্যক্তিতে, একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে নিতান্ত উন্মাদের মতই,—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। অতি কষ্টে কয়েক মিনিট কাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অন্তরের প্রচণ্ড বিপ্লব গোপন রাখিতে সচেষ্ট হইল। শেষে নিতান্ত সহজ ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "প্রিয়তম! তুমি—তুমি আজ এমনি ভাবে আমাকে প্রবোধ দিতে,—এতটুকুন কুণ্ঠা বোধ করনি? তুমিই ত শিখিয়েছিলে,—স্ত্রীলোক যাঁকে একবার স্বামীরূপে বরণ করে, তিনিই তা'র জীবনদেবতা রূপে চিরকাল বিরাজমান থাকেন,—বাছাই করা জিনিষটা ভালবাসা রাজ্যের ভিতর একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার!—সেই তোমার মুখে এ ধরণের উপদেশ আজ যেন কেমন শুনাচ্ছে!—সুন্দর ও বিদ্বান, এ মাপকাঠী নিয়ে যদি স্বামী গ্রহণ করার সুনিয়ন্ত্রিত পথ আবিষ্কৃত হয়, তবে আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র তাদেরই স্ত্রী সংগৃহীত হওয়া উচিত,—ভালবাসা জিনিষটা একমাত্র তাদেরই একচেটে সম্পত্তি হওয়া উচিত,—যা'রা সুন্দর ও বিদ্বান বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে! কিন্তু তা'ত প্রণয় রাজ্যের নিয়ম নয়—মনের অসীম টানের উপরই এর ভিত্তি সুগ্রথীত!—আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি, তোমার স্নেহ লাভ করবার সুবিধা তুমিই আমার করায়ত্ব করিয়েছ,—এখন তুমি তা ফিরিয়ে নিতে চাইলেও, সে অমূল্য দান পরিত্যাগ করার উপায় ত আমার নেই। তুমিই আমার উপাস্য ও কাম্য! চিরকাল তুমি তাই থাক্‌বে,—আমাকে বিলিয়ে দেবার প্রবৃত্তি তোমার অন্তরে জাগরিত হলেও, আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব ত স্থান পেতে পার্‌বে না! বাদসা সাহেবের ইচ্ছায় এর কোন ব্যবস্থাই ত হয় নি। তোমার একান্ত ইচ্ছার উপর না এত বড় অভাবনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান চল্‌ছে!—তোমার মত পরিবর্ত্তন করে দেখ,—সব গোলযোগ এক মুহূর্ত্তে মিটে যাবে। তোমার মতের উপরই ত আমার সুখ, শান্তি,—ইহকাল পরকাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কচ্ছে! বল—তুমি আমারি থাক্‌বে? আমাকে এমনি করে অপরকে বিলিয়ে দিবে না?"

বর্ষায় নদীর বুক যখন ভরিয়া উঠে, তখন সে নিজের কল্ কল্ তানেই ভরপুর হইয়া বহিয়া চলে। অপরের কথা ভাবিবার সময় সে পায় না। সাহাজাদারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে ক্ষণিকের জন্য,—লজ্জার গাঢ় রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল "আমার মন যাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, যাকে পাবার জন্য আমি উন্মত্ত

অধীর চিত্তে—দিনের পর দিন কাটিয়ে, মিলনের সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা কচ্ছি,—তুমি কি মনে কর, তোমার অনুরোধে, তোমোর শান্তির জন্য, তাকে "পর" করে দিয়ে, চিরকাল অনুতাপানলে, জ্বলে মর্‌ব? সাধারণ মানুষের পক্ষে যে নিয়ম প্রযোজ্য, বাদসার ভাবী উত্তরাধিকারীর পক্ষে সে নিয়ম খাটতে পারে না। তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন—এর ভিতর নূতনত্ব কিছুই নেই। বাদসার বেগম হবার লোভ, স্ত্রীলোক মাত্রেরই হয়ে থাকে। আমি যে একমাত্র তোমাকে নিয়েই জীবনযাত্রার একমাত্র উন্মুক্ত পথ মেনে নিব, এরূপ কোন নিয়ম নেই। আমার ভোগের সামগ্রী, কোন দিনই, গণ্ডীবদ্ধ থাক্‌তে পারে না,—কিংবা গণ্ডীবদ্ধ থাকে, এরূপ আমার ইচ্ছা নয়! আমি মতিয়াকে চাই,—এর প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি হ'তে চাইলে যে টুকুন স্নেহ, ভালবাসা, এখনও আমার নিকট তুমি দাবী কচ্ছ,—হয়ত তা'ও চিরদিনের মত হারিয়ে ফেল্‌বে।"

বজ্রের জ্বালাভরা ঝাঁঝের মতই, সাহাজাদার কঠোর উক্তি শ্রবণ করিয়া, দৌলতন্নেছার অন্তরের সমস্ত রক্ত অকস্মাৎ আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া গেল। তাহার নীরক্ত অধর সহসা দারুণ শৈত্যে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হৃদযন্ত্র যেন অসাড়—আড়ষ্ট হইয়া, জমিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাহার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন যেন, আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে চাহিতে ছিল,—ওগো!—আমি যে তোমার দৌলত; আশৈশব হ'তে তুমি যা'কে তোমার অসীম স্নেহ ও করুণায় অভিষিক্ত করে আস্‌ছিলে,—এ দুনিয়ায় সে-যে তোমাকেই একমাত্র আরাধ্য বলে চিনে নিয়েছিলে—সেই ত তুমি,—আজ এ-কি পরিবর্ত্তন! আজ তুমি তাকে এম্‌নি নির্ম্মম কথা শুনাতে দ্বিধা বোধ কর্‌লে না? তুমি যা' সহজভাবে বলে গেলে, তা'র প্রতি অক্ষর যে আমার হৃদয় শতধা করে ছিন্ন করে দিয়ে গেল! কেন তুমি আমাকে পথের ধূলা হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে, বুকের হার কর্‌বার প্রলোভন দেখায়ে একেবারে অথাও সলিলে, ডুবিয়ে দিতে চাইছ? অতঃপর কয়েক মুহূর্ত্ত নত মস্তকে,—নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, দৌলতন্নেছা দৃঢ়কণ্ঠে, বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিল "প্রিয়তম! তুমি এতটা নির্দ্দয় হ'বে, তা'ত কোনদিনই বুঝ্‌তে পারিনি। তোমাকে না পেলে,—আমার বাঁচা মরা যে সমান হয়ে দাঁড়াবে! তোমার শত শত দাসীর মধ্যে না হয়, আমাকে একজন বলে মেনে নেও! তোমাকে সেবা কর্‌বার অধিকারটুকুন আমাকে ফিরিয়ে দাও;—দশজনের মধ্যে আমিও একজন হয়ে, তোমার সেবায় জীবন কাটিয়ে দোব! এ অধিকার হ'তে আমাকে বঞ্চিত কর না,—আমাকে এমনি করে অপরের হাতে বিলিয়ে দিয়ে, চিরদিনের মত "পর" করে দিও না,—এতটুকুন ভিক্ষাও কি আমি তোমার নিকট দাবী কত্তে পারি না,—আজ মরণ পথে দাঁড়ায়ে,—এই শেষ প্রার্থনা জানাবার জন্য তোমার নিকট এসেছি। তোমার সামান্য মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আমার জীবনের সমস্ত অশান্তির যে অবসান হয়ে যেতে পারে!"

সাহাজাদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "না—তাত হবার উপায় নেই! আমার ত এতে আর কোন হাত নেই,—দৌলত! আমি মতিয়াকে গ্রহণ কর্‌লে, বাবা কিছুতেই তোমাকে আমার কণ্ঠলগ্ন হ'তে দিবেন না। এরূপ একটা প্রতিশ্রুতি তিনি অনেকদিন হয় আমার নিকট হতে আদায় করেই—না, তিনি শেষে এতবড় ব্যাপারে আপনাকে জড়িত করেছেন! মতিয়া আমার হ'লে,—হোসেন আলীর হস্তেই তিনি তোমাকে অর্পণ করবেন। হোসেনের উপর যে অত্যাচারের ব্যবস্থা হচ্ছে, তা'র কথঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যই তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তোমার বাঁচা মরার কথা বল্‌ছ, সে একটা কথার কথা! এটা মনে রেখো, বাদসার উত্তরাধিকারী,—তোমার মত শত শত ভালবাসার পাত্রীর মৃত্যুতে, এতটুকুনও বিচলিত হ'তে পারে না, তা' যদি হয় তবে তার মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না। মৃত্যু যত সহজ বলে তুমি মনে কর, তত সহজ ব্যাপার নয়-ই! হোসেনকে পেলে, আবার দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে! হোসেন আলীই আবার আরাধ্য হয়ে উঠবে, এ-হচ্ছে স্ত্রী চরিত্রের বিশেষত্ব। মরণের ভয় দেখিয়ে, আমাকে শঙ্কান্বিত করিতে চেষ্টা করো না, এ'তে কোনই সুফল ফলবে না।"

উপর্য্যুপরি আঘাতের প্রবলতায় দৌলতের রোদন-বিবশ চিত্ত,—সুগভীর অভিমানে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্‌শক্তি যেন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম

হইল। একটা প্রবল আত্মগ্লানি ও মর্ম্মান্তিক ধিক্কার সে আপনার ভিতর অনুভব করিল! তাহার মনে হইতে লাগিল এমনি ভাবে তা'কে লাঞ্ছিত না করে, নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত কর্‌লেও তা'র পক্ষে এত বড় নিদারুণ ও অসহনীয় হ'ত না। ......তাহার হৃদয়-বীণা যেন, এই বাক্য-বাণের কঠোর আঘাতে,—একেবারে ছিঁড়িয়া পড়িল। সে স্তব্ধ-অসাড়-বেদনা-পাণ্ডুর মুখে—ঈপ্সিতের মুখের প্রতি আহত নেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিল। একটা অব্যক্ত ব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাহার ভিতরটা ফাটাইয়া দিবার জন্য, অসীম বেগে পীড়ন করিতে লাগিল! দৌলতন্নেছা অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া, রোদন রুদ্ধ স্বরে, সকাতরে বলিল "স্ত্রী চরিত্রের যে টুকুন উপলব্ধি করে,—তুমি আজ বিশেষজ্ঞ সাজতে চাইছ, আমার মনে হয়, তা'র আগা-গোড়াই, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমাত্মক ছাড়া আর কিছু নয়-ই! আশৈশব তোমার ছায়া অনুগমন করেই চল্‌তে চেষ্টা করেছি, এতটা মাথামাথির সংস্পর্শে এসে, তুমি যদি, আমার ভিতর সেরূপ পূতিগন্ধময়, কোন বিশেষত্বের সন্ধান পেয়ে থাক, তবে সে-টা হয়ত, আমার সময়োচিত নিতান্ত দুরদৃষ্টের ফল বলেই ধরে নিতে হবে! তবে আমার অন্তর নিহিত, যা কিছু আছে, তা' যদি বিশ্লেষণ করে দেখাতে পার্‌তুম, তবে দেখতে, আমার অন্তরের প্রতি পর্দ্দায়, তোমার মোহন ছবি অঙ্কিত রয়েছে! সেখানে আর কোন কিছুর স্থান হবার সম্ভাবনা নেই! একমাত্র, স্বামী বিরহে উন্মত্তাধীর স্ত্রীলোকই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হয়ে থাকে, কিন্তু স্ত্রীর জন্য পুরুষ, প্রাণত্যাগ করেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের পাতায় খুবই কম। মৃত্যু,—সেত অতি তুচ্ছ কথা! এত বড় অভিসম্পাত মাথায় তুলে নিয়ে, জীবন ধারণ করার চেয়ে, আমার পক্ষে, মৃত্যুকে বরণ করাটা কি খুবই লোভনীয় নয়? যে অসীম জ্বালা বুকে করে—জীবন ধারণ কচ্ছি, তার পরিসমাপ্তি খুঁজতে গেলে, মৃত্যুই যেন, একমাত্র শান্তিলাভের প্রশস্ত মুক্ত-পথ বলে মনে হচ্ছে! অনেক আশা করেই আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, এ ভাবে, এতটা শেল বাক্য তুমি প্রয়োগ করবে বলে যদি ধারণা কত্তে পার্‌তুম, তবে হয়ত তোমাকে বিরক্ত কত্তে কখনও আসতুম না, আমার অপরাধ ভুলে যাও, ক্ষমা করো, আর যেন তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক সেজে, তোমার সুখের-পথে কণ্টক বিস্তৃর্ণ না করি। এতটুকুন শক্তি কি খোদা আমাকে দিবেন না? এ দাসীকে যদি কোন দিন, মনে করবার অবকাশ হয়, তবে ভেবে দেখো, কত বড় মর্ম্মন্তুদ যাতনা নিয়ে আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, আর কত বড় আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, আমার এই অভিশপ্ত জীবনের লীলা সাঙ্গ করবার সংকল্প নিয়ে, তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ কচ্ছি! না—আর ত পারি না, বিদায়—বলিয়াই দৌলতন্নেছা পাগলিনীর ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিল!

দৌলতন্নেছা বাহিরে আসিয়া, একাকী দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া ক্রন্দন করিল। শেষে ত্বরিত পদে আমিনার শয়ন কক্ষেরদ্বার প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে প্রহরী তরবারি হস্তে পদচারণা করিতেছিল, দৌলতন্নেছা তাহার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল "প্রহরি! দ্বার খুলে দাও, আমি ভিতরে যাব।"

প্রহরী করযোড়ে, নত জানু হইয়া, বিনম্রকণ্ঠে বলিল "সহাজাদি! ভিতরে প্রবেশের হুকুম ত কারো নেই, বড়ই কড়া আদেশ, গর্দ্দানা যাবার ভয় ত আমার রয়েছে।"

দৌলতন্নেছা মাতালের মত টলিতে টলিতে, বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে বলিল "কোন ভয় নেই প্রহরি! আমি হুকুম দিচ্ছি, সব দোষ আমিই মাথায় করে নিব। দ্বার খুলে দাও। পনর মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে যাব।"

প্রহরী দৌলতন্নেছার মনের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিল। একটা অসীম সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ছাইয়া গেল সে আর কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, নিজ দায়ীত্বে,—দরজার অর্গল মুক্ত করিয়া দিল। দৌলতন্নেছা কক্ষে প্রবেশ করিতেই, প্রহরী আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

দৌলতন্নেছা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, উপর হইয়া পড়িয়া, আমিনার বক্ষে দেহভার সংন্যস্ত করিল,—এবং অজস্র অশ্রু প্লাবনে তাহার বক্ষসিক্ত করিয়া, উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। আমিনা দৌলতের অভাবনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, একেবারে হতভম্ব বনিয়া গেল! একটা বুক ফাটা আর্ত্তনাদে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল! বিরক্ত-

তিক্ত-হতাশ-চিত্ত লইয়া, আমিনা বহু চেষ্টায় তাহাকে অনেকটা শান্ত করাইয়া, সমস্ত ঘটনার সারমর্ম্ম টুকুন সংগ্রহ করিয়া লইল। আগামী কল্য, কাজী সাহেবের অজ্ঞাতসারে মতিয়াও সাহাজাদার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করান হইবে, এই সংবাদে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটা অবসাদে তাহার সমস্ত দেহ, মন সহসা যেন একেবারে শিথিল হইয়া গেল! আমিনা ভাবিতে লাগিল—এ বিবাহের পরিণাম যে ভয়ানক গুরুতর! কয়টি নিরপরাধি প্রাণীর জীবন নাশের আশঙ্কা যে এতে বিদ্যমান!—এখন সে কি কত্তে পারে? সে যে বন্দী! এক পা'ও যে তা'র চল্‌বার ক্ষমতা নেই! কাজী সাহেব অনেক দিন বলেছেন, সাহাজাদার ও মতিয়ার বিয়ে হওয়াটা, নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বেঁচে থাকতে, এরূপ মিলন, কোন দিনই হ'তে পারবে না! এর ভিতর হয় ত কোন গূঢ়-রহস্য বিদ্যমান্ আছে, ডাকাত কর্ত্তৃক অপহৃত হবার পর হতে, মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ তিনি কিছুই সংগ্রহ করে উঠ্‌তে পারেন নি, কত চেষ্টা করেছেন, কোন ফল হয় নি! তাঁ কে এ সমস্ত সংবাদ জানাতে পার্‌লে, হয়ত কোন প্রতিকার হতেও পারে! অতঃপর একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "দৌলত। শুধু কাঁদলে কোন ফল হ বে না বিপদে ধৈর্য্যহারা হইও না। তোমাদের রক্ষার জন্য আমি বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, কিন্তু কিছু কত্তে পারলুম না, আজ আমি বন্দী, পরিণাম ফল যে কি দাঁড়াবে তাও জানি না, আমার জীবন দিয়েও যদি হোসেনের উপকার কত্তে পাত্তুম, তবেই আমার এ উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হত! যাক্ সে কথা, আচ্ছা দৌলত! তুমি যদি একটা কাজ কত্তে পার, তবে আমি এ কারাগারে আবদ্ধ থেকেও শেষ চেষ্টা করে দেখতাম,—বল পারবে?"

দৌলতন্নেছা তাহার আগ্রহান্বিত দৃষ্টি আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া বলিল 'কি কত্তে হবে আমাকে আমিনা দিদি? বল, আমি চেষ্টা করে দেখব।"

আমিনা দৃঢ় স্বরে বলিল 'আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে—যদি কাজী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিতে পার, তবে কোন ফল হলেও হতে পারে? বল পার্‌বে? ধরা পড়লে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না!"

দৌলতন্নেছা দৃঢ়তার সহিত বলিল "তা পাঠাতে পার্‌ব বলেই ত মনে হয়, আমিনা দিদি! দাও তুমি চিঠি লিখে। তবে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বিশেষ যে কিছু হবে, এমন ত মনে হচ্ছে না!"

আমিনা আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিঠি লিখার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিল, এবং দৌলতন্নেছার হস্তে চিঠিখানা অর্পণ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। দৌলতন্নেছা চিঠি হস্তে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সঙ্কেত করিতেই, দ্বার খুলিয়া গেল। সে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিল। প্রহরী পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

দুর্গোৎসব

(শ্রী পূর্ণিমাপ্রভা রায় সরস্বতী)

শরতের প্রভাত সূর্য্যের বিশ্ববিমোহন রক্তচ্ছটা ধরাবক্ষ চুম্বন করিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের কনককিরণ রেখা দিগ বধূর মুখমণ্ডল রাঙায়িত করিয়া তুলিয়াছে। দিকে দিকে শরতের অপরূপ লাবণ্য রাশি উছলিয়া-উথলিয়া-ঝংসিয়া পড়িতেছে! প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে শরতের সুষমা, শরতের—মধুরিমা, শরতের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে! মাঠভরা ধান্য রাশিতে শরতের হরিত শ্যামকান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, শেফালিকার শুভ্রদলে, সরসীর নীলজলে, গগনের নীল শোভায় পদ্ম কুমুদের সুরভিচ্ছটায়, কি জানি কি এক অপরূপ অভিনব, অতুলনীয় রূপ মাধুর্য্য জনমন উতাল করিয়া তুলিয়াছে? কিসের এ আনন্দ? কিসের এ পুলক শিহরণ? কাহার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির এই অপরূপ সজ্জার বিপুল আয়োজন? বুঝিয়াছি আসিয়াছে সে দিন। বাঙ্গালীর চির আকাঙ্ক্ষিত-চির-অভিপ্সীত, চির- আরাধিত সেই শুভদিন। তাই যে কাণে, কাণে আসিয়া কোন সুদূরের অলক্ষ্য চরণ নূপুর গুঞ্জন ধ্বনি মৃদু মধুর রবে বাজিতেছে? তাই যে শরতের শুভ্রোৎফুল্ল যামিনীর উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যচ্ছটায়; অনুসন্ধিৎসু প্রাণ কোন এক মহাসৌন্দর্য্যের গভীর সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। তাই যে "টুপটাপ" শিশির পতনে সন্তান বর্গের বিশুষ্ক হৃদয় মায়ের আশীষধারা বর্ষণের ন্যায় সিঞ্চিত পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। বুঝিয়াছি আসিয়াছে সে দিন

অন্তরীক্ষে মঙ্গল দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। সমীর সঞ্চালনে কানে কানে প্রাণে প্রাণে সে রব বাজিতেছে, বিঘোষিত হইতেছে! মা আসিতেছেন তাহারই আগমনের আবাহন সঙ্গীতেরসুর পাখীর কণ্ঠে, অলির ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে! তাহারই আগমনের সাড়ায় প্রকৃতি সজীব, সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তাহারই আগমনে অবসাদগ্রস্ত বিষাদ মলিন, বাঙ্গালীর বিক্ষতচিত্ত আনন্দের অধীর রঙ্গে রাঙ্গায়িত হইয়া শক্তির নবীন উদ্যমে জাগরিত, পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে! ইহাই যে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব—গৃহীর এক বিরাট আনন্দোৎসব! এ আনন্দোৎসবের তুলনা হয় না। আত্মবিস্মৃত হইয়া, বাঙ্গালীর, জীবন্ত উৎসবাবলীর চিরানন্দ বিস্মৃত হইয়া কেহ যদি বৈদেশিক উৎসবের নিছক ইন্দ্রিয় মন উন্মাদনাকারী শ্লীলতা-সভ্যতার পরিপন্থী নৃত্যগীতাদির মোহে ডুবিয়া থাকেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে বাঙ্গালী "বাঙ্গালী জীবনের শান্তিটুকু, পবিত্রত-টুকু যাহারা বিস্মৃত হয় নাই, তাহাদের প্রাণের কাণায় কাণায় আজি দুর্গোৎসবের আনন্দ সুধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ দৈন্য নিষ্পেষিত, নিঃস্ব বাঙ্গালীর প্রাণ আজি বিশ্বময়ীর আগমনের দিনে বিশ্ব সম্পদের অধিকার গৌরবে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে তাই বাঙ্গালী হৃদয় আজি বিশ্বময়ীর "সন্তান" গৌরবে উৎফুল্ল, গৌরবান্বিত বাঙ্গালী আজ মায়ের আগমনের দিনে আপনাকে শুধু নিঃস্ব, কাঙ্গাল দীন, আর্ত্ত আর ভাবিতে পারিতেছে না। বহির্জগতের কর্ম্ম কোলাহলগ্রস্থ জীবন হইতে আজ সে অন্তর্জগতের গভীরতম, নিবিড়তম প্রদেশের সান্নিধ্যে আসিয়া বিশ্বজননীর চরণছায়ায় উপবেশন করতঃ আপনাকে বিশ্ববাসীর চেয়ে অনেকখানি গৌরবান্বিত মনে করিতেছে এখানে সে একা প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন বিজয়ী বীরের ন্যায় একা; বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভীতি নাই, আইনের রৌদ্র তারণ নাই, সত্যই সে একা! প্রাণ মন ভরিয়া বিশ্বজননীকে মানসপটে অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী প্রেমবিহ্বল চিত্তে 'মা' 'মা' বলিয়া মায়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে! ইহা তাহার—বিপুল গৌরবকাহিনী নহে কি? বিশ্বের 'মা' কে "বাঙ্গালীর" মা বলিয়া যে জাতি বিরাট আনন্দোৎসব করিয়া থাকে সে জাতি কি নিঃস্ব? সে জাতি কি কাঙ্গাল? আর যাহার আনন্দ ব্যক্তির প্রাণের নহে, সম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধ নহে, যাহার আনন্দ দেশকে পরিপ্লুত করিয়া তুলে, যাহার আনন্দ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিচ্ছুরিত সেই মহোৎসব—দুর্গোৎসব—এক জীবন্ত উৎসব। উহার মহত্ত্ব নিরূপণ তুলাদণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে, বহির্জগতের তুলনীয় বস্তু নহে, উহা এক অপার্থিব আনন্দ! এই আনন্দের অমৃতবারি সিঞ্চনেই বুঝি শোক দুঃখ-দৈন্য পীড়িত বাঙ্গালী আজও বাঁচিয়া আছে। সারা বৎসর চাকুরীজীবি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বাঙ্গালী, ছাত্র বাঙ্গালী, প্রবাসের বিষাদ মলিন-জীবন, এই একমাত্র দুর্গোৎসবের আনন্দ বুকে পুরিয়াই বুঝি হাসিমুখে অতিবাহিত করিয়া থাকে; তাই আজি পূজার ছুটীর নৈকট্যে তাহার "প্রবাসী জীবন" একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, জননী জন্মভূমিও জগদম্বার দর্শনে ও অর্চ্চনীয় অলক্ষ্যেই যেন তাহার প্রাণ মন নিবেদিত হইয়া রহিয়াছে তাই আর মায়ের অদর্শন যেন সহ্য হইতেছে না। এই যে প্রাণের আকুলতা, ব্যাকুলতা—মায়ের জন্য শিশু প্রাণের ন্যায় ব্যাগ্রতা অস্থিরতা ইহা কি সত্যই বাঙ্গালী জীবনের মাতৃভাব প্রবণতার বিশেষত্ব নহে? বাঙ্গালীর মাতৃসাধনা, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব মৃণ্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীর অর্চ্চনা মূলেও এক অসাধারণ তপস্যা ও গভীর গবেষণা নিহিত রহিয়াছে, যে শক্তি মেঘে, রৌদ্রে, বিদ্যুতে, বর্ষণে, অনলে, অনিলে, জ্যোৎস্নায়, হিমে নিয়ত বিদ্যমান; বিশ্বের উত্থানে, পতনে, সৃষ্টিতে লয়ে যে শক্তির মহিমা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানীগণ যাহাকে "বিশ্বশক্তি" বলিয়া থাকেন সেই রূপময়ী অথচ রূপাতীতা গুণময়ী অথচ গুণাতীতা নিরাকারা সর্ব্বাকারা বিশ্বময়ীকে রূপ দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া যে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে উহাই যে বাঙ্গালীর এই "দুর্গোৎসব"। মা তিনি বিশ্বময়ী তিনি ভক্তকল্পিত মূর্ত্তিতেও তিনি, জড়েও তিনি, চেতনেও তিনি, অণুতেও তিনি, ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি, আনাতেও তিনি, জগতেও তিনি সুতরাং মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতেও তিনি, মৃন্ময়ীমূর্ত্তিও তাঁহার অধিষ্ঠানে জীবন্ত। তাই মায়ের কৃপায় বাঙ্গালীর এই উৎসব জীবন্ত ও সার্থক হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বাঙ্গালী শক্তি লাভের সাধনা জগজ্জননীর অভয়-দায়িনী বরাভয়-প্রদায়িনী শত্রুসংহারকারিণী আপদ বিপদ অরিষ্ট বিনাশিনী দুর্গামূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরী

রাজরাজেশ্বরী সুর-নর-বাঞ্ছিত রক্ত-কোকনদদল লাঞ্ছিত, অলক্তক-রঞ্জিত চরণতলে বসিয়া বাঙ্গালী "রূপং দেহি" "ধনং দেহি" "জ্ঞানং দেহি" "জয়ং দেহি" রবে, জ্ঞান, রূপ, ধন ও সর্ব্বপ্রকার বিজয়ের কামনা করিয়া থাকে। শক্তির পুত্র বাঙ্গালী জাতি—ক্লীব, পঙ্গু ও নির্বীর্য্য নহে, বীর্য্যশালী ও পৌরুষ সম্পন্ন সন্তান বলিয়াই বাঙ্গালী মায়ের এই রণরঙ্গিনী চণ্ডিকা মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়া "দুর্গাপূজায়" শক্তি সাধনাই প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়াই এই মহাপূজা চলিয়া আসিয়াছে বীর সন্তান বীর জননীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে, বীর জাতির ললাটদেশে তাই একদিন সাম্রাজ্য বিজয়ী রাজটিকাও ভাস্বররূপে জাজ্বল্যমান ছিল। কিন্তু দিনে দিনে দাসত্বের মসীলিপ্ত দেহ ও "আত্মবিস্মৃত প্রাণ" বাঙ্গালী বুঝি শক্তিহীন হইয়া, শক্তিময়ীর অর্চ্চনা হইতেও বঞ্চিত হইতেছে। মাতৃপূজার অধিকার বিচ্যুত বাঙ্গালী তাই আজ কতক অর্দ্ধাহারে অনাহারে, ব্যাধিগ্রস্ত ও দৈন্য-পীড়িত হইয়া অকালে মানব জীবনের আহুতি প্রদান করিতেছে শক্তির সন্তান বাঙ্গালী আজ জীবন সংগ্রামে অশক্ত! ভবিষ্যৎ তাহার পক্ষে আজ ঘনান্ধকারময়। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব কেবল শক্তির অর্চ্চনা নহে ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, জ্ঞানদাত্রী বাগ্দেবী এবং শক্তিপুত্রদ্বয় কুমার কার্ত্তিকেয় ও বিঘ্ননাশক গণপতির অর্চ্চনা ও দুর্গোৎসবের অঙ্গাঙ্গীভূত, সুতরাং 'দুর্গোৎসব' মানব জীবনের যাহা কিছু অভীষ্ট, যাহা কিছু ইষ্ট ও যাহা কিছু বাঞ্ছনীয় বাঙ্গালী তাহারই কামনা করিয়া থাকে, মায়ের নিকট সন্তানের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না, মা সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট চিরকালই পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ যে সন্তানের সকল সাধনাই ব্যর্থ দেখিতেছি, তবে কি মা পাষাণীর মেয়ে সন্তান বাৎসল্য ভুলিয়া গিয়াছেন? তাও কি হয়? মা কি কখনও সন্তানকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? মাতৃ হৃদয়ের শতমুখী-স্নেহ-গঙ্গা-ধারা কি কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে? উহা যে চিরকালই সন্তানকে অমৃতসিক্ত করিরা তুলে। আত্মবিস্মৃত সন্তানই বুঝি আজ আপনার মাকে ভুলিয়া গিয়া মায়ের অর্চ্চনায় তেমন করিয়া আর প্রাণ মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না। তাই মাতৃপূজার বাহ্যানুষ্ঠানে মা আর তেমন পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। গৃহধর্ম্মচ্যুত প্রবাসে লালিত, চাকুরীর অন্নে প্রতিপালিত সন্তানের পরপদানত চিত্তের অর্ঘ্য মায়ের রক্ত-কোকনদাভ পদতলে আর তেমন পরিশোভিত হইতেছে না। তাই যে, সন্তান-দুঃখ-মোচনে মাতৃ-হৃদয় তেমন বিগলিত বিচলিত হয় না। বাঙ্গালি! যদি তুমি শক্তি অর্জ্জন করিতে চাও, যদি শক্তি-সাধনা করিয়া শক্তিময়ীর কৃপালাভ করিতে চাও, যদি নিজের অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, পরমুখাপেক্ষিতা, বিদূরিত করিতে চাও তবে মাতৃপদে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া, মাতৃচরণে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া বাহিরের ঘটে ও মানসপটে শক্তিময়ীকে আহ্বান করিয়া তবে মাতৃপূজায় প্রবৃত্ত হও! দেখিব তোমার "শক্তিসাধনা", তোমার "দুর্গোৎসব" সত্য ও সার্থকতায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; দেখিবে তখন, মায়ের অমোঘ আশীর্ব্বাদ বলে "অবসাদ দৈন্য" জীবন তোমার শক্তি সম্পদে বলীয়ান্, গরীয়ান্, মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু বাহ্যাড়ম্বরেই দুর্গোৎসব হয় না, মাতৃ হৃদয় বাৎসল্য-স্নেহে দরবিগলিত হয় না। মাতৃপূজায় চাই ভক্তি! চাই শ্রদ্ধা! চাই একাগ্রতা! সুতরাং দুর্গোৎসবের দিনে সন্তানকে সে কথাই বড় করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেমপুষ্পে অন্তর-ডালিকে সুসজ্জিত করিয়া মাতৃচরণে তাহাই উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে। আবার দুর্গোৎসব সন্ন্যাসী বা প্রবাসীর উৎসব নহে, উহা যে গৃহীর উৎসব, গৃহীই যে এ পূজার অধিকারী। বাঙ্গালি গৃহহীন তুমি কোন অধিকারে শক্তিপূজা করিবে? যাও! প্রবাসের বিলাসপূর্ণ জীবনের মোহ কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, দাসত্বের নাগপাশাবদ্ধ চিত্তকে মুক্ত করিয়া স্বাবলম্বী হও। আবার তেমন করিয়া গো রক্ষায়, তুলসী সেবায় অতিথি-সৎকারে দেব-বিগ্রহের পূজা অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ কর! দেখিবে তখন অভয়া বরদা মূর্ত্তিতে মা তোমার পূজা গ্রহণ করিয়া তোমার সকল অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। সেদিনই তোমার দুর্গোৎসব সার্থক হইবে।

কুমারী সুপ্রভা রায় বি, এ, বি, টি—

চাঁদের প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

শরতের পূর্ণশশী নির্মেঘ আকাশে জোছনা ধারা ঢালিয়া ভারতকে স্বর্গের মত শান্তি নিকেতন করিয়া তুলিয়াছিল। ছাদের উপর—কার্ণিসে হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত কবি ভাবিতেছিলেন—

"কে বেশী সুন্দর ?"

কথাটা আনমনা কবির মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—

"কে বেশী সুন্দর ?"

"কে বেশী সুন্দর কবি ?"

একটু চমকিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কবি কহিলেন—আসুন। আমি ভাবছি কে—বেশী সুন্দর,—চাঁদ—অই শরদাকাশের পূর্ণশশী—না সে !

"সে ?—মানুষ ?"

"হাঁ রাজা মানুষ।"

"সে কে, কবি ?"

"সংযুক্তা"

"এত সুন্দর সে ? বল কি কবি! তোমর কবিত্বের রসান দেওয়া চোখ কবিত্বে জ্বল জ্বল করছে—ভাবের লালিমায় হিয়ায় সৌন্দর্য্যের বাণ ডাকে, তুমি যাকে ভাল বলতে চাইবে, তাকে এমন করে এঁকে তুলবে যে অমন ছবি হয়ত জগৎ পিতার ধারণারই বাইরে। তাই তুমি কবি। তুমি সৃষ্টির বাইরে কিছু গড়ে তুলতে জানো। কেমন কবি হলো ত। এই ত তোমার কল্পনায় মানসী প্রতিমা! নয়—

রাজা, জগৎ ধন্য হয়ে যেতো—যদি সবারই কবির চোখ থাকতো। যাক্ ও জিনিস বোঝাবার নয়—ভাগ্যে থাকলে ঘটে—অন্ধকে আলো বোঝানর মত অকবিকে কবিত্বের রস—শোন রাজা, তার সৌন্দর্য্যের কথা উঠছিল সে এর চাইতে ঢের বেশী সুন্দর। এ চাঁদের আলো ধার করা; প্রাণহীন, কোমলতার ছায়াও এতে নাই। এর সৌন্দর্য্য সুধু তার জন্যে আর আর কিছু দেখবার নাই। এ জোছনা চাঁদের মতই নিরেট মাত্র পৃথিবীর জন্যে। অবশ্য এ সুন্দর বটে খুবই সুন্দর—কিন্তু—

কিন্তু কি কবি? ভাবে থৈ পাচ্ছে না বুঝি!

হাসছ রাজা! সত্যি তার নাগাল ধরতে পার্চ্ছি না। তবে এ কথা বল্লে ভুল হবে না—এ চাঁদের জোছনা তার পা'র নখে গড়ায়—

বটে! কবি বড় বাড়াবাড়ি কর্চ্ছ! বর্ণনার শেষ প্রান্তে গিয়েছ আর ঠাঁই নাই।

হাঁ রাজা, তার রূপের গর্ব্ব কল্পনার কাম্য। আর তার মানবতার গৌরব, তার নারীত্বের মহিমা—সে দেবলোকের বাঞ্ছনীয়—নরলোকের গৌরব - বিধাতার অপূর্ব্ব দান।

"সত্যি ?"

"হাঁ রাজা।"

"সংযুক্তা—কনোজ কুমারী এত রূপ এতগুণ ভারতের অধীশ্বরীর হতেই হবে—"

ভাবিতে ভাবিতে পৃথ্বীরাজ চলিয়া গেলেন!

কবি ভাবিলেন—নাঃ—সব নষ্ট হয়ে গেল। অরসিকেষু রস নিবেদন—নাঃ—দুর্ভাগ্য!

(২)

সেই একদিন আর এই একদিন! এইখানে বসে একদিন শারদ চন্দ্রালোকে সংযুক্তার রূপের খ্যাতি গুণের প্রশংসা করেছিলাম। ভেবেছিলাম কনোজ আর ইন্দ্রপ্রস্থের মনোমালিন্য ঘুচাবার এই সূত্র। ভুল করেছিলাম। আজ ভারতের উপর কালো মেঘ ছেয়ে এসেছে। মূর্খ জয়চাঁদ নিজের ঘরে আগুন দিচ্ছে। ভাবছে—পৃথ্বীকে পুড়ে মারবে। তা নয়—পৃথ্বী জয়চাঁদ সব ভস্ম হবে ভারতে দাবানল জ্বলবে। ঘোরী মহা আড়ম্বরে রণসজ্জা করে এসেছে অন্ধকার ঘোর ঘনঘটা মা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী জগদম্বা অন্ধকার ঘুচাও—

কি ভাবছ কবি!"

"কে—রাজা এত আঁধারে কেন? ভারতের আকাশ জুড়ে এত কালী কে ঢেলে দিলে?"

"আঁধার? চোখ বুজে আছো না চেয়ে বলছ—"

"চেয়েই বলি আর চোখ বুজেই বলি আমার বুকের ভিতর আঁধার জমাট হয়ে শক্ত হয়ে উঠছে। আঁধার পাথরের মত!"

"খেয়াল দেখছ না কি—চোখ চাও।"

"হাঁ চাঁদ উঠেছে বটে। বাঃ—সঙ্গে তুমিও এসেছ? এ বেশ! হাঁ ভারতের মহারাণী বটে! কেমন রাজা মনে পড়ে,—এইখানে এক শুভ্র শারদ জোছনায় তোমার চিত্তকে স্নান করিয়ে এই মহীয়সী মহিলার হৃৎপদ্মাসনে তোমায় অভিষিক্ত করেছিলাম। হাঁ, রাণী বটে—"

"কবি, আশীর্ব্বাদ করিও—যেন ভারতেশ্বরীর গৌরব ক্ষুণ্ণ না করি।"

বাবা, সাক্ষাৎ মা তুই মহাশক্তি তোর পেটে জন্মে গণেশ কার্ত্তিক—যারা জ্ঞানে শক্তিতে স্বর্গজয় করে তারকাসুর নিধন করে। এমন যাদের মা, তারা পরাধীন হতে পারে না। কখ্‌খনো না—

কবি, স্বপ্ন দেখছ ভুল ভেঙ্গে যাবে। জাতি যে নেই। থাকৃত যদি তা হলে আমার বাবা উঃ—থাক্‌ দীর্ঘকাল পর হয়ত আবার আমিই আস্‌ব যখন আমার বাবা নূতন হয়ে জন্মাবে—যখন বাবা মোর ঘরের দুয়ারে দুষ্‌মন নিয়ে আস্‌বে না—দুষ্‌মন তাড়াতে মেয়ের সঙ্গে প্রাণ দিবে এ যাত্রা এই শেষ—

এ কি কথা বল্লি মা—! রাজা, রাজা—

কি কবি—

শুনছ—?

না—আমি বহু দূরে গুপ্তচরের আলোক সঙ্কেতে লক্ষ্য কর্চ্ছিলাম।

(৩)

"নীরব নিশীথ নীরব ভারত
পূরিত নীরব আঁধারে।
স্তম্ভিত অতীত, ভীত ভবিষ্যত
সিক্ত নয়ন আসারে।
অভ্রপৃক্‌ অদ্রি উত্তুঙ্গ ভীষণ
গর্ব্ব স্ফীত বক্ষ ভীম প্রহরণ
শুনিয়া সভয়ে প্রতীচী গর্জ্জন
নিমগ্ন নীহার সাগরে।
নিস্তব্ধ নীরব যখন প্রতীচী,
লক্ষ পিককণ্ঠে কুহরিত প্রাচী,
(আজি) প্রাচীর মিহির জ্যোতিঃ প্রতীচীর
বর্ষিছে কর তীব্রধারে।
কুলিশ নির্ঘোষ বীরের হুঙ্কার
ভীম নীরবতা পরিবর্ত্তে তার
(আজি) ক্ষীণ পিককণ্ঠে অনুকারী স্বর
কম্পিত কণ্ঠে ঝঙ্কারে।
(যখন) প্রাচী সিংহাসন উন্নতি শিখরে,
প্রতীচী তখন পূরিত বর্ব্বরে,
ভীত ভিখারী আজি সেই প্রাচী
উন্নত প্রতীচী দুয়ারে।"

কবি, এ আঁধারে রণক্ষেত্রে পড়ে ডুকারিয়া কাঁদ্‌ছ?

না মা স্বপ্ন দেখছি—

স্বপ্ন—

হাঁ মা—দেখলাম শোণিত সিক্ত ভারত লক্ষ্মী সুদূর প্রতীচীর পদতলে ভিখারিণী—

তুমি কবি!

হাঁ মা, আমি কবি—ভবিষ্যৎ দেখছি—

সঙ্গে কেউ আছে?

হাঁ মা—এই লও ভারতের স্বাধীনতার পবিত্র শবদেহ। কেউ ছোঁয় নাই—শুধু সেবক হিসাবে, কবি হিসাবে—সাহিত্যিক হিসাবে—আমি ছুঁয়েছি—মা! খুব আঁধার তবু দেখ্‌ছি এ বুকের রক্তধারা গাঢ় লাল—

কাঁদ্‌ছ কেন কবি অযোগ্যের স্বাধীনতা থাকে না। জাতীয়তা হীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কেন? কনোজে দিল্লীতে বিরোধেই ভারত মরে,—ভ্রাতৃ বিচ্ছেদে স্বাধীনতার চিতা জলে ওঠে! দাও কবি, এ শবদেহ আমার বুকে,—এ সংযুক্তার প্রাণপতির অমর পুণ্যস্মৃতি। যদি কখনো ভাই ভাই সংযুক্ত হয়, আবার সংযুক্তা এই বীরপুরুষকে নিয়ে চিতা ভস্ম হতে বের হয়ে আসবে। আমি চল্লাম কবি, আমি এসেছিলাম ভারতে—আমি কে এতদিন বলিনি—আজ বলে যাচ্ছি—

আমি ভারতের রাজলক্ষ্মী!

হাঃ—হাঃ—নূতন বল্লি কি মা,—এ আমার জানা কথা! আমি কবি—

দাও কবি, ওই চন্দনে সাজানো চিতায় রায় পিথোরার পুণ্যময় দেহ তুলে;—আমি সেজে এসেছি—"

তুমি কোথায় যাবে মা—

বাঃ জানো না তুমি? তবে তুমি ত কবি নও! আমি যে রাজার রাণী! এ লোকে ও লোকে—সর্ব্বত্র! সেথায়ও রাজার সাথে এম্নি বীরবেশে থাক্‌ব—তারপর যদি জন্মাতে হয় এই দেশে এম্নি বীরাঙ্গনার সাজে আস্‌ব—আমি সংযুক্তা।

চিতা জ্বলে উঠ্‌ল।

* * * *

আমি করেছিলাম এই আগুনের সৃষ্টি—আজ নিভে গেল। চাঁদ কবি, চেয়ে দেখ্‌ছ তোমার কবিত্বের উৎস, আগ্নেয়গিরির গলিত উষ্ণ কর্দ্দমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে আর কেন? ঐযে তর-তর-প্রবাহিতা যমুনা—তারি তীরে জন্মেছি—তারি তীরে বেড়েছি—তারি জলে বেঁচেছি—আজ তারি জলে প্রায়শ্চিত্ত করে রাজার সঙ্গে মিশি গে। রাজা—রাজা—বন্ধু—সুহৃৎ—আবাল্য সহচর—! রাণীছাড়া রাজার চলে না—কবি, সহচর ছাড়াই কি চল্‌বে—?—দুঃ—

* * * *

চিতা নিভে গেল। যমুনার জলে কি জানি একটা পড়ে ঝুপ্‌ করে উঠ্‌ল--রজনী অবসানা—

একটা পাখী দূর তরুশিরে ধ্বনি করে উঠ্‌ল—অঃ—অহ হ—অঃ—অঃ—

ভীষণ ভূকম্পে পৃথ্বীরাজের বিজয়স্তম্ভ কেঁপে উঠ্‌ল!

হৃদয়ের শত্রু

[শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ]

মানুষের হৃদয় যখন প্রথম বিকাশোন্মুখ হয়, সে মানুষের এক পরম সৌভাগ্যের মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐ সময় বড় সতর্কতার সহিত হৃদয়ের পুষ্পিত চারাগাছটিকে বাহিরের ঝড়্‌ঝাপ্‌টা থেকে—বাহিরের জন্তু জানয়ারের রূঢ় আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হয়। প্রেমের ইহাই পরীক্ষার সময়। তারপর যখন চারাটি দৃঢ়মূল ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন আর কোনও ভয় নাই। তখন তার শাখার আশ্রয়ে শুধু মানুষ নয় হিংস্র জীব পর্য্যন্ত স্নেহ-শীতল ছায়া পায়। তার পুষ্পের সুবাস ও ফলের সুমিষ্ট আস্বাদ নিখিল জন-মনের পরিতৃপ্তি আনে। সে তখন সকলের।

কিন্তু প্রথম থেকেই যে সবার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে চায়, সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করে। কারণ তখন তার আত্মরক্ষার সামর্থ্য নাই। সে তখন সকলেরি শিকারের লক্ষ্যস্থল—গ্রাসের বস্তু।

প্রথম হৃদয়ের বিকাশের ক্ষেত্র বড় নিভৃত, বড় নীরব হওয়া চাই। তার মানে এই নয় যে মানুষ কর্ম্ম-সংসার পরিত্যাগ করে ভাব-বিলাসীর মত এক কবিত্ব কুঞ্জে দিনের পর দিন কাটাবে। তা' নয়—কর্ম্ম ক্ষেত্র থেকে পলায়নের কথা হচ্ছে না। চাই এরই মধ্যে এমন একটা শান্তির গণ্ডী, যেখানে সংসারের কল-কোলাহল প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। নিভৃত-নিকুঞ্জ চাই, কর্ম্ম-জগতেরই মধ্যে হোক্‌ আপত্তি নাই, তবু তা' চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বল্‌তেন "তোরা সংসার করিস্‌ তা'তে ক্ষতি নাই কিন্তু মাঝে মাঝেই সব ছেড়ে ছুড়ে নিয়ে সৎসঙ্গ ক'রে আস্‌বি—তা' হ'লে সব সার বাঁধতে পারবে না।"

একটা শান্তির আশ্রয় যার জীবনে নাই, তার জীবনের কোনও মহৎ সার্থকতার আশা বৃথা। কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে যদি কোলাহলে প'ড়ে যাও, তবে হৃদয়কে হারা'বে অনিবার্য্যরূপে। তাই চাই সব কর্ম্মে একটা স্থিত ধীর ভাব, একটা শান্ত অচল অটল অবস্থা—তা'হ'লে ভিতরের ফল্গু-ধারা আবর্জ্জনার স্তূপে একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যায় না। শান্তিতে গেলেই আবার স্রোতের মুখ খুলে যায়। অশান্তি চাঞ্চল্য হৃদয়ের এক প্রধান বিঘ্ন।

দ্বিতীয় বিঘ্ন ভয়। ভয় মানুষের একটা জৈবিক সংস্কার! আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি থেকে এ বৃত্তি মানুষ পেয়েছে। ইহা অন্ধ, অজ্ঞান পশু-স্তরের একটা দান, মানুষ যা' সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ-কে মনুষ্যত্বের স্তরেও আর রাখা চলে না। আর যারা দেবতার উদ্দেশ্যে আত্ম-নিবেদন কর্ত্তে চায়, তাদের পক্ষে এ একটা প্রধান, এমন কি প্রধানতম রিপু। ভয়ে মানুষ সদাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে;-নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। অথচ ভয় যে মানুষকে বিপদ থেকে সত্যি বাঁচাতে পারে, তা' ত নয়ই, বরঞ্চ উল্টে বৃহত্তর বিপদকে ডেকে আনে!

এই ভয় মানুষের হৃদয়ের মহাশত্রু, কেন না হৃদয়ের মূলমন্ত্রই আত্মোৎসর্জ্জন। আর ভয় ঘোর স্বার্থপরতা

থেকেই উদ্ভূত। হৃদয়ের বিকাশে তাই ভয় একটা দুরন্তর বাধা। ভয় মানুষকে সদা সতর্ক করে, "এই যে নিজেকে বিলিয়ে বিকিয়ে দিচ্ছ, এতে যদি ফল খারাপ হয়, তবে কি হবে? হৃদয়ের পথ অজানা পথ। এই অধ্রুব পথে গিয়ে যদি মারা পড়?" ভয় আরও বলে, সাধনার পথে মানুষের কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না—ত্যাগের নেশায় সে বহু পরিশ্রমলব্ধ জিনিষ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সুতরাং ও পথ মাড়িও না।" ভয় অনেক ভাবে আসে, উদাহরণ কত দিব? কিন্তু ভয় অন্ধ। সে প্রকৃত কল্যাণ জানে না। হৃদয়ে কত বড় নিঃশ্রেয়সের বরাভয় হাতে ক'রে রয়েছে ভয়ে তা' বুঝ্‌তে পারে না।

সংশয় হচ্ছে তৃতীয় বিঘ্ন। সংশয় ও জন্মে মানুষের স্বার্থমুখী বৃত্তি থেকে। সংশয় হৃদয়কে বিভ্রান্ত ক'রে দেয়,—মানুষকে তার অন্তরের নির্দ্দেশে সন্ধিহান ক'রে তোলে। সংশয় প্রেমকে মোহ ব'লে প্রমাণিত কর্ত্তে চায়—ভগবানকে কল্পনার পুতুল ব'লে উড়িয়ে দেয়—সাধনাকে ভাব-বিলাস ব'লে অবজ্ঞা ক'রে। সংশয় জাগে তখন যখন মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র হ'য়ে সংসারের ক্ষুদ্র লাভ লোকসানকেই বড় করে দেখে। মানুষ যখন শুধু দেখে সে কি পেলো—তার কি লাভ হ'ল তখনি এই রিপু জাগে। হৃদয়ের পথে গিয়ে লাভ কি হয় এই হিসাব যে কর্ত্তে গেছে সে হৃদয়ের উৎস থেকে বহু দূরে স'ড়ে গিয়ে সংশয়ের মরুভূমিতে শুকিয়ে মরেছে। হৃদয় ত লাভ চায় না—সে চায় আত্মদান। এই আত্মোৎসর্গেই তার চরম লাভ—এ-তেই তার পরম সার্থকতা। হৃদয়ের ধর্ম্মই নিজকে দিয়ে দেওয়া। পাওয়া ও যায় এ-তেই।

হৃদয়ের অন্তস্থলে যে আগুন জ্বল্‌ছে, হে মানুষ! সেখানে তোমার সর্ব্বস্ব আহুতি আগে দাও, অগ্নিদেবের কৃপা হোক্,—তারপর তোমার নিখিল পুরুষার্থ সাধিত হবে সন্দেহ নাই। যে মানুষ তার সব দিতে পারে, সে সবই পায়। ভোগে ত তারি অধিকার। অগ্নি হচ্ছেন পুরোহিত—তাঁর তৃপ্তি হ'লে অন্যান্য দেববৃন্দ প্রীত হ'য়ে বর হাতে ক'রে নেমে আসেন। সাধনায় মানুষ বঞ্চিত হয়, এ কথা যারা মনে করে তারা ভ্রান্ত।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি *

[শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী]

সভাপতি মহাশয় একবার মাত্রও আমার দিকে না চাহিয়াই একটা প্রবন্ধ পাঠের দণ্ডাজ্ঞা জারি করিলেন। কিন্তু এ হেন বিজ্ঞ ব্যক্তির একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, এই আদেশটা, কাকের মাথায় কামান দাগান কি না!

এক কাঙ্গালের ছেলে তাহার মাকে জানাইল, সে নাকি স্বপ্নে গুড় খাইয়াছে। শুনিয়াই তাহার মা ছেলের গালে এক চড় কসাইয়া বলিল,—"হতভাগা ছেলে, যদি বিনা পয়সাই খেলি তবে গুড় কেন? সন্দেশ খেতে কে মানা কল্লে? "আমিও বলি, এত বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক থাকিতে প্রবন্ধ পাঠ আমার কেন? তবে কাহারো কাহারো নাকি উপবাসেও লোভ থাকে। সে হিসাবে হইলে আমি নাচার।

অনেকেই হয়ত এই অভাগাকে চেনেন এবং মূর্খতার পুঁজি কম থাকিলে বসন্ত-চিকিৎসক হওয়া যায় না তাহাও জানেন। আমাদের দেশে একটী পাগল ছিল, তাহার কাপড়ের পাড় পছন্দ হইল না, তাই জীবনভরা লেংটিই রহিল। আমার অবস্থাও তাহাই। কালি, কলম এবং কাগজ পছন্দ হইল না বলিয়া, বিদ্যা বুদ্ধির সম্পর্কে উলঙ্গই রহিয়া গিয়াছি। কিন্তু তবুও সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করা যায় কি?

আজ আমার বক্তব্য বিষয়, "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।" লোকে যাহাই বলুক আমার কিন্তু দুটাই চাই। ব্রজগোপীর যদি কুলের বালাই না থাকিত, তবে শ্যামের সেই উজ্জ্বল নীলমণির ছটা অমন ভাবে নূতন করিয়া চক্ষে লাগিত না। কুলের বাঁধন যতই তাহাদের পেছন-টানা সুরু করিল, জটিলা কুটিলার ভ্রূভঙ্গি যতই কড়া পাহাড়া দিতে লাগিল, ব্রজাঙ্গনার আকুল প্রাণে মোহনিয়ার মোহন মুরতির মধ্যে ততই নূতন হইতে নূতনতর বিলাস বাসন অনুভূত হইতে লাগিল। আর কুলের বালাই ততই পুরাতন হইয়া দাঁড়াইল।

এইত গেল সে কালের কথা। তোমার আমার বেলাই কথাটা না খাটিবে কেন? নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে

একবার কোমর কাছিয়া কে না নামিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি বা নূতনত্বের জটিল পথটী সোজা মনে করিয়া একবার পা না বাড়াইয়াছে? যদিও তাহা Experiment is at always dangerous কথাটীর সত্যতাই অনেক সময়ে রক্ষা করে কিন্তু তথাপিও কোন ব্যক্তি একবার নূতনের চাটনি জিহ্বায় লাগাইতে ছাড়িয়াছেন? এখন শ্যাম কি কুল যেটাই নূতন কি পুরাতন হউক না কেন দুটায় মিলাইয়া খিচুরী পাকাইবার সংবাদ ইতিহাস রাখে না। তবে তৃতীয় চতুর্থ পক্ষের যে একটা জনশ্রুতি আছে, সে অভ্যাস আমার নাই। বস্তুতঃ মধুর অভাবে গুড় বা গুড়ের বিরহে মধুর ব্যবহার চলিতে পারে এবং ইহাই চিরন্তন। তাই আমি শ্যাম এবং কুল দুটাই ঘরে রাখিতে চাই।

যাহাদের ভাঙ্গন কুলে বাড়ী তাহারা যেমন নিয়তই ঘাটে একখানা নৌকা বাধিয়া রাখে, আমরাও যৌবনের কুলে অকুল দেখিয়া বার্দ্ধক্যের ঘাটে শ্যামের ডিঙ্গা বাধিতে সাধ যায়। কিন্তু পেছন ফিরিয়া চাহিলে গত দিন গুণার জন্য যে মমতা জাগিয়া উঠে তাহারই অনুশাসনে কুল বর্জ্জন করিয়া শ্যাম রাখিতে মন চলে না।

আমার একটী প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বার্ত্তা শুনিলে সকলেই বুঝিতে পাইবেন কেমন করিয়া নূতনের গায়ে পুরাতন এবং পুরাতনের গায়ে নূতনের অঙ্গরাগ বাধিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যেন কোন অশীতিপর বৃদ্ধ যৌবনের দাবী করিয়া না বসেন ইহাই প্রার্থনা।

কি একটা পার্ব্বন মুখে করিয়া আমার কেরাণী খানাটা বিশ্রাম লইতে ছিল। কাজ কর্ম্ম না থাকায় এদিক ওদিক খুজিতে খুজিতে পিতামহের আমলের একটা পুরাতন সিন্দুকের দিকে চক্ষু পড়িল। দিন ভরা আলস্যে কাটাইয়া প্রত্নতত্ত্বের অছিলায় সিন্দুকের ডালা খুলিয়াই একটা অবর্ণনীয় সড় সড় শব্দ শুনিলাম। ভাবিলাম হয়ত, পিতামহের সঞ্চিত মুদ্রা শিশুর অর্থাৎ সিকি দুয়ানী জোর আধুলি ভায়ারা বেড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অন্ধকারটী অনেকদিনের পুরাতন রোগীর মরণের গতির মত কেবলমাত্র ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাই দীর্ঘ রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় না রহিয়া একটী কেরাছিনের ডিপ হাতে করিয়া সিন্দুকের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দিলাম। আর অমনি আমার এত আশা ভরসার মুদ্রা শিশুগুলা তেলাপোকার মূর্ত্তি ধরিয়া, আমার নিজ হাতের জরিপ করা, সাড়ে তিন হাত দেহ-ভূমিতে দখল লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন নিঃসন্দেহে মনে হইল, দাদা নাতিতে যে মধুর শ্যালক সম্ভাষণ বিনিময় হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

পর দিবস প্রাতে উহাদের গঙ্গাযাত্রা করাইলাম। উহারা বৈকুণ্ঠে গেল কি শিবলোকে গেল সে সংবাদ "সৌরভ-সঙ্ঘ" লইবেন। কিন্তু, আমার পুকুরের মাছগুলা যে দীর্ঘকাল পরে একটা পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

তিন দিবস পরে সিন্দুকটী খুলিয়া পাইলাম ১২১৩ সনের একখানা নূতন পঞ্জিকা। বিধাতার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি, গুপ্তপ্রেসের কি অদ্ভুত মহিমা, এতগুলা দিন তাহার গায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল আজও তাহার নূতনের খেতাবটী পুরাতন হইল না। সেইদিনই বুঝিলাম যাহা কিছু বাঁচিয়া থাকিলেই নূতন থাকে। কেহ বা বিবর্ত্তবাদের নিত্যানূতন টানা হেচ্‌ড়ায়, আর কেহবা নিত্য নূতন সুখ দুঃখের নৈমিত্তিকতায়।

আমার এক অতি বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী ছিলেন, তিনি তাহার অশীতি বৎসর বয়সের শিশু পুত্রটীকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন। আমিও সেই দন্তহীন খোকাটীর খোকাত্বের অনুপাতেই পঞ্জিকার নূতনত্বের বয়সটী মাপিয়া লইলাম। এবং মনে মনে বলিলাম হে গুপ্তপ্রেসের সত্বাধিকারিগণ তোমরা যদি দেশটা ভরিয়া কপালে কপালে ঐ তিনটী অক্ষর ছাপিয়া দিতে পারিতে, তবে অতি তুচ্ছ পাকা চুল বা দন্তহীনতার নজির ধরিয়া বৃদ্ধ বয়সে ব্যক্তি বিশেষের চক্ষুশূল হইতে হইত না।

অনেক বাজে বকিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক পঞ্জিকা হাতে তুলিয়া বুঝিলাম তেলাপোকার দেশে পাঁচ আইনের বালাই নাই। উহাদের মূত্রত্যাগের অভ্যাস আছে কি না আয়ুর্ব্বেদ সে সম্পর্কে নীরব, কিন্তু মল ত্যাগ প্রচেষ্টায় খুঁৎ খাঁৎ ভরাট করিয়া, উহাকে যে পুরাতন হইতে দেয় নাই, আমি নিজেই তাহার চূড়ান্ত সাক্ষী। সেই দিনই বুঝিলাম যাহাদের

গায়ে নিত্য তেলাপোকা হাটিয়া বেড়ায় তাহাদের পুরাতন হওয়া অসম্ভব।

এই নূতন পুরাতনের নিত্য বিড়ম্বনাদি কেহ মুছিয়া দিতে পারি তবে যে জগতের কতখানি কল্যাণ হইত সে দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। প্রতি বৎসরই নূতন বছর আসে, গ্রামে গ্রামে ময়দানে ময়দানে মেলা বসে। তীর্থস্থান গুলায় লোক সমাগম বাড়িয়া যায়। পার্ব্বণ উপলক্ষ করিয়া সকলেই তাহাদের সংক্রান্তি ভোজের ব্যবস্থা করে। অধিকাংশ গৃহস্থই গুপ্তপ্রেস, শ্রীরামপুরী, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পি, এম, বাগচি শঙ্খনিধি বটকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি পঞ্জিকাকারের ঘরে কিছু কিছু গুজিয়া দিয়া পঞ্জিকা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লয়। সাহেব সুবার খানসামা বাবুটি হইতে মেথর মুদ্দাফরাস পর্য্যন্ত সকলেই বাবুদের ঘাড় ধরিয়া বকসিস্ ওয়াশিল করে। কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমি ত জীবন ভরাই ভৈরব মুদীর তাগাদা সহিলাম! বরং নূতন বছরের নাম করিয়া উহার বর্ব্বর সরকারটা একপাল বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও সময়ে অসময়ে অভদ্র ভাষায় তাগাদার উপরে তাগাদাই করিয়া যায়। আহা! কেহ যদি এই নূতন কথাটা তুলিয়া একটা এক ঘেয়ে নাম লাগাইয়া দিতে পারিত তবে তাহার চরণের রেণু হইতেও আমার দুঃখ হইত না।

লোকে বলে নূতন বছর আসে। কিন্তু আমিত দেখিলাম এক দুই তিন করিয়া ক্রমে আমার জীবনের দিনগুলা ফুরাইয়া যাইতেছে। এবং কেবলই আমাকে ফাঁকি দিবার জন্যই আর একটা বছর সামান্য ৩৬৫ দিনের পরমায়ু লইয়া দেখা দিবে, এ কেমন কথা! তাই বলি, ওগো! তোমরা কে আছ, একবার এই অভাগার দিন ফুরালো রোগের একটা টোট্‌কা বলিয়া যাও।

সূর্য্য কিরণ পৃথিবীর গায়ে বাধা পায় বলিয়াই তাপের মূর্ত্তি ধরে। নদীর জল বাধা পাইলে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। মিলনে বাধা পায় বলিয়াই বিরহীর ইতিহাস ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাই বৎসরের গতাগতিটাও বন্ধ করিতে চাহি না। আসে আসুক। কিন্তু আমাকেও উহার এই আসা যাওয়ার নূতন স্রোতে ফেলিয়া একটু নূতন করিয়া লয় না কেন? আমি ঘরে ঘরেই আড়ি প্যাতিয়া শুনিয়াছি, সকলেই নূতন হইবার সাধ রাখে। তাই দোকানে এত চুলের কলপ, নড়া দাঁত শক্ত করিবার রাশি রাশি যন্ত্রপাতি এবং সাবান ক্ষুর আমদানীর এত কলকারখানা। তবে বয়সটা একটু বাড়িয়া আসিলেই সাধটা একটু বাড়িয়া উঠে। তোমার আমার দোষ কি?

দুনিয়াটাই নূতনত্বের আদর অভ্যর্থনা লইয়া ব্যস্ত। নূতন কচি আমের অম্বল কোন্ বৃদ্ধের শুষ্ক রসনায় জল সঞ্চার না করে? নূতন যৌবনের ভরা জোয়ার কোন্ নদীর মোহনায় যাইয়া দু'একটা তরঙ্গ তুলিয়া না আসে? নূতন খেজুরী গুড়ের রসাল গন্ধ নূতন ইলিশ মাছের চর্চ্চরী কোন সংযমীর ধ্যানে বিঘ্ন না ঘটায়? নূতন কচি পাঠার ঝোল নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার রসনায়ও জল সঞ্চার করিয়াছিল। নূতন ঔষধের গুণে রোগীর জীবন ফিরিয়া আসে, টাট্‌কা রসই অনুপান বা সহ পানে প্রশস্ত, টাট্‌কা ফুলের গন্ধই অধিক মধুর। বালিকার নবোদগত রূপই বিশেষ চমকপ্রদ, নূতন ঘৃতই অলক্ষ্মী দূর করিতে পারে' বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ স্বীকার করিয়াছে। তবে নূতন বদন আর নূতন বসনে একটু বিড়ম্বনা আনিয়া দেয় তাহা পরে বলিতেছি।

কোন কোন মনীষী বলেন যে, জীব-জগতের ভাব-প্রবাহটাও নাকি প্রত্যেক দুইশত বৎসর পরে একই সুরযন্ত্রের একই ঝঙ্কার লইয়া বাজিয়া উঠে। যদি অনাদি পুরুষের মূল সূত্র অবধিও অনাদি হইয়া থাকে,—যাহার প্রভাবে কোটী কোটী ভঙ্গ চোড়ের ভিতর দিয়াও সেই একত্বের বৈদ্যুতিক আলোক রেখাই ছুটিয়া বাহির হইল, তবে তাহাকে লইয়াই নূতন করিয়া ঢাক ঢোল পিটাইয়া নূতনের নূতন হাট বসাইতে চাও কেন?

আছে—দরকার আছে। বিস্মৃতির মহিমাকে আরও মহিমান্বিত করিতে নূতনের বেচা কেনা ব্যতীত অন্য পথ আছে কি? তুমি প্রতি পদে আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছ,— অতি তুচ্ছ জন্মান্তরের বিবর্ত্তে পড়িয়া আপনার পুরাতন সত্বাটীকে হারাইয়া ফেলিতেছ, তোমার বিশ্লেষণ বুদ্ধিশূন্য অলস মন প্রতি মুহূর্ত্তেই অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। ভগ্নস্বাস্থ্যে বিস্মৃতির কড়া শাসনে নূতনই ভাল লাগিবে। কিন্তু পুরাতন গুড়, ঘৃত, তেঁতুল বা আমস্বত্ত্ব যত গুণ,

নূতনে তাহা দেখিয়াছ কি ? তবে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক বিস্মৃতিময় ব্যবহারিক জীবনে পুরা দস্তুর খাটিবে কিনা, এই কয়টা দাঁত থাকিতে তাহা বুঝিবে না।

যাহাই বল, নূতন বাদ দিয়া কেবলই একঘেয়ে পুরাতন লইয়া ঘরকন্না বড়ই শক্ত মনে করি। মনে করিয়া দেখ দেখি সেইদিনটার কথা ?—যেদিন নূতন মুখখানা আসিয়া নূতন হাব-ভাব, নূতন ভাষা বৈচিত্র্য এবং নূতন তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গে তোমার সীমাবদ্ধ বায়ুমণ্ডলে নূতন স্পন্দন সৃষ্টি করিয়া, কোকিলের কুহু কূজনে, পাপিয়ার কলরবে ভ্রমরের নিরর্থক গুঞ্জরণে, তার যন্ত্রের তান লয়ে প্রীতির উপরে প্রীতি মাখিয়া দিয়া তোমাকে জাগাইয়া রাখিত ? আর একবার পিছন ফিরিয়া সে দিনটা দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি ? নূতন নাত জামাই দেখিতে যাইয়া ওপাড়ায় নিতামণি যে কলপের জন্য গোপনে পয়সা খরচ করিয়াছিল, তখন নিন্দা করিলেও কয়েক গণ্ডা দন্তপাতের পরে, আর করি নাই।

নূতনত্বের মধু-মাধুরিমা না থাকিলে শিশুর কণ্ঠ আমার কণ্ঠের মতই আদর পাইত। কোকিল যদি কেবল বসন্তকালে দেখা না দিয়া বছর ভরিয়া আমার তেঁতুল ডালে বসিয়া কুহু কুহু করিত, তাহা হইলে কাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীই উহু উহু ভুলিয়া কোকিল গোষ্ঠী ঝাঁটাপেটা না করিত। হরিণীর মনোরম চক্ষু লইয়া কবি গোষ্টি কত তালপাতা নষ্ট করিয়াছেন কিন্তু উহা যদি বনবাসী না হইয়া গৃহপালিত মেষগোষ্ঠীর মত নিত্য আসিয়া গৃহস্থের কুমড়ার ডগা ভোজন করিয়া যাইত, তবে মহাকবি কালিদাসও তাহার প্রসংশা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। অতিথি যদি তিথি মাত্র বাস না করিয়া জন্মযুগ ধরিয়া পড়িয়া থাকিত, তবে খেসারীর ডাল আর লঙ্কা ভাজাই ব্যবস্থিত হইত। সহজলভ্য বলিয়া খেসারীর আদর হইল না।

বালকের কচি কণ্ঠস্বর, কোকিলের কুহুকূজন, ময়ূরের কেকা রব, ভ্রমরের গুঞ্জরণ, ডাহুকীর রবাব, কুরঙ্গীর চক্ষু, আকাশের নিলিমা, সমুদ্রের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বতের অনন্ত স্থৈর্য্য, নারীর রূপ যদি নিয়তই হাতের কাছে কাছে পাওয়া যাইত, তবে এত আদর থাকিত কি ?

যাক সে কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি যে ভাবে, গায়ের জোরে নূতন বস্তুকে পুরাতনের পাবণতিতে ঠেলিয়া নেও তোমাকেও সেভাবে ঠেলিয়া ঠুলিয়া পুরাতন পুরুষের সঙ্গে দেখাশুনা আছে কি ? যদি না থাকে তবে, তোমার এই জীবনব্যাপী ভ্রমণের স্বার্থকতা কি কেবল চতুঃপ্রহরে কবিরাজের নূতন গুড় পুরাতন করিয়া,—না "আর গেভিন" কোম্পানীর চুলের কলপের বিক্রয় বাড়াইয়া ? তোমার সংসর্গ দোষে ফুল ঝরিয়া পড়ে, ধনীর গৃহিণী অসূর্য্যস্পর্শা নাম গ্রহণ করে, রূপসীর বয়স বাড়িয়া যায়। বলি, এত অত্যাচার সহিবে কে ?

যাহারা আমার মত ভাঙ্গা দাত আর পাকা চুল সাক্ষী রাখিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, মাংসপেশীতে লোহার শিকল ছিঁড়িবার সামর্থ্য খুজিয়া পাইতেছেন না,—দিনটা বুঝি ফুরাইয়া গেল, আমার তরীখানা বুঝি পাকা পোক্ত কাণ্ডারীর অভাবে অকূলে ডুবিয়া যাইবে ;—বছর জুড়িয়া বসন্তের মলয় হাওয়া বহিলেও বুঝি আর ভোগীর সুখ লইয়া ভোগ করা চলিবে না, পথে ঘাটে কি নির্জ্জনে কেলিকুঞ্জে ষোড়শীর বিলোল কটাক্ষ আমার শ্রীহীন রূপের অপেক্ষায় আর বুঝি ফিরিয়াও চাহিবে না। এই সকল চিন্তা যাহাকে সুবর্ণ পারদের মত একবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, সেই বুঝিবে স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, গণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি কেন দিন যামিনী নূতন খুঁজিতে যাইয়া ভাবে ভাষায় নূতনত্ব ছড়াইয়া দিয়াছে। এ জগতে কাহার নামখানা পাগলের খাতায় না উঠিয়াছে বলিতে পার কি ?

তবে নূতনকে একঘেয়ে ভালও বলা চলে না। ইহা রোচক বটে কিন্তু কাহারো ধাতে রেচকও হইয়া থাকে। নূতন তেঁতুল সানাইওয়ালার শত্রু, নূতন খেজুরী গুড় আমাশয়ীর যম স্বরূপ, নূতন পিয়াজ রসুনে দুর্গন্ধ অধিক, নূতন শাখা কোমলাঙ্গীর অঙ্গ ছিঁড়িয়া দেয়, অনভ্যাসের ফোটা চড়চড় করে, নূতন বসনে অস্বস্তি বোধ হয়, নূতন বদন লজ্জা ডাকিয়া আনে, নূতন তাম্রকূট সেবীর কাসি এবং নূতন নস্য সেবীর হাঁচি আসে, নূতন জমীর আবাদে খরচ এবং কচি কাঁঠালের আঠা বেশী, নূতন মানুষে বিশ্বাস জমে না, নূতন মাতালের চাটের খরচ বেশী, নূতন চূণের ওজন পাওয় যায়

না, নূতন তাম্বুলের ঝাল এবং নূতন মামলায় বারবরদারী অধিক, নূতন রোগে লক্ষণের বিড়ম্বনা বেশী, প্রথম সিন্দুর রূপসীর কপাল ঢাকিয়া ফেলে, নূতন মাঝীর আতঙ্ক থাকে, নূতন হাট সহজে জমে না, নূতন লেখকের কালি কলমের খরচ বেশী, নূতন বক্তার নিন্দার ভয় প্রচুর।

নূতন বধূর ঘোমটার আড়গোড় ভাঙ্গিতে যাইয়া অনেক রসিকেরই বিরহ জাগিয়া উঠে। কিন্তু নূতন বধূ যখন গিন্নির তক্তে বসিয়া সহজ সরল অথচ তীব্র লজ্জা শূন্যা অবস্থায় হাসির ছটায় গরীবের ঘরের কেরাছিনের চিরাগটীকে বৈদ্যুতিকে ফলাইয়া তোলে; তৃতীয় ধোপের লাল পেড়ে শাড়ীখানা পড়িয়া পিয়াস্ চক্ষু দুটীকে শত পাকে ঘুড়াইয়া, কথার ছলায় তোমার মনের গায়ে সোণালী রং ঢালিয়া দেয়, বলি তখনো কি তোমার নূতনের বালাই লইয়া বুক জুড়াইতে ইচ্ছা করে? নূতন বিনামার ক্ষতটা যখন ছয় মাস ধরিয়া খোড়া করিয়া রাখে, নূতন ধনী যখন চাঁদার উপরে চাঁদা, টেক্সের উপরে টেক্স দিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, নূতন দরিদ্র যখন শত চেষ্টা করিয়াও পুরাতন হালচাল বদলাইতে না পারিয়া চক্ষুলজ্জার তীব্র দংশনে মরমে মরিতে থাকে; তখন কতখানি দুঃখ লইয়া পুরাতনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে?

নূতন তেতুল রসনায় মাঘের শীত আনিয়া দেয়, নবান্নের পায়স উদরে বিঘ্ন জন্মায়, পুণ্যাহের আনন্দ প্রজার মহাশ্বাস ডাকিয়া আনে, নূতন তণ্ডুলে অন্নে হাড়ি ভরে না, নূতন ধনীর মেজাজ অসহনীয়, নূতন পুত্র দর্শনেও দর্শনী লাগে। কিন্তু বিপত্নিকও পুরাতনের দোহাই দিয়া শশুর গৃহে আদর পায়। নূতন বন্ধুত্বে বিস্মৃতির আশঙ্কা বেশী, নূতন জলে সর্দ্দি আসে, নূতন কুটুম্বিতায় তত্ত্বের হেঙ্গামা বেশী, নূতন পূজকের আড়ম্বর থাকে, নূতন প্রদীপের তৈল খরচ অধিক, টাটকা ভাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়। বস্তুতঃ পুরাতনে গুণাধিক্য বেশী না থাকিলে সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর সতী দেহ ঘাঁটে করিয়া সৃষ্টি জোরা ছুটিয়া মরিতেন না। তাই আমি নিয়তই ভাবি, এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।" যখনই যাহা চক্ষের কাছে দেখি তখনইত তাহা মিঠা লাগে এবং তাহারই রস বৈশিষ্ট্যে মন ডুবাইয়া রাখিতে চিত্ত এলাইয়া পড়ে।

আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন বাহিরের ছড়ান প্রাণ কুড়াইয়া ভাড় করিতে পরিলে, দেখিবে সেই মরণশীল নূতন রূপ, নূতন সুখের আশায় নাচাইবে না, লালসার দাসত্বে নিজত্বের দাবীটুকু বিক্রয় করিয়া জন্ম মরণ গতির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশ্ব প্রকৃতির লাথি খাইতে হইবে না। তখন বিশ্বময় সেই বিশ্বেশ্বরের চিরস্থির মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই ধ্যানে, তাহারই জ্ঞানে অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া যাইবে। তখন নূতন পুরাতনের বিচার বুদ্ধি আপনিই সংযত হইবে এবং রূপ তোমাকে আকর্ষণ করিতে, রস তোমাকে অলস করিতে, গন্ধ তোমাকে চঞ্চল করিতে এবং স্পর্শ তোমাকে এক তিল হটাইতে পারিবে না।

হরি! হরি! পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া যে পাগল হইতে ইচ্ছা হয় বস্তুতঃ পাগলা গারদের চাবিটী দণ্ডের জন্য পাইলে বুঝাইয়া দিতাম কোন্‌টা নূতন আর কোন্‌টা পুরাতন।

রাধা *

[অধ্যাপক শ্রীসুধেন্দুকুমার বাক্‌চী এম. এ]

চৈত্রের শেষ সন্ধ্যা ম্লান হ'য়ে এল—বৈষ্ণব ভিখারী একতারা নিয়ে গাইছিল,—

"যাওল চেত মদনসখা কুণ্ঠিত
লহু লহু চাহ পিছুপানে,
সাঁওল সাঁঝ কদম মূল শিহরিত
ঘন ঘন বাঁশরী তানে।
মুরলী! একই বোলি তুঝ সাধা,
দোসর গীত নাহি কি তুয়া অন্তর,
বোলত বোলত রাধা?"—

এইটুকু শুন্‌তে পেলাম, তারপর আর শোনা হ'ল না। আমার ক্লান্ত বৎসরটিও একটি অসমাপ্ত কীর্ত্তনের মত চৈত্রের শেষ অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেল—কিন্তু রেখে গেল একটি কাকুতিভরা জিজ্ঞাসার ধুয়া—

—"দোসর গীত নাহি কি তুয়া অন্তর
বোলত বোলত রাধা?"

এর উত্তর পাই কোথা? "বোলত বোলত রাধা?"— বেদ নীরব,—পঞ্চধারার কলধ্বনির মধ্যে বৈদিক ঋষি

* হুগলী সাহিত্য সভায় পঠিত।

রাধার সন্ধান পান নাই। উপনিষদের মুখ ঘন শ্রাবণের সান্ধ্যগাম্ভীর্য্যের মত রহস্যময়,—দৃষ্টি অচিন্ত্যের উদ্দেশ্যে বাদল মেঘের অতল স্পর্শতায় হারিয়ে গিয়েছে। পুরাণকারের মধ্যে যেন "ধরি-ধরি-ধরা-হল-না" ভাব। পেয়েছেন,—কিন্তু এই বৈষ্ণব ভিখারীর মত এমন সত্যরূপে, এমন নিবিড় ভাবে পান নি; শুনেছেন,—যেন কি গানের মত, যেন কোথা থেকে আস্‌ছে,—কিন্তু এমন করে তাঁর প্রাণে বেজে ওঠে নি "বোলত বোলত রাধা"। ধর্ম্মশাস্ত্র যখন মূক, অনন্ত মুহূর্ত্তে কবি তখন মুখর হয়ে উঠলেন—

"অপরূপ পেখনু রামা
কনকলতা অবলম্বনে উথল
হরিণহীন হিমধামা।"

(৩)

কিন্তু 'পেখনু' কোথায়? কে সেই "অপরূপ রামা?" দ্যুলোকের অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে তাঁর কোনও গ্রন্থি আছে বলে কেউ জানে না। দেববালাদের তারা বীথিকার পরিপূর্ণ অবসরের অন্তরাল হতে কখনও তাঁকে কেউ মিটি মিটি চাইতে দেখে নাই। পারিজাত উৎসবের দিনে পরাগমদির সন্ধ্যার বিদ্যুল্লেখাগণের সঙ্গে নন্দনের কানন পথে তিনি কখনও চরণরেখাপাত করেন নাই। বৈকুণ্ঠের কুণ্ঠাহীন দ্যুতির মধ্যে অম্লান আনন্দের ভিতর কখনও তাঁর নূপুর শিঞ্জিনি ধ্বনিত হয় নাই। তবুও ফাল্গুনী পূর্ণিমার কুঙ্কুম কেলির কলতানে, ঝুলন রজনীর দোলন-ছন্দমুখর মেঘমেদুর আকাশের মধ্যে, রাসলীলার লীলায়িত আনন্দ গুঞ্জনে, বহুযুগ ধরে কোন্ গুপ্ত বৃন্দাবনের ভিখারী বৈষ্ণবের সুর কালিন্দীকল্লোলের সাথে মিলিত হয়ে বাজ্‌ছে—"অপরূপ পেখনু রামা।"

(৪)

না,—প্রাচীন শাস্ত্রকারকে একেবারে রাধাহীন ভাবা ভুল। তিনি স্পষ্ট করে রাধাকে পান নি,—কিন্তু তাঁর অস্পষ্ট অনুভূতিতে, পুলক শিহরণে, নিবিড় ভূমানন্দে, প্রাণগহনচারিণী রাধিকারই স্পর্শলাভ করেছেন। চিরন্তনী রাধা অমূর্ত্ত আহ্লাদের আকারে যুগযুগান্ত হতে শাস্ত্রকারের অঙ্গে অঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছেন। তাই উপনিষদ্‌কারের ব্রীড়াবতী পুরবালা আনন্দবাসরের মধ্যে আনন্দরূপের সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছেন। তাই উপনিষদের শ্যামল ঘনছায়াতলে এত ইঙ্গিত, এত অস্পষ্টতা, এত কানাকানি, এত চকিত-গোপন-প্রকাশের সচল লীলা।

(৫)

শাস্ত্রকারের আনন্দবেদনবাসিনী অদেহী রাধা বৈষ্ণব কবির প্রেরণায় প্রাণস্পর্শে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লেন—গোধূলি সন্ধ্যার অভিসারিকা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শের পরিপূর্ণ সুষমা, উতলা, কুণ্ঠিতা, আবেগময়ী, কৃষ্ণমুখী, পুরুষপ্রধানের অভিযানযাত্রী; আর কবি এই অভিসার চঞ্চলা বিশ্বপ্রকৃতির ঝিল্লীনূপুরধ্বনির সুরে সুর মিলিত করে গাইলেন—

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুলি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।"

(৬)

বৈষ্ণব কবির আনন্দ দুলালী রাধা বিশ্বপ্রাণের আবেগ-ময়ী গীতি কবিতা। গ্রহতারকার প্রতীক্ষাভরা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, সিন্ধুর নীলচঞ্চল উচ্ছ্বসিত অনুসন্ধানে, তমালবনের রহস্যময় আহ্বানস্বননে, নরনারীপ্রাণের দুর্ব্বোধ অনির্দ্দিষ্ট, আকাঙ্ক্ষা-স্পন্দনে বৈষ্ণব কবি বিশ্বপ্রকৃতির গোপনবাণী শুনলেন—

"একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে?"

—শুন্‌লেন, আর স্বেদপুলক কম্পনের মধ্যে অনুভব করলেন যে তাঁর জীবনগুহাবাসিনী রাধা বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রাণে, পরিপূর্ণ শোভাতে শ্রীমতী। নিজের মধ্যে যে মুহূর্ত্তে বিশ্বপ্রকৃতিকে বৈষ্ণব কবি উপলব্ধি করলেন, অমনি পরমপুরুষের নীরব ইঙ্গিত রবময়ী, মুরলীধ্বনির আকারে তাঁর অন্তর-বৃন্দাবনে বেজে উঠ্‌ল,—অশ্রু যমুনায় উজান বইল,—বেলা শেষের সুর রাজপুরীর বাতায়নে আকুল মিনতি নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল আর কবি প্রাণের চিরন্তনী বৃকভানুনন্দিনী অজানা রাখালিয়া বঁধুর উদ্দেশে ছুট্‌ল—

"একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে?"

(৭)

এই বিশ্বপ্রাণের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাই চিরবাঞ্ছিত অসীমকে সমাপ্ত ক'রে, প্রেমসম্বন্ধ ক'রে মিলনের বেশে সাজিয়ে দিয়েছে,—কানে তার কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, বক্ষে ফুলমাল, আঁখিতে কাজর, অধরে মুরলি। বিরাটের সীমাহীন লীলাব্যঞ্জনা বিশ্ব আকাঙ্ক্ষার আদর বেষ্টনের মধ্যে এসে একটি ঘন সমাপ্তির ক্ষণিক কুঞ্চনের ভিতর নিবিড় রহস্যময় শ্যামলরূপে, চির কিশোরের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছেন—আর প্রকৃতি কন্দরবাসিনী আরাধনা নবীন কিশোরীর ভঙ্গিমায়, উচ্ছ্বসিত রসলীলায় পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিনের শ্রীরাধারূপে বৈষ্ণব কবির হৃদি-বৃন্দাবন হতে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন এই বলে—

"চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর
পীতবসন বনমালি!"

(৮)

যুগ যুগ ধ'রে প্রকৃতির প্রাণে এই বৃন্দাবন লীলা চল্‌ছে,—যুগ যুগ ধ'রে এই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন সম্বলিত বৃন্দাবনগাথা সৃষ্টির কুহরে কুহরে ধ্বনিত হচ্ছে। যুগযুগান্ত হতে বৈষ্ণব কবি তাই সচ্চিদানন্দের আত্মনিবেদনের গভীর মধুর মিনতি শুন্‌ছেন—

"গোলক ত্যজিয়া গোকুলে এসেছি
তোমারে সেবিতে রাই!"

তাই তিনি রাধা-ভাবে ভাবিত হয়ে কখনও বাদল-সন্ধ্যার গুরুগুমরণের মধ্যে চিরবিরহিণীর "দুরু দুরু হিয়া কম্পনে" অস্থির হয়ে বল্‌ছেন—"ই ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" আবার কখনও বা বসন্তরজনীর পূর্ণ মিলনের পুলকাতিশয্যে গাইছেন—

"আজি মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজি মঝু দেহ হো'ল দেহা
আজি মঝু বিহি অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।"

(৯)

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এই দীপ্তা, শঙ্কিতা, আবেগময়ী, রাগরঞ্জিতা অভিসারিকাই শ্রীরাধা। অনাদি রজনীর রহস্যবনবীথিকার উদ্বেগময়ী রজনীগন্ধা,—দেবচয়নিকার প্রথম উষায় মালাকর তোমার সন্ধান পান নাই। বৈষ্ণব কবি তাই অন্তরের মধ্যে তোমার সুরভি ইঙ্গিতে অনুভব করে বিশ্বমানবের পরম মিলন রাত্রির কণ্ঠমালার জন্য তোমায় চয়ন করেছেন। তুমি একান্তই বৈষ্ণবের, তুমি একান্তই মানবের,—তুমি সৃষ্টির প্রথম চেতনার মধ্যে ভূমানন্দ উন্মাদনা, তুমি বিশ্ব বৈষ্ণবের প্রথম প্রণয়ধ্যান, তাই তুমি সাধিকা। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

(১০)

একতারাটি আবার বেজে উঠ্‌ল। মনে হল বুঝি আমার শোণিত প্রবাহের রিণি রিণিতে, আমার অণু পরমাণুর অসীম রহস্যতলে গোপনচারিণী শ্রীরাধিকার বলয় শিঞ্জিনি ধ্বনিত হ'ল। মনে হল যেন আমার জীবনাকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ পুলককীর্ত্তনে ব্যথিয়ে উঠ্‌ছে—

"কি পুছসি অনুভব মোয়—
সোহি পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

আমরা ক্লান্ত চৈত্রের শেষ সন্ধ্যার জিজ্ঞাসা নববর্ষের এই পরমপ্রাপ্তির নিবিড়তার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর আম্রমুকুলমদির প্রান্তরপথে অপরাহ্নের আলোছায়ার আলিঙ্গনে তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষুদুটি আকাশের দিকে রেখে, আমার সেই ক্ষীণকায় বৈরাগীটি গাইছে—

"দোসর গীত নাহি কি তুয়া অন্তর
বোলত বোলত রাধা?"

সৌরভ-সঙ্ঘের উদ্বোধনে

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(১)

এসো ধনী, এসো মানী, দীনহীন নিঃস্ব!
তোমাদের সহযোগে জাগিল, এ বিশ্ব!
জাগিয়াছে নরলোক, অপগত দুখ-শোক,
খোলো আজি নির্ম্মোক্
সারা জাতি সঙ্ঘ?
সরে' যদি রহো এবে লোপ পাবে বঙ্গ!

(২)

দাও শত শুভ কাজে যার যাহা শক্তি!
ধন দাও, মন দাও, দাও অনুরক্তি!
আজি দেশ দিশেহারা, সব কাজে ছাড়া-ছাড়া,
আনো নব ভাব-ধারা,
ভগীরথ্-ধর্ম্মী!
তোমাদেরি মাঝে রাজে সেই মহাকর্ম্মী!

(৩)

চেয়ে চেয়ে দিন গেল, ঘনায় যে রাত্রি!
কোথা আছ কে গো তুমি সুদূরের যাত্রী!
শোনো নাকি সবাকার ঘরে ঘরে হাহাকার!
অফুরাণ্ প্রাণ যার
চাই তার স্পর্শ!
তারি মাঝে পাবে জাতি জীবনের হর্ষ!

(৪)

দুনিয়ার দৌলত্ নয় শুধু টঙ্কা!
যত বেশী পুঁজি করো, বেড়ে যায় শঙ্কা!
করো হেন সঞ্চয়, ভয় যাতে নাহি রয়,
দাতা গ্রহীতার হয়
লাভ মানবত্ব!
সেই ধনে ধনী হয়ে নাও বুঝে স্বত্ব!

(৫)

বেড়ে গেছে বাট্‌পাড়ি সয়তানি বুদ্ধি!
জ্বালাময় জৌলুসে ভাগিয়াছে শুদ্ধি!
কাৎরায় অন্তর, ধূ ধূ মাঠ প্রান্তর,
মুক্তির মন্তর
পশিল না কর্ণে!
আঁকড়িয়া ধরি সদা তামা চাঁদি স্বর্ণে!

(৬)

ভালো যাহা গড়ে' ওঠে তা'ই হয় মন্দ!
মানবতা পাশবতা করিতেছে দ্বন্দ্ব!
হোক্ শত হের্‌ফের, জয় হবে চিত্তের,
অবিচার বিত্তের
নাশ হবে সত্যি!
গাদা-খড় ছাই হবে পেলে আগ্ রত্তি!

(৭)

দানা বেঁধে ওঠো সবে, সত্যের ভক্ত!
যতখানি ভাবো বটে নয় তত শক্ত!
প্রাণ শুধু জাগে যদি, সবি সোজা নিরবধি;
থাক্ মাঝে মহানদী,
ঢেউ অতি উচ্চ,
পার হয়ে যাবে তারা সব করি' তুচ্ছ!

(৮)

সকলের মূলে তাই মন চাই তৈরী!
জ্ঞান ছাড়া আর সব ভোগ সুখ বৈরী!
হে তাপস, ওগো ঋষি, এসো সাধি দিবানিশি,
ছ'ড়াতে তা দশদিশি
করি শুধু যত্ন!
সাধনার ফল সে যে, সেই মহারত্ন!

(৯)

স্বার্থের সাধনায় মন হয় খর্ব্ব !
স্বজাতির মঙ্গলে আত্মার গর্ব্ব !
চিত্তের বলে সব, হবে আজি উদ্ভব,
অর্থের উৎসব
হবে চির-লুপ্ত।!
চলো এবে রাজপথে, কেন থাকো গুপ্ত ?

(১০)

কেন আর আপনারে ভাবো অতি ক্ষুদ্র ?
সকলের সাথে আছে মহাদেব রুদ্র !
তুমি যাহা দিতে চাও, সুসময়ে দিয়ে যাও !
ঝরা-বেল্‌পাতা দাও,
শিব তা'তে ফুল্ল !
দিন গেলে যদি দাও নাহি তার মূল্য !

সৌরভ-সঙ্ঘ

স্বর্গীয় কেদারনাথের সাধনা পূত "সৌরভ" এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ময়মনসিংহে একটী সাহিত্যিক মণ্ডলী গঠন করিয়াছে—সাহিত্যের আসরে ময়মনসিংহের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সৌরভ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সম্পদ দান করিয়াছে তাহার বিচার বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক অবশ্য করিবেন। তবে অমন্যমনা সাহিত্য সন্ন্যাসীর ছায়াতলে বসিয়া এ জেলার একান্তে একটী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যিক পরিবারটী কেদারনাথকে অবলম্বন করিয়া "সৌরভ সঙ্ঘে" রূপান্তরিত হইয়াছিল। শৈশবে এই সঙ্ঘের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্রনাথ বি, এ, বি, টি এক্ষণে তিনি কার্য্যবাহুল্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ায়, আর তেমন ভাবে যোগদান করিতে পারিতেছেন না। কেদারনাথের মৃত্যুতেও সঙ্ঘের কার্য্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ সাহিত্য মজলিসের আবশ্যকতা আছে। আমরা এই জেলার নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাব বিনিময় ও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য চর্চ্চায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবার জন্য "সাহিত্য সঙ্ঘের" অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছি।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বদাই একটী লেখক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন এই জেলার প্রথম সংবাদ পত্র "বিজ্ঞাপনী" প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটী লেখক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্বর্গীয় জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী, ৺গিরীশ-চন্দ্র চৌধুরী (ধানকূড়া), ৺হরচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর), ৺হরিকিশোর রায় (মশুয়া) প্রমুখ মনীষী ব্যক্তিগণ এই সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মীছিলেন। তৎপর "ভারত মিহির" যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও ইহার সহিত একটী সুগঠিত লেখক মণ্ডলী দেখিতে পাই। এই শক্তিশালী লেখক মণ্ডলী ছিল বলিয়াই "ভারত মিহির" তৎকালের সংবাদপত্রের মধ্যে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। জননেতা অনাথবন্ধু গুহ, কবি কাহিনীর কবি দীনেশচরণ, হেলেনা কাব্যের কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, সুলেখক জানকীনাথ ঘটক, মনীষী অমরচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীনাথ চন্দ প্রভৃতি এই মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। ময়মনসিংহের এই গৌরবময় যুগের পূজারীদের মধ্যে একমাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীনাথ চন্দ জীবিত আছেন। তিনিও আজ এই নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী ব্রাহ্মপল্লীর শান্তি নিকেতনে পরপারের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ইহার পর চারুবার্ত্তা ও চারুমিহির প্রভৃতি পত্রিকারও এইরূপ এক একটী সঙ্ঘ ছিল। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও চিন্তাশীল লেখক অমরচন্দ্র প্রভৃতি বাণী সেবকগণ চারুবার্ত্তার মণ্ডলীতে ছিলেন। চারুমিহিরেরও তৎকালে একটী লেখক চক্র ছিল। জানকীনাথ ঘটক অনাথবন্ধু গুহ, শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মজুমদার, শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সোম, ৺অমরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই চক্রের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতে-ছিলেন।

১৮৭৫ সনে যখন সেরপুর হইতে 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' মাসিক পত্রিকা বাহির হয় তখনও এই পত্রিকা 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' সভারই মুখপত্র ছিল। ইহার পর যে কয়খানা

মাসিকপত্র ক্ষীণ জীবন লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহাদের আভ্যন্তরীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে প্রত্যেক পত্রিকার সংশ্রবেই একটা ক্ষুদ্র বৃহৎ সাহিত্যিক সঙ্ঘ ছিল। এইরূপ সঙ্ঘের আবশ্যকতা নানাভাবেই অনুমোদন করা যাইতে পারে। কলিকাতার মাসিক পত্রগুলির যে সুযোগ ও সুবিধা মফঃস্বলের পত্রিকার দারিদ্র যে অল্প তাহা আমাদের মনে হয় না। আমাদের মনে হয় উভয়ের কর্ম্মপন্থা ও উদ্দেশ্য এক নহে। প্রত্যেক মফঃস্বল পত্রিকারই একটা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। রাজধানীর পত্রিকার অনুসরণ করিয়া চলিলে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না। কথায়, কাহিনীতে, কাব্যে ও প্রবন্ধে জেলার বৈশিষ্ঠ্য ফুটাইয়া তুলাও জেলার পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে লেখক মণ্ডলী গঠন করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যে সকল লেখকের সহিত ভাববিনিময়ের অন্তরায় আছে, যাহারা সখের সাহিত্যিক এবং পত্রিকার সহিত মমত্ববোধহীন তাহাদের দ্বারা এই সকল পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইতে পারে না। ভাবের আদান প্রদানের জন্য সাহিত্যিক সৌহৃদ্য যেমন আবশ্যক, তেমনি মমত্ববুদ্ধিরও প্রয়োজন এইজন্যই মফঃস্বলের প্রত্যেক পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী লেখক মণ্ডলী গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মণ্ডলী যত সুগঠিত ও শক্তিশালী হইবে পত্রিকাও সেইরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সম্পদশালী হইবে। মফঃস্বলে কিরূপ শক্তিশালী সাহিত্যিক মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে এবং তাহাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা প্রতিযোগীতাক্ষেত্রে কিরূপ জয়যুক্ত হইতে পারে সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং তাহার সাহিত্যিক মণ্ডলীই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সভাপতি মহাশয় সেই বান্ধব মণ্ডলেরই একজন পূজারী।

আমাদের ইচ্ছা ময়মনসিংহে এমন একদল সুস্থ সবল চিন্তাশীল লেখক সৃষ্ট হউক যাহাতে ময়মনসিংহ তাহার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া বিশ্বের দরবারে গৌরব রক্ষা করিতে পারে।

বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের অন্তরে থাকিয়া যে দেবী সাহিত্য চর্চ্চায় প্রেরণা করিতেছেন আমরা তাহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এবং তাহারই কৃপাকণা ভরসা করিয়া "সৌরভ সঙ্ঘকে" পুনরুত্থোথিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সুখের বিষয় সুসঙ্গ রাজকুলপ্রদীপ মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ইহার স্থায়ী সভাপতিপদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথ রায় এম, এ এখন হইতে "সৌরভ সঙ্ঘের" সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। আশাকরি সৌরভামোদী সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এ জেলার সাহিত্যানুশীলন প্রচেষ্টাকে সম্পদশালী করিবেন।

কাব্য ও জীবন

[শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়]

মানুষের জীবনে আনন্দের প্রয়োজন অসীম। আনন্দ বিহীন হইয়া মানুষ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে পারে না। শক্তি, সাধনা ও অর্থ নিয়া সে যতই কেন মশগুল হইয়া থাকুক না কেন কেবলমাত্র এগুলিই তাকে সংসার স্রোতে জীবন্ত ও সতেজ রাখিতে পারে না। তাহার সমস্ত বাসনা কামনা ও সাধনা ধারণাকে সুরঙ্গীন এবং প্রাণবন্ত করিয়া তুলার পক্ষে আনন্দ জিনিষটা অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই অন্ধকারের আবছায়ায় যদিবা ফলপুষ্প আত্মপ্রকাশ করে রবিদ্যুতির মোহনস্পর্শ বিহনে তাদের সত্যবিকাশ ঘটে না। —স্বতঃস্ফূর্ত্তি ও সুবিকাশের বলে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই আলোর সুহাস।

ঠিক এই হিসাবে দেখিতে গেলে মানব জীবনে কাব্য শিল্প ও সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন অপরিমেয়। একদিকে যেমন ইহারা এই ব্যথা বেদনাময় সংসার মরুতে অপরূপ শান্তিধারা সৃষ্টি করে অপরদিকে তেমনি জীবনের সংঘর্ষময় গতিপ্রবাহে প্রকৃত প্রাণরস সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সমস্ত দৈহিক ক্ষুধার অন্তরালে মানব জীবনে কাব্য, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের জন্য একটা অনির্ব্বাণ মনের ক্ষুধাও বর্ত্তমান। দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি তাহাকে পরিপূর্ণ শান্তি প্রদান করিতে পারে না এ বিষয়ে তার মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ও প্রয়োজন। মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হজরত মহম্মদের

একটী বাণীতে সংসার জীবনে আর্টের মূল্য দেখান হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

জোটে যদি মোটে একটী পয়সা
থাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটী যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে তার
ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগি!
বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেইত সুধা।"

মানব জীবনের বাহ্যিক অভাব অনটন ও প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে কাব্য শিল্প ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ মূল্যই আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু অন্তরের অন্তঃপ্রেরণার দিক হইতে বিচার করিলে ইহার চরম সার্থকতার কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। 'Addision বলিয়াছেন There is nothing that makes its way more directly to the soul than beauty" একটা সুন্দর জিনিষের পক্ষে ইহাই হইল পরম লাভ। অন্ধকারের ভিতর সঞ্চারিণী দীপশিখার মত দুঃখ বিষাদময় সংসারভূমে সে যদিবা একটু পবিত্র আনন্দ বিতরণে সমর্থ হইল—ইহাই তার সার্থক পরিণতি।

সৌন্দর্য্যের সার্থকতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে এইমাত্র যে কথা বলা হইল কাব্যের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। কারণ সুন্দরের উপাসনা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতেই কাব্যের প্রধান প্রয়াস। কবি আপনার সূক্ষ্ম ও উপাদেয় বিশ্লেষণে সৌন্দর্য্যের অনন্ত খনি আবিষ্কার করেন আর তাহা নিত্যকালের জন্য বিশ্ববাসীর উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের ডালি বহন করাই কাব্যের একমাত্র বস্তু নয়। কবি Coleridge বলেন "Poetry is the blossom and fragrance of all human knowledge which immediately diffuses a secret satisfaction and comapliances through the imagination human thought, human passion emotions and language" মানব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান সম্পদ চিন্তাধারা ও বাসনা কামনাতেই. ইহার সত্যিকার প্রসার দেখা যায়। সংসারের অভিজ্ঞতা-সম্ভার ইহার বুকে পাদচিহ্ন আঁকিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। মানব জীবনের প্রবাহমান সাধনা ধারণার ইহাই মাপকাঠি। এককথায় কমবেশী পরিমাণে কাব্য জীবনের মূর্ত্ত ছবি Mathew Arnold এর লেখাও একপাটার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে Poetry is the criticism of lifs'—জীবনের সমালোচনাই কাব্য। বিশ্বজীবনের স্বরূপ অঙ্কন কাব্যের বিষয়ীভূত। আর ঠিক এই সম্পদ আছে বলিয়াই কাব্য মানুষকে তার নিজের সাথে পরিচিত করিয়া দেয়; ইহার ভিতর দিয়া সে আত্মচেতনার সুযোগ লাভ করে ও সত্যাদর্শের বিমল জ্যোতিতে আপন জীবনের পরিমাপ করিয়া মানুষ নব প্রেরণা লাভ করে।

বস্তুতঃ জীবনের নিপুণ বিশ্লেষণেই কাব্যের প্রধান সার্থকতা, কারণ শ্রেষ্ঠ কাব্য সর্ব্বদাই জীবন রহস্য লইয়া। অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার একটা সাধনা ইহার ভিতর বর্ত্তমান। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সত্যকে প্রকাশ করিবার, অজানাকে জানার ভিতর টানিয়া আনার ও বিরাটকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার যে পরম তৃষা মানুষের গুমরিত অন্তঃস্থলে স্পন্দন জাগাইয়া থাকে একমাত্র কবির কাব্যচর্চ্চাই জগতের সম্মুখে সে অচিন্‌পথের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে।

Prof Mackail বলিয়াছেন Poetry is that artistic and dignified expression of emotional thought which in its operation creates patterns of life; thought and speech. মানব জীবনের ভাবাবেগ সমূহের উদার বিশ্লেষণে, নিজ দীপ্ত মনীষা ও কল্পনা প্রভাবে কবি মানুষের জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে এমন সব আদর্শ সৃষ্টি করেন যাহা দশের দ্বারা অনুসৃত হইয়া সমাজের বুকে উৎকর্ষতা আনয়ন করে। ফলে চারিদিকের আঁধার গ্লানিমার ভিতর আলোক রেখা ফুটীয়া উঠে। বাস্তবিক সারা বিশ্বের জন্য একটা সমুন্নত মঙ্গল প্রচেষ্টা অনেক সময়ই কাব্যের প্রাণ স্বরূপ—

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন

আনন্দ ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলি মাঝে।"

অমৃতের পুত্র হিসাবে কবি তার নিজ স্বত্বাকে জগতের সাথে একীভূত করিয়া দেয়, আর তার বুকে নর্ত্তন জাগাইয়া ধ্বনিয়া উঠে বিশ্বের প্রবাহমান গতি নিঃশ্বাস। ব্যথা-বেদনার তপ্তস্পর্শে শিহরিয়া উঠে তার হৃদয়, পুলক ধারার সুখ সঞ্চারণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তার বদন। দুঃখ বিষাদ-ময় এ বিশ্বভূমিকে মনোরম ও সুখ সঞ্চারিণী করিয়া গড়িয়া তুলাতেই কাব্যের পরম সাধনা নিহিত। আর ইহাই কবির পরম তৃপ্তি—

"সংসার মাঝে দুয়েকটী সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটী কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটী নিব।"

সৃষ্টি কর্ত্তার সহিত মানুষের যোগসূত্রকে সবচেয়ে সত্য করিয়া দেখায় কবি। ইহা তাহার কাব্যের অন্যতম প্রয়াস। আকাশের বুকে ভাসিয়ে যাওয়া শুভ্র মেঘগুচ্ছ; মলয়ের মৃদুল প্রবাহে আন্দোলিত ধরণীর তৃণ শ্যামলিমা সমস্তই তাহাকে সেই অদৃশ্য শক্তির কথা মনে করিয়া দেয়—আর সে লেখনীর সাহায্যে সেই পরম পুরুষের স্বরূপ ফুটাইতে চেষ্টা করে। মানব জীবনের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষণের দিক দিয়া সেই অদৃশ্য শক্তিকে নিত্যকালের জন্য বিশ্ববাসীর প্রেমসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—মানুষ তাহাকে নিতান্ত সন্নিকটে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়।

যুগে যুগে সঞ্চিত ধরণীর শত প্রকার ব্যথা বেদনায় সহানুভূতি ও অভয়মন্ত্র ধ্বনিয়া তুলার ভিতর দিয়া মানব জীবন ও কাব্যের ভিতর এক চির মঙ্গল সম্বন্ধ বর্ত্তমান। নিপীড়িতের তপ্ত নিঃশ্বাস, পতিতের গুরুমর্ম্মবেদনা, ভাগ্য-হতের করুণ আর্ত্তনাদ, কবির অন্তরে বেদনার ঝড় সৃষ্টি করে আর সে কাব্যের মধ্য দিয়া তাহাদের জীবনে সান্ত্বনা ও শক্তিরস সঞ্চারিত করিয়া দেয়। দুঃখ বিষাদের প্রতিকূল অবস্থার ও নিয়তির বিদ্রূপ পরিহাসে মানুষ অটল অচল থাকার শিক্ষা পায়। কবি রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা এ এ বিষয়ে অনবদ্য—

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী,
আসবে ছুটে বনের প্রাণী;
তবু হয়ত তোমার আপন ঘরের পাষাণহিয়া টলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়ত বাতি জ্বলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

মানব জীবনের যে রহস্য নিয়া কাব্যের প্রধান বেসাতি তাহা অসীম ও চির অনির্দ্দেশ্য, সেই হিসাবে দেখিতে গেলে কাব্যও অসীম। জীবন ধারার অনন্ত প্রবাহে ইহা চিরন্তন ও শাশ্বত।—ইহার ধ্বংস নাই শেষ নাই। ধরণীর বুকে মাধুর্য্য ঢালিয়া ও মানুষের প্রাণে পুলক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া কাব্য নব নবরূপে নিত্যকালের জন্য বহিয়া যাইবে আর তার সার্থক পরিণতি স্বরূপ—

"সুখহাসি আরও হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহধারা মাখা বাস গৃহতল
আরও আপনার হবে।"

লাইব্রেরী আন্দোলন

মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাধারণের শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা কীর্ত্তন গান প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণে উদার শিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু লেখাপড়ার ভিতর দিয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের ফল।

বরোদা রাজ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বিরাট আয়োজন চলিতেছে। ১৯০৭ সালে সেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই বৎসরই মফঃস্বলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে প্রতি নগরে ও ৮০০ গ্রামে পাঠাগার ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদের শতকরা ৫০ জন লোক লাইব্রেরীর সুবিধা পাইয়াছে।

বরোদার লাইব্রেরী বিভাগের দুই অঙ্গ। রাজধানীর লাইব্রেরী পরিচালন ভার এক অঙ্গের উপর এবং গ্রাম্য লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শন অন্য বিভাগের উপর ন্যস্ত। মফস্বলের লাইব্রেরীগুলির তিনটী ভাগ। (১) স্থায়ী লাইব্রেরী; (২) Travelling ও গতিশীল লাইব্রেরী; (৩) ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রভৃতি এই তিন প্রকারে গ্রামবাসীদের শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে।

গ্রাম্য লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয় অর্থের তিন ভাগের এক ভাগে গ্রামবাসীরা সংগ্রহ করেন। এক ভাগ জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপালিটী দেন, বাকী এক ভাগ বরোদা রাজ সরকার হইতে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা যদি লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চান তবে খরচের তিন ভাগের এক ভাগ তুলিতে হয় বাকী দুই ভাগ সরকার বা জেলা বোর্ড হইতে ব্যবস্থা হয়। বরোদায় ৫৬টী গ্রাম্য লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ আছে। বরোদা রাজ্যে গ্রামবাসীদের ১৫০টী পাঠাগার আছে।

বরোদায় Travelling লাইব্রেরীতে প্রায় ২০০০০ হাজার পুস্তক আছে। বড় বড় কাঠের বাক্স করিয়া এই বই গ্রামে কোন শিক্ষকের নিকট বা কোন পল্লী সেবকের নিকট পাঠান হয়। এক একটী কেন্দ্রে বাক্সগুলি তিন মাস পর্য্যন্ত রাখা হয়। বই পাঠাইবার খরচ রাজ সরকার বহন করেন। যাঁহার নিকট বই পাঠান হয় তাঁহার উপর পুস্তক বিতরণের ভার অর্পিত হয়। তাঁহার অপরিচিত ব্যক্তিকেও পুস্তকের মূল্য জমা রাখিয়া পুস্তক দিতে পারেন। ইহা ব্যতীত কাহাকেও কিছু দিতে হয় না।

সাধারণের শিক্ষার জন্য বরোদা রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়। গ্রাম্য পাঠাগার প্রভৃতির জন্য ১৯২৬—২৭ সনে প্রায় ২৬০০০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বরোদার প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ১৪৪ জন শিক্ষিত, বাংলার অনুপাত ১০৪ মাত্র।

বাঙ্গালায় তেমন ভাবে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কোন সূচনা করা যাইতে পারে না কি?

সংবাদ

গত ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার স্থানীয় সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ বেঙ্ক হলে "সৌরভ সঙ্ঘের" উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে এই নগরের ও মফঃস্বলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল কর্ত্তৃক সেতার বাদ্য ও শ্রীমতী বীণা গাঙ্গুলীর সঙ্গীত গীত হইলে পর সৌরভ সম্পাদক সঙ্ঘের পূর্ব্বের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সৌরভ সঙ্ঘের উদ্বোধন কবিতা, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "কাব্যে হেঁয়ালি" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কষ্টিপাথর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বুদ্ধি ও অনুভূতি ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' প্রবন্ধ পাঠ করেন তৎপর বরিশালের শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সাহিত্য চর্চ্চার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৩ই আশ্বিন স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হলে সেসন জজ শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে, সাহিত্য সভার এক অধিবেশন হইয়াছে যন্ত্রালাপ, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ মালায় সভাকে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সভায় জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

গত ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই আশ্বিন নিখিল বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলনের অধিবেশন এই নগরে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ আলম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুমারী সুপ্রভা রায়ের চিত্র এবার প্রদত্ত হইল। তিনি স্থানীবিদ্যাময়ী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার বিলাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী আগামী সংখ্যা হইতে সৌরভে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

সৌরভের সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "মনুষ্যের ইতিহাস" "বাঙ্গালার গল্প" ও "ছেলেদের মহাভারত' বাহির হইয়াছে। পূর্ণবাবুর পূজার ডালি আমাদের আনন্দের জিনিস।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্তের কবিতা গ্রন্থ "মন্দাকিনী" বাহির হইল।

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

সপ্তদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩৩৬। নবম সংখ্যা।

ব্যষ্টির সাম্যসাধনা

(শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী দ্বারা অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অভাব সমূহ মোচন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে ভাবে আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করি তাহা দ্বারা সমাজের অর্থাৎ আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটুকু উপকৃত বা অপকৃত হয় এবং আমাদের সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ কামনায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে অর্থনৈতিক হিসাবে সমষ্টিগত ভাবে আমরা লাভবান্ হইতে পারি, তাহার একটু সংক্ষেপ ইঙ্গিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিতে আমরা প্রয়াস পাইব।

সমষ্টিগত ভাবে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় আমরা সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক কি ভাবে জীবনযাপন করে তাহা হইতেই পাই। যে দেশে বা সমাজে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা উপভোগ করতঃ নিজের দৈহিক, আত্মিক প্রভৃতি মানবজীবনের প্রয়োজনীয় অভাব সকল দূর করিয়া মনুষ্য জীবনের চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত মনে করিতে হইবে, আর যেখানে তাহা নয় বরং তৎপরিবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজে একশ্রেণী মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন উপভোগ করিয়া অসম্ভব ভাবে ধন আহরণ ও সঞ্চয় করতঃ ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে ধন বাড়াইয়া তাহাই আবার ভাগ্যহীন নির্ধনের ধন হীনতার কারণ বাড়াইয়া তোলেন এবং অপরদিকে মনুষ্য জীবনের সামান্য অভাবটুকুও পূরণ করিতে অক্ষম, বহু দরিদ্র অনাহারে, চিকিৎসাবিহীনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মবিহীনে অর্থ আহরণ না করিতে পারিয়া প্রাণত্যাগ করে, বুঝিতে হইবে সেখানে সমাজের অবস্থা অবনত এবং সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সেখানে করা একান্ত প্রয়োজন।

এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিবার সময় আমাদের সামাজিক জীবনের মূলতত্ত্বে একটু যাইতে হইবে। সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য কি? উত্তর—মনুষ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য টুকুকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য জীবনের সমষ্টিগত ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করান। মানুষ যে পশু হইতে পৃথক এবং মানুষ যে তাহার বিচার শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তাহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতঃ তাহার নিজের পরিবারের সমাজের, দেশের তথা বিশ্বমানবের

কল্যাণে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে তাহাই তাহার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য হইতেই তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হইতেই যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সামাজিক জীবনের মূল তত্ত্বই কিভাবে সমাজস্থ সমস্ত মনুষ্য ব্যক্তিগতভাবে উন্নত হইয়া সমাজের এবং সম্ভব হইলে বিশ্বমানবের চরম কল্যাণ সাধন করিতে পারে, এই চরম কল্যাণের মূলেই মানবের আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যদিয়া, আমাদের অশন, বসন, আহার, বিহার প্রভৃতির ভিতর দিয়া এবং আমাদের কর্ম্মময় জীবনের যাবতীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের ক্রমোম্মোধন করিতে হইবে। কাজেই সামাজিক জীবনের মূলস্থিতি আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ মূলক কর্ম্মময় জীবনের কর্ম্মশক্তির সুষ্ঠু পরিচালনার উপর নির্ভর করে। এবং এই পরিচালনাদ্বারাই আমাদের দেখিতে হইবে সমাজের বিভিন্নস্তরের অবস্থা বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করিয়া কিভাবে আমরা সমাজ স্থিতির সহায়ক হইতে পারি অর্থাৎ আমাদের দেখিতে হইবে আমরা কি ভাবে আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহ নিয়মিত করিব যাহাতে সমাজস্থিতির উপরি উক্ত মূলভিত্তি আমাদের জীবনের পরিচালনাদ্বারা আমরা সুদৃঢ় করিতে পারি এবং মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের তথা নিজের আত্মোন্নতির চরম উদ্দেশ্য সফলকাম হইতে পারি। যে সমাজ যত পরিমাণে এই উদ্দেশ্য নিয়া সামাজিক জীবন পরিচালিত করে সেই সমাজ সেই পরিমাণ উন্নত এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই উদ্দেশ্য নিয়া জীবন পরিচালিত করেন তিনি তত পরিমাণ উন্নত এবং মানবের উন্নতির সহায়ক এবং তাহার সমাজাত্মবোধ (Social conscience) তত পরিমাণ উন্নত।

এখন দেখিতে হইবে কি অবস্থায় আমরা সমাজের উন্নত অবস্থা বুঝিব। এক কথায় বলিতে গেলে যে সমাজে সমাজের সমস্ত লোক মানবের উপভোগ্য এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় সুখ সুবিধা সর্ব্বাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে অর্থাৎ নিজ ব্যবহারে আনিয়া মানবতার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে সেই সমাজ উন্নত। "Manimum satisfaction of the Manimum numbers" ইহাই সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক আদর্শ, অবশ্য এই satisfaction এর মধ্যে যাহা মানবতার বিরোধী এবং মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এখন কিভাবে এই Manimum satisfaction আমরা সমাজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের মানব জীবনে যতপ্রকার প্রয়োজন তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার—

১। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক অর্থাৎ যাহা না হইলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতে পারি না।

২। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য আবশ্যক।

৩। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের জীবনধারণের পক্ষে কিংবা আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য আবশ্যকীয় নহে অর্থাৎ যে সমস্ত আমাদের না হইলেও হয়। সমাজ জীবনে যাহাতে সকলেই উপরিউক্ত তিন প্রকার সুখ সুবিধা সর্ব্বাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে এবং তন্মূলে মানব জীবনের যাবতীয় অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে উন্মেষ করিয়া মনুষ্যত্বের চরম উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহাতেই সমাজের চরম কল্যাণ এবং তাহাতেই Manimum satisfaction এর দিকে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যায়। শেষোক্ত তৃতীয় প্রকারের অভাবগুলি অপেক্ষা ১ম ও দ্বিতীয় প্রকারের অভাবগুলি অন্ততঃ সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই ভোগ করিতে পারে, তাহাই সমাজ জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত, কারণ ১ম ও ২য় প্রকারের অভাবগুলি বর্ত্তমান সভ্য মানবজীবনের উন্নতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম প্রকারে অভাব না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না— আহার, পরিধেয়বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি আমাদের বাঁচিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রকারের অভাবের মধ্যে—শিক্ষা, দীক্ষা; নৈতিক উন্নতির জন্য জীবনকে প্রস্তুত করা ইত্যাদি ও বর্ত্তমান সভ্য মানবসমাজের সভ্য মানবরূপে জীবনকে উন্নত করিবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। শেষোক্ত অভাবগুলি যাহা অর্থনীতির ভাষায় luxury বলা হয় তাহা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় না হইলেও হয়—সেগুলি অনেকে তাহাদের জীবন পরিচালনা

অভ্যাসের দরুণ নিতান্ত অভাব মনে করেন এবং তাহাদের ধনবত্তার শক্তিতে তাহারা ঐ সমস্ত অভাব পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। যে সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ শেষোক্ত অভাবগুলির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেছে অথচ অন্য শ্রেণী একেবারে অপরিহার্য্য প্রথম শ্রেণীর অভাব গুলির তৃপ্তির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার তৃপ্তির কোনও কিনারা করিতে পারে না, বুঝিতে হইবে, সেই সমাজের ধনবৈষম্যের মূর্ত্তি দুরন্ত আকার ধারণ করিয়াছে—এবং সেখানে ধনবৈষম্যের নিরাকরণ হেতু ঔষধ প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই মতে যে সমাজ যত পরিমাণে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক উপরি উক্ত তিন প্রকারের অভাব অভিযোগ গুলির পরিতৃপ্তি করিতে পারে সেই সমাজ সেই পরিমাণ উন্নত বলিতে হইবে এবং সেই সমাজের লোক তত পরিমাণ মানবতার দিগে অগ্রসর হইয়া মনুষ্যত্বের চরম উন্নতি সাধন করিতে পারে। "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্"—অভাবগ্রস্ত জাতি নানাভাবে আত্মধ্বংসী হইয়া মনুষ্যত্বের অবমাননা করে।

সুতরাং সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক যাহাতে সর্ব্বাধিক সমপরিমাণ তাহাদের অভাব অভিযোগ পরিতৃপ্ত করিতে পারে তাহাই সমাজ জীবনের আদর্শ। ইহা সাধারণতঃ দুইভাবে হইতে পারে একভাবে (১) সমাজের প্রত্যেক লোকের আর্থিক আয় যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আর (২) যাহাতে সমাজের প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগত আয়ের দ্বারা না চলিলেও সর্ব্বাধিক পরিমাণে তাহাদের অভাব পরিতৃপ্তি করিতে পারে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা। প্রথমোক্ত অবস্থার ব্যবস্থা দেশে আয়কর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানদ্বারা এবং তৎসম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা এমন করা যাহাতে সকলেই সমভাবে সুবিধা পায়—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'equality of opportunity' সেই অবস্থার সৃষ্টি করা এবং সমাজের শাসনযন্ত্র এমন ভাবে পরিচালনা করা যাহাদ্বারা ধনীর অর্থ ব্যয় প্রভৃতি এমন ভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে ঐ অর্থ সমাজের প্রত্যেক স্তরে সঞ্চারিত অর্থাৎ distributed হয়। ধন আহরণের সমপ্রকার সুবিধামূলক ব্যবস্থা ও ধনের সদ্বিচার মূলক সমসঞ্চরণই (equal distribution) প্রথম প্রকার ব্যবস্থার মূলনীতি আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থার মূলনীতি—সমাজের সংহত শক্তি সমাজজীবনকে এমন ভাবে পরিচালনা করিবেন যেন ধনী বাধ্য হইয়া এমন ব্যবস্থার অধীনে পড়েন যাহাতে তাঁহার সঞ্চিত ধন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কি কম অবস্থার অধস্তন স্তরের ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগে প্রতিযোগিতা করিয়া যে ধন আহরণ করিয়াছেন কিংবা নিজ স্বকৃত শক্তি নিরপেক্ষে ধনী পিতার ঘরে জন্মিবার সৌভাগ্যে কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'unearned in come' মূলে যে ধন আহরণ করেন, তাহা তিনি বাধ্য হইয়া সমাজজীবনের বৈষম্য-দলনী সাম্য-প্রণয়নী ব্যবস্থার চরণে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। Inheritance tax, progressive income tax, progressive land-Valuation tax or cess প্রভৃতি অনেকটা এই মূলনীতি দ্বারা অনুসৃত হয়।

এখন দেখিতে হইবে উপরি উক্ত অবস্থানিচয়ের সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদের কি প্রকারে পন্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। পাশ্চাত্য জগৎ সমাজতন্ত্রকে চরম আদর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজের সম্যক্ নির্ম্মূল সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা জনমত-অধ্যুষিত সুগঠিত রাষ্ট্র শক্তিদ্বারা মানবের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থার এমন সর্ব্বতোমুখী শাসন ক্ষমতার অধীনে আনয়ন করিতে চান যাহাতে রাষ্ট্রশক্তি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারাই সমাজজীবনের যাবতীয় বৈষম্য দূর করিয়া equality of opportunity & distribution of wealth" অর্থাৎ যাবতীয় সাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন। অল্পাধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য যাবতীয় রাষ্ট্রশক্তিই এই মূলনীতির অনুসরণ করেন। একদিকে রাশিয়ার উগ্র বলসেভিক নীতি ও অন্যদিকে ইংলণ্ডের "tempered state socialism" উভয়েই একই মূলনীতির উপাসক। তাহারা সকলেই ধনী জমিদার ব্যবসায়ী, কলের মালিক, যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানকে income-tax, supertax, inheritance tax প্রভৃতি নানাপ্রকার করদ্বারা তাহাদের ধন সরাইয়া সাধারণের কার্য্যে নিয়োগ করতঃ free primary

education, labour housing, sanitation post office, railway, irrigation প্রভৃতি নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের অবতারণা করিতেছেন। ইহাদ্বারা অনেক দরিদ্র নানাপ্রকার সুবিধা পাইতেছে যাহা এই সমস্ত ব্যবস্থার অভাবে তাঁহারা কখনও পাইত না। রাশিয়া এই নীতির চরম উপাসক। রাশিয়া ধন আহরণের যাবতীয় যন্ত্রই রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত করিয়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছুই রাখেন নাই। সমাজের সমস্ত ভূমি, শ্রমশক্তি এবং ধন রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই উহার আয় ব্যয়ের অধিকারী এবং তাহা সাধারণের সৌকার্য্যার্থে সকলের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য অর্থাৎ সকলেরই যাহাতে সমপরিমাণ সুবিধা পাইয়া উন্নত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রই তাহা ব্যক্তিগত সুবিধা নিরপেক্ষে ব্যয় করিবেন। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে Man proposes but God disposes মানুষ তাঁহার উন্নতির জন্য যত প্রকার চেষ্টা করে, তাহার কোন টাতেই তাহার সম্যক সুবিধা হয় না। এই প্রকার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রহীন সমাজজীবন মানবজীবনের যেমন কতিপয় সুবিধার সৃষ্টি করে, সেই প্রকার মানবের মানবতার চরম স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাতও কম জন্মায় না। মানুষ সমস্ত বিষয়ে সংহত শক্তির অধীন হইয়া তাহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলে এবং সে সংহত শক্তির ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ একপ্রকার যন্ত্রে পরিণত হইতে চলে। ধন বৃদ্ধির জন্য তথা সমাজের অনুন্নত ধন বৃদ্ধির আচারগুলিকে সে তেমন মমতার সহিত আকড়াইয়া ধরে না, কারণ তাহার স্বার্থ বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে অথচ নিষ্কামতা ও তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। এই জন্য এই নীতির অনুসরণে মানবতার ক্রম হ্রাসমান বিবর্ত্তনে মানব ক্রমশঃ পঙ্গু হইয়া যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আমরা করিতে পারি।

সুতরাং দেখিতে হইবে উপায় কোথায়। আমাদের প্রধান সমস্যাই এই :—মানবতার স্বাভাবিক পরমার্থ বজায় রাখিয়া আমরা কি ভাবে এই বৈষম্যমূলক মানবসমাজে সাম্যের সাধনা করিতে পারি। এই সমস্যার সমাধান আমাদের প্রাচ্য আদর্শে একটু দেখা যায় যদিও সেটা চরম বলিয়া মনে করা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম সমাজ ইহার একটা সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহারা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কর্ম বিভাগদ্বারা সমাজের সকলেরই আর্থিক আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরস্পরের প্রতিযোগীতা ক্ষুন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের অনুশাসনদ্বারা ধনীর ধন ব্যয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন সঞ্চরণের ব্যবস্থা এই বর্ণাশ্রম সমাজ করিয়াছেন। নির্ধন ব্রাহ্মণকে সমাজের উচ্চস্তরে আসন দিয়া ধন আহরণের মমত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া ধন বৈষম্যের যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করিতে বর্ণাশ্রম সমাজ সক্ষম হইয়াছিলেন। পিতৃলোকের স্বর্গ কামনা মূলক ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ভগবানের প্রতি অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তির মূলে শ্রাদ্ধ, পূজা, যাগযজ্ঞ, দান প্রভৃতির মধ্যদিয়া ধনী গৃহস্থের ধন ব্যয় প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম সমাজ করিয়াছেন— যাহাতে সমাজের কঠোর শাসন ব্যতিরেকে, কোনও বাধ্যতা মূলক বিধি ব্যবস্থার নিরপেক্ষে সমাজের সর্ব্বস্তরে স্বাধীন সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণায় ধনী তাহার সঞ্চিত ধন সঞ্চরণ করিয়াছেন। আমরা মানবের তৃতীয় প্রকার অভাব অভিযোগ অর্থাৎ যাহা luxury নামে অভিহিত করিয়াছি বর্ণাশ্রম সমাজ তাহারও একটা সুষ্ঠু কল্যাণকর আবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ তৃতীয় প্রকার অভাবের সার্থকতা এই যে ধনীর ধনব্যয় দ্বারা দরিদ্র কাজ (employment) পায় এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন সঞ্চারিত হয়। বর্ণাশ্রম সমাজে ধনী দরিদ্রের সাহায্য, দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ ও পিতৃলোকের স্বর্গকামনার বিশ্বাসে নানাবিধ লোক হিতকর কার্য্যে তাহার ধনবত্তার পরিচয় দিয়া নিজের ধনসম্ভ্রম বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন—পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্য ধনী অগণিত বিলাস দ্রব্যে নিজের ধন সম্ভ্রম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন—তাহার ফলে তাহার ধন বিলাস দ্রব্যের Manufacturer আর এক ধনীর উন্নতিরই সাহায্য করে তাহাতে সমাজের নিম্নস্তর তত বেশী উপকৃত হয় না বা তাহার নিকট ধন সঞ্চরণ হয় না। বর্ত্তমান ধনীর ধনব্যয় প্রবৃত্তি অনেকটা এই বৈষম্যের বৃদ্ধিই করিতেছে—সাম্য আনয়ন করা তাহার কার্য্যদ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। "They help cumulatively to increase inequality of wealth," এই জন্যই বর্ত্তমান সভ্য সমাজে নিরানন্দ, অশান্তি এবং শ্রমিক ধনীর দ্বন্দ্ব কোলাহল।

কিন্তু, বর্ণাশ্রম সমাজেও বংশগত জাতি প্রতিষ্ঠায় ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীদ্বারা নীচ শ্রেণীর প্রতি নানাপ্রকার ভেদ বুদ্ধি মূলক অত্যাচার উপদ্রবের সৃষ্টি হওয়ায়—তাহার উৎকৃষ্ট গুণগুলি লোপ পাইল এবং তাহাও অবশেষে নিকৃষ্ট নীতির অনুসরণে নিজকে আত্মধ্বংসী পরস্পর বিদ্বেষী সমাজে পরিণত করিল। রাষ্ট্রশক্তির অভাবে বর্ণাশ্রম সমাজ গঠনে মরিচা ধরিল এবং ইহা বর্ত্তমানে ধ্বংসোন্মুখ। উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবে যে—মানবতার পরমার্থ বজায় রাখিয়া সাম্যের সাধনা বিষম সমস্যাপূর্ণ ও সঙ্কটাকুল। আমরা উপর্যুক্ত উভয় অবস্থা হইতেই একটি মুলনীতি পাই তাহা এই :—সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ধন ব্যয় প্রবৃত্তি এমন হওয়া চাই যাহাতে তাহার ধনব্যয় প্রবৃত্তির পরিচালনাতে ধন সমাজের প্রত্যেক স্তরে সঞ্চারিত হয় এবং এই ভাবেই আমাদের ধনব্যয় প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আমাদের সমাজের আর্থনৈতিক গতি অনেকটা নির্ণয় করিতে পারে। সাম্যসাধনার বীজমন্ত্রই আমাদের ধনব্যয় প্রবৃত্তি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে উহা সমাজের সর্ব্বস্তরে ধনসঞ্চরণের সাহায্য করে। সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভাবগুলি ঐ সমস্ত জিনিষ দ্বারা পূরণ করিব যাহার মুল্যের অর্থ সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এই জন্যই কুটীর শিল্পজাত জিনিষ ব্যবহার সাম্যসাধনার সহায়ক পরন্তু মিলের জিনিষে বৈষম্য ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে বাড়ায়। খদ্দরে অর্থব্যয় বাড়িলে সামান্য কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পির হাতে ধন সঞ্চয় হয়, মিলের কাপড় পড়িলে বোম্বাই বা 'মাঞ্চেষ্টারের' তেলো মাথায় তেল দেওয়া হয়। প্রাচ্যে ধনীর প্রাচ্য আদর্শানুযায়ী ধনব্যয়ে পূজাপার্ব্বনে ব্যয় করিলে দেশের আপামর দরিদ্র সাধারণে ধন সঞ্চারিত হয়—পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আদর্শানুপ্রাণিত সহরবাসী ধনীর 'Rollsroy', 'Dodge' দরিদ্রের হাতে ধন প্রেরণ না করিয়া ধন বৈষম্যের মাত্রা বাড়াইয়া তোলে। আমাদের দেশের ধনীরা বিদেশী-বিলাস দ্রব্য দ্বারা ধনসম্ভ্রম বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আবার "গোদের উপর বিস্ফোটকের" সৃষ্টি করেন। স্বদেশী বিলাস দ্রব্য স্বদেশীয় ধনীর হাতে টাকা পাঠাইলেও ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সেই ধন স্বদেশীয় দরিদ্রের পাইবার আশা থাকে কারণ উহা স্বদেশেই সঞ্চরিত হইবে কিন্তু বিদেশে গেলে উহার আর এদেশে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না; বিশেষতঃ আমাদেরও এই বিদেশী পন্যের মুল্য আমাদের দেশের উৎপাদিত খাদ্য শস্য দ্বারা দিতে হয় (কারণ আমাদের রপ্তানীর উপযোগী manufacture নাই বলিলেও চলে), তাহাতে ধন সঞ্চরণ হওয়া দূরে থাকুক—দরিদ্রের দুরায়ত্ত অন্ন সমস্যা আরও বাড়াইয়া তোলে। উপরি উক্ত আলোচনাতে আমরা—'সমস্যা' কোথায় তাহার একটা ধারনা করিতে পারি। আমাদের ধনব্যয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রন করাই আমাদের সাম্যমন্ত্রের একমাত্র সাধনা। পাশ্চাত্য জগৎ রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার অবতারণা দ্বারা অঙ্কুশাহত করিয়া সমাজকে সাম্যের পথে চালাইতে প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু মানুষ তাহাতে সাম্য ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়া আবার মানবতার অপমান করিতেছে। আমরা কি মানবতার স্বাভাবিক পরমার্থ বজায় রখিয়া আমাদের স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যাত্রায় দৈননন্দিন কর্ম্মপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না যাহাতে, সমাজের সর্ব্বস্তরে অর্থ সঞ্চরিত হইয়া সমাজের কল্যানসাধন করিতে পারে? সুধীগণ তদ্বিষয় চিন্তা করুন। সমস্যা গুরুতর। উদ্বুদ্ধ দরিদ্র নারায়ন জাগ্রত হইতেছেন—তাহার উদ্বোধনী শক্তির অবমাননা করিবেন না—করিলে বিপদ অনিবার্য্য। যে পর্য্যন্ত সামাজিকভাবে কোনও মীমাংসায় আমরা উপনীত হইতে না পারি ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের ধনব্যয় প্রবৃত্তিকে কিভাবে সযংত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তহার আভাস এই প্রবন্ধে কতকটা আলোচিত হইল—আমরা সেইভাবে ব্যক্তিগতভাবে অন্ততঃ সাম্যেরসাধনা করিতে পারি কি না সুধীগণ তাহার সমাধান করুন। অর্থাৎ কিভাবে ব্যষ্টি সাম্য সাধনা দ্বারা সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহার চিন্তা করিবার সময় আমাদের আসিয়াছে—অবশ্য ইহাতে এমন কথা বলা হয় না যে, সমষ্টিগতভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় কোনও চেষ্টা থাকিবে না—কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেষ্টা যেন মানবতার পরমার্থকে ধ্বংস না করে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সেরপুর পরিক্রমা

[শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ]

বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী এবং বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কারের জন্মভূমি বলিয়া সেরপুর, পুর্ব্ববঙ্গের এক প্রধান তীর্থ। এ তীর্থ দেখিবার ইচ্ছা, অনেকদিন যাবৎ ছিল কিন্তু দেখিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এবার সকল বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া যাত্রা করিলাম। শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র বসু সঙ্গী হইলেন।

পোড়াবাড়ী, টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসিগণের ষ্টিমারে উঠিবার ঘাট। ২৮শে ভাদ্র অপরাহ্ণে নৌকাযোগে পোড়াবাড়ী অভিমুখে চলিলাম। পথ—দীর্ঘ; জল,—উজান; পাল খাটাইবার বাতাস নাই, কাজেই একটু বেশী সময় হাতে করিয়াই, যাত্রা করিতে হইল; কিজানি যদি ষ্টীমার পঁহুছিবার পুর্ব্বে পঁহুছিতে না পারি।

যাত্রার সময় গৃহিণী কিন্তু চিঁড়া, মুড়ি, গুড় ও সন্দেশ সঙ্গে দিয়াছিলেন। কি জানি, যদি রাত্রিতে পাক করিবার সুবিধা না হয়। বৃদ্ধের রাত্রিতে না খাইলেও চলে, কিন্তু যুবক ছেলের ত উপবাস করা চলিবে না। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঘটিলও তাহাই। বাবাজি অখিল, রাত্রিতে পাক করা, মত করিল না। মাঝি সহ, মাতৃদত্ত চিঁড়া-মুড়ি গুড়-সন্দেশ দ্বারা কোনমতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। আমি ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী, খাওয়া অপেক্ষা উপবাসই বেশি আরামজনক, কাজেই কোন অসুবিধা হইল না।

শুক্লপক্ষের দশমী। আকাশ—সুনীল, যেন একখানা নীল চাঁদোয়া। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহারই মাঝে ঢাকাই জামদানীর বুটার মত তারাগুলি জল জল করিয়া উঠিল। দশমীর চাঁদ হাসিতে হাসিতে দেখা দিল। নদী, কূলে কূলে ভরা, স্রোতের বেগে অধীর, কোথাও ফেণপুঞ্জে শোভিত—যেন কেহ, এই মাত্র শ্বেত কুসুমের অঞ্জলি দিয়া গিয়াছে। কোথাও ছোট ছোট তরঙ্গগুলি নাচিয়া চলিয়াছে, কোথাও আবর্ত্ত—ঠিকই নাভির মত। তাহারই উপরে চাঁদের আলো পড়িয়া জলিতেছে, খেলেতেছে, হাসিতেছে। তীরে সবুজ ঘাস, সবুজ ধান, সবুজ পাট—জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া এ সবুজ, আরও কাঁচা, আরও যেন রসেভরা হইয়াছে। কোথাও কাশ-ক্ষেত্র শ্বেত চামরের মত কাশ-কুসুমগুচ্ছ দুলিয়া শারদ-লক্ষ্মীর গায়ে বাতাস করিতেছে। বাঙ্গালায় ত শারদলক্ষ্মীই লক্ষ্মী; বসন্ত ত বাঙ্গলায় নাই। বাঙ্গালী, শরতের দৌলতেই মানুষ, শরৎ শোভায়ই ভাবুক, শারদীয় শক্তিপুজায়ই সেবক। শাস্ত্রে অকাল বলুক, শরৎই বাঙ্গালার কাল। বাঙ্গালার দেবতা, শরতেই যে জাগ্রত, তাহা বাঙ্গালার নদী ও বাঙ্গালার মাঠের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়।

ছইয়ের বাহিরে বসিয়া শারদলক্ষ্মীর এই শোভা দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম—এমন শ্রী যে দেশের মাঠে ও নদীতে, সে দেশের লোক শ্রীহীন কেন? এমন শস্য ভাণ্ডার যাহার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, সে দেশের লোক, "অন্নাভাবে শীর্ণ" কেন? এ কেনর উত্তর, বাতাস দিল—শো-শো; নদীর জল দিল—কল-কল, কুলু-কুলু। উহারা কি বলিল, তাহা বুঝিবার মত হৃদয় আমার নাই, কাজেই কিছু বুঝিলাম না।

মধ্য রাত্রিতে নৌকা তীরে বাঁধিয়া মাঝিরা শয়নের উদ্‌যোগ করিল। আমারও চক্ষু মুঁদিয়া আসিতেছিল, ছইয়ের ভিতরে যাইয়া শয়ন করিলাম। অখিলচন্দ্র, সুষুপ্ত; তাহার মুখে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। একবার চাহিয়া দেখিলাম, যৌবনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সে মুখে উছলিয়া পড়িতেছিল। ডাকিলাম না। শীতল বাতাসে শুইতে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। দুর্লভ নিদ্রা, আজ বড় সুলভ হইয়াছে মনে হইল।

প্রাতে জাগিয়া দেখি, মাঝিরা গুণ টানিয়া চলিয়াছে। নদীর জলের কল গান, শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রভাতের বাতাস, সে গানের যেন তাল দিতে থাকিয়া থাকিয়া গায়ে আসিয়া লাগিল। দূরে পাখীরা প্রভাতী গাইতেছিল, তাহাদের সে ললিত-ভঁয়রো টোরীর তান, শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। হায়, এ আনন্দের কণাও যদি এ হৃদয়ে থাকিত, তবে আর এ ধূলি-ধূসর ধরনীর বুকে অভাব ছিল কি? ঋষিরা এ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাহারা বলিতে পারিয়াছিলেন—"আনন্দেন জাতানি

জীবন্তি"—। ঠিক কথা, আনন্দই যে জীবন; যাহার আনন্দ নাই, সে আবার জীবিত কি? সে শুধু শ্বাস ফেলে, কিন্তু বাঁচিয়া নাই। কেবলই মনে হইল, দাও প্রভু, ঐ আনন্দের এক কণা, আর যে কিছুই চাইনা, কিছুই চাই না প্রভু। এ আনন্দ যে পায়, তাহার কাছে বাতাস, আকাশ—. এমননিকি "পার্থিবং রজঃ" ও যে মধুমৎ হইয়া উঠে। কেমন করিয়া সে মধুর সন্ধান করিতে হয়, কে বলিয়া দিবে?

প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পরেই মনে হইল আহারের কথা। রাত্রিতে কিছু খাওয়া হয় নাই; গৃহে থাকিলে হয়ত আমার মত Dyspeptic এর এই ভোরের বেলাতেই থরচার কথা মনে হইত না। কিন্তু আজ জল-বাতাস ও সুনিদ্রায় বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন—ক্ষুধাটা জীব ধর্ম্ম; আজ বুঝিলাম আমিও একটা জীব বটে, যেহেতু আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। এ জীবধর্ম্মটা প্রায় হারাইয়া যাইবার মত হওয়াতেই দেহটা হারাইবার দশায় আসিয়াছি। কাজেই ক্ষুধায় একটু আনন্দ দিল। ততক্ষণ শ্রীমান্ অখিলচন্দ্রও উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে আহারের কথা বলিলাম। বাবাজী কিন্তু ভাবনায় পড়িলেন। বুঝিলাম, এ ভাবনা, পাকের জন্য। আহার করিতে হইলেই পাক করা ছাড়া, উপায় নাই। কিন্তু সে বিদ্যায় পুত্র, পিতার মতই সুদক্ষ। কাজেই পোড়াবাড়ী যাইয়া হোটেলের রাঁধা ভাত অথবা লুচী মিঠাই খাওয়ার দিকেই বাবাজীর আগ্রহ দেখা গেল। কিন্তু নৌকার গতি বড় মৃদু, বুঝা গেল পোড়াবাড়ী যাইতে মধ্যাহ্ন আগত হইয়া যাইবে। কাজেই অগত্যা পাকেরই উদ্যোগ করিতে হইল। মাঝি, চুলা ধরাইয়া দিল, অখিলচন্দ্র ডাইল তুলিয়া দিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া অ ি.লের নিষেধ সত্ত্বেও হোমের পুরোহিতের মত ২। ১ খানা সমিধ্ নহে—শুষ্ক ইন্ধন চুলায় প্রক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ডাইল ভাত রাঁধাও যজ্ঞই বটে, আর যজ্ঞ কেন, ইহাই বোধ হয় বড় যজ্ঞ। ঋষিদের ভাষায় পাক-যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলেই ত মানুষ বাঁচিয়া আছে। 'স্বাহা' শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোনমতে মসুরের ডাইল আর ভাত হইয়া গেল। স্নান করিয়া আহার করিলাম। তৃপ্তিতেই বটে, কেন না সকল উপকরণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষুধা নামক উপকরণটি প্রচুরই ছিল। কাজেই কোন অসুবিধা হইল না। নদীর ঘোলা জল, পরম তৃপ্তিতেই আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিলাম। আজ আর ঘোলা বলিয়া দ্বিধা নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার এমনই তাড়না।

পোড়াবাড়ী আসিলাম। আমরা যে ষ্টীমারে যাইব—যাহাকে কালীগঞ্জ ষ্টীমার বলে—তাহা তখনও আসে নাই। কখন আসিবে তাহারও ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না। ধূম দেখিয়া নাকি উহার আগমন বুঝিয়া লইতে হয়। ন্যায়শাস্ত্রের বাঙ্গালিগণ ধূম দেখিয়া আগুনের অনুমানের একটা শিক্ষা, অনেকদিন হইতে আছে। ধূম দেখিয়া ষ্টীমার আসিবার অনুমান ইংরাজ আমলের শিক্ষা। আমরা সেই ধূম দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে "স্থলচর" নামক ষ্টেশনটির দিকে জলচর ষ্টীমারের জন্য চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম আর নৌকায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। এইভাবে বিকালটা গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ষ্টীমার আসিল। তাড়াতাড়ি সুটকেস ও বিছানা কুলীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলাম। সস্তায় পার হইবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া একবার চক্ষু স্থির হইল—একবারে "ন স্থানং তিলধারণে", যাত্রীতে জাহাজ বোঝাই। টিকিট বদলাইবার একবার ইচ্ছা হইল কিন্তু তখনই মনে হইল, কেন ইহারাও ত আমরাই—আমারই ভাই সব। ইহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিব না কেন? যদি ইহাদের সঙ্গে, অবহেলা বা ঘৃণা করি, বাঙলা মাকেই ঘৃণা করা হইবে। সে পাপ করিব না, তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইব। কোনমতে একটু স্থান করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পেটার্ণ ষোলআনাই কৃষক শ্রেণীর মুসলমান, হিন্দু অল্প। ইহারা, সপরিবার কেহবা একা, "খোলাবান্ধা" চলিয়াছে। বাঙলা-মা এই ছেলে-গুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—হয়ত খেদাইয়াই দিয়াছেন। ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া ইহারা আসামের বন জঙ্গলে অন্নের সন্ধানে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে।

আমার এই গৃহছাড়া ভাইদের মধ্যে বসিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলাম। আলাপে জানিলাম—

দেশে থাকিলে দিন-মজুরী ছাড়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের অন্য কোন গতির সম্ভাবনা ছিল না. "খোলাবান্ধা' গিয়া তাহারাও দু-দশ বিঘা জমি করিয়াছে। উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই উহারা সেই স্বজন-হীন স্থানেও একটা তৃপ্তি বোধ করিতেছে। অনেকে আসামের জল-বায়ু সহিতে না পারিয়া মরিতেছে ও বটে, কিন্তু সে মরণের জন্য ইহারা কেহই ভীত নহে। মরণ জয় করিতে অথবা মরিতে ইহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একজন মরিলে সেখানে বাঙ্গলা হইতে দশজন যাইয়া দাঁড়াইতেছে। বাঙ্গলা মায়ের সংশপ্তক সন্তানগণ, আসাম জয় করিয়া আসামকে বাঙ্গলা করিয়া তুলিল, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। আসামে বাঙ্গলার এই বিজয়-গৌরব, এই গৃহ-হারা লক্ষ্মী-ছাড়া কৃষকদিগেরই বটে। শিক্ষিত বলিয়া যাহারা অভিমানী, সেই হস্তপদ-হীন কেতাবের বোঝা বাহকদিগের নহে।

রাত্রি ১২টার পর ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ভিড়িল। আমরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া তল্পী সহ রেলগাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। এখানে বন্দী রহিলাম, ভোর ৫টা পর্য্যন্ত। জগন্নাথগঞ্জে চোর ও গাট-কাটার উপদ্রব বড় বেশী। আধঘণ্টা পরে পরেই একজন কনেষ্টবল আসিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া যাইতে লাগিল। ব্যবহারটি সুন্দর। গাড়ীর মধ্যেও সতর্কতার জন্য বিজ্ঞাপন আটা দেখিলাম।

ভোরে গাড়ী ছাড়িল। সিংজানী ষ্টেশনে (জামালপুর) সাড়ে ছয়টার সময় পঁহুছিয়া আমরা নামিয়া পড়িলাম। এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে জামালপুর সহরের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মপুত্রের খেয়াঘাটে যাইতে হইবে। একখানা গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলাম। খেয়াঘাটে যখন পঁহুছিলাম তখন ৭টা বাজিয়া গিয়াছে! ব্রহ্মপুত্র পার হইবার জন্য একখানা ষ্টীম-লঞ্চ আছে শুনিলাম কিন্তু দেখিলাম না। সেখানা নাকি ওপার গিয়াছে, কখন আসিবে ঠিক নাই। কাজেই ধ্রুব খেয়ানৌকা পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুব লঞ্চের জন্য অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। আমরা খেয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। নৌকাখানা খুবই বড়। মাঝি ৩জন; সবই পশ্চিমা, বাঙ্গালী নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে পশ্চিমারা সব জায়গাতেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে যত কুলী, সবই পশ্চিমা, বিড়ি সিগারেট-পান-মিঠাই বিক্রেতা পশ্চিমা, খেয়া নৌকাতেও পশ্চিমা। বাঙ্গালার শ্রমজীবীরা হয় 'বাবু' হইয়াছে, নয় দেশ ছাড়িয়া আসাম চলিয়াছে, বাঙ্গালায় তাহাদের ভাত নাই। তাহাদের ভাত পশ্চিমারা কাড়িয়া নিয়াছে। স্বদেশে যাহাদের এমন পরাজয়, তাহারাই কিন্তু চলিয়াছে, আসাম বিজয়ে।

পশ্চিমা বাহক তিনজন, যেরূপ নৌকাখানি বাহিতে লাগিল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, যে দেশে উহাদের বাড়ী, তাহার আশে-পাশে নদী নাই, এবং উহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কেহই নৌকা বাহে নাই। চটের একটা প্রকাণ্ড পাল, উহারা তুলিয়া দিল, কিন্তু উহা নৌকা চালাইবার জন্য, কি আরোহীদিগের গায়ে ধাক্কা দিবার জন্য, সেটা ভাল করিয়া বুঝা গেল না। বাতাস নাই কাজেই পাল রূপী সেই প্রকাণ্ড চট, ঘুরিয়া ফিরিয়া যাত্রীদের গায়ে মাথায় কেবল ধূলাই মাখিতে লাগিল, নৌকা চলিবার তাহাতে কোন সহায়তা হইল না। অগত্যা নাবিক তিনজন দাঁড় ধরিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বলের কাছে, এই গঙ্গাপুত্রদের হাতের বল হারিতে লাগিল। বহুশ্রমে পূর্ণ দুই ঘণ্টায় ইহারা নৌকাখানা, নির্দ্দিষ্ট ঘাটের অনেক দূর ভাটীতে গিয়া ভিড়াইল। যেখানে নৌকা ভিড়াইল উহার নাম 'পক্ষী-মারী'। রৌ-মারী, চিল-মারীর সোদর ভাই। আমরা 'দুর্গা' বলিয়া পক্ষীমারীতে নামিয়া পড়িলাম।

পক্ষীমারির বটগাছ তলায় সেরপুর যাইবার মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়ায়। আমরা সেখানে যাইয়া দেখিলাম সবগুলি মোটরই চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বিপদ কাটিল না, গাড়ীখানার দুইটি ঘোড়ার মধ্যে একটি একবারে অশিক্ষিত। গাড়োয়ানের ইঙ্গিত ত বুঝেই না, চাবুকও মানে না। গাড়ীখানাকে বিপথে নিয়া ফেলিতে অশ্বিনী-নন্দনের যে আগ্রহ, তাহার এক ভগ্নাংশও সোজা পথে চলিতে নয়। কাজেই গাড়োয়ান বার বার নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং নামে ইহা ঘোড়ার গাড়ী হইলেও কাজের বেলায় ঘোড়া-মানুষের গাড়ী। এই অপূর্ব্ব গাড়ীতে প্রাণটা হাতে করিয়া কোনমতে সেরপুরে আসিয়া পঁহুছিলাম। বোধ হয় রাস্তাটি প্রশস্ত আর পাকা বলিয়াই এ গাড়ীতে আসা।

সম্ভব হইল। সাধারণতঃ মফস্বলের এবং মফস্বলের ছোট ছোট সহরের পথঘাট যেরূপ, এ পথ সেরূপ হইলে পথেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের নয়—পারের, সদ্যঃফল ফলিত।

সেরপুরের নিম্ন দিয়া 'সেরী' নদী প্রবাহিত ছিল। এখন প্রবাহ নাই, ভূমিকম্পে মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাত আছে। সেই খাত, নানাজাতীয় তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন, একখানি নৌকাও উহাতে দেখিলাম না। কিন্তু এক সময়ে সেরীনদীর বক্ষে সহস্র সহস্র নৌকা দিনরাত্রি যাতায়াত করিত। সেরীনদী বাহিয়াই এ প্রদেশের লোক 'ভাটী'তে যাইত। শাহাবাজ খাঁ কম্বু, ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই 'সেরী' নদী দিয়াই সেরপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে আজ চারিশত বৎসরের কথা। আমরা সেরীনদীর উপরের পাকা পুল দিয়া সেরপুর প্রবেশ করিলাম।

"সহরে সেরপুর" বাদশাহী আমলের নাম। সেরপুর মরিচা এবং দশকাহনিয়া সেরপুর অন্য নাম। একালের নাম সেরপুর-টাউন। আরও একটা সেরপুর আছে, উহা বগুড়া জেলায়। প্রবাদ, খেয়ায় সেরপুর আসিতে ব্রহ্মপুত্রের দশ কাহণ কড়ি দিতে হইত, এজন্য ইহার নাম দশকাহনীয়া সেরপুর। সে কালের দশ কাহণ কড়ি, বড় অল্প কথা নহে। ইহা হইতে সেকালের ব্রহ্মপুত্রের পরিসর অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বোধহয় সে সময়ে একপারে জামালপুর, অন্য পারে সেরপুর, মধ্যে অপর কিছু ছিল না।

সেরীনদী, সেরীপাড়া, সেরপুর—এই সকল নামের সহিত, এক সেরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলে, ইহার পুরনাম—সেরখাঁ। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। খুব সম্ভব, সেরীপাড় বলিয়া চিহ্নিত পল্লীতে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। হইতে পারে সেরীনদী ইহারই কাটা-খাল। সেইজন্যই নাম—সেরী। এই একটি নহে, উত্তর ভারতের প্রায় সমুদায় নদীই এইরূপ কাটা-খাল, এবং অনেকের নামই, যিনি কাটিয়াছেন, তাঁহার নাম। জহ্নুমুনির কাটাখাল—জাহ্নবী (গঙ্গা), ভগীরথের কাটাখাল—ভাগীরথী; পদ্মমুনির কাটাখাল—পদ্মা। ব্রহ্মপুত্রকে যমুনায় পরিণত করিবার ঘটনা, সে দিনের কথা বলিলেই হয়। জনৈক কৃষক, দা দিয়া কোপাইয়া ব্রহ্মপুত্রের একটা ক্ষীণধারা নিজের ক্ষেতে লইয়া আসিয়াছিল, একটু প্রসার হইলে সেই খালের নাম হইল—দাওকোপা। তারপর ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহ দাও-কোপা দিয়া প্রবাহিত হইলে ইহার নাম হইল—যবুনা; এখন নাম যমুনা। এ যমুনা, কলিন্দ-নন্দিনী নয়, কৃষক-কন্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কৃষকের নামটা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

সেরীর পুল পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিতে প্রথমেই একটি সুদৃশ্য বিদ্যালয় দেখা যায়। শুনিলাম, উহার প্রতিষ্ঠাতা সেরপুরের বিখ্যাত জমিদার বাবু গোপালদাস চৌধুরী M. A. B. L. আর কিছু অগ্রসর হইলেই মুনসেফী আদালত ও থানা। তাহার পরে 'রঘুনাথ বাজার'। 'রঘুনাথজী' বিগ্রহের নামে এ বাজার। এই বাজারের মধ্য দিয়া আমরা ফৌজদারী আদালতের নিকটে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র বসু, আমাদিগকে বাসায় লইয়া গেলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সহর দেখিতে বাহিরে হইলাম। সুপ্রসর পাকা রাস্তা, এত রাস্তা এবং এত বড় ও ভাল রাস্তা অনেক জেলার সদরেও নাই। বাজার অনেকগুলি। প্রত্যেক জমিদারেরই এক একটা পৃথক পৃথক বাজার। মাছ, তরকারী, কলা বেশ সস্তা। খুব বড় সফ্‌রি কলা, এক পয়সায় একটি। সফ্‌রি কলা অপেক্ষা বীচা কলার দাম বেশী। এ অঞ্চলের লোকে নাকি বীচা কলাই বেশি পছন্দ করে। চাউল, খুব উৎকৃষ্ট, এবং সস্তা। দুধ ভাল না। কাঁঠাল প্রচুর জন্মে, কিন্তু আম ভাল হয় না। এই দুরধিগম্য স্থানেও দেখিলাম পেশোয়ারী আসিয়া তাহার দেশের মেওয়ার দোকান খুলিয়াছে। মনোহারী দোকান প্রচুর। কবিরাজী ঔষধেরও দোকান অনেক। সে হিসাবে ডাক্তারী ঔষধের দোকান অল্প। ডাক্তারও অল্প। শুনিলাম এ স্থানের লোকে কবিরাজী চিকিৎসাই পছন্দ করে, ডাক্তারী ঔষধ সহজে খাইতে চায় না। শুভ বুদ্ধি বটে। কিন্তু যুগমাহাত্ম্যে এ শুভ বুদ্ধি কতদিন থাকিবে জানি না।

সেরপুরে পুকুর প্রচুর। পথে বাহির হইলে ডাহিনে বামে কিছু দূরে দূরেই ছোট বড় বহু পুকুর দেখা যায়।

শুনিলাম পুকুরের সংখ্যা ২০০। ২৫০ শত হইবে। ময়নামতীর দেশে—"কারো পোখরির জল কেহো নাহি খায়।"

সেরপুরেও সেই প্রথা কিনা জানি না কিন্তু নিজের পুকুর ছাড়া অন্যের পুকুরে যাইবার প্রয়োজন কাহারও হয় না, তাহা বেশ বুঝিলাম। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই দুই একটি পুকুর আছে। অধিকাংশ পুকুরই বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্যপূর্ণ। একটি পুকুরে প্রচুর রক্ত কুমুদ দেখিলাম। জমিদার বাড়ীগুলির সম্মুখে বড় বড় পুকুর, পিছনেও পুকুর। এ সকল পুকুরের জল গভীর ও নির্ম্মল, বাঁধা ঘাট, বড়ই সুদৃশ্য। জমিদার বাড়ীগুলিও সুন্দর। এক একখানি বাড়ী বহু বিস্তৃত। দালান বেশি দেখিলাম না। শুনিলাম, ভূমিকম্পের ভয়ে, জমিদারেরা দালান দেন না; দিলেও দোতালা করেন না।

পরদিন আহুত হইয়া মোক্তার লাইব্রেরীতে গেলাম। মোক্তার বাবুরা সকলেই সদালাপী এবং শিক্ষিত। কেবল আইন লইয়াই ব্যস্ত নহেন, অনেকেই আইনের বাহিরের সংবাদও ভালরূপেই জানেন। প্রধান মোক্তার বাবু অশ্বিনীকুমার নাহা, তাঁহার বাসায় যাইতে খুব অনুরোধ করিলেন, স্বীকার করিলাম। এই একজন মহাশয় লোক; সেরপুরে যাহার অন্যত্র আশ্রয় মিলে না, অশ্বিনীবাবুর বাসাই তাহার আশ্রয়। যাহার কেহ নাই, তাহার অশ্বিনীবাবু আছেন। কলেরার সময় যেখানে রোগী, সেইখানেই অশ্বিনীবাবু। তাহার চরিত শুনিয়া বড় শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে বলিলাম—"বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দ" —

বাবু চিন্তাহরণ সেন, মোক্তার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট। ইনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত ৺ভবতারিণী মায়ের সেবক, পূজক ও সাধক। মাথায় দীর্ঘ জটা, মুখে শান্তি আর শিষ্ট কথা, মনে অজেয় বল - একবারে আসল শাক্ত। এমন মানুষ কদাচিৎ মিলে। ৺ভবতারিণীর নামে তিনি যখন জয়ধ্বনি করেন, সহর সে ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠে। পূর্ণিমার রাত্রিতে তাঁহার সে ধ্বনি শুনিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। ৺ভবতারিণীরপ্রসাদ—খিচুড়ী পায়স, চিন্তাহরণবাবু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, রাত্রিতে সে প্রসাদ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। দুইদিনেই তাঁহার সহিত একটা যুগের বান্ধবতা হইয়া গেল। মাথার পাকা চুলের গৌরবে আমি তাঁহার দাদা হইয়া গেলাম।

পরদিন ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী—সেরপুরের বিদ্যা গৌরবের পীঠ—দেখিতে চিন্তাহরণবাবুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাত্রা করিলাম। যে পাড়ায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী, উহার নাম বাগ্‌রাশা। পথে একটা মাদ্রাসা দেখিলাম। সেরপুরে এইটাই মুসলমানদের বিদ্যা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই একটি বেশ বড় রকমের পুকুরের পাড়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী। পুকুরটি সেরপুরের জমিদারেরা কাটাইয়া দিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম। পুকুরের পাড়েই বসিবার ঘর। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পৌত্র, আমাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন। ইনি যুবক, ইঁহার পিতা - তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বয়সে প্রৌঢ় পুরুষটি সাদাসিধে ব্রাহ্মণ মাত্র, তর্ক বা অলঙ্কারের কিছুই ইঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তবে বেশ শান্তশিষ্ট প্রকৃতি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছবি, পুস্তক, হস্তলিপি—কিছুই ইঁহাদের ঘরে নাই, শুনিয়া দুঃখ হইল। যে ঘরে বসিয়া সেই বিশ্ব-বিখ্যাত বাণীর সাধক, তর্ক ও অলঙ্কারের অধ্যাপনা করিতেন, "চন্দ্রবংশম্" ও "সতী পরিণয়ম্" লিখিয়া রঘু ও কুমারকে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, উদ্বাহ ও শুদ্ধির উপর "চন্দ্রালোক" ছড়াইয়া রঘুনন্দনকে নন্দিত করিয়াছিলেন, সেই ঘরখানা - সেই সর্ব্ববিদ্যার পীঠ—দেখিতে আগ্রহ করিলাম। উঁহারা বলিলেন—সেখানা ছনের ঘর ছিল, এখন নাই। আমি দুঃখিতচিত্তে বলিলাম—ভিটাখানা? বলিলেন, তাহা আছে। সে ভিটায় আমরা টীনের ঘর করিয়াছি, আসুন, দেখুন। - উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। বড় দুঃখ হইল। যেখানে তর্কালঙ্কার মহাশয় বসিয়া লিখিতেন, তাঁহার পুণ্যস্পর্শপ্রাপ্ত সে মাটী, অনেক মাটীর নীচে পড়িয়াছে। সাবেক ভিটার উপর ইঁহারা মাটি ফেলিয়া সকল গৌরবের স্মৃতি মাটী-চাপা দিয়াছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আসিলাম। একখানা বই—কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত—দেখিতে পাইলাম না। আমাকে দুঃখিত দেখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যুবক পৌত্রটি বলিলেন, মুদ্রিত বইগুলি নয়আনী জমিদার বাড়ীর (৺হরচন্দ্রবাবুর বাড়ী) লাইব্রেরীতে আছে। বিদায়লইলাম।

পরদিন নয়আনীর জমিদারবাড়ী দেখিতে গেলাম। সুপ্রসর পরিখা-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী, একটিমাত্র পথ ছাড়া উহাতে প্রবেশের উপায় নাই। বাড়ী নয়, একটি দুর্গ বটে। এ দুর্গ দেখিলেই ইহার অধিকারীদিগের প্রভাব ও সম্পদ্ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। প্রথমে দেখা হইল যুবক জমিদার বাবু কিরণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহিত। ইনি ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। দেখিয়াই মনে হইল বংশের গৌরব রক্ষা করিবার যোগ্য বটে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ, বিনয়ে ননীর মত কোমল। বি, এ পাশ করিয়া কিছুদিন নিজেদের হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এখন সেরপুর বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। শুনিলাম এ বাড়ীর ব্যবস্থা—ছেলে কলেজ ছাড়িয়া আসিলে কিছুদিন নিজেদের স্কুলে মাষ্টারি করিতেই হইবে, তাহার পরে অন্য কাজ। বুঝিলাম, ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের যোগ্য ব্যবস্থাই বটে। কেমন করিয়া মানুষ গড়িতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ৺হরচন্দ্রবাবু নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র চারুবাবুর নামে 'চারুবার্ত্তা' বাহির করিয়াছিলেন। আজ সে চারুবার্ত্তা ময়মনসিংহের ভারতমিহিরের সহিত মিশিয়া চারুমিহির হইয়া বাহির হইতেছে নিজে হরচন্দ্রবাবু কত বড় বিদ্বান্ ছিলেন, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু কত বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও আছে। সে প্রমাণ—চারুবার্ত্তা (চারুমিহির), সে প্রমাণ—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "চন্দ্রবংশম্" "সতী পরিণয়ম্" প্রভৃতি কাব্য, নাটক ও ব্যাকরণ। এ সমুদয় গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন হরচন্দ্রবাবু। নিজের অর্থে তিনি এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এ বিক্রমাদিত্য না পাইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় নগণ্য টোলের পণ্ডিত হইয়াই থাকিতেন, 'নব কালিদাস' হইতে পারিতেন না। সেরপুরও সারস্বত পীঠ বলিয়া কেহ জানিত না।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বইগুলি দেখিতে চাহিলে কিরণ বাবু তাঁহার লাইব্রেরীয়ানকে দেখাইতে বলিয়া দিলেন। লাইব্রেরীতে গেলাম। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও লাইব্রেরীয়ান একখানা বইও দেখাইতে পারিলেন না। তালিকায় বইয়ের নাম আছে, কিন্তু আলমারীতে বই নাই। বুঝা গেল রক্ষকের দোষ, বইগুলি হয় নষ্ট, নয় অপহৃত হইয়াছে। লাইব্রেরীটির দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। ৺হরচন্দ্র বাবুর কত বড় যত্নের ধন, আজ তাহার এই দশা। বঙ্গদেশের লাইব্রেরীগুলির সর্ব্বত্রই পরিণাম এইরূপ। বাঙ্গালীর প্রশংসার কথা নহে।

সেখান হইতে রায় শ্রীযুত হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনিই এখন সেরপুর বেঞ্চের চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট। সুবিচারক বলিয়া সরকার ও সাধারণের নিকট ইঁহার বড় সুনাম। অত বড় জমিদার, অত বড় নাম, কিন্তু কি বিনয় কি ভদ্রতা! 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" বলিয়া যে কথা, তাহা অনেক স্থলেই দেখা যায় কিন্তু বিদ্যা-সৌভাগ্য-সমৃদ্ধিতেও যে বিনয় দেয়, তাহা এই প্রথম দেখিলাম। বহুক্ষণ আলাপ হইল, বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিন রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি সেরপুরের বর্ত্তমান জমিদারদিগের মধ্যে এখন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ। ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া আসিতেছেন কিন্তু একদিনও নিজের বৈঠকখানা ছাড়িয়া কাছারীতে যান নাই। নিজের গৃহে বসিয়াই কোর্ট করিবেন, এ ব্যবস্থা কেবল ইঁহারই জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই একটা কথাতেই বুঝা যাইবে, গবর্ণমেণ্টে ইঁহার মর্য্যাদা কত। রায় বাহাদুর পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সমাজে খ্যাতনামা সাধক বলিয়া পরিচিত। এখন অধিকাংশ সময়ই ভজন সাধন লইয়া ব্যস্ত থাকেন, কোর্ট করিবার অবসর ঘটে না।

রায় বাহাদুরের দুইটী ছেলে। দুইটিই যুবক। ছোট ছেলেটি আমাকে পুকুরের পাড়ের বৈঠকখানায় বসাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। বেশ সদালাপী, প্রফুল্ল বদন ও বিনয়ী। কিছুকাল আলাপের পরে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, রায়বাহাদুর বাহিরে আসিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা দেখা করিতে চলিলাম।

খাস বৈঠকখানার বারান্দায় বর্ষীয়ান্ রায় বাহাদুর বসিয়াছিলেন, দেখা হইবামাত্র উঠিয়া প্রফুল্লমুখে আদর

করিয়া আমাদিগকে বসাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল বয়স ৭০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বয়সেও কি উৎসাহ, কি বিদ্যানুরাগ। আলাপ আরম্ভেই বলিলেন —আপনার "হিন্দুবিবাহ" পড়িতেছি, সবটা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভূমিকা পড়িতেই অনেক সময় গিয়াছে। এ ত আর তাড়াতাড়ি পড়িবার বই নয়। ভাবিয়া পড়িতে হয়, পড়িয়া আবার ভাবিতে হয়। পড়িয়া খুব আনন্দ পাইতেছি। সবটা পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব।" দেখিলাম, বইখানা তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রহিয়াছে, মধ্যে একখানা কাগজ দেওয়া। বুঝিলাম, কাগজটুকু পড়িবার ঠিকানা। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলাপ হইবার পরে কথা উঠিল চৈতন্যদেবের তিরোভাব সম্বন্ধে। অল্পদিন হইল দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—গুণ্ডিচা মন্দিরে চৈতন্যদেব, দেহরক্ষা করেন, সেই মন্দির মধ্যেই তাঁহার সমাধি আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—দীনেশবাবুর এ সিদ্ধান্ত তাঁহার স্ব-কল্পিত; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ইহা স্বীকার করিবে না। ৺গোপীনাথের মন্দিরে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইয়াছিল, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ কথা। এ কথার সমর্থনে তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থের অনেক প্রমাণ বলিলেন। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বলিলাম, তিনি লিখিতে স্বীকার করিলেন! বহুক্ষণ আলাপের পরে বিদায় লইলাম।

সেরপুরের জমিদারেরা সকলেই বৈদ্যবংশীয়। ইঁহাদের জমিদারী লাভের কাহিনীর সহিত সেরপুরের কায়স্থ নাগ মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠা জড়িত। ফিরিবার আগেরদিন নাগ -পাড়ায় গেলাম। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে সেরপুরের নাগ বংশ, বিশিষ্ট প্রাচীন কায়স্থ। এই বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র নাগ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সদালাপী, শিষ্টাচারী, সুশিক্ষিত বিজয়বাবুর সহিত কায়স্থজাতি সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসে দেখিয়া বিদায় লইলাম। বিজয়বাবু বলিলেন তিনি নাগবংশের ইতিহাস লিখিয়া ছাপাইতে দিয়াছেন। বইখানা বাহির হইলে সের-পুরের অনেক কথা লোকে জানিতে পারিবে।

অভিশপ্ত

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

[শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন]

বেলা দ্বিপ্রহর,—বাদসার অন্দরের সকলেই বিবাহ-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। নিম্নতম কর্ম্মচারীবর্গ ছুটাছুটি করিয়া,—তাহাদের অসীম কার্য্যতৎপরতা সপ্রমাণ করিতে-ছিল। যাহারা কাজের লোক, নীরবে তাহারাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া যাইতেছেন,—আর যাহারা অলস,—কোন কাজ করিতে চাহিতেছিল না,—তাহারা বাক্য বিন্যাসে, চারিদিক মুখরিত করিতেছিল। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম, এ নিয়মেই দুনিয়া চলিতেছে!

বাদসা সাহেব বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন শেষ করিয়া,—বিশ্রাম কক্ষের, সাটিন মোড়া আরাম কেদারায় হেলানে দিয়া বসিয়া, রূপার গুড়্গুড়ি হইতে, সোণার মুখনলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন। ঘরের মেঝের উপর—বহু মূল্যের সতরঞ্চ পাতা,—চারিধারে কাঠের আসবাবে সুসজ্জিত। দেয়ালে, কাচের ফ্রেমে আঁটা, সোণার অক্ষরে লেখা, চারিদিকে কোরাণের "বয়েৎ" টাঙ্গানো রহিয়াছিল। বাদসা সাহেব নীরবে বসিয়া,—আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন;—দৌলত, হোসেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ কত্তে একান্ত অনিচ্ছুক,—এদিকে মতিয়াও, পুত্রবধূ হ'তে নারাজ! একরকম জোর করে,—এ বিবাহে তা'কে সম্মতি জ্ঞাপক উক্তি, পুনরায় আদায় করান হয়েছে;—এ অবস্থায়—এ—দুই বিবাহের শেষ পরিণাম যে কি হবে? খোদাই বল্‌তে পারেন। দৌলতকে শৈশব হ'তে,-আপন কন্যার মত লালন পালন করে, এত বড় করেছি। পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করে, ঘর সংসার পেতে দিবার সংকল্প নিয়ে-সে ভাবেই তাকে অনুপ্রাণিত করেছি। হঠাৎ পুত্রের ভাবান্তর দেখে, কেমন একটা জেদের বশবর্ত্তী হয়ে, আমিও একটা অভাবনীয় অরাজকতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হয়েছি! একমাত্র পুত্র,—তা'র সুখের জন্য না—করেই বা কি করি? হোসেন খুবই আদর্শ ছেলে,—এর উপর অযথা অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। দৌলতকে তা'র হস্তে অর্পন করে

অবিচারের মাত্রাটা, অনেকটা হালকা কত্তে চাইছি। রাত্রি সাতটায় বিবাহ কার্য্য শেষ করে,—তবে কাজি সাহেবকে, আনবার জন্য লোক পাঠাব। এ বিষয় তাঁ'কে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলব,—তিনি যদি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন, তা তে আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই;—বাদসার কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়াটা যে গুরুতর অপরাধ, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁ'র অন্তরের উত্তেজনার উপশম করে দোব। কাজী সাহেব এ ক'দিনের মধ্যে, দুবার এসে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন, আমি তাঁ'র আবেদন অগ্রাহ্য করেছি। এতটা করা ত ঠিক হয় নি! তাঁ'র কোন প্রতিবাদই এখন আমি গ্রাহ্য কর্‌বই না,—সে অবস্থায় তাঁ'র নিকট এতটা লুকচুরি করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। কন্যা বেগম হবে, এত তাঁ'র আনন্দের বিষয়! কন্যার অমতে বিয়ে হচ্ছে বলেইত তিনি—এ কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সেজেছেন। বিয়ের পরে আমার মনে হয়, সবই ঠিক হয়ে যা'বে।

বাদসা সাহেবের চিন্তাস্রোতে বাধা প্রদান করিয়া, একজন প্রহরী আসিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক জানাইল,—"কাজী সাহেব, বাহিরে অপেক্ষা কচ্ছেন, আদাব জানিয়েছেন, তিনি হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।"

বাদসা সাহেবের মুখ মণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পর মুহুর্ত্তে আত্ম সংবরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

কাজী সাহেব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, লম্বা সেলাম করিয়া কহিলেন—"সলাম ওয়ালেকুম।"

"ওয়ালেকুম সলাম" বলিয়া বাদসা সাহেব উঠিয়া দাড়াইলেন এবং কাজি সাহেবকে আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া, নিজে আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর নানা প্রসঙ্গে উভয়েই প্রায় পনর মিনিট কাল অতিবাহিত করিলেন

কাজী সাহেব কথা প্রসঙ্গে একটা শুভ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ! আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলবার জন্য আজ আপনার নিকট এসেছি। যে বিষয়টি আমি এতদিন গোপনে রেখে,—কয়েকটি নিরীহ প্রাণীর অশান্তির ইন্ধন যোগাতে সহায়তা করেছি, তা-ই আজ আপনার নিকট প্রকাশ করে, আমার জীবন নাটকের যবনিকা ফেলে দোব।"

বাদসা সাহেব উদ্বেগ উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাজী সাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "তা" আপনি নিঃশঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।"

কাজী সাহেব জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! আমার বক্তব্য, সাহাজাদার শ্রোতিগোচর করান খুবই বাঞ্ছনীয়। আর মতিয়া সেও পার্শ্বের কক্ষে বসে, আমার সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ কর্‌বে এ হচ্ছে আমার শেষ প্রার্থনা।"

বাদসা সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া আমার প্রাসাদে অবস্থান কচ্ছে, এ সংবাদ আপনাকে কে দিল? কে আপনাকে এরূপ সংবাদ দিয়েছে তা'র নাম আপনাকে প্রকাশ কত্তেই হবে।"

কাজী সাহেব নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন কেমন করে জেনেছি, এবং কে আমাকে খবর দিয়েছে, সবই আমি আপনাকে জানায়ে দোব, কিছুই গোপন করব না। তবে মতিয়াও হোসেন যে আপনার আশ্রয়ে আছে তা আমি অবগত হয়েছি। আমার বক্তব্য শ্রবণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কত বড় গূঢ় রহস্য গোপন করে, মতিয়াকে প্রতিপালন করেছি, কত বড় প্রাণের টানে এবং তাকে চিরদিনের মত দাবী হারা করবার আশঙ্কায়, তা'কে এত বড় অশান্তিতে ফেলে দিয়ে, নীরবে বসে আছি! যখন সে নিগূঢ় তথ্য গোপনে রেখে, তাদের অশান্তি স্খলনের কোনই প্রতিকার কত্তে পারিনি, এ অবস্থায় মনে করেছি, সমস্ত প্রকাশ করে দিয়ে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অশান্তির অবসান করে ফেল্‌ব।"

বাদসা সাহেব কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টের মতই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, শেষে কাজী সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর, পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাদসা সাহেব, সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া বাদসা সাহেব কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার কন্যা মতিয়া পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান কচ্ছে, আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন, সেই ওখানে বসেই, সমস্ত কথা শুনতে পারবে।"

কাজী সাহেব একটুকুন ইতঃস্তত করিয়া, দৃঢ় স্বরে "বলিলেন খোদাবন্দ! আপনার বেগম, দলিয়ার স্মৃতি হয়ত এখনও বিস্মৃত হন নাই। আপনি তাকে সামান্য অপরাধে সাত মাস গর্ভাবস্থায় জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে ছিলেন, তা হয় ত ভুলে যেতে পারেন নি। দলিয়া ছিল আমার নিকট আত্মীয়া, ভাগিনী তা'র মত সৎ, সাধ্বী কর্ম্মঠা স্ত্রী লাভ করা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে উঠে না। আপনি তা'র সাত মাস গর্ভ উপেক্ষা করে, মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা বোধ না করে থাক্‌লেও, মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার ধ্যান করেছে। তার পতি অনুরাগ পূর্ণ উক্তি গুলি শুন্‌লে, নিতান্ত পাষাণও হয়ত গলে যেত। সে যাক পরের কথা পরে বলব। তা'কে যখন জীবন্ত সমাধির জন্য কবরের নিকট দাঁড় করান হয়, আমি তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম। সে—সেই শেষ মূহুর্ত্তেও আপনার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করে আমাকে বল্‌ল্—মামু! বাদসার আদেশ আমি হাসি মুখে প্রতিপালন কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। তবে আমার গর্ভে বাদসার স্মৃতিচিহ্ন যে বিদ্যমান রয়েছে! কি দোষে গর্ভস্থ শিশু আমার ন্যায় শাস্তি ভোগ কর্‌বে? তাঁ'র স্মৃতি চিহ্নটুকুন যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিন। প্রসবের পর আমি স্বহস্তে আমার জীবন লীলা শেষ করে ফেল্‌ব,—এ বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা কত্তে প্রস্তুত আছি। বাদসা সাহেব তা'র সেই কাতর বিলাপ শ্রবণ করে, আমি স্থির থাক্‌তে পারি নি, আপনিও হয়ত পার্‌তেন না। আমি তা'কে আমার বাড়ীতে নিয়ে প্রতিপালন করেছি। এদিকে প্রকাশ করে দিয়ে ছিলুম, দলিয়ার জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে! তা'রপর বাদসা সাহেব! দশ মাস অন্তে, দলিয়া মতিয়াকে প্রসব কর্‌ল। যে দিন মতিয়ার জন্ম হয়, তা'র পরদিন আমারও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ জন্মের দু'দিন পরেই, আমার সে কন্যার মৃত্যু হয়। আর আমার কোন সন্তানাদি হয় নি। আমি এখন নিঃসন্তান! আমার স্ত্রী, সেই কন্যা হারিয়ে একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে গেল। দলিয়া আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে গেল। সে বল্‌তে লাগল, দুনিয়ার সবই রহস্য পূর্ণ। কেউ সন্তানকে জীবন্ত কবরে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আবার কেউ একটি সন্তানের জন্য জীবন্মৃত হয়ে থাকে। এ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পর, একদিন অতি প্রত্যুষে—গাত্রোত্থান করে দলিয়া শয়ন কক্ষে গিয়ে দেখলুম দলিয়ার দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বাহির হয়ে গিয়েছে! তা'র হাতের লেখা একখানা চিঠি এ শয্যায় পড়ে ছিল, তা' পাঠ করে জান্‌লুম, সে বিষ খেয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান করেছে। সে হ'তে বাদসা সাহেব! মতিয়া আপনার কন্যা হলেও, কন্যা স্নেহে তাকে আমি প্রতিপালন করে এত বড় করে তুলেছি। সাহজাদার সাথে তা'র বিয়ে অসম্ভব, তাই আমি এতদিন সে কথাই বলে আস্‌ছিলুম, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, এ বিবাহে বাঁধা দিতে চেষ্টা করেছি। স্নেহের আতিশয্যে আমি যা করেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। মতিয়া আজ আর আমার কন্যা নয়, বাদসার কন্যা, রাজ্যের আংশিক অধিকারিনী! বলিয়া কাজী সাহেব বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন!

কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বাদসা সাহের অন্তর, ভীষণ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল। এক অপ্রত্যাশিত বিবেক—আলোড়নের প্রেরণায়,—তাঁহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া, আবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়া দিল। এক গুরুভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত হৃদয় মন লইয়া,—তিনি অসীম অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! এ সমস্ত ব্যাপার সবই যে আমার নিকট হেয়ালি বলে মনে হচ্ছে!"

কাজী সাহেব কথায় বাধা প্রদান করিয়া, শান্ত ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! হেয়ালীর কিছুই নেই এর ভিতর! সবই সত্য,—খাটী সত্য! এই দেখুন— দলিয়ার স্বহস্তের লিখিত শেষ চিঠি,—এ লেখা আপনার হয়ত খুবই পরিচিত! এ চিঠি পাঠ করলেই, আপনার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে।" বলিয়া কাজি সাহেব, স্বীয় জামার পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, বাদসা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

বাদসা সাহেব আগ্রহাতিশয্যে চিঠি খানা গ্রহণ করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"মামু!—আপনার সাহায্য না পেলে, আজ আমি বাদসার "স্মৃতি চিহ্নটুকুন," জীবিতাবস্থায়,—পৃথিবীতে রেখে যেতে পারতুম না। কবরে, আমার বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এ ও নষ্ট হয়ে যেত! তজ্জন্য আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ রইলুম। কন্যার নাম মতিয়া রেখে গেলুম,—আপনিও মতিয়া নামে, এ-কে পরিচিত কর্‌বেন। আপনি নিঃসন্তান, আপনাদের শোকে সন্তপ্ত হৃদয়ের বিয়োগ ব্যথা মুছে ফেল্‌বার অভিপ্রায়ে, আজ আমি মতিয়াকে, আপনাদের হস্তে অর্পণ করে গেলুম। কন্যা স্নেহে, আপনারা মতিয়াকে প্রতিপালন করবেন। মতিয়ার জন্ম বৃত্তান্ত কাউকে জান্‌তে দিবেন না,—এই আমার শেষ প্রার্থনা। যদি ঘটনা চক্রে, এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ান, যে সময় মতিয়ার খাটি পরিচয় প্রদান না করে, তা'কে রক্ষা কর্‌বার, আর কোনই উপায় থাকবে না, সেই সময়ই কেবল, তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করবেন, নইলে নয়। জীবনে অনেক আশাই করেছিলুম,—অনেক আশাই বুকে নিয়ে, সুখের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, কপাল দোষে, সবই অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি নিজ হাতে বিষ খেয়েছি, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়! এমনি ভাবে যে আমাকে জীবন বিসর্জ্জন কত্তে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি! যে স্ত্রীলোক স্বামীর আদরে বঞ্চিতা,—তার মৃত্যু, সহস্রবার বাঞ্ছনীয়! মৃত্যু সময় স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ কত্তে পার্‌লুম না, এ-খেদ মনে থেকে গেল! ক্ষমা কর্‌বেন,—বিদায়।"

আপনার স্নেহের ভাগিনী,
দলিয়া।

পত্র পাঠ করিয়া বাদসা সাহেব একেবারে মুসরিয়া পড়িলেন। মনোভাবের সুস্পষ্টই অভিব্যক্তিতে তিনি একান্ত বিস্ময়াহত ও স্তম্ভিত প্রায় হইয়া পড়িলেন। একটা প্রবল হাহাকারে, তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত হইতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিলেন। দলিয়ার স্মৃতি,—ধ্যান ও ধারণার প্রবল উন্মেষণের ভিতর দিয়া, তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া, তাঁহার বাসনার ও কামনার মোহ-গন্ধ, পীযূষধারাবৎ, শরীরের শোণিত শিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাদসা সাহেব উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া পার্শ্বের কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। শেষে পবন সোহাগে, মতিয়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, স্বীয় আসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি মতিয়ার মুখের উপর স্নেহদৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া বলিলেন "মতিয়া! মা আমার, আমাকে ক্ষমা কর, আমি না জেনে, তোমাকে কত কষ্টই না দিয়েছি। বাদসার কন্যা হয়ে, তুমি যে ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিলে, তা মনে কর্‌লে, আপনাকে বাদসা বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ কচ্চি। মা! আমাকে ক্ষমা করো! পিতার শত অপরাধ, ক্ষমা কত্তেই হ'বে তোমাকে।"

মতিয়া কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, পিতার বক্ষে মস্তক লুকাইয়া, ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কন্যাও পিতার নীরব ক্রন্দনের ভিতর, কত গূঢ় রহস্য ও স্নেহের কত বড় উচ্ছ্বাস যে নিহিত ছিল, তাহার পরিমাপ করা নিতান্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত। এ ভাবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া বাদসা সাহেব আপনাকে অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইলেন। আবার পিতা ও কন্যার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সাহাজাদা এতক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অন্তরের ভাব একেবারে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে বহুদিন পূর্ব্বে মতিয়াকে, কাজি সাহেবের বাধান ঘাটে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিয়াছিল। আজ মতিয়াকে, সে এক নূতন ভাবে অবলোকন করিয়া—ভ্রাতার স্নেহ-পীযূষধারায় তাহাকে অভিসিঞ্চন করিয়া ফেলিল। এ-কি অভিনব পরিবর্ত্তন, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের অসীম চাঞ্চল্য মন হইতে এক মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দিয়া, এক অসীম স্বর্গীয় ভাবের স্ফুরণের ভিতর দিয়া, সাহাজাদা মতিয়াকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না! ইহাই মানুষের স্বাভাবিক স্ফুরণ, ইহাকেই বলে, একই রক্তের, অসীম আকর্ষণ!

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকালে, নানা কথা প্রসঙ্গে, অতিবাহিত করিয়া বাদসা সাহেব বলিলেন "কাজী সাহেব! যে ব্যক্তি আপনাকে মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছিল, তা'র নাম আমাকে জানতে হবে। সে আমার যে উপকার করেছে তার প্রতিদান হয় না। যদি গোপনে বিবাহ কার্য্য শেষ হয়ে যেত তা হলে কত বড় গুরুতর অভাবনীয় কার্য্যের যে অনুষ্ঠান হত, তা ভাব্‌তেও শরীর রোমাঞ্চিত

হয়ে উঠে! তা কে আমি বিশেষভাবে পুরস্কৃত করব, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!'

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "খদাবন্দ! যে এ সংবাদ প্রেরণ করেছে, সে আপনার প্রাসাদে আজ বন্দী। তা'র নাম আমিনা।"

আমিনার নাম শ্রবণ করিয়া বাদসা সাহেব সবিস্ময় শ্রদ্ধাতিশয্যে একেবারে গম্ভীর হইয়া গেলেন। দারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে বজ্রসূচী বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি ক্ষোভ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! আমিনা আপনার কি হয়।"

কাজী সাহেব বিনীত কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা আমার পালিতা কন্যা। বাল বিধবা, আমি তা'র একমাত্র অবলম্বন। মতিয়া ও হোসেন অপহৃত হবার পরদিনই,—সে গোপনে আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে, আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছে। মতিয়া ও হোসেনকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই হয় ত সে আপনার প্রাসাদে বাস কচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টায়ও এতদিন তা'র সন্ধান কত্তে পারিনি। কাল তা'র একখানা চিঠি পেয়ে আমি সমস্ত অবস্থা অবগত হয়েছি।

বাদসা সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, আসন পরিত্যাগ করিলেন, এবং মতিয়াকে কাজী সাহেবের সহিত অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া অসীম খেদের সহিত বলিলেন "হায়! এ প্রসঙ্গে আমি কত অশুভ অনুষ্ঠানেরই না সহায়তা করেছি! আমি এ মুহূর্ত্তেই আমিনাকে,—স্বহস্তে মুক্ত করে দিচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব, আমিনার কারা কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

হাসি-কান্না

(শ্রীদেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ)

কাল গেল মোর বিয়ে!
শোভন রাতির বাড়ীর আলোর ঝল্‌সে ছিল হিয়ে!
আর্সিখানি ধর্‌ছি হাতে,
হলুদ বরণ গামছা সাথে,
গুরু সবাই আমায় মাথায় সোণার টোপর দিয়ে।
ঢোল কাঁসী আর বাজল সানাই,
হাসি কৌতুক করল সবাই,
কনের বাড়ী গেলাম আমি পাকীর উপর চ'ড়ে,
সোহাগ ভরে নারীদলের হুলুধ্বনি পড়ে।
মাঙ্গলিক সেই পূর্ণ কলস
দিল প্রাণে কতই হরষ্!
র'ম কদলীর তোরণ দ্বারে দুল্‌লো ফুলের মালা;
তার তলেতে সাজিয়ে ছিল বালার বরণ ডালা।

আজ্‌কে ভীষণ বেশ!
মাথারভূষণ তুল্‌সী গাছ আর ছেড়া কাঁথা শেষ!
সংসারে ভাই এই ভেল্‌কী,
আজ্‌কে বাঁধে বাঁশের পাল্‌কী,
শত্রুভাবে শোয়ায় তা'তে হরিধ্বনি দিয়ে,
ঐ মিশে যায় চিতার ধোয়ায় আমার সাধের বিয়ে!

তা'য়ে ভা'য়ে বিষম দ্বন্দ্ব
দৈবে মোদের হলো বন্ধ,
অঙ্গার হয়ে বরাঙ্গ মোর ভাস্‌ল নদীর জলে!
শ্মশ.ন ঘাটে সে ঘট রাজে নেক্‌ড়া পাটের তলে!

বারবেলার ভুত

(শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।)

শনিবারের বারবেলায় নিজ ব্যবসায় গৃহে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলাম, এমনি সময়ে এক মুখ চেনা প্রতিবেশী আসিয়া বলিলেন—"কব্‌রেজ মশাই একটু উঠুন।"

"কেন, বলুন ত?"

সে ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"আমার ভগ্নিটী যেন কেমন কচ্ছে, একটু না দেখলেই নয়।"

সে দিনটায় আমার ব্যবসায়টী বড়ই মন্দা ছিল। তাই, এই বারবেলার ডাকটাও যেন একটু আশস্ত করিল। কিন্তু যাত্রা করিয়া পা বাড়াইতেই চর্ম্মপাদুকার একখানা যখন

চৌকাঠে ঠেকিয়া ঠক্ করিয়া উঠিল, তখনই ভাবিলাম দর্শনীর ক্ষুদ্র-চতুষ্টয় কোন প্রকারে হাতে আসিলেও, হয়ত রোগী লইয়া একটু খঠমটি লাগিবে।

পথে যাইয়া শুনিলাম রোগিনী ভূতগ্রস্থা। একজন গ্রাম্য ওঝা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। এক যোগে দু'জন অথচ বিভিন্ন প্রণালীর চিকিৎসক ডাকিবার দরুণ একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলিলাম—সাত সন্ন্যাসী এক সঙ্গে ডাকলে যে কেবলই গাজার শ্রাদ্ধ হয় তা জানেন?

শুনিয়া প্রতিবেশী বলিলেন, সে জন্য আপনার ভাবনার কিছুই নেই। যা কিছু করবার, সে ওঝাই করবে। আপনি দর্শক থাক্‌বেন।" —কি লাভ?

প্রতিবেশী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"লোকসানই বা কি? আপনার প্রাপ্য টাকাত আপনি পাবেনই। তবে একটু বসে থাকা মাত্র।"

যাক! বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিয়া রোগীর বাড়ীর এক প্রান্তে যাইতেই, আবার একখানা পাদুকা একটা গাছের শিখড়ে লাগিয়া, ঠক্ করিয়া উঠিতেই একটু দাঁড়াইলাম এবং মনে হইল, যাত্রাটা একেবারে অযাত্রায় যাইয়াই যেন বা মোর ফিরে।

অর্দ্ধ মিনিট কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া যখন পা বাড়াইলাম, তখনই শুনিতে পাইলাম, যেন একটি স্ত্রী লোক উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে—"এক ব্যাটা এসে ওস্তাদি সুরু করেছেন, আর এক ব্যাটা আস্‌চেন তামসা দেখিতে!

আরও একটু অগ্রসর হইয়া শুনিলাম, সেই কণ্ঠটাই আরও একটু উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া বলিতেছে,—"যা শূয়রের বাচ্চা এ বাড়ী থেকে। নয়ত তোরই এক দিন আর আমারই এক দিন?"

শুনিয়া বড়ই কৌতুহলি হইয়া সকল বাধা বিঘ্ন বারবেলা প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, একটু দ্রুত পদবিক্ষেপে বাড়ীর উঠানে যাইয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, আঙ্গিনা খানা দর্শকে ভরিয়া গিয়াছে এবং ওঝা মহাশয় মন্ত্রপুত কুণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া নানা প্রকার আস্ফালন সুরু করিয়াছেন। আর রোগিনী ঘরের দরজার কাছে বসিয়া, অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "যা এক্ষুনি এখান থেকে। নয়ত তোরই একদিন আর আমারই এক দিন।"

আমি চিকিৎসক হইলেও আজ দর্শকের মতই এক পাশে যাইয়া বসিলাম। কিয়ৎকাল পরে রোগিনী (আবিষ্টা) ধীর মন্থর গতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, আমার কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে ওঝা মহাশয়ের কুণ্ডলীর বাহিরে যাইয়া স্থির হইল।

ওঝা মহাশয় তখন একটু মুচ্‌কী হাসিয়া গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিল ডামরী মন্ত্রের আকর্ষণ বা বা! স্বয়ং ব্রহ্মারও এর কাছে হার মেনে চলতে হয়।

কথাটী বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্টা যা' তা' গালাগালির সহিত নিতান্ত বিশ্রী মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিল—"যা, এখনই এখান থেকে উঠে যা। না যাস্‌ত এক লাথি মেরে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।"

ওঝা মহাশয় তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া একটু হাসিয়া, একটা বেত হাতে করিয়া, উহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি মন্ত্র পড়িয়া উপর্য্যুপরি তিনটী দীর্ঘ ফুৎকার দিয়া, যেই মাত্র মাটীতে একটী বাড়ি মারিয়া বলিয়াছেন—"আকাশের সাত তারা, পৃথিবীর মাটী"—আর অমনিই আবিষ্টা বুকের উপরে এমন একটী লাথি মারিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন।

দেখিয়া, কেহ কেহ আহা! আহা! করিতে করিতে ভয়ে পালাইয়া গেল, আর দুই চারিজন বলিষ্ঠ লোক যাইয়া আবিষ্টাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই, সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া রোগিনী ওঝার সর্ব্বাঙ্গে আরও দু'চার ঘা বসাইয়া দিল।

ওঝা মহাশয় তৎক্ষণাৎ শনির বারবেলায় প্রশংসা করিতে করিতে অঙ্গ ঝাড়িয়া সরিয়া পড়িলেন। জানি না, ইহার পরে আর কখনো ডামরী আকর্ষণটা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কি না। আমিও বারবেলার ফলটা দেহের উপর দিয়া না হইলেও, কতটা মনের গায়ে গাঁথিয়া লইয়া শূন্য হাতে ঘরে ফিরিলাম।

পর দিবস সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, নিস্ফলা রবিকরের প্রথম আহ্বান লইয়া, সেই প্রতিবেশীটি আসিয়াই বলিলেন, "কালত যা হবার হল। এখন আমাদের সকলেরই ইচ্ছা আপনিই এই রোগীটী চিকিৎসা করুন।

শুনিয়া মনে হইল, এই নিষ্ফলা দিনটায় যাইয়া বারবেলার লাথি গুতা না-ও খাইতে পারি, কিন্তু প্রাপ্তির দিকটায় ঐ বিশেষণটা দেখা দেওয়া অসম্ভব কি ?

আমার ভৌতিক চিকিৎসায়, দেশীয় সাধারণ ওঝাদের মত বেতের ঘা মারিতে হয় না বা ফুল বেলপাতা ধান দুর্ব্বা কিম্বা সাত সমুদ্র তের নদীর জলের প্রয়োজন হয় না। রোগীকে যে কোনও স্থানে বসাইয়া চুম্বক স্পর্শ দিলেই রোগী মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। পরে ঐ হতজ্ঞান দেহে প্রেতাত্মা আহ্বান করিতে হয়। কখনো কখনো অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাগত আত্মা আপনিই আসিয়া পড়ে। মৌখিক কোনই আড়ম্বর বা কোনও দুর্ঘট বস্তুর দোহাই দিয়া রোগীর পরিজনের ক্লেশ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

দিবা আট ঘটিকার সময়ে রোগীর বাড়ী যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। রোগিনী তখন অন্য ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল। একজন যাইয়া ডাকিয়া আমার ঘরের দরজায় আনিবা মাত্রই আমাকে দেখিয়া কেমন একটা বিকট মুখভঙ্গী করিয়াই, একটু পিছাইয়া বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কয়েকজন উঠিয়া গিয়া বলপূর্ব্বক উহাকে ধরিয়া আমার কাছে আনিয়া বসাইতেই, আমার পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে হৃত চৈতন্য করিয়া, প্রেতাত্মা আহ্বান করা মাত্রই রোগিনী (এ স্থলে মাধ্যমিক,) আমার দুই পায়ে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, মধুসূদন নাম স্মরণ না করিয়া পারিলাম না।

যাহা হউক দুই চারিজন বলিষ্ঠ লোক উহাকে ছাড়াইয়া দিতেই, চক্ষু দু'টী রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "তুই যা এ বাড়ী থেকে।"

"কেন ?"

"তোর এখানে এসে লাভ কি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "খুব লাভ আছে।

মাধ্যমিকও এবার হাসিয়া বলিল—লাভ না ? যা লাভ তা আমি জানি। একটী পয়সা দিবে তোকে? তুই ব্যবসায়ী, দিক্ দেখি তোকে একশ' টাকা? আমি এক্ষুনি ছেড়ে যাব।

"আমি যদি টাকা না নেই ?

এবার রোগিনী হাসিয়া বলিল "তোকে না নিতে হবে না। দেখিস, ওরাই তোকে শুধু হাতে বিদেয় করে দেবে।

রোগিনীর ভগ্নিপতি নিতান্ত কাছে বসিয়াছিলেন। উহার মুখের কথা শুনিয়া বলিলেন 'তু জানিস টাকা দেব না ?"

এই কথাটী বলিবা মাত্রই, মাধ্যমিক খপ করিয়া তাহার লম্বা দাড়িতে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল "তুই শালাই ওকে টাকা দিতে কথা দিবি। আচ্ছা বলত কালকার ঐ ওঝাটা যে লাথি খেয়ে এত বড় দুঃখটা পেয়ে গেল, ক'পয়সা দিয়েছিস তাকে ?"

একটু নীরব রহিয়া দাঁতে দাঁত ঘসিতে ঘসিতে বলিল "রোগ সারাতে পারেনি সত্য ; কিন্তু খেটেছিল ত ?

সে ব্যক্তি কোন প্রকারে দাড়ি ছাড়াইয়া, "তা খাটুক গে" বলিয়াই এক পাশে যাইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন।

(২)

এই সময়ে আমি মাধ্যমিককে প্রশ্ন করিলাম—তুমি কে ?"

মাধ্যমিক একটা বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমি যে-ই হই, আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করা তোমাদের অন্যায়।

"কেন বলত ?"

"কেন, তার আর কি জবাব দিব ? এখানে আমার ঠিক ঠিক অধিকার আছে বলেই এই লোকটাকে ধরে বসে আছি।"

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "কেমন অধিকার ?"

তেমনই কণ্ঠে মাধ্যমিক বলিল তোমরা দশজনে মিলে, সাত সমুদ্র তের নদীর জল এনে যেমন অধিকার দিয়েছিলে, তেমনই একটা অধিকার আমার আছে। "একটু থামিয়া আরও কাতর কণ্ঠে বলিল কথাটা বুঝলেইবা তোমরা আমার আর কতটুকু কি কত্তে পারবে ?'

"না পারলে শুনতে নেই তার অর্থ কি ?"

মাধ্যমিক বলিল—তোমাদের এসব শুনা শুনিতে আমার এক বিন্দু দুঃখও কমবে না।

আমি বুঝিলাম এই পথ ধরিয়া চলিলে উহার মনের কথা বা পরিচয়, প্রভৃতির কোন কথাই বাহির করা যাইবে না।

তাই কথাটা ঐ খানেই বন্ধ করিয়া বলিলাম "দেশ ছিল কোথায় ?'

"ফরিদপুর জেলায়।"

"তুমি জাতিতে কি ছিলে ?

"কায়েস্থ !"

"নাম ?"

মাধ্যমিক একটু দৃঢ় অথচ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, না বলব না, কিছুতেই বলব না তুমি বড় চতুর। কোন দিক্‌ দিয়ে আবার সেই কথাই বের করে নেবার চেষ্টা কচ্ছ !"

আমি বলিলাম "বল্লে দোষ কি ?"

"দোষ কিছুই নেই, তবে বড়, ব্যথাট লেগে উঠবে। তাই আমার আপত্তি।

"তোমার সব পরিচয় দাও, আমরা তোমার পিণ্ড দিয়ে উদ্ধার করে দেব।"

মাধ্যমিক এবার তাহার চক্ষের তারা দুটী বেশ উজ্জ্বল করিয়া আগ্রহের সহিত বলিল "পারবে আমার সকল গোষ্ঠীর পিণ্ড দিতে ? তা'হলে নাম গোত্র সব বলত, আর তোমাদের রোগীকেও জন্মের মত ছেড়ে যেতে পারি। কিন্তু তাতেও যেন আমার দুঃখ হবে মনে হচ্ছে।"

"কেন ?"

মাধ্যমিক তখন বুকে হাত দিয়া বলিল, এই লোকটার তাতে বড় কষ্ট হবে। যদিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওর খুবই একটা কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রোগী তাতে কোনই কষ্ট বোধ করে না। বরং সময় সময় আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে নিজের দুঃখটাই লাঘব করে নেয়।"

শুনিয়া রোগিনীর ভ্রাতা আগ্রহের সহিত বলিল "তা" হলে রোগী তাহাকে দেখতে পায় ?

হাঁ পারে বৈ কি।"

আমি বলিলাম "এতই যদি তুমি বান্ধব, তবে নামটা বল্লে দোষ কি ?"

"দোষ কিছুই নেই। তবে সকলেরই মনে একটা শক্ত ব্যথা পাবে।" বলিয়াই আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাধ্যমিক বলিল তোমাদের রোগীর স্বামীর বাড়ী ছিল কোথায় ?

রোগিনীর ভ্রাতা বলিল তা' শুনে তোমার কি লাভ।

মাধ্যমিক হাসিয়া বলিল তোমরা দেহী, লাভ লোকসানের হিসাব তোমরা গে খতাও। আমার লাভ একটু জানা মাত্রই।

ইহার পরে অনেকক্ষণ অবধি আর কেহই কোন কথা বলিল না। কিন্তু মাধ্যমিক কেমন একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। খানিকপরে মাধ্যমিককে প্রশ্ন করিলাম—তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে ?

মাধ্যমিক কেমন একটা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমার কোন কষ্টবোধ নেই। কিন্তু"—

"কিন্তু কি ?

ইহার কোনই জবাব না দিয়া আমাকে বলিল--তুমি আজ যাও।

"কেন ?"—"কেন তা পরে নিজেই বুঝতে পাবে।"

মাধ্যমিকের মনের ভাব কিছুই বুঝিলাম না। তাই একটু আগ্রহের সহিত বলিলাম—"একটু খুলেই বল না ?"

"এখানে আর কিছুকাল থাকলে একটা বিপদের অংশ অনিচ্ছায় ঘাড় পেতে নিতে হবে।"

"আমারও কোন বিপদ হবে ?"

"না, তবে একটু লাঞ্ছনা সইতে হবে। অনেক কাজ নষ্ট হবে।

এ ঘরে অনেক লোক জমিয়াছিল। এই ভবিষ্যৎ সংবাদটা শুনিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। এবং এক ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া একটু উপহাসের সুরে বলিল—আরে মশাই ! গেয়ে ভূতের কথা রেখে দিন্‌। ওসব ফাকাবাজি, মিথ্যা কথা !

শুনিয়া মাধ্যমিক চট্‌ করিয়া বসিয়া, সেই বক্তা ভদ্রলোকটিকে এমন একটা অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়া ফেলিল, যাহা শুনিয়া নিমেষ মধ্যে তিনি মাথা গুজিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। আর মাধ্যমিক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক্‌ বাঁচা গেল। হারামজাদা পালিয়েছে।

আমি বলিলাম—তা হ'লে এখন বোধহয় আর আমাকে যেতে হবে না ?

"না"

"কেন বল ত ?

মাধ্যমিক কর্কশ কণ্ঠে বলিল সব কথারই একটা কেন থাকা চাই, না? শুনবে?—ও হারামজাদা বজ্জাৎ আজ তিন মাস যাবৎ এই বিধবাটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা কচ্ছে। রোজ নদীর ঘাটে ঘটী গামছা নিয়ে গিয়ে বসে থাকে—কতক্ষণে তোদের রোগীটা নাইতে যাবে; আর এক সঙ্গে স্নান করবে। রাত দুপুরে এই রাস্তা দিয়ে কত কি রসের গান কত্তে কত্তে চলে যায়। আরো কত কি ঢং করে, তার হিসাব নিকাস নাই।

আমি বলিলাম—তা যেন বুঝলাম। কিন্তু আমাকে যেতে বলেছিলে কেন?

মাধ্যমিক এবারও খুব কর্কশ কণ্ঠে এবং প্রতিহিংসার ভাব লইয়া বলিল--হারামজাদা বিধবাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, আবার আজ এসেছেন মুখের কাছে বসে রূপ সুধাপান কত্তে! আর একটু থাকলেই একবারে রক্তগঙ্গা করে ফেলতুম।

"তাতে কি লাভ হত?"

"শিক্ষা।"

"কিন্তু কেউ কেউ হয়ত মনে কত্ত আমিই এই কাজটা করিয়েছি।

মাধ্যমিক হাসিয়া বলিল—তাইত তোমাকে সরে পরতে বলেছিলাম।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক রোগীতে যাইয়া এইরূপ একটা ঘটনায় বড়ই বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকগুলা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহার মধ্যে আমার কোনই কারসাজি নাই। আর একবার আমার এক ভৌতিক রোগীতে, চিকিৎসার মাঝখানে, এক ওঝা আসিয়া নানাপ্রকার বাগাড়ম্বর সুরু করিতেই রোগিনী একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াই, সেই ওঝার প্রকাণ্ড একছড়া রূপার মালা, তাহার হাত হইতে হঠাৎ কাড়িয়া লইয়া, মুহূর্ত্তে শত টুকরা করিয়া, এমন ভাবে চতুর্দ্দিকে ছুড়িয়া মারিল যে, কিছুতেই সে ব্যক্তি আর সকল গুলি মালা খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু দোষটা আসিয়া আমার ঘাড়েই পড়িল।

রোগিনীর কথা শুনিয়া আমার সেই কথাগুলি মনে পড়িল। এবং এই ঘটনাটা না হওয়ায় একটু স্বস্তিই বোধ করিলাম। পরে প্রশ্ন করিলাম—"যাক। এখন তুমি এই বিধবাটাকে ছেড়ে যাও।"

মাধ্যমিক বেশ শান্ত সুরে বলিল—"আমায় ছেড়ে দাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু—

"কিন্তু কি?"

মাধ্যমিক বলিল—"কিন্তু আর কিছুই নয়; তুমি যে ছেড়ে যেতে বলছ, তার অর্থ জন্মের মত যাওয়া। ওটায় আমি রাজী নই।"

"কেন, বলত?"

এই কেনর জবাব দিতে গেলে এমন একটা গোল বাঁধবে যে, শেষে তুমিও পালাতে পারলে বাঁচবে।

অনেক প্রেতাত্মাই নানা ভঙ্গীর কথা বলিয়া চিকিৎসককে একটু ভয়াতুর করিয়া তুলিতে চাহে। চিকিৎসক ভয় পাইলে ইহাদের অনেক সুবিধা বাড়িয়া যায় এবং এই রকম অবস্থায় অভিজ্ঞতা আমার প্রচুরই ছিল। তাই উহার কথাটা একবারে উড়াইয়া দিয়া বলিলাম তা হ'ক গে। তুমি ছেড়ে যাবে কি না তাই বল।

শুনিয়া, মাধ্যমিক একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলিল "আমার সকল সম্বন্ধের বাঁধন ছিড়ে গেছে। এখন যা কিছু একটু আছে, তা-ও তোমরা মুছে ফেলতে চাও? আচ্ছা যদি না যাই!"

আমিও কর্কশ কণ্ঠেই বলিলাম তুমি কি মনে করেছ যে, তোমাকে তাড়াবার হাতিয়ার না থাকলে আমি এ কাজে হাত দিয়েছি, না, ওরাই আমাকে ডেকেছে?

মাধ্যমিক কিন্তু এ কথায় জবাবে সুর চড়াইল না—শান্ত ভাবেই বলিল "হাঁ তোমার হাতিয়ার আছে তা আমি জানি। কিন্তু তুমিত আর চিরদিন কাছে বসে থাকবে না? এক দিন হয়ত ওদের অযত্নে বা মনের ভুলে হাতিয়ারে ময়লা ধরে যাবে। তখন?

আমিও সুরের পরদা একটু নীচে নামাইয়া বলিলাম—যখন ময়লা ধরে ধরবে। এখন তুমি যাও। তার পড়ে চিরদিনের জন্য দরজা বন্ধ কত্তে না পারি তো এস।

মাধ্যমিক একটু বিরক্ত কণ্ঠে বলিল "একবার ওরা আমাকে পূজা করে এনে, আমার বাপ ভাই জ্ঞাতি গোষ্ঠি শুদ্ধ অপমান করে দিয়েছে, তার পরেও আমি নির্লজ্জ

পশুর মত নিজেই এসেছি। এবার ওরা এনেছে তোমাকে বলিয়াই, সুরের পরদা পঞ্চমে চড়াইয়া বলিল আমি যদি যাই, তুই ব্রাহ্মণ, তোকে ছুয়ে বলছি, তোদের রোগীটাকেত নিবই, ওদের গোষ্ঠির ও ক'জন বেঁচে থাকে পরে দেখবি।

শুনিয়া রোগিনীর পিতামাতা একবারে কপালে চক্ষু তুলিয়া, সমস্বরে আমাকে বলিল—"থাক তবে আর ওকে ছাড়িয়ে কাজ নেই। যখন ফিট্ হবে আমরা দশজনে বরং ধরে রাখব। ওর ব্যামো থাকে থাক্।

আমি বুঝিলাম ইহা সেই বারবেলারই প্রেরণা মাত্র। তাই একটা আপোষ নিষ্পত্তির ছলায় মাধ্যমিককে বলিলাম "তুমি আমাদের সুস্থ লোকটাকে অনাহুত কষ্ট দিচ্ছ, তার উপর আবার ওদের গোষ্ঠীসুদ্ধ নিকাশ কত্তে চাও। তোমার সখতো খুব!

মাধ্যমিক বলিল আমি ওকে ধরে কোনই অন্যায় অপরাধ করিনি। যেখানে আমার ঠিক ঠিক অধিকার আছে, সেইখানেই এসে বসেছি। তোমরা যে তাড়াতে চাচ্ছ, ওটাই হচ্ছে জুলম।

পূর্ব্বেও একটা কথায় একটু কেমন কেমন ঠেকিতে ছিল। এই কথাটা আমার আরও একটু খটকা বাঁধিল। তাই কতুহলী কণ্ঠে বলিলাম এ রোগী তোমার কে?

মাধ্যমিক খুব প্রশান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "এ রোগী আমার ধর্ম্ম পত্নি—আমার নাম অমুক—

এইখানে রোগীর পারিবারিক একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। ইহার বিবাহের সময়ে একটা সামান্য কথা লইয়া এমনই গোলযোগ উপস্থিত হয় যে, ঐ রাত্রিতেই, সকল বরযাত্রী ও বর সহ বরের পিতা বিবাহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। রাগের বশে কন্যার পিতা ব্যাপারটী মিটাইবার কোন চেষ্টাই তখন করে নাই। কিন্তু পর দিবস বরের বাড়ী যাইয়া নিষ্পত্তির-চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া, অকথ্য ভাষায় এমনি গালিগালাজ করিয়া আসে যে পাঁচ বৎসরেও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের আর কোন সুযোগই আসিল না। ষষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে স্বামী দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন মৃত্যুর দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইল, তখন ক্ষীণ-কাতর-কণ্ঠে পিতার নিকট স্ত্রীদর্শনের কামনা জানাইল। এবং পিতাকে বুঝাইয়া বলিল যে, বিবাদের পরিণামে ত্যাগ করিয়াছি সত্য, এ বিবাদ তাহার বৈধব্য ঠেকাইতে পারিবে না।

শুনিয়া পিতা তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে আনিয়া পুত্রের পাশে রাখিয়া, আঙ্গিনায় পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এ কান্নায় যোগ না দিল এ বাড়ীতে এমন কেহ ছিল না। কিন্তু দু'ঘণ্টা পরে যখন একটু শান্ত হইয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, মৃত স্বামী এবং হৃতচৈতন্য স্ত্রী দৃঢ়-আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া শয্যার বাহিরে মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহার পরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। সেই বিষাদের কথা মৃত্যুর দিনের কথা কাহারো বড় স্মরণে আসে নাই এবং এই আবিষ্টার দেহে প্রবিষ্ট আত্মা যে কে তাহারও কোন সংবাদ নিবার সুযোগও পায় নাই। তাই আজ কন্যার (আবিষ্টার) মুখে জামতার নাম শুনিয়া গৃহস্থিত আত্মীয় স্বজন পিতামাতা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর আমি তৎক্ষণাৎ রোগীর চৈতন্য সঞ্চার করতঃ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলাম এবং এইখানেই শনিবারের পালা শেষ করিলাম।

মেয়ের আব্দার

(শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

তিন বছরের মেয়ে আমার, নামটি হেনারাণী;
"আকাশের চাঁদ দাও, মা, পেড়ে!" বলে' তাহার মাকে,
জ্যোৎস্না রাতে আঁচল টেনে আকুল করে' থাকে!
যতই বোঝায় ততই কাঁদে, বেজায় অভিমানী!
কদিন ধরেই চল্‌লো এমন; শেষে বিপদ জানি'
"তোর বাবা চাঁদ ধর্‌তে জানে!" গিন্নী বলেন তাকে;
সেদিন থেকেই বল্‌ছে আবার আমার কাজের ফাঁকে,—
"বাবা, তুমি চাঁদ পেড়ে দাও! দাওনা তাকে আনি'!"

এই ক'টা দিন ভাব্‌ছি শুধুই—কেমন ধারা মেয়ে!
আলোর পিয়াস কে জাগালো ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে?
সে এসেছে এই জগতে আলোর ঝর্ণা বেয়ে!
তাই বুঝি বা অমনি করেই মনের তার্‌টি বাজে!
আজ্‌কে তবু অশ্রু আসে মেয়ের পানে চেয়ে;
এমন মধুর মন্‌খানি তার হারিয়ে যাবে কাজে!

নারী জাগরণ

(বিলাত ও ভারতে আন্দোলন)

নারী সমাজের প্রকৃত উদ্বোধন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

আমাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ মহাশয় ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন। শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার কর্ম্মশক্তি কেবল তাহাতেই নিবদ্ধ নহে, সারা ভারতের নারী প্রগতির সহিত তিনি আজ বিশেষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে প্রকৃত ত্যাগ ও আন্তরিকতা দেখাইয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আজ দেশের শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নহে।

তাঁহার পত্নী "সরোজনলিনী" বাংলা দেশের নানাস্থানে নারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের নারী সমাজের হিত সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গুরুসদয়বাবু পত্নীর আরব্ধ কার্য্যে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে "সরোজনলিনী নারী-মন্দির" কলিকাতায় সংস্থাপিত হইয়াছে।

উহার শাখা প্রশাখা দেশে বিস্তৃত হইয়া নারী জাগরণের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। বস্তুতঃ পত্নীর চরম আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার পত্নি-প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

শ্রদ্ধাস্পদ দত্ত মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সারা ভারতের জাগরন্মুখ নারী সমাজের বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে লণ্ডন নগরে সরোজনলিনী সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় নারীজাতি সম্বন্ধে বিলাতের লোকেরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল তাহা খণ্ডন করিবার জন্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন এবং নানা ভাবে ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা ও গৌরব ঘোষণা করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

প্রথমতঃ তিনি "ভারতের নারী" (A woman of India) নাম দিয়া ইংরেজীতে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানা মহিলা সমিতি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাত্রী তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী সরোজনলিনী দেবীর জীবনী।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি লণ্ডনস্থিত ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধি স্থানীয়া কয়েকটী বিশিষ্টা মহিলাকে লইয়া লণ্ডনে "সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির" একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য নারী সমাজের সহিত ভারতীয় নারী সমাজের একটী মিলন-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ তিনি বিলাতের বিশিষ্ট সমাজের কয়েকটী সভা সমিতিতে ভারতীয় নারী সমাজের সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিলাতের সংবাদপত্র সমূহে "ভারতের নারী" নামক পুস্তকখানির উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছে। তাহাদের মতে "মাদার ইণ্ডিয়া" জাতীয় বই পড়িয়া এ দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের যে ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা "ভারতের নারী" পড়িয়া দূর হইতেছে। "ভারতের নারী" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহারা এতদিন ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিত। তাহারা ভারতের নারীর চরিত্র-সৌন্দর্য্য ও সারল্যময় গার্হস্থ্যজীবন, তাহাদের পতিভক্তি, এবং স্বার্থশূন্যতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ভারতের নারীজীবন জগতের নারীজাতির আদর্শ স্থানীয়। পৃথিবীর কোন দেশের নারীর সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। "ইয়র্ক সায়ার অবজার্ভার" নামক পত্র মন্তব্য করেন যে, ও দেশে যে একটা ধারণা আছে যে ভারতের নারীজাতির উন্নতিকল্পে যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা বিদেশীরাই করিয়াছেন এই ধারণা এতদিন দূর হইল এবং বাংলার মহিলা সমিতি আন্দোলন হইতে বোঝা যায় যে "ভারতীয় নারীজাতির মুক্তির উপায় ভারতীয় নারীগণের হস্তেই রহিয়াছে" ("Indian womanhood will find its salvation from within itself")

বাংলার মহিলা সমিতিগুলির ভিতর দিয়া বাঙ্গালী মহিলারা যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিদেশের লোক বিস্মিত হইয়াছে। এতদিন তাহাদের ধারণা ছিল ভারতীয় মহিলারা আত্মোন্নতির জন্য চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিবেন, তাহাদের নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। তুরস্ক প্রভৃতি দেশে যেমন পাশ্চাত্য রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা হুবহু গৃহীত হইতেছে, ভারতের

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত এম. বি. ই.

মহিলারা তেমন না করিয়া যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে প্রীত হইয়া বিলাতের সংবাদ পত্রগুলি এই আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সরোজনলিনী সমিতির লণ্ডন শাখা বর্ত্তমান বৎসরে কয়েকটী প্রদর্শনী ও সভাসমিতির ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাতে মার্শনেস্ অব এবারডিন্, ভাইকাউণ্টেস্ এলিব্যাঙ্ক, লেডী এষ্টর্, লেডী ডেন্‌ম্যান্ প্রমুখ বিলাতের বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মীগণ নিজেরা যোগদান করিয়া, এগুলিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সমিতির কার্য্যাবলীর সহিত লিপ্ত থাকিয়া ভারতীয় রমণীগণকে তাঁহাদের প্রীতি জ্ঞাপন করেন। বৃষ্টলের মহিলারা একটী সভা করিয়া তাঁহাদের ভারতীয় ভগ্নীগণের প্রতি তাহাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহু মহিলার স্বাক্ষরিত একটী অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। বিলাতে কয়েকটী গ্রাম্য মহিলা সমিতি ইতিমধ্যেই বাংলার মহিলা সমিতি গুলির সহিত প্রীতির বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যাবলি দ্বারা, আশা করা যায় যে; উভয় দেশের মহিলা সমাজ পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের যথেষ্ট অবকাশ পাইবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ দত্ত মহাশয় বিলাতে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে পাশ্চাত্য নারীগণ এমন একটা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন যাহা তাহাদের কোন দিন করায়ত্ব ছিল না। কিন্তু ভারতের নারীগণ চাহিতেছেন যাহা তাহা তাঁহারা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভোগ করিতেন। তাই বিলাতের পুরুষ সমাজ নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বাধা দিতেছেন; আর ভারতের পুরুষগণ সহস্র বৎসরের সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাদেরই প্রাচীন আদর্শের কথা স্মরণ করিয়া, নারীগণ না চাহিতেই তাঁহাদের হস্তে তাহাদের প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার ফলে বিলাতের যে নরনারী সংগ্রাম বাধিয়াছে, এ দেশে তাহার কোন চিহ্নই নাই।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় জেনেভাতে কয়েকটী আন্তর্জ্জাতিক মহিলা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। সেখানকার মহিলারাও ভারতীয় মহিলা সমিতিগুলির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তাহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বোম্বাই প্রদেশের কয়েকজন মহিলা কর্ম্মী মহিলা সমিতি আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীযুত দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কর্ম্মীগণের শিক্ষার ব্যাপারে বোম্বাই বাংলাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। সেখানে সেবা-সদন, নারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সাহায্যে কর্ম্মীগণ রীতিমত শিক্ষা পাইতেছেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে সরোজনলিনী সমিতির উদ্যোগে এই আন্দোলন বাংলায় যত অগ্রসর হইয়াছে অন্য কোন প্রদেশে তত অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুত দত্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনার ফলে বোম্বাইর মহিলা কর্ম্মীগণ পল্লীগ্রামে এই আন্দোলন চালাইবার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া বোম্বাই পল্লী মহিলা সমিতি সংগঠন (Bombay Rural Mahila Samiti Association) নাম দিয়া একটী প্রাদেশিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা বাংলার মহিলা সমিতির আদর্শই তাঁহাদের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারী ডাঃ মিস্ত্রি ঐ সমিতির সম্পাদিকা।

আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা বিস্তার-কল্পে মহিলা সমিতিগুলি যত কার্য্যকরী হইবে ততটা আর কিছুতেই হইবে না। দেশের মাতৃজাতিকে যদি আমরা সুশিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি বিষয়ে দেশের প্রভূত উন্নতি হইবে। এই আন্দোলন যেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই ইহা সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিবে। ইতিমধ্যেই সমগ্র উত্তর পূর্ব্ব ভারতে সরোজনলিনী সমিতি ইহার শাখা সমিতি সমূহ স্থাপন করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ও ত্রিবাঙ্কুরে ডাক্তার শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী এই আন্দোলন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতেছেন। সুদূর পঞ্জাব হইতেও বাংলার এই আন্দোলনের কর্ম্মপ্রণালী চাক্ষুষ দেখিয়া শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষার্থীরা আসিয়াছেন। আমাদের জেলারও পল্লীতে পল্লীতে যাহাতে ইহার প্রসার লাভ করিতে পারে তজ্জন্য সকলেরই নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে এই সহরে এবং অন্যান্য স্থানেও এতদুদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদের স্থানীয় নেতাগণ এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

বর্ত্তমান সমস্যা

(শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ)

দেশের প্রাণ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ একটা ভাব জাগিয়াছে যে যাহা চলিতেছে, যে ভাবে আমরা রহিয়াছি, ইহাতে আর তৃপ্তি নাই। যে বিধি নিষেধ সমূহ বর্ত্তমান পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা এক্ষণে অসংখ্য বন্ধন-পাশেই পরিণত হইয়াছে এবং এইসকল ছিন্ন করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে সর্ব্বদাই তাই দেখি তরুণের বিদ্রোহ অভিযান। এখনকার কথাবার্ত্তায় কোনও রাখা-ঢাকা ভাব আর নাই। মনোভাব আজ বেপরোয়া ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সমাজের উপর দণ্ডধারী যে শক্তি এতদিন রাজত্ব চালাইয়া আসিয়াছে, সমাজের শৃঙ্খলা ও নিয়ম অব্যাহত রাখিয়াছে, আজ জরার অবশ্যম্ভাবী দৌর্ব্বল্য তার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। কালপুরুষের ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,- সে আজ তাই সন্ত্রস্ত, ভীত। সে বুঝিয়াছে যে তার দিন ফুরাইল বলিয়া। তাই দৌর্ব্বল্যের অস্ত্র নিস্ফল ক্রোধের শেষ আস্ফালনে সে খানিকটা সোরগোল তুলিয়া নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দিবার নিরর্থক প্রয়াস করিতেছে, যদিও মনে মনে ভালরূপেই জানিয়াছে যে এবার তার রাজত্বের অবসানপ্রায়।

তরুণ আজ যে এত বেপরোয়া তার অর্থও তাই। তরুণও বুঝিয়াছে তার উপর অত্যাচারের যে বজ্রমুষ্টি এতদিন ধরিয়া নিয়ত উদ্যত ছিল, কালপ্রভাবে আজ তাহা শিথিল প্রায়। তবে আর ভয় কি? বিদ্রোহের রণরঙ্গে তরুণের দল আজ তাই মাতিয়া উঠিয়াছে, বিদ্রোহের মন্ত্রসঞ্চারিত করিয়া দিতেছে দেশে দেশে দিকে দিগন্তরে। এই মন্ত্র যে দারুণ অনল সৃষ্টি করিবে তাহাতে সমাজের জীর্ণ কারাগার পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তরুণের এই যে বিদ্রোহ-মন্ত্র ইহার অর্থ তাঁহারা নিজেরাই কি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন? তাঁহারা কি জানেন কেন এই ধ্বংসের আয়োজন? কি চান তাঁরা? তরুণ যদি সরল হন তবে বলিতে বাধ্য হইবেন "কি চাই তা' জানি না। কিন্তু যা' আছে তা' চাই না।" এক কথায় তরুণের সামনে আজ স্থির লক্ষ্য কিছু নাই। সে চলিয়াছে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত এক আত্মহারা আবেগে, যাহাকে সাম্‌নে পাইবে তাহাকেই ধ্বংস করিবে, নিজেও ধ্বংস হইবে।

যুগসন্ধির সময়ে একটা বিপ্লব, একটা উলট্ পালট্ যে অনিবার্য্য সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রলয়ের সার্থকতা তখনি যখন সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ও মহত্তর নব সৃষ্টির আয়োজন চলিতে থাকে। তরুণেরা কিন্তু এদিক্‌টা ভাল করিয়া দেখিতেছেন না। যে কোনও আদর্শ যে দিক হইতেই আসুক সেইটিরই পিছনে পিছনে তাঁরা ধাবমান হন। কিছুদিন অহিংস খদ্দরব্রত চলিল, এক্ষণে রুশিয়ার সাম্যমূলক শূদ্রধর্ম্ম এক অভিনব মোহের হাত ছানিতে তাহাদের প্রাণে সাড়া তুলিতেছে। কমিউনিজম্, বল্‌শেভিজম্ রুশিয়ার জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের তাড়নায় জাগিয়াছে। তা' আজও চূড়ান্তরূপে পরীক্ষিত হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। যাই হোক তবু তাহা রুশিয়ার জাতীয়াত্মার একটি সত্যকার প্রকাশ চেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় গঠন অন্যরূপ। তাহার অভাবও অন্য ধরণের। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের দিকে একেবারে লক্ষ্যহারা না হইলে শুধু অতীত ইতিহাস কেন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির প্রতি একটু অবধান করিলেও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির সূক্ষ্ম গতির দিকে চক্ষু মেলিয়া তাকাইলে কখনও আমরা রুশিয়ার ব্যর্থ অনুকরণে এত মাতিয়া উঠিতাম না। রুশিয়া কেন অপর কোনও দেশেরই অন্ধ অনুকরণে ভারত-উদ্ধার হইবে না। অন্যান্য দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সমূহে আমরা অন্ধ হইব না, ভারতবর্ষের উপযোগী যাহা, তাহা আবশ্যক মত গ্রহণও করিতে হইবে। অথবা যে সব সত্য সার্ব্বজনিন, যাহা সংকীর্ণ দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে, যে সকল সত্যের আবিষ্কারের মানবের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, এমন সব সত্য সব দেশ হইতেই আমরা লইতে পারি, কিন্তু সজ্ঞানে ও প্রয়োজনানুযায়ী চৌদিক হইতে সত্য ও শক্তি আহরণ করা, আর যাহা সাম্‌নে পাওয়া যায় অন্ধভাবে তাহাই গলাধঃকরণ করা— এ দুইয়ে প্রভেদ অনেক। আজ কালকার অতি আধুনিক এক সম্প্রদায় এই শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহাদের বিশেষ কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞাতা নাই।

তারপর শুধু জাতীয় সমস্যার কথাই বলিতেছি না। বিশ্ব-সমস্যার দিক্ দিয়াও ভারতবর্ষের জাগরণের আজ বিশেষ অর্থ আছে। প্রত্যেক জাতীয় সমস্যার মধ্যে সারা জগতের সমস্যাও নিহিত থাকে। নানা দেশে ও কালে, প্রতি জাতির উত্থান পতনে এই সমস্যা সমূহ নানা ভাবে সমাধান খুঁজিতেছে। কোনও সত্যই যে কোনও বিশিষ্ট দেশের একচেটিয়া জিনিষ নয় ইহা আমরাও স্বীকার করি কিন্তু এক দল তরুণ মনে করিতেছেন বলশেভিক রুশিয়াই জগৎ সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসায় সমর্থ হইয়াছে। তাই সব দেশেই বলশেভিক মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে। বলশেভিক জগতই যে আদর্শ জগৎ বলশেভিকবাদই যে জগতের শেষ সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ভারত প্রতিভার ভাবী সুবিপুল সম্ভাবনার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিয়াছি কি?

আমরা বলিতে চাই যে শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্যই ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা ও সাধনার এক নবীন ও বিরাট অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান শিক্ষায়, সমাজে, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থার মধ্যে, এই নববিকাশে যাহা কিছু বাধা স্বরূপ তাহা উৎপাটিত হোক—ধ্বংসের এই দিকে উপযোগিতা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেখিতে হইবে ভারত প্রতিভার সৃষ্টি ভঙ্গির নিজস্ব ধারাটি কিরূপ। রুদ্রের প্রয়োজনীয়তা জগতে রহিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মার সৃজন প্রতিভা ও বিষ্ণুর পালনী শক্তিই সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ধ্বংস, সৃজন ও পালন এই তিন শক্তিই যাহাদের সম্মুখ আয়ত্তে নাই, তাহাদের দ্বারা নবীন বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। তবে অন্ধভাবে ধ্বংসলীলায় যাহারা যোগ দিয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞানে প্রকৃতিরই একটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতেছেন। প্রকৃতির হাতের অবশ যন্ত্র তাঁহারা। আমরা চাই বা না চাই, ভাল বলি আর মন্দ বলি, প্রকৃতি তাহার কার্য্য উদ্ধার করিবেই। এই প্রকৃতিকে নিরোধ করা অসম্ভব। তাই ধ্বংস হইতে সম্পূর্ণ গা বাঁচাইয়া ভারত দাঁড়াইতে পারিবে না। কিন্তু ধ্বংস সত্তেও জাতীয়াত্মার নিখুত সৃষ্টি প্রতিভা ও ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণী ক্ষমতার জাগরণ প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ ভারতের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদ্দুর সম্ভব ধ্বংসের ব্যাপারটীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে শক্তির অপচয় কমিবে, বিপ্লবের অনিষ্টকরী সম্ভাবনা লাঘব হইবে।

তাই ধ্বংসের দিকে শুধু লক্ষ্য না রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের দিকে ধ্যান-নির্দ্দেশ তরুণ ভারত জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানের হীনতার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া যে ভবিষ্যৎ ভারত আপন গৌরব ময় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার মোহনীয়তা আমাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রাচীন অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর এক অনবদ্য ও পূর্ণশক্তি বিধৃত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবার জন্য ভারতপুরুষ কাল গণনা করিতেছেন।

কবি জনার্দ্দন

(শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ)

বঙ্গের নিভৃত পল্লীতে কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া সরল ও সুন্দর রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, উহার কতক লিপিবদ্ধ না হওয়ায় এবং কতক মুদ্রিত হইয়া জন সাধারণে প্রচারিত না হওয়ায়, বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। যে "ময়মনসিংহ গীতিকা" প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপ প্রভৃতি সভ্যদেশ বাসিগণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তদ্রূপ কত অমূল্য রত্ন যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।১টী বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। ময়মনসিংহ জেলাবাসী রামু, রামগতি, শম্ভু, কালী, বিজয়-নারায়ণ, গোবিন্দ আচার্য্য প্রভৃতি প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মনোমুগ্ধকর রচনা দ্বারা দেশবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল রচনা লিপিবদ্ধ না করায় মুকুলেই বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলাবাসী ভাট ব্যবসায়ী কতিপয় ব্রাহ্মণ নানাবিধ সরস রচনা দ্বারা দেশের অবস্থা বর্ণন, এবং নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে ও দেশবাসীর আদর অভাবে ঐ ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও ক্রমেই অতি বিরল হইতেছে।

প্রবন্ধে কবি দ্বিজ জনার্দ্দন কৃত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীই আমাদের আলোচ্য; আমার পাঠ্যাবস্থায়, আমাদের পুস্তক বাড়ীতে "ব্রতাদি পূজার পদ্ধতি" নামক প্রাচীন হস্ত লিখিত পুস্তক মধ্যে কবি দ্বিজ জনার্দ্দন কৃত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" নামক বঙ্গভাষায় পদ্যে লিখিত একখানা জীর্ণ পুস্তক দেখিতে পাই, ঐ পুস্তকখানার সরল ও সুন্দর রচনা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। পুস্তকখানা অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় বিশেষ চেষ্টা করিয়া পাঠোদ্ধারান্তে একখানা নকল করিয়া জীর্ণ পুস্তক সহ রাখিয়া দিয়াছিলাম। এ বৎসর একদিন ঐ পুস্তকখানা দেখিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় ঐ পুস্তক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এবং পুস্তকাংশের কতক উদ্ধৃত করতঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কবি পাঁচালীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন:—

"বেদে নারায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

এই প্রমাণ উল্লেখ করিয়া প্রথমেই নারায়ণের বন্দনা করিয়াছেন:—

"বন্দ দেব নারায়ণ শঙ্কর বচন।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিল স্মরণ॥"

কবি জনার্দ্দন যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার পরিচয় কবিতায় পাওয়া যায়:—

"বোলে দ্বিজ জনার্দ্দন, শুন শুন ব্যাধ জন,
বিষাদ আর না ভাবিও মনে,
চণ্ডীরে কর স্মরণ, খণ্ডিবে তব বন্ধন,
কালি হইবে তোমার মোচন"

কবি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন কবিতায় তাহারও আভাস পাওয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গে কোন পূজা উৎসবাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই স্ত্রীলোকগণের "জুকার" দেওয়ার প্রথা আছে, কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন:—

"জুকারের * শব্দ কন্যা সেই বনে শুনে,
জুকার উদ্দেশ্যে চলে খুলনা যুবতী"

আরও প্রমাণ পাওয়া যায়:—

পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানে এখনও কেহ কোন স্থানে যাত্রা করিয়া "রোওয়ানা" হওয়ার সময় বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ মঙ্গলচণ্ডীর দুর্ব্বা তণ্ডুল দিয়া থাকেন; কবি লিখিয়াছেন:—

"চলিলেক সাধুর পুত্র যাত্রা করিয়া,
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা দিলেক আনিয়া"

আরও প্রমাণ পাওয়া যায়:—

পূর্ব্ববঙ্গে এখনও শিশুকে "ছাওয়াল" বলিয়া থাকে, কবি তাহারও কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন:—

"শ্রীপতি কুমারে বলে ছাওয়াল বিস্তমান,
আমাকে তুলিয়া দেও এই খড়িখান"

সুতরাং কবি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কবি জনার্দ্দন গ্রন্থের শেষেও নিজ নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা:—

"মঙ্গলচণ্ডীর দাস ভনে জনার্দ্দন
পাঁচালী রচিল যেন অমৃত কথন"

কবি জনার্দ্দন কৃত রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

বন্দ দেব নারায়ণ শঙ্কর বচন।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিল স্মরণ॥
মঙ্গল চণ্ডিকা পদে কোটী-নমস্কার।
মহামায়া রূপে দেবী ধরিছে সংসার॥
পদ্মে পদ্মাসনা দেবী মধুর ভাষিণী।
জপন পূজন ধ্যানে দুর্গতি নাশিনী॥
মুকুট মণ্ডিতা শিরে শোভে মণিময়।
কনক কুণ্ডল কর্ণে বিশেষ শোভয়॥ *
গীবায়ে শোভয়ে দেবী গজমতিহার।
স্থানে স্থানে শোভা করে দিব্য অলঙ্কার॥

---

* পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানে কোন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্রেই স্ত্রীলোকগণ "জুকার" (জয়কার—হুলুধ্বনি) দিয়া থাকেন, শাস্ত্রেও, তাহার বিধান দেখা যায়, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তৎপ্রণীত উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন:—

মৎস্য সূক্তে—"বলি কর্ম্মণি যাত্রায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
মহোৎসবে চ মাঙ্গল্যেতত্রস্ত্রীণাং ধ্বনিঃ শুভঃ॥"

স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ হুলুহুলুধ্বনিঃ ইতি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা।

* মৎ প্রণীত "ব্রত কথায়" এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই কিন্তু ভনিতায় কোন কবির নাম নাই। সৌঃ সঃ

দুই হস্তে শোভিয়াছে কনক কেয়ূর।
দুই পদে শোভিয়াছে কনক নূপুর॥
অভয় বরদা দেবী সকরুণা হয়।
অনুগত জনেরে পালয় সদায়॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেব সুরপতি।
চরণে পড়িয়া যাঁহার নিত্য করে স্তুতি॥
সহস্র মুখেতে নহে গুণের কথন।
তাকে কি কহিব আমি মনুষ্য অধম॥
পৃথিবীতে আছে রাজ্য উজানী নগরী।
বিক্রম কেশরী নাম তথা নরপতি॥
সেহি দেশে বৈসে সাধু নাম ধনপতি।
লহনা খলনা তার দুই যুবতী॥
বিধির নির্ব্বন্ধে সে না হইল ভাগ্যবতী।
দুর্ভাগা হইল তার খুলনা যুবতী॥
পতি সনে খলুনার নাহিত পীরিতি।
আর এক দিনে সেহি সাধুর বচনে।
খলুনাকে নিয়োজিল ছাগল রক্ষণে॥
ছাগল হারাইয়া কন্যা ভ্রমে বনে বনে।
জুকারের শব্দ কন্যা সেহি বনে শুনে॥
জুকার উদ্দেশে চলে খলুনা যুবতী॥
মঙ্গল চণ্ডিকা বলে শুন নরপতি।
যদি রক্ষা চাও তুমি রাজ্য সঙ্গতি॥
কালকেতু নামে ব্যাধ হয় মোর দাস।
বন্ধন মোচন কর পুর তার আশ॥
ই বলিয়া দেবী তবে রাজা বিদ্যমান।
সেবক বৎসলা দেবী হইলা অন্তর্দ্ধান॥

* * * *

মঙ্গলচণ্ডী দেবীর বরে কালকেতু নানক ব্যাধ বহু ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার শত্রুপক্ষ তদ্দেশের সহস্রাক্ষ নামক রাজার নিকট কালকেতু সম্পত্তি নানা প্রবঞ্চনা করিয়া লাভ করিয়াছে এক অভিযোগ করায় রাজ আদেশে ব্যাধবর বন্দী হইলেন, কবি ঐ স্থানে অতি মর্ম্মস্পর্শি ভাষায় ঐ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

লাচাড়ি

কান্দে ব্যাধ সকরুণ মন, তুমি মোকে দিলা ধন,
তাতে কেন বিড়ম্বন, প্রাণ রাখ হইনু কাতর।
মনে অতি বাসি — ভয়, বন্ধন অতি গুরুতর,
মোচন চণ্ডী করহ সত্বর।
মুঞি না দেখিব আর, স্ত্রী পুত্র পরিবার,
কামিনী আর না লইব কোলে।
মৃগগণের সাঁপে মোর, বিধি দিল দুঃখ ঘোর,
কান্দে ব্যাধ সকরুণ সুরে।
কহে দ্বিজ জনার্দ্দন, শুন ব্যাধের নন্দন,
কালি হবে তোমার মোচন।

দ্বিজ গঙ্গাদাস যে পাঁচালী রচনা করিয়াছেন এই স্থানে তাঁহার ভাব এরূপ সুন্দর হয় নাই পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য "গঙ্গাদাস কৃত পাঁচালীর" কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

কালিঙ্গ রাজ্যের রাজা ব্যাধ ছিল তার প্রজা
শুনিয়া বান্ধিয়া তাকে নিল।
বন্ধিয়ানে থাকি ব্যাধ, মনেতে ভাবি বিষাদ,
চণ্ডিকারে শরণ করিল।
শুন দেবি মহেশ্বরি নিজ গুণে দয়া করি,
এবে কেন হইলা নিদয়া,
তুমি মুকে দিলে ধন, তাহাতে হইল বন্ধন,
রক্ষা কর ভবানী ভব জায়া।
ব্যাধের স্তবন শুনি, অকস্মাৎ দৈববাণী,
না কান্দ না কান্দ ব্যাধ জন,
বন্ধন মোচন হবে, এ দুঃখ নাহিক রবে,
রাজা দিবে আর কিছু ধন।

প্রথিত যশা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে দ্বিজ জনার্দ্দন কতৃক এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটী পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দে বিরচিত। এদেশে মঙ্গলচণ্ডিকার—ব্রতোপলক্ষে ঘরে ঘরে পাঁচালী পঠিত হইয়া থাকে। রচনা সৌন্দর্য্যে এই পুঁথিখানি রচয়িতার উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির নিদর্শন। দুঃখের বিষয় অনুসন্ধিৎসুলোকের অভাবে "জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের যে এইরূপ কত অমূল্যনিধি

কীটের করাল কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দ্বিজ জনার্দ্দনের নামের ভনিতা ছাড়া গ্রন্থে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিলাতের পত্র

(শ্রীসুপ্রভা রায় বি, এ, বি, টি)

Wink worth Hall.
Sunday, May 12th

শ্রীচরণেষু—

* * * *

আমার ত ফিরবার সময় হল। তাই পরশু এখান থেকে একটী মেয়ে Oxford যাবে শুনেই তার সঙ্গে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করে ফেল্লা'ম আমিও যাবে। বীণাকেও (মুরারীচাঁদ কলেজের প্রিন্সিপাল অপূর্ব্ব দত্তের মেয়ে) সঙ্গে নিলাম। Oxford দেখে আমার যেন একদিনে মনে হল বিলাত আসা আমার সার্থক হয়েছে। অবিশ্যি University এবং Residential College ছাড়া Oxfordএ আর কোন attraction নাই! কিন্তু ৪০০।৫০০ বছর ধরে এই যে বিশাল একটী রাজ্য নিয়ে কলেজ এবং তার ভিতরে কত রকম আয়োজন, দেখলে সত্যি অস্বীকার করতে পারি না জগতে এরাই শ্রেষ্ঠজাতি। এখনও প্রাচীন সব চিহ্ন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। একটী দেয়ালের পাথর যদি খসে যায় repair করে ঠিক ঐ রকম, ancient type এর পাথর আবার সেখানে বসিয়ে দেয়। এই যে প্রাচীনত্ব এই যেন Oxford এর বিশেষত্ব। Day excursion এ গিয়েছিলাম। কাজেই যতদূর সম্ভব কলেজ সবই দেখেছি। শ্রীহট্ট কলেজের প্রফেসর যোগেন চৌধুরী Eng. M. A. Oxford পড়ছেন study leaveএ আছেন। তিনি সব দেখালেন। বীণার বাবার ছাত্র তিনি। সেই পরিচয়ে তিনি খুব যত্ন নিয়ে সারাদিন আমাদের সব দেখালেন। সব কলেজের ছবি এনেছি ভিতরের dinning Room এর ৪০০ বছর আগের রান্নাঘর এখনও সেই ভাবে চলছে। সব ছবি এনেছি। এখন আর পাঠালাম না। সঙ্গে নিয়ে যাব। Walk বলে Magdalen Collegeএর ভিতরে এমন সুন্দর একটী রাস্তা; প্রত্যেক কলেজের ভিতরেই lake ও ফুলের শোভা এমন সুন্দর। তাতে দিনরাত ছেলেরা নৌকা নিয়ে ঘুরছে। ছেলে এবং মেয়ে student এর discipline সম্পূর্ণ প্রাচীন ভাবের। স্বাধীনতা Oxfordএ আছে কিন্তু খুবই অল্প রকম। Tom Tower বলে Christ Church কলেজে ৮০০ বছর ধরে একটী ঘণ্টা বাজছে। রাত ৯ টার সময় ১০১টী বাজে এবং সহরের সমস্ত student তখন বাড়ী ফিরবে। তারপরে যদি কোন student বাইরে যায় তাকে Cap এবং Hood পরে (under graduate দেরও hood পরতে হয়) যেতে হবে। এবং ঘণ্টা হিসাবে এক পেনী করে fine হয়। রাত বারটার পরে কোন ছেলেকে বাইরে পাওয়া গেলে Uni. Proctor যে রকম ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। অর্থাৎ সবই old fashioned মনে হল। Oxford তাই নিয়েই গর্ব্বিত।

অক্সফোর্ডএ অনেক মহিলা শিক্ষার্থীও আছেন। তাঁহাদের জন্য বিভিন্ন কলেজ ও ছাত্রাবাস আছে। তাঁরা কোনও কোনও লেক্‌চারে শুন্‌তে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে attend করেন। এখানকার আবহাওয়াই জ্ঞানের রাজ্যের দিকে মনকে আকর্ষণ করে। পড়াশুনার জন্য মাথা ব্যথা চিন্তা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। বাহিরেই বেশী সময় ছাত্ররা কাটাইতেছেন। খেলা-ধূলাতেই বেশীটা যেন এঁরা জোর দেয়। এতে অক্সফোর্ডের এত জ্ঞান গরিমা কিসে তাহা ভাববার কথা। স্বাস্থ্যে ও স্ফূর্ত্তির মধ্যে শিক্ষার্থী জীবনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত কর্ম্মে দক্ষ শক্তিবান মানুষ তৈয়ার করিবার আয়োজন এই ইউনিভার্সিটীর ভিতর দিয়া এই জাতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে মেয়েদের ডিগ্রি দেওয়া হইত না, এখন অক্সফোর্ডে ডিগ্রি দেওয়া হয়। যখন ছুটী থাকে তখন দূরে গিয়েই ছাত্ররা কোনও নির্জ্জন স্থানে পরীক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে পড়াশুনা করেন। অবশ্য এখানে মেধাবী ছাত্রদেরই সমাবেশ হয়। তাই অক্সফোর্ড তার গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছে।

আমি এরমধ্যেও আর একদিন Cambriege যাব ভাবছি। Mrs. Mr. B. M. Sen (ডাক্তার নীলরতন সরকারের মেয়ের জামাই) ওখানে আছেন এখন।

Bristol যাব আর ফিরবার পথে যতদূর পারি দেখব। পড়াশুনার শেষ দেখি না ; কোন কূল কিনারা নাই।

এখানে সকলেরই একবার অন্ততঃ আসা উচিত মনে করি। তবে ভীষণ খরচ সাপেক্ষ। Cal. Univ. Graduate হলে সব কলেজেই সহজে admission পাওয়া যায়। নতুবা খুব মুস্কিল হয়। সোনাদার এখানে এসে কোন বিষয়ই ৪ বছরের কমে হতে পারে না। এক বছরের মত কি পড়তে পারবে বুঝি না। আর বিলাতের পড়াশুনা সহজ ও আমি কোন দিনই মনে করি না। এদের মাথা খুব অন্ততঃ যাদের মাথা আছে তারাই Univ. পর্য্যন্ত আসে অন্যরা Vacational কিছু করে এবং তার জন্যও শিশুকাল হতে সেরকম স্কুলে তৈরী হয়।

* * * *

বরের দর

(শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।)

বরের বাজার বিষম চড়া—ভীষণ অত্যাচার।
মেয়ের বিয়ে দিতে বুঝি—পারবে না কেউ আর ?
যাহার ঘরে পাঁচটী মেয়ে, তাহার কথা ভাবতে যেয়ে—
হৃদয় আমার উঠ্‌ছে কেঁপে, হেরি অন্ধকার !
বরের বাজার বিষম চড়া ! ভীষণ অত্যাচার !
হাজার টাকা নগদ নিয়ে, বাপ্ ছেলেকে দিচ্ছে বিয়ে,
এই কি হলো দেশের রীতি ? কাণ্ড চমৎকার।
মেয়ের পিতা ভিটা বেচে, দিচ্ছে বিয়ে বি, এর কাছে,
টাকার উপর দান সামগ্রী, মেয়ের অলঙ্কার !
ছেলের পিতা কসাই মুচি, কর্ে দাবী সুযোগ বুঝি—
"রিচ্‌ট ওয়াচ আর হারমনিয়ম, চাচ্ছে ছেলে তার।"
মেয়ের বাপে চায় না দিতে, পীড়ণ ব্যথা জলছে চিতে,
নূতন কথায় বিয়ের সভায় বাজ্‌লো কেলেঙ্কার।
সমাজ চোখে লাগে না তোর ! সবাই কিরে গুলিখোর।
কোন্ অপরাধ মেয়ের বাপের ? এতই অবিচার ?
কাণ্ড দেখে চক্ষু বুজি, প্রাণে আমার বিধে সূচী,
মেয়ের বাপের ভিটা যাবে ছেলের পিতা হাজার পাবে !
এমন রীতি কোন দেশে ভাই ! শুনি নাইক আর ?
লক্ষীছাড়া ! অন্ধ সমাজ, চক্ষু যদি না মেলে আজ,
চির দিনই মেয়ের বাপের, থাকবে হাহাকার।
ঝাঁটা মার তার কপালে (যে) বেচ্‌ছে ছেলে বিয়ের ছলে
সমাজ দ্রোহি তারেই বলি, অবোধ জানোয়ার !
মেয়ের বাপের রক্ত চুষে, পণ নিয়ে যে উদর পোষে,
সমাজ তারে ঘাড় ভাঙ্গিয়ে দাও না করে বা'র।
স্থান দিও না তোমার কোলে এমন কুলাঙ্গার।

পুস্তক পরিচয়

হিন্দু-বিবাহ—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ বিরচিত সচিত্র পুস্তক। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা, ১৪৩+১৫=১৫৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, বাণী ভাণ্ডার, ঢাকা।

হিন্দু-সমাজের বিবাহ বিধান সম্পর্কে আজ যে মুহূর্ত্তে শিমলা-শৈলে মুসলমান খ্রীষ্টান ও অহিন্দুগণ কর্ত্তৃক আইন-কানুন রচিত হইতেছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হিন্দু-বিবাহ নামক একখানি পুস্তক টাট্‌কা মুদ্রিত হাতে পাইয়া খুবই কৌতূহল হইল, না জানি ইনি আবার কোন্ মতাবলম্বী। কেউ বলিতেছেন মেয়েদের বিবাহ যোগ্য বয়স ন্যূনকল্পে চৌদ্দ, কেউ ষোল কেউ বা আঠার বৎসর। কেহ কেহ হয়ত মনে মনে কিংবা প্রকাশ্যেই একুশ বৎসর পর্য্যন্ত ও মেয়েদিগকে অবিবাহিত রাখা আইনের অন্তর্গত করিতে সঙ্কল্প করিতেছেন। এহেন মতবৈষম্য সময়ে বসু মহাশয়ের হিন্দু-বিবাহ নামক পুস্তক 'মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ' অবলম্বন করিবে, অথবা ভারতীয় সনাতনীদের মত অবলম্বন করিবে কিংবা অভিনব যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিবে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পুস্তক খুলিলাম, পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং অবশেষে পুস্তকের ভাষা, ভাব, রচনা চাতুর্য্য এবং সর্ব্বোপরি লেখকের পাণ্ডিত্যমূলক গবেষণা ও বিচার-পদ্ধতি আমাকে পুস্তকের আদি হইতে অন্তে লইয়া গেল। বুঝিলাম, ইনি শুধুই 'বসু' নহেন, বিদ্যাবিনোদ ও বটেন। নামের সঙ্গে উপাধি সংযুক্ত আছে বলিয়া ইনি যে শুধু পণ্ডিতদের ন্যায় শাস্ত্রবচনই আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, শাস্ত্রের সঙ্গে

যুক্তি আছে, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান আলোচনা আছে, এই দেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিবাহ সমস্তার বিবৃতি আছে।

বর্ত্তমনে সময়ে এই শ্রেণীর পুস্তক হিন্দু সমাজে যথোপযুক্ত সমাদরলাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থমধ্যে বিবাহ কি? বিবাহের উদ্দেশ্য কি? হিন্দু বিবাহের আদর্শ ও প্রকারভেদ; নারীর গৌরব ও কর্ত্তব্য; স্বামীর কর্ত্তব্য, স্বামী স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য, গৃহিণীর ধর্ম্ম, বর নির্ব্বাচন, কন্যা নির্ব্বাচন ও কন্যা বিবাহের বয়স প্রভৃতি নানা বিষয় নানা ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আহারে বিহারে, বসনে ব্যসনে, আচারে বিচারে, ভাবে ভাষায় এমন কি স্বতন্ত্র চিন্তাধারায় পর্য্যন্ত আমরা যদি বৈদেশিক সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাই, তবে ভারতের ভারতীয়ত্ব থাকে না, হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এবং আমাদেরও মন্তব্য তদনুরূপ। বিজাতীয় বৈদেশিক আদর্শ যদি আমাদের স্বজাতীয় স্বাদেশিকতাকে অভিভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাকে দলিয়া পিষিয়া টুটি চাপিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে চায় তবে তেমন-ধারা আদর্শ কোনও বুদ্ধিমান মনস্বী জাতি স্বেচ্ছায় বরণ করিতে যায় না। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের গৃহ কর্তৃত্বও অপরের হাতে যাইতেছে! যেই স্বাধীনতাটুকু আমাদের হাতে ছিল তাহাও আজ কালের দোষে অপরের হাতে তুলিয়া দিতেছি।

আজ ইউরোপ এবং আমেরিকা, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও ধনে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিলেও গার্হস্থ্য শান্তির অভাবে এবং পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার প্রয়াণে সেইক্ষণে প্রাচীনা ভারত ভূমির দাম্পত্যসুখের দিকে হয়ত বা ব্যগ্র দৃষ্টিতেই তাকাইতেছিল ঠিক সেই সময়েই আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া অপর দেশের গুপ্ত অশান্তি অর্জ্জন করিতে যাইতেছি।

সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা কবিতা প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ভূয়োদর্শনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইংরেজী উক্তিগুলি যাঁহাদের পুস্তকে, বা বক্তৃতায় অথবা করিলে গ্রন্থের শক্তি বৃদ্ধি পাইত। সম্ভবতঃ প্রুফ সংশোধকের অনবধানতা বশতঃ সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে কতিপয় অশুদ্ধি (বা মুদ্রাকর প্রমাদ?) রহিয়া গিয়াছে। তিন পৃষ্ঠায় –

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ যজ্ঞঃ
ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।

এইরূপ রচনা শুদ্ধ হইবে। যাহা মুদ্রিত আছে তাহা অশুদ্ধ। ৪৩ পৃষ্ঠায় সেই শ্লোকই বিশুদ্ধরূপে ছাপা হইয়াছে।

গ্রন্থকার বহুস্থলে মনু সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুকেই যে প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন ইহা বর্ত্তমানে সৎ-সাহসের পরিচায়ক। আজকাল ভারতের নানাস্থানে উঠন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জল্পনা আলোচনা মনুস্মৃতিকে সাগরের জলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা দেশের উন্নতি অসম্ভব। নারী স্বাধীনতাকল্পে, অস্পৃশ্যতা পরিহার উদ্দেশ্যে মনু সংহিতার ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্র নাকি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। হিন্দু হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র জলে বিসর্জ্জন না দিলে হিন্দুত্ব কোথায়? উন্নতমনা মনস্বী ব্যক্তিগণ কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন—

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। অর্থাৎ যে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থে মনু সংহিতার বিপরীত অর্থ পোষণ করে সেই সমস্ত গ্রন্থ আদরনীয় নহে।

পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিষ কন্যার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং বিষ কন্যার সংস্পর্শে যে কিরূপ অনিষ্ট সংশোধিত হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছেন ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রণিধান যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত কবি বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে বিষ কন্যার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

হিন্দু বিবাহ পুস্তক পাঠে হিন্দু সমাজের পাত্রপক্ষও পাত্রীপক্ষ উভয়পক্ষ উপকৃত হইবেন। এই পুস্তক একে অন্যকে বিশ্বস্তভাবে উপহার দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।

জাপানে বঙ্গনারী—স্বর্গীয়া সরোজ-নলিনী দত্ত এম, বি, ই, প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। এম, সি, সরকার এণ্ড কোং, কলিকাতা।

লেখিকা এখন বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে আর

পল্লীতে পল্লীতে বহু "মহিলা সমিতি" তাঁহার স্মৃতি বুকে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে।

এখানি জাপান ভ্রমণের কাহিনী। জাপানের শিক্ষা দীক্ষা, স্কুল, কলেজ, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অভিজ্ঞতা "রোজ নামচার" ভিতর দিয়া তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আজকাল দেশ ভ্রমণ একটা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু এই মহিলা যে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসুক লইয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন তাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ হিন্দু মহিলার পক্ষে। তিনি ভ্রমণ কালে যে সমাজে মিশিয়াছেন তাহাদের যাহা কুৎসিৎ অনাচার তাহা নির্ভিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন আবার যাহা ভাল দেখিয়াছেন তাহার শতকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যখন কিছু তাঁহার নারী হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, তখনই তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন— "আমাদের দেশের ভদ্র মহিলারা কোথাও কিছু দেখতে গেলে যেমন ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়া যান জাপানের মেয়েরাও তাদের ছেলেপিলে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কিন্তু এক ঘরে এতগুলি ছেলেপিলে থাকা সত্বেও একটু গোলমাল শুনা গেল না। এদের ছেলেপিলেদের বিশেষত্ব যে আমাদের দেশের ছেলেপিলেদের মত তারা কান্নাকাটি বা গোলমাল করে না। এদের মেয়েরাও সব চুপ চাপ বসে আছে বা আস্তে আস্তে কথা বলছে। এরা এত সংযত যে এত স্ত্রী লোক একত্রে বসে আছে অথচ জোরে হাসতে বা জোরে কথা বলতে কাউকে দেখলাম না। যাদের মেয়েরা এ রকম সংযত তারা যে সংযম শিক্ষা করে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলেও একত্রিত হলে ঠাট্টা কথা বার্ত্তায় এত গোলমাল বাধান যে, যে শিক্ষা লাভের জন্য গেছেন বা যা কিছু উপভোগ করার জন্য গেছেন তার উপর অনেক সময় দৃষ্টিই থাকে না। আর আমাদের শিশুরা অকারণে বা সামান্য কারণে কান্নার রোল তোলে।

* * * * *

আমরা যে দিন জাপানি মাতাদের মত সংযত হয়ে সন্তানদের সংযম শিক্ষা দিতে পারব, সেই দিন আমাদের দেশেও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।"

অন্যত্র—"আমাদের দেশে বই পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানীরা বই পড়ার সঙ্গে হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা দিচ্ছে। কি সুন্দর শিক্ষা প্রণালী! মিসেস্ সুকা মটোর কাছে জানা গেল যে, মেয়েরা রোজ পড়া শেষ করে বাড়ী যাবার পূর্ব্বে পালা পালি করে তাদের স্কুল ঘরগুলি ধোয়। এ কাজের জন্য অন্য চাকর রাখা হয় না। আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, সেজন্য মেয়েরা লেখা পড়া শিখলেই অত্যন্ত সৌখিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন কাজ স্কুলে করতে দিলে আমাদের মেয়েদের অভিভাবকরা হয়ত তাকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করেন; কিন্তু এতে যে মেয়েদের চরিত্রের কত উন্নতি হয় তা ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই সব শিক্ষার প্রভাবেই জাপানী মেয়েরা এত উচ্চ শিক্ষা সত্বেও নম্রতা বজায় রাখে। মেয়েরা স্কুলে ঘরের কাজ শিক্ষা করছে আবার লেখা পড়াও শিক্ষা করছে। এই রকমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নম্রতা বজায় রখতে শিক্ষা করাই নারীর আদর্শ শিক্ষা হায় আমাদের অভাগা দেশের কবে চক্ষু খুলবে! কবে আমরা এমন ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতে শিখব? যে দিন আমরা আমাদের দেশের বালিকাদের এমনি যত্ন করে শিক্ষা দিতে পারব সে দিন এখনও কি অনেক দূরে আছে? যা হোক শিক্ষায় আমরা এখনও যে কত পশ্চাদপদ তা এই রকম স্কুল দেখলে ভালরূপ অনুভব করতে পারা যায়। শিক্ষা মানুষের যে কি পরিবর্ত্তন করতে পারে তা এ দেশে এলে বোঝা যায়।" ইত্যাদি—

লেখিকার স্বদেশ প্রীতির নিদর্শন পুস্তকের ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থ ভাষায় সম্পদ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় লেখিকা তাঁহার রচনাগুলি পুস্তকাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সংবাদ

সুসঙ্গবাসীর উদ্যোগে এবং বিগত শারদীয়া ষষ্ঠী দিবসে সুসঙ্গের আদরের দুলাল চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের অমর আত্মার তৃপ্ত্যর্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে সুসঙ্গের পদপীঠ দশভূজা প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সুসঙ্গের রাজা বাহাদুরগণ, আমাত্য ও প্রজামণ্ডল, স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ, শিক্ষক মহোদয়গণ ও ছাত্রবৃন্দ একাসনে সমবেত হইয়া যোগভ্রষ্ট পুরুষবর মহারাজের মহান চরিত্রের গুণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গত ১৯শে কার্ত্তিক নারায়ণ ডহর "বাণী মন্দির" সাধারণ পাঠাগারের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গলার বিক্রমাদিত্য মহারাজা স্যর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রকাশের জন্য গত ৩০শে কার্ত্তিক সৌরভ সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় শোক প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত এবং তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করা হয়।

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার জীবনী অবলম্বন করিয়া নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধ শ্রেষ্ট প্রবন্ধ লেখিকাকে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি এস মহোদয় একটী ৫০৲ টাকা ও একটী ২৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন। অন্যত্র তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

স্থানীয় বিদ্যাময়ী বলিকা বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত সুধীরা মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহিলা সমিতির বিশেষ অধিবেশন হয়। মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই সভায় একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া দেশের মহিলাগণের গার্হস্থ্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় এম, এ, বি, এল মহোদয় বেদ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "বেদতীর্থ" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

পাঠাগার প্রদর্শনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন বড় দিনের ছুটীর সময় এবার লাহোরে হইবে। ইহার সংস্রবে ২৬শে ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে একটী সমগ্র ভারত পাঠাগার প্রদর্শনী বসিবে। ছবির পুস্তক, তরুণ সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বহি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও বিদ্যামন্দির ছবি ইত্যাদি নানা বস্তু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে।

আগামী সরস্বতী পূজার সময়, ১৯শে মাঘ রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, তিন দিন দক্ষিণ কলিকাতাবাসিগণের উদ্যোগে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের সুব্যবস্থার জন্য এক অভ্যর্থনা-সমিতি পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মেলনের এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহোদয়গণ যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীমতী কামিনী রায়, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

এই সম্মেলনের সহিত হস্তলিপি, কারুশিল্প চিত্র, মুদ্রণ এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে।

অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃত আলোচনা সম্ভবপর করার জন্য সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং আগামী পৌষ মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে লেখকদিগের প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার অভ্যর্থনা সমিতির হস্তগত হইলে কার্য্যের সুবিধা হয়। বাঙালী সাহিত্যসেবী মাত্রেই এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য ইহাতে যোগদান করা প্রয়োজন।

এই সম্মেলনের যাবতীয় সংবাদাদি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ সম্পাদকগণের নিকট ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

শিল্পী—হেমনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী বি, এ

ওপারের যাত্রী

সপ্তদশ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। } দশম সংখ্যা।

স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ

(শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস)

আমাদের দেশে যখন মেয়েদের কথা উঠে তখন আমাদের মনে হয় "আহা এরা পেছনে পড়ে আছে, এদের টেনে তুলতে হবে, এরা বড় কৃপার পাত্রী" আমাদের দেশে এত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিলেও এত দর্শনের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও মেয়েদের সম্বন্ধে এই যে একটা ধারণা এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা। আমাদের দেশে এত জ্ঞান অতীতের এত গৌরব থাকা সত্ত্বেও আমরা যে বর্ত্তমান যুগের সকল জাতির পেছনে পড়ে আছি আমাদের যে এত অবনতি এর কারণ শুধু এই যে আমরা মেয়েদের কৃপার চোখে দেখে থাকি। মাতৃজাতির উপর এই আমাদের অশ্রদ্ধার ভাবই দেশটাকে পিছু টেনে রাখ্‌ছে; জাতিকে পঙ্গু ও শক্তিহীন করে রেখেছে। কিন্তু অপরাপর দেশে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, সে দেশের লোকেরা মেয়েদের শিক্ষাকেই জাতীয় কল্যাণ বলে মনে করে, ইংরেজ কবি বলে গেছেন The hand that rocks the cradle rules the world. এ কথাটা আমরা এ দেশে থেকে ভাল করে বুঝতে পারি না। কিন্তু বিদেশে গেলে প্রথমে না হলেও কিছুদিন পরে উপলব্ধি হয় যে, যদিও ইংরেজ পুরুষরা এ দেশের প্রভু, তথাপি প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করছেন ইংরেজ মেয়েরা। দেশের যদি প্রকৃত উন্নতি কর্ত্তে হয়, তবে মেয়েদের উন্নত শিক্ষা দিতেই হবে। সেই শিক্ষায় মেয়েরা যখন শিক্ষিতা হবে, তখন সেই মাতৃ-জাতির পবিত্র স্তন্য দুগ্ধে ছেলেরাও প্রকৃত শিক্ষা পাবে। তাতে শুধু মেয়েদেরই উপকার হবে তা নয়, সমস্ত দেশেরও কল্যাণ হবে। এখানে দাঁড়িয়ে আজ আমি বল্‌ছি আমার স্ত্রী স্বর্গীয়া সরোজনলিনীই আমাকে এ কাজে টেনে এনেছেন। তিনি কোন স্কুলে শিক্ষা পান্‌নি, কোন দিন কলেজে যান্‌নি, তিনি তাঁর প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর দিদিমার কাছ থেকে। তিনি তাঁর দিদিমার কাছ থেকে শিখেছিলেন ব্রত করতে, পূজা করতে, ঘরকন্না করতে, আর তারি ভিতর দিয়ে তিনি শিখেছিলেন কি করে নিজকে নিজের গৃহকে স্বাস্থ্যে সম্পদে মহিমান্বিত করে তুলতে হয়। তিনি শিখেছিলেন প্রকৃত গৃহিণী হতে। গৃহিণী মানেই গৃহ। গৃহিণী ভাল হলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে, গৃহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে। সমাজকে দেশকে গৃহকে কি করে সমৃদ্ধ করে তুলতে হয় শিক্ষার মানে তাই।

অবশ্যি প্রকৃত শিক্ষায় কি বুঝায় তা বুঝতে এখনও আমাদের অনেক দেরী আছে। শিক্ষার মানে শুধু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া নয়, বি, এ, এম, এ পাশ করলেই শিক্ষার সমাপ্তি হয় না। জীবনের প্রতিদিন এমন কি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানানুশীলন করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানে কয়েক খানা বই পড়া নয়, স্কুলের শিক্ষা সোপান মাত্র। আসল শিক্ষা কি তা বুঝতে আমাদের এখনওঅনেক দেরী আছে। এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, বয়স্থা মেয়েদের গার্হস্থ্য শিক্ষা দেওয়া; আর যে সব মেয়েরা গৃহিণী তাঁদের পাকা গৃহিণী হতে শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীর সবদিক থেকে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছেলেমেয়েদের সকলকেই Nursery থেকেই শিক্ষা দিতে হবে, বয়স্থা মেয়েরা যাঁরা তাঁরাই হবে দেশের গৃহিণী। তাঁদের শিক্ষা কেবল বি. এ, এম, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না; তাঁদের প্রকৃত গৃহিনী হতে শিক্ষা দিতে হবে। এ কথাটাই আমাদের দেশ এখনও বুঝছে না।

Canada, Belgium, Japan, England, Holland প্রভৃতি দেশে শিল্প শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ঘরকন্না শিক্ষা গোপালন শিক্ষা, প্রভৃতি দেওয়ার জন্য একদিকে স্কুল কলেজ আছে অন্য দিকে মহিলা সমিতি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের সমকক্ষ হতে হলে সকল বয়স্থা মেয়েদের Domestic science বা গৃহস্থালী বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভগবান যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, সেই সব নিয়ম ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার নূতন নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। আর দিতে হবে Home making শিক্ষা, ঘরকে কি করে সমৃদ্ধ করতে হয় সেই শিক্ষাই দিতে হবে।

আমি বেলজিয়মে গিয়াছিলাম সেখানে বয়স্থা মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা লাঙ্গল চালায়। তাহারা গো পালন কর্‌ছে, তারাই প্রকৃত দুহিতা। সেখানে মেয়েদের College of domestic science আছে। সেখানে Farm management training দেওয়া হয়; আমাদের দেশের স্কুলে বড় বড় বাগান থাকবে। সে সব বাগানে বয়স্থা মেয়েরা সব্‌জি উৎপন্ন কর্‌বেন। স্কুলে মেয়েরা গো পালন শিখ্‌বে, কি করে গরু দুইতে হয়! কি করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করলে খাদ্যে সার ভাগ বেশী থাকে এবং কোন খাদ্যে কি সার এবং কিসে সে সার বজায় থাকে ঐ সব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ইউরোপের মেয়েরা স্কুল কলেজে শিখে কি করে রান্না করতে হয়, কি করলে রান্না ভাল হয় ও রান্নায় সার থাকে। আমাদের মেয়েদেরও তেমনি শিখাতে হবে।

ইউরোপ এমেরিকায় যদি কোন বাড়ীতে কেবল বাজারের জিনিষ দিয়ে ঘর সাজান হয় তবে সেটা অসভ্যতার, সেটা অশিক্ষিতের পরিচয়।

সে সব দেশের মেয়েরা কাপড় বুনতে শিখে, কম্বল বানাতে শিখে, খেল্‌না তৈরি করতে শিখে, বাড়ী ঘর মেরামত করতে শিখে, আর আমাদের দেশে কেবল নিচ্ছে, কিছু দিচ্ছে না। কেবল কিন্‌ছে, কিছু তৈরী কর্‌ছে না। যে দেশ যত বেশী দরিদ্র, সে দেশ তত বেশী নেয়, দেয় না।

জাতীয় জীবন কি করে গড়ে তুল্‌তে হয়, মেয়েরা তা শিখবে। আমি বলি মেয়েদের শিক্ষা হোক, পুরুষদের কথা ভুলে যান। মেয়েরা সুশিক্ষিতা হলে পুরুষরাও তাঁদের কাছ থেকে উদ্দীপনা লাভ করবে। মেয়েদের শিক্ষায় বড় করে তুল্‌তে পারলে তো আমরা বীরের জাতি।

হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হলে গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠিত হওয়ার দরকার। মহিলা সমিতি মানে মেয়েদের একত্র সম্মিলন। তাঁদের কথাবার্ত্তা ভাবের আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে একটা শক্তি গঠিত হয়। তার ভেতর দিয়ে তাঁদের মনে একত্র হয়ে কাজ করবার একটা প্রেরণা আসে। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা মেয়েরাই দিবে। মেয়েরাই স্থানে স্থানে প্রাথমিক কেন্দ্র স্থাপন করবে, কিন্তু দেশের বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ কর্‌তে হবে। ভাগ ভাগ হয়ে নয়। ভাগ ভাগ হয়ে কোন কাজ হয় না। United we stand divided we fall. যার বাংলা আমি করেছি "একজোটে জয়, বিভক্তের ক্ষয়।" মেয়েদের মধ্যে হবে কেবল যোগ, বিয়োগ নয়। আমরা আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একত্রে আমাদের চলার পথে চলব। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারলে লাভ, এই যে মায়ের জাত একা হয়তো কেউ ভুল করে বস্‌তে পারে, বিপথে চলতে পারে, কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে চল্‌লে ভুল করবার ভয় খুব কম। কাজেই

আমরা যেই যা করি, এক বড় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চলবো। তবেই শক্তি বাড়বে কাজের পথ সহজ হবে।

কর্ম্মের শক্তি গ্রামে, সে পশ্চাতে পড়ে আছে। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে নিতেই হবে। তাঁদের ভিতর কাজ করবার যথেষ্ঠ শক্তি রয়েছে, কিন্তু তাঁরা অনেকেই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। সেখানে নেতা কিম্বা নেত্রী হয়ে সম্মিলিত শক্তি গঠন করবার কেউ নেই। এসব বিষয়ে অর্থ সমস্যা খুব বেশী নয়, চাই Organisation. এ জেলার প্রত্যেক গ্রামে ৫ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটি করিয়া মহিলা সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ১২০০০ হাজার। এই দেশে অনেক বড়লোক আছেন, এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয়ে তাহারা যদি একযোগে কাজ করেন এবং দেশের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে প্রাণপণে কাজ করেন, তবে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি এসে পড়বে। এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন সম্মিলিত ও সংহত চেষ্টা।

অর্থ সংগ্রহ করা কিছু কঠিন নয়, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মী সংগ্রহ করাই কঠিন। গ্রামে এমন অনেক লোক আছেন যাদের একটু সুযোগ দিলেই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন। *

টেলিগ্রাফের জন্ম

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল]

অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাপ্রকার সঙ্কেতের দ্বারা দূরবর্ত্তী ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সে কালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, নানা বর্ণের পতাকা অথবা আলোক দেখাইয়া, দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া দূরবর্ত্তী দুর্গে কিংবা সৈন্যদিগকে সঙ্কেত করা হইত। এখনও প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকালে ঐরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেল ষ্টেশনে লাল ও নীলবর্ণের আলোক ও পতাকা দ্বারা ইঞ্জিন চালাইবার অথবা থামাইবার সঙ্কেত করা হইয়া থাকে। আলোক ও পতাকা প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ দ্বারা অধিক দূরে সংবাদ প্রেরণ করা যায় না। এইজন্য প্রাচীন কালে যুদ্ধের সময়ে দূরবর্ত্তী স্থানে অতি সত্বর আবশ্যকীয় সংবাদ প্রেরণের জন্য পত্রবাহী কপোত ব্যবহৃত হইত। এখনও কপোত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে অথবা অপরিচিত স্থানে কপোত সংবাদ বহন করিতে পারে না। বিশেষতঃ ঝড় বৃষ্টির সময়ে কিম্বা কুজ্ঝটিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন থাকিলে কপোত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ অসম্ভব হয়।

ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অতি অল্প ব্যয়ে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ডাকের পত্র যে সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে অনেক সময়ে অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংবাদ প্রেরণ করিতে না পারিলে নানা কাজের অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়া থাকে। টেলিগ্রাফ বা তাড়িতবার্ত্তা আবিষ্কারের পর দূরবর্ত্তী স্থানে অতি সত্বর সংবাদ প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে।

বিদ্যুতের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নানা দেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল যাবত চেষ্টা করিতেছিলেন। কোন্ মনীষী তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের উপায় প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে টেলিগ্রাফ বহু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তির ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে টেলিগ্রাফের ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছেন।

কথিত আছে ইংলণ্ডে স্যর ফ্রান্‌সিস্ রোণাল্ডস (Sir Francis Ronalds) সর্ব্বপ্রথমে তাড়িত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কৌশল আবিষ্কার করেন। রোণাল্ডস্ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে হইতেই তাড়িত শক্তি সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। বড় হইয়া রোণাল্ডস তাড়িত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি কতকাংশে এই বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। রোণাল্ড্‌স্ তাঁহার বাড়ীর বাগানের চারিদিকে আট মাইল লম্বা একটী তার স্থাপন করেন। ঐ তারের দুই প্রান্তে তিনি এইরূপ কৌশলে দুইটী যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে তারের

* স্থানীয় সিটি স্কুলের মহিলা প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে শ্রীপরিমলকান্তি রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ চালিত হইলে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজে সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত হইত। রোনাল্ড্‌স্‌ তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধন করিয়া এই যন্ত্র দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যবহার করিতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ না করিয়া রোণাল্ডস্‌কে জানাইলেন যে টেলিগ্রাফ্‌ প্রতিষ্ঠার কোনই আবশ্যকতা নাই। আজ যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ আফিস একদিনের জন্য বন্ধ থাকে তবে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য একরূপ অচল হইয়া পড়িবে; লোকের অসুবিধার সীমা থাকিবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টই এই টেলিগ্রাফের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম কুক্‌ (Sir William Cook) তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র ইংলণ্ডের কোন কোন রেল ষ্টেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহা অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্স, জর্ম্মানী ও আমেরিকার মনীষিগণও তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আমেরিকার সেমুয়েল ফিন্‌লে মোর্সের (Samual Finlay Morse) চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলবতী হইয়াছিল। মোর্সের উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক বর্ণমালাই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহৃত হইতেছে।

মোর্স আমেরিকার অন্তর্গত চার্লস টাউনে (Charles town) ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া মোর্স চিত্রাঙ্কণ বিদ্যানুশীলনে মনোনিবেশ করেন। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা হেতু তিনি নিউইয়র্ক সহরের চিত্রশালায় প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু চিত্র ব্যবসায় তাঁহার আর্থিক অবস্থার কোনই উন্নতি হইলনা। দারিদ্র্যের তাড়নায় তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দুইবার ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে ও তিনি ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে বিধাতা মোর্সের জন্য এক অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রস্তুত করিতেছিলেন। দ্বিতীয় বার যখন মোর্স ইয়ুরোপে গমন করেন তখন তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না; ইংলণ্ডে থাকিয়াই চিত্র ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডে তাঁহার জীবিকার্জ্জনের কোনই সংস্থান হইল না। ভগ্ন মনোরথ হইয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে তিনি জাহাজে স্বদেশ-যাত্রা করিলেন।

মোর্স জাহাজে যখন একাকী থাকিতেন তখন কেবল তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথাই মনে উদয় হইত। এই সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মী সহসা অঙ্গুলী সঙ্কেতে মোর্সের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিলেন। একদিন জাহাজে কয়েকটী সহযাত্রীর সহিত মোর্স তাড়িত শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তাড়িত শক্তি সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবনের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হইল। কয়েক দিন নিবিষ্ট চিত্তে একাকী এই বিষয়ের চিন্তা করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইলে জাহাজেই তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ও ষ্টিম্‌ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয় নাই। সেকালে পাল খাটাইয়া জাহাজ চালাইতে হইত। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিত। জাহাজ আমেরিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মোর্স তাঁহার টেলিগ্রাফের যন্ত্রের চিত্রাঙ্কন শেষ করিয়াছিলেন এবং জাহাজেই তিনি তাঁহার সাঙ্কেতিক বর্ণমালা ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কাগজের উপর যন্ত্র অঙ্কন করা সহজ কাজ। কিন্তু এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ব্যবহার উপযোগী করা অতি দুরূহ ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোর্স অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বহু ধনী ব্যক্তির নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থী হইলেন কিন্তু কেহই এই দরিদ্র বৈজ্ঞানিককে অর্থ সাহায্য করিলেন না। এইরূপে অর্থ সাহায্য লাভে বিমুখ হইয়া ও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। কয়েক বৎসর অধ্যবসায়ের সহিত কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিলেন তাহা দ্বারা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে একটী টেলিগ্রাফের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। মোর্সের এই অভিনব

যন্ত্র ও উহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। ইহা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি মোর্সের সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিলেন না। কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মোর্স যাহা উপার্জ্জন করিলেন তাহা স্বীয় যন্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা স্থানে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। কয়েক বার গবর্ণমেণ্ট মোর্সের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। নূতন আবিষ্কারের উপকারিতা মানুষ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবিষ্কারককে সকল দেশেই নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিতে হয়। অনেক চেষ্টার ফলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট মোর্সের যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের জন্য একটী টেলিগ্রাফের লাইন খুলিলেন। এত দিনে দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার শ্রম সার্থক হইল। এই লাইনে মোর্স প্রথম সংবাদ প্রেরণ করিলেন "ভগবান্ কি আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছ"। সেদিন মোর্সের হৃদয়ে যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য।

এই সময়ে মোর্সের এক নূতন বিপদ দেখা দিল। মোর্সের যন্ত্রের সফলতা দেখিয়া জেক্সন্ নামক আমেরিকার এক জন অধিবাসী প্রচার করিলেন যে তিনিই প্রথম তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; মোর্স তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্র ও বর্ণমালা দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। জেক্সন্ এই কথা প্রচার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাহার দাবী প্রমাণের জন্য আদালতের আশ্রয় লইলেন। জেকসনের তাড়িত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং টেলিগ্রাফের যন্ত্র উদ্ভাবন করা ত দূরের কথা উহার কার্য্য প্রণালী বুঝিবার শক্তিই তাহার ছিল না। আদালতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জেক্সন্‌কে টেলিগ্রাফের যন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু জেক্সন্ তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। মোর্স অনায়াসে পণ্ডিতদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার যন্ত্রটী খুলিয়া উহার প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া এবং তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের প্রণালী সকলকেই অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। মোর্স জয় লাভ করিলেন। তিনিই টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের ও সাঙ্কেতিক বর্ণ মালার আবিষ্কারক বলিয়া বিচারক নির্দ্ধারণ করিলেন। মোর্সের যশঃ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোর্স জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই তাঁহার উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহারা মোর্সের উদ্ভাবিত যন্ত্র ও বর্ণমালা সাহায্যে টেলিগ্রাফ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে মোর্স অনেক অর্থলাভ করিতে পারিতেন কিন্তু উদার হৃদয় বৈজ্ঞানিক কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। ইয়ুরোপের অধিবাসীরা এই পরম হিতকর আবিষ্কারের জন্য মোর্সকে পুরস্কার স্বরূপে স্বেচ্ছায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মোর্স স্বীয় প্রতিভা বলে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত সকল দেশেই মোর্সের উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যেই তারের সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি ১৪টী স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি ৩৬টী ব্যঞ্জনবর্ণ। এই সমস্ত বর্ণমালার সাহায্যেই কথা সকল লিপিবদ্ধ হয়। ইংরেজীতে মোট ২৬টী বর্ণমালার দ্বারা সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। টেলিগ্রাফের সাঙ্কেতিক বর্ণমালা বিন্দু (•) ও ড্যাস (—) বা ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা গঠিত হইয়াছে। বিন্দু ও ড্যাসের সাহায্যে ইংরেজী ২৬টী বর্ণমালার কাজ করা হয়। একটী বিন্দু ও একটী ড্যাস্ বা ক্ষুদ্র রেখা, যথা •— দ্বারা A অক্ষর বুঝাইয়া থাকে। একটী ড্যাস ও তিনটী বিন্দু যথা, —••• দ্বারা B বুঝাইয়া থাকে। তিনটী বিন্দু যথা ••• দ্বারা C বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে কয়টী বিন্দু ও ড্যাসের দ্বারা ইংরেজী ২৬টী বর্ণমালার কাজ করা হয়। শিক্ষা করিলে ঐ সাঙ্কেতিক বর্ণমালা দ্বারা সকলেই ইংরেজী কথা লিখিতে পারিবেন।

প্রত্যেক 'টেলিগ্রাফ' আফিসে একটী বা একাধিক যন্ত্র আছে। এক আফিসের যন্ত্রের সহিত

অপর আফিসের যন্ত্রের তারের যোগ আছে। তাড়িত, তারের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক আফিসের যন্ত্র হইতে অন্য আফিসের যন্ত্রে সাঙ্কেতিক শব্দ বহন করিয়া নেয়। প্রত্যেক যন্ত্রের উপরিভাগে অঙ্গুলীর মত মোটা ৫। ৬ ইঞ্চি লম্বা একটী হাতুল আছে। হাতুলটিকে বলে চাবি। হাতুলের একপ্রান্তে একটি উচু বোতাম সংলগ্ন থাকে। সেই বোতামটিতে আঙ্গুল দিয়া টোকা দিলে "টক্" "টক্" শব্দ হয়। টেলিগ্রাফ করিবার সময় এই টক্ টক্ শব্দ শুনা যায়।

মনে করুন কলিকাতা হইতে ঢাকায় তারের সংবাদ পাঠান হইবে। টেলিগ্রাফের তারের এক প্রান্ত কলিকাতার আফিসের যন্ত্রের সহিত এবং অপর প্রান্ত ঢাকা আফিসের যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন আছে। কেরাণী সংবাদ পাঠাইবার সময় অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া হাতুলের বোতামে টিপ দেয়। বিন্দু বুঝাইতে হইলে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী টিপ্ দিতে হয় এবং ড্যাস বুঝাইতে হইলে তদপেক্ষা একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী টিপ দিতে হয়। চলিত কথায় টেলিগ্রাফের সাঙ্কেতিক বিন্দুকে "টরে" এবং ড্যাসকে টক্কা বলে। কলিকাতায় যন্ত্রের বোতাম টিপিয়া "টরে টক্কা" শব্দ করিলে ঐ শব্দ বিদ্যুতের সাহায্যে তারের ভিতর দিয়া ঢাকায় যন্ত্র ঠিক এরূপ 'টরে টক্কা' শব্দ উৎপন্ন করিবে। ঢাকার কেরাণী কলিকাতা হইতে প্রেরিত শব্দ শুনিয়া যখন যে অক্ষরের সাঙ্কেতিক শব্দ হইবে তখনই সেই অক্ষরটি কাগজে লিখিয়া ফেলিবে। এইরূপে কলিকাতা হইতে প্রেরিত অক্ষর দ্বারা বিভিন্ন শব্দ গঠিত হইবে। সমস্তগুলি অক্ষর লিখিত হইলেই একটী তারের সংবাদ প্রস্তুত হইবে।

আধুনিক সময়ে টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি তারের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে বিনা তারে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে বিনা তারে কেবল তাড়িতের তরঙ্গ দ্বারা স্থানান্তরে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তৎকালে জগদীশচন্দ্র অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুশীলনে ব্যাপৃত থাকায় তিনি বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণের চেষ্টা করেন নাই। জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারের অব্যবহিত পরে ইটালি দেশীয় 'মার্কনি' নামক একটী অসমান্য প্রতিভাবান যুবক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা সংবাদ প্রেরণের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। (Marcani) মার্কনি প্রথমে তাঁহার বাটী সংলগ্ন একটী বাগানে নিজের প্রস্তুত সাধারণ একটী যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। মার্কনি বাগানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তারপর মাঠে গিয়া সেই যন্ত্র সাহায্যে তিনি দুই মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

অতঃপর মার্কনি তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়ে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইটালির গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। স্বদেশে নিরাশ হইয়া মার্কনি ইংলণ্ডের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সার উইলিয়ম প্রিসের (Sir William Preece) নিকট তাঁহার আবিষ্কারের কথা লিখিলেন এবং ইংলণ্ডে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। প্রিস্ মার্কনিকে ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিলেন। মার্কনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন মার্কনির বয়স ১৯ বৎসর মাত্র। প্রিস্ শীর্ণদেহ তরুণ যুবক মার্কনিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই যুবক তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে ইহা প্রথমে তাঁহার বিশ্বাসই হইল না। কিন্তু কিছুক্ষণ মার্কনির সহিত আলাপ করিয়া প্রিস্ মার্কনির তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন।

মার্কনি ইংলণ্ডের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহার যন্ত্রের কার্য্যকরী শক্তির প্রমাণ প্রদান করিলেন। তারপর তিনি ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়া সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাশ্চার্য্য আবিষ্কারের উন্নতি সাধনের জন্য মার্কনিকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিলেন। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া মার্কনি অধিকতর দুরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল প্রদেশে একটী যন্ত্র

স্থাপন করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া নিউ ফাউণ্ড্‌লেণ্ড্‌ দেশে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি একটী বিশাল ঘুড়ি প্রস্তুত করিলেন। অনেকেই তাঁহার অসাধারণ বৃহৎ ঘুড়ি দেখিয়া মনে করিল এই লোকটার নূতন রকমের ঘুড়ি উড়াইবার খেয়াল হইয়াছে। মার্কনি তাঁহার সেই সুবৃহৎ ঘুড়ির সহিত একটী সংবাদ ধরিবার যন্ত্র (Receiving instrument) সংযুক্ত করিলেন। সুতার পরিবর্ত্তে টেলিগ্রাফের তার দিয়া সেই ঘুড়ি উড়াইবার ব্যবস্থা হইল। তারের এক প্রান্ত ঘুড়ির সহিত এবং অপর প্রান্ত ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত একটী তাড়িত যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইল। একদিন মার্কনি একটী উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অদ্ভুত ঘুড়ি উড়াইয়া দিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণানুসারে সেই দিন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কর্ণওয়াল্‌ হইতে মার্কনির যন্ত্র সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইল। সেই সংবাদ মার্কনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তাঁহার ঘুড়িতে সংযুক্ত সংবাদ ধরা যন্ত্র সাহায্যে শুনিতে পাইলেন। মার্কনির বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। ইহা ১৯০১ সনের কথা।

এখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। একদিন পৃথিবীর কোন লোক কল্পনাও করিতে পারিত না যে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হইতে পারে। মোর্স সেই কার্য্য সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মার্কনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে নব যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হওয়াতে আমরা দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে অত্যল্প সময়ে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। তাহাতে দেশ সুশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নানাবিধ কাজকর্ম্মের যথেষ্ঠ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল তীর হইতে বহুদূরে সমুদ্রপথে বিপদগ্রস্ত হইলে সে বিপদ অন্য কাহাকেও জানাইবার কোনও উপায় ছিল না। এখন সমুদ্রগামী জাহাজ সকলে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। জাহাজে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এই যন্ত্র দ্বারা টেলিগ্রাফ করিয়া অন্য জাহাজের লোককে কিম্বা দূরবর্ত্তী নগরে সেই সংবাদ দেওয়া যায়। সুতরাং এখন সহজেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রেরণ করা যাইতে পারে।

এখন পূর্ব্বোক্ত তারহীন সংবাদ প্রেরণ যন্ত্রদ্বারা মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত সঙ্গীতধ্বনি বহু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইতেছে। কোন সুগায়ক বোম্বাই সহরে বসিয়া গান গাহিলে তাহা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে শুনান যাইতে পারে। কলিকাতা সহরে গীত সঙ্গীত ঐকান্তিক বাদ্য ও বক্তৃতাদি দুই তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী পল্লীর অধিবাসীগণ শুনিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপারের কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

দিবা স্বপন

(শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

আজ দুনিয়ার গগন ভুবন ভরেছে আর্ত্তনাদে!
যত দুর্ব্বল দিশেহারা হয়ে নিয়ত কেবলি কাঁদে!
সকল রকমে নিঃস্ব সবাই,
তবু তাহাদেরে করিছে জবাই,
তারা অবিচারে ডাকে বারে বারে কাঙ্গালের ভগবানে!
বুড়া ঈশ্বর আছে কাণ খেয়ে, কিছুই শুনেনা কাণে।

আমি যে উদাসী আমারো হৃদয় কেঁপেছে অত্যাচারে;
ছুটে যেতে চাই, শুধু বাধা পাই অবিরত চারিধারে।
আষ্টে পৃষ্টে হায় কি বাঁধন!
বিফল হবে কি জীবন সাধন?
বোধনের বেলা রোদনে আমার সাধের স্বপন ভাসে!
কণ্ঠ নীরব হয়ে আসে ক্রমে গভীর হতাশ্বাসে।

কে আছিস্ ভাই শক্তিমন্ত, বাধা ভেঙ্গে কর গুঁড়া!
চাল্‌সে ধরেছে নয়নে যদিও, তবু কভু নহি বুড়া।
এখনো সঙ্গে পারিব চলিতে,
সকল দুঃখ ছুটিব দলিতে,
বিলাস-ব্যসন-পঙ্কে ডুবিনি, হৃদয় যায়নি মারা;
কান্না-কাতর কাঙ্গালের কথা করে যে পাগলপারা!

মানুষ আজিকে মানুষের কত করিছে সর্ব্বনাশ!
কেহ কারো নয়—এই মনে হয়, গলে দিতে চাহে ফাঁস
দাস-মনোভাব রয়েছে যাহার,
জুটিছে তাহার প্রচুর আহার,
স্বাধীন সত্য-সেবকের সবে পিষিয়া মারিতে চায়!
সংসার হোলো নারকি-নিবাস, প্রাণ করে হায় হায়।

হবে চিরকাল সত্যের জয়—একথা যায়নি ভুলি';
আছে আজো হেথা প্রাক্তন মুনি ঋষিদের পদধূলি!
পূর্ব্বেও ছিল দেবতা দানব,
ছিল ঘরে ঘরে প্রকৃত মানব,
তাদের বংশ হয়নি ধ্বংস, আসিবে নবীন দেহে;
নূতন স্বর্গ নামিবে আবার সকলের গেহে গেহে!

জগতে তাহার পেতেছে আভাস; থাক্ ভগবান্ চুপ।
তেত্রিশ কোটি দেবতারে দিয়ে ভরাও অন্ধকূপ!
জপ তপ আর কোরো না মিছাই,
ফুল চন্দনে করিছ কি ছাই?
চলিবে নবীন পূজা-পদ্ধতি সঙ্ঘশক্তি বলে;
মালা দাও এবে দেবতারে ছাড়ি' মহামানবের গলে!

ভাগ্যবন্ত, সম্বল করি' লোটা কম্বল কাঁথা—
গাও দেশে দেশে শাক্ত-কর্ম্মী-গুণী গৌরব-গাথা!
নিজেরা ত্যজিয়া আরাম-শয়ন
ভিতরে ফিরাও জাতির নয়ন!
'মানুষের' মানে হুঁস্ হয় যদি তখনি মানুষ হবে;
সমবেদনায় সমানে সমানে সেদিন ছুটিবে সবে।

পদপৃষ্ঠেরা বিচার না পেয়ে হয়ে আছে থতমত;
শুষ্ক বারুদ হয়ে আছে সহি' যন্ত্রণা অবিরত।
তোমরা, বন্ধু, হয়ো না নিদয়!
তাতায়ো না আর, তিতাও হৃদয়!
দুঃখ বিদুরি, সোজা পথ ধরি' চলিতে শেখাও এবে
তাজা প্রাণ নিয়ে বাহিরিয়া এসো, মরিতেছ কেন ভেবে?

জগৎ জুড়িয়া ছুটিছে সবাই, করিছে একটা-কিছু;
আমরা ক্রমশঃ হটিতে হটিতে পড়েছি অনেক পিছু।
তথাপি দম্ভে উড়ায়ে নিশান,
কাহারা ও-সব ফুঁকিছে বিষাণ?
গোলামের জাতি সেলাম ঠুকিতে এখনো চাহিছে চুপে?
দাম্ভিক নহে দেশের সেবক, যা করে মিথ্যা ছুপে!

দিবস-স্বপন দেখিতে দেখিতে ফুরায়ে আসিছে দিন!
যতটুকু পারি পরিশোধ করি' যাবো স্বদেশের ঋণ!
আলোর পিপাসা হৃদয়ে পুষিয়া
যাবো সোজা পথে সত্য তুষিয়া,
যে-আশা জীবনে বাসা বেঁধে আছে, ভাষা তার বাজে প্রাণে
মরণের পরে পাবে সে জীবন জাতীয় ঐক্যতানে।

প্রকৃত মানব, দরদী বন্ধু মরিনু মিছাই খুঁজি'!
ফাঁকা-যশলোভী স্বার্থের দাসে ধরা ভরে' গেছে, বুঝি!
সকলের ব্যথা বুঝিবে এমন
মানুষ কোথায়? দেখিতে কেমন?
এত বড় হিয়া কোথা পাবো গিয়া? কোথায় সে আছে লুকি'?
তার আগমন করিয়া মনন জীবনটা দিনু ফুঁকি'!

নিরাশার মাঝে আছে আশা, কান্নার মাঝে হাসি;
যাতনার মাঝে রয়েছে শান্তি সকল দুঃখনাশী!
বারিদের মাঝে রয়েছে দামিনী,
হেরিব অরুণ যদিও যামিনী,
পতনের মাঝে উত্থান আছে, মরণের মাঝে প্রাণ;
সত্য রয়েছে স্বপনের মাঝে; আমি গাহি সেই গান!

কিশোরগঞ্জের শিব সঙ্গীত

[শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়]

প্রাচীন বাংলার প্রিয় দেবতা ছিলেন শিব। সেই জন্য সকল দিক দিয়া ভক্তপ্রাণ নরনারীর অর্ঘ্য নিবেদন তাঁহারই উদ্দেশ্যে অর্পিত হইয়াছে বেশী। গত বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণকে তিনি নিজ ক্যাপা স্বভাব দ্বারা এমনি ক্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহারা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে একজন গৃহীর আসনে বসাইয়া নিতান্ত আপনার মত করিয়াই পূজা অর্চ্চনা করিয়াছিল। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানে শিবই ছিলেন প্রধান হোতা। ফলে তাহার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া পল্লী কাব্যের অধ্যায় পরিপূরিত হইতে লাগিল। উৎসবে আনন্দে পথে ঘাটে অন্য শত প্রকার সঙ্গীতের সাথে শিব সঙ্গীতর সুরের রেশ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই সময় হইতে শিব-পর্ব্ব ও অনুষ্ঠানের শিব-পর্য্যায়ে সামাজিক আচার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে পরিপ্লাবিত।

পল্লীর এই সকল শিব সঙ্গীতের পরম বৈশিষ্ঠ সেখানে শিবকে প্রায়ই সংসারের একজন হিসাবে এক কথায় একান্ত সংসারীর মত চিত্রিত করা হইয়াছে। মেয়েলী সঙ্গীতের আশ্রয় স্থল অনিন্দ্য পাত্র হিসাবে তাহার গুণ বর্ণনা আছে, কৃষক মহলে স্ত্রীকন্যা পরিবৃত সংসারের সুখ দুঃখ পীড়িত আদর্শ গৃহস্থের মত তিনি সম্পূজিত হইয়া থাকেন আবার সাংসার মত্ততার অন্তরালে সিদ্ধিপায়ী প্রচ্ছন্নযোগীর আসনে বসিয়া লোকের অর্ঘ্যগ্রহণ করিতেও আমরা তাহাকে দেখিতে পাই।

কিশোরগঞ্জের মেয়েলী সঙ্গীতে লোকের বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত শিব দেবতা হইয়াও ঠিক মানুষের মতই তাহাদের সুখ দুঃখে বিজড়িত। বিবাহ পর্য্যায়ের প্রতি স্তরে তিনি একাধারে বিবাহোপযুক্ত কুমার; বিবানুষ্ঠানের ভিতর সুশোভিত বর তারপর নব বধূর প্রেম-পরশজড়িত সত্যকার গৃহী। এইসব গীতিগুলিতে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সংসার জীবনের উল্লেখযোগ্য শুভানুষ্ঠানে শিবকে উপস্থাপিত করিবার একমাত্র কারণ সব বিষয়েই তিনি আদর্শ ও পরোমৎকৃষ্ট বিবেচিত হইতেন।

হিন্দু বিবাহের প্রারম্ভে বর যাত্রার গীতি ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে আর সেখানকার জামতা স্বয়ং শিব।

(নন্দীরে) সাজ শীঘ্র করি যাইতে হইবে
গিরিরাজ ভবনে
আন বাঘাম্বর দেও সত্বর পরণে
আন সিদ্ধের ঝুলি ভস্ম রুলি
মাখিব বদনে।
(নন্দী রে) শুইনে লোকের মুখে দেখব তাকে
বাঞ্ছা হইল মনে
শ্বশুড়বাড়ী স্বর্গপুরী বলে সর্ব্বলোকে
আমি কি দেখাব শ্বশুর দেশে
ভাঙ্গ ধুতুরা বিনে
যাইতে হইবে গিরিরাজ ভবনে।

(২)

দেখ দেখ আরে সখি হিমালয় ভবন
চণ্ডিরে করিতে বিয়া শিবের আগমন
বাইরে বইসে যত দেবগণ
চান্দুয়ার মধ্যে শিব কমললোচন
পুরন্দরে ছত্র ধরে শিবের উপর
নারদ বাতাস করে লইয়া চামর
সখি গিয়া বার্ত্তা লইল মেনকার কাছে
মেনকার রঙ্গ হইল জামাই দেখিবারে
ডাইন হাতে ধান্য দুর্ব্বা বাতী বাম হাতে
স্বস্তি বলিয়া দুর্ব্বা দিল তাহার মাথে।

বিবাহের সময় বর কন্যাকে শিব ও উমার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। শিব ও উমার মিলন-কাহিনী এই সমস্ত ব্যাপারের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার মাপকাঠি। প্রগাঢ় ভালবাসা; পতি বা পত্নী-প্রেম পরিমাপ করার ইহাই গ্রামের চিরন্তন সামাজিক প্রথা।

চল রঙ্গ দেখি গিয়া
আট বছরের গৌরীরে শঙ্করে করে বিয়া
পুবমুখে রইছেন শিব গো বাঘ ছাল পরিয়া
পশ্চিমমুখী হিমালয় গো গৌরী কুলে লইয়া
মাইয়া দান কইরা বাপে ফুরাইল দায়
জ্বালাইয়া তুষের আগুন দিল মায়ের গায়

ডাকপাটের ছড়া চৈত্রমাসে হরগৌরী পূজা উপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। ডাকপাট ছড়া সর্ব্বাঙ্গীনভাবে শিব সঙ্গীত। সুসজ্জিত সমাজদার গায়ক যুবাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া নৃত্য সহযোগে হরগৌরী নাটক অভিনয় করেন আর ইহার মধ্য দিয়া ক্ষ্যাপা শিবের মত্ততা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আন্দোলিত করিয়া দেয়। পূজারীর দল নৃত্য গীতের সাহায্যে প্রতি ঘর হইতে পূজার ডালি গ্রহণ করে এবং পরিশেষে এক পূজায় হরগৌরীর অর্চ্চনা সম্পাদন করে। এই সময়কার সঙ্গীতগুলি অনেকাংশে শিবের ক্ষ্যাপোন্মত্তার দিকটা পরিস্ফুট করে। তবে কিছু কিছু করুণ চিত্র গঠিতও বটে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটী শিবের তাণ্ডব মত্ততা ও আনন্দ উচ্ছ্বাস সংযুক্ত অবস্থা পাঠকের নিকট পরিস্ফুচিত করিবে।

আইলাইন পার্ব্বতী ছুড়াইলান বলদ
অরুই দৌড়ে গেল শিব কুচুনীনগর
কচুনীনগর গিয়া গো শিব বীণায় মাইলান টান
ভাল ভাল কুচের নারী ধরিল যুগান
কেউ লইল ধান্য দুর্ব্বা কেউ লইল ঝাড়ি
হীরার কচুনী লইল সিন্দের বুগলী
তিনদিনের উপাসী গো শিব মুখখানি চামুক
হাড়ী ডিম পাতিলা ডিম রাইন্ধা ভোজন করুক
গাওয়া ব্যাঙের ঘটঘটানি কাট্যা ব্যাঙের ঝাল
কোনি ব্যাঙের অম্বল তিন বেন্নুনই ভাল
ছি ছি গিন গিনি ভাই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তিন পুষ্যে ব্যাঙ নাহি খায়
কাল খাইয়াছে ভাঙ্গ ধুতুরা আজ খাইয়াছে বিষ
এ কারণে বুড়্যা শিব পথের না পায় দিশ
উমমুড়িয়া মারে কিল খুমমুড়িয়া উঠে
বুড়া মইল বুড়া মইল কুচুনী বুক কোটে
আয়রে বুড়া তোর গায় দেই তেল
ছয়োনা গো মা বইন সকল কিলে পরাণ গেল
আছে বুড়া শিব মা ডাকিলে কারে
আইযুক কচুনী তোরে যে শাস্তি করে
আমে বাহুর নী ভাই
শিবে যে ভাঙ্গ খাইয়া নৃত্য করছিল
নাচখান দেখতে চাই

ছড়াটী সমবেত ধ্বনির ভিতর রঙ্গ রস ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হওয়ার পর গায়কদলের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়। এবং নৃত্য প্ররোচনার ইঙ্গিত "ওরে যাদুয়ালী ভাই শিব যে ভাঙ্গ খাইয়া নৃত্য করছিল সেই নাচখানা দেখাও চাই" একথা কয়টির সাহায্যে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের শিব অনেকাংশে ত্রিনাথ নামে সুপরিচিত দিনের শেষে গৃহে মাঠে সর্ব্বত্র ত্রিনাথের নাম করিয়া সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে।

দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও সাধুরে ভাই
ফুল দিয়া সাজাওরে ভাই ত্রিনাথের ছবি
অনায়াসে তরইয়া যাইবে যমকে দিয়া ফাঁকি।
ত্রিনাথের নাম লইয়া যেবা যাত্রা করে
সাপে নাহি দংশে তারে বাঘে নাইসে মারে
ও সাধু ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।

গাঁজা ও ভাঙ্গের আড্ডায়ই ত্রিনাথদেবের সত্যিকার প্রতিপত্তি সেখানকার প্রত্যেকটী লোকই নিজকে সদাশিবের চেলা বলিয়া মনে করে। এবং সিদ্ধি ভাঙ্গ সমস্তই তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া পরে প্রসাদরূপে নিজেরা গ্রহণ করে। এ সময়কার সঙ্গীতগুলি শিবের এদিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তাণ্ডব মত্ততার হাস্যরসিক উপাদান ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট একটী চৌকির উপর বিল্বপত্র ও ফুল সহযোগে সাজাইয়া ভক্তের দল আত্মভোলা হইয়া ত্রিনাথ সঙ্গীতে মত্ত হয়।

আইল বাবা কাশীনাথ যোগিয়া
বোম্ বোম্ ভোলা আইল নাচিয়া।
তুমি ভূতের নাথ ও মহাদেব
তুমি ভাঙ্গ খাও ধুতুরা খাও

গাইলের মধ্যে কুটীয়া,
ফুলা দিয়া টেকিয়া।

ও টেকিয়া, ব্যোম ব্যোম ভোলা আইল নাচিয়া
তুমি ভূতের নাথ, ও মহাদেব, ভূতের নাথ
ভূতের পতি, ভূত লইয়া কর বসতি

সদায় যুগাও ভূতের মান ;
কেমনে নিবে কলির জীব তড়াইয়া
ব্যোম ব্যোম ভোলা আইল নাচিয়া
আইল বাবা কাশীনাথ যোগিয়া।

হেড্ মাষ্টার বাবু।

[শ্রীবীরেশ্বর বাগচী বি, এ]

(নক্‌সা)

হেড্‌মাষ্টার বাবুর বারান্দায় রোজ বিকালে সভা বসে। এ সভার সভ্য হচ্ছেন সাধারণতঃ শিক্ষকেরাই। বাইরের লোকও মাঝে মাঝে দু'একজন এসে বসেন। এখানে সমস্ত বিষয়েরই সমালোচনা হইয়া থাকে। শিক্ষক মহাশয়দের প্রত্যেকেই একজন তীব্র সমালোচক। পাঁচু পানওয়ালা থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সমালোচনাই এঁরা নির্ব্বিকারে সমানভাবে করে থাকেন। কারো বেলায়ই এঁদের ভাষা অপেক্ষাকৃত সংযত কিম্বা অধিকতর অসংযত হয় না। কিন্তু এ সমস্তই Strictly Coterie criticism বলে এর কিছুই বাইরের লোকের কানে উঠ্‌তে পারে না, উঠা এঁরা পছন্দও করেন না। গুহ্য পারিবারিক কুৎসার মতন প্রত্যেকেই এগুলি নিজেদের মধ্যে অতি যত্নে গুপ্ত রাখেন।

রোজ যেমন বসে তেমনি আজ সন্ধ্যায়ও সভা বসে বসে হয়েছে। হেড মাষ্টারবাবু স্থায়ী সভাপতি হলেও, এখন ও বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নাই। উপস্থিত, সদররাস্তার দিকে মুখ করে, বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে আছেন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার কালাচাঁদ বাবু, এবং সহকারী শিক্ষক গোবর্দ্ধন বাবু। গোবর্দ্ধন বাবু বল্‌ছেন —"যাই বলুন, এভাবে abdicate করা আমানুল্লার পক্ষে ঠিক হয় নাই। ইনায়েৎ-উল্লা আমীর হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনিওত তেমন Competent hand নন। আজীবন ছাপাখানার কালী ঘেঁটেই কাটালেন এখন কিনা হলেন আমীর! কালাচাঁদ বাবু Historyতে honours নিয়ে B. A. পাশ করা লোক Creasyর Fifteen Decisive Battles of the world বেশ ভাল কের পড়েছেন। তাই, মুরুব্বিয়ানা সুরে বল্‌লেন—"দেখুন, ঘরে বসে এ সব বিসয়ে সমালোচনা করা চলেনা। ঘটনা স্থলে গিয়ে Prevailing Circumstances গুলো ভাল করে Study না করলে ঠিক্‌ঠাক্ কিছু বলা যায় না!" গোবর্দ্ধন বাবু সায় দিলেন... "তা ঠিক—তবে কিনা খবরের কাগজ থেকে যা বোঝা যায় তাতে কাজ ঠিক করেন নাই বলেই মনে হচ্ছে। গোবর্দ্ধন বাবুর এ ভাবে আত্মমত সমর্থনের প্রয়াস কালচাঁদবাবু সইতে পারলেন না। বল্‌লেন—ও বোঝার কোন মূল্য নেই। History থেকে একটা Concrete example দিচ্ছি। এই ধরুন Waterlooর যুদ্ধ —Millitary details সব মনে আছে?" গোবর্দ্ধন বাবু বল্‌লেন—Note পড়ে short cut করেছিলাম কিনা Lodge এর ঐ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত ভাল manage করে উঠ্‌তে পারি নি—তা কিছু কিছু মনে আছে বই কি?" কালাচাঁদ বাবু উপদেশ দিলেন—"ওসব কর্ত্তে নেই। Original বইটা না পড়লে ঠিক্ Idea হয় না। ছেলেরা স্কুলে যাতে note না পড়তে পারে সে দিকে ও একটু দৃষ্টি রাখবেন। যা বলছিলাম—Marshal Neyকে Napoleon Quartrebras দখল কর্ত্তে পাঠালেন। Quartrebras থেকে এক মাইল তফাতে Camp ফেলে Ney খবর পাঠালেন—দখল হয়েছে। সকালে উঠে দেখা গেল Wellington আগেই Quartrebras দখল করে বসে আছেন। এখন মিথ্যে খবর পাঠিয়ে Ney বাহ্যতঃ একটা মস্ত বড় অপরাধ করলেন—ফলে Napoleonকে হারতে হল! কিন্তু ভিতরের ব্যাপার অনুসন্ধান করলে তাঁকে মোটেই দোষী সাব্যস্ত করা চলে না, কারণ তিনি যেখানে এসেই Camp ফেলেছিলেন, সেই পর্য্যন্ত এসেই ফরাসী সৈন্যেরা সারাদিন forced march করার ফলে tired হয়ে মাটীতে শুয়ে পড়েছিল—চলার শক্তি তাদের আদৌ ছিল না। তখনকার খবরের কাগজে আমানুল্লার খবরের মতন এই খবরটাও উঠেছিল—তখনও আপনার মত লোকেরা তাই পড়েই Neyকে একটা মস্ত বড় বিশ্বাসঘাতক ঠাউরে বসেছিলেন। কাগজের খবরের এই ত মূল্য!

গোবর্দ্ধন বাবুর উপরে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের তেমন সুদৃষ্টি না থাকায়—দূর ভবিষ্যতে কালাচাঁদ বাবুর হেডমাষ্টার হওয়ার রকম সাড়ে এগার আনা সম্ভাবনা বিদ্যমানে এবং "States-

man" এর "Wanted"'এর পিছনে প্রতি মাসে সাত আট টাকা ব্যয় করেও কোন সুবিধা না হওয়ায়, গোবর্দ্ধনবাবু কখ্‌খনো কালাচাঁদবাবুর উপরে কোন কথা বলতেন না—"দুর্জ্জনং প্রণিপাতেন" নীতি অনুসারে সর্ব্বদাই তাঁকে মুরুব্বি মান্য করে চলতেন। তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ না করে, ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, Press billটা কি Assemblyতে Pass হবে বলে মনে হয়?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—European membersদের ভেতরেও দল হয়ে গেছে কিনা!" হেঁ হেঁ করে হেসে গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"এ সব বিষয়ে আপনিই হচ্ছেন আমাদের authority আপনিই যদি না বুঝতে পারেন তবে কে আর বুঝবে!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"Politicsএর চর্চ্চা কিছুদিন করেছিলাম কিনা!"

এই সময়ে অঙ্কের মাষ্টার শচীন্দ্রবাবু এসে বারান্দায় উঠলেন এবং কোন কথা না বলে কালাচাঁদবাবুর গা ঘেঁসে থপ করে বসে পড়লেন। হেডমাষ্টার বাবুর অনুপস্থিতে কালাচাঁদ বাবুর স্কুলের ভিতরে এবং বাইরের সকলের কাছেই হেড্‌মাষ্টার সাজেন—অনেক স্থলে তিনি হেডমাষ্টার বাবুর চেয়ে ও যে অধিকতর কার্য্যদক্ষ সে কথাও ইঙ্গিত কর্ত্তে ছাড়েন না। শচীন্দ্র বাবুর এমন বেখাতির ভাবে এসে গা ঘেঁসে বসা, কাজে কাজেই, তাঁর পছন্দ হলনা। ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে শচীন্দ্র বাবুর পানে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন second classএর ঐ Mathematicsএর Marksheet Submit করেছেন?" হেডমাষ্টারবাবু আপনাকে জিজ্ঞেসা কর্ত্তে বলেছিলেন।" কথাটা একেবারে মিথ্যা—হেডমাষ্টারবাবুর নামে তিনি অমন ঢের কথা চালিয়ে থাকেন। শচীন্দ্রবাবু জবাব দিলেন—"না শিগ্‌গিরই কর্ব্ব।" এজবাবে খুসী না হয়ে বিষণ্ণমুখে কালাচাঁদ বাবু বল্লেন "কি যে করেন বুঝি না—অঙ্কের কাগজ ফল মিলিয়ে নম্বর দেওয়া ছাড়া ত আর কিছু নয়—এতেই এত দেরী করেন—history কিম্বা ইংরিজীর paper হলে যে একেবারে নেতিয়ে পড়্‌তেন! শচীন্দ্রবাবু কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে বসে রইলেন!

কিছুক্ষণ পরেই এসে জুটলেন হেডপণ্ডিত। পণ্ডিত মশায় সদাই সপ্রতিভ এসেই বল্লেন—"বাঃ আপনারা আজ অগ্রেই সমবেত হয়েছেন দেখ্‌ছি—আমাদের শচীন্দ্রবাবুর বিরস বদন কেন?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"হেড্‌মাষ্টার বাবুর instruction মত ওঁকে কয়েকটা unpleasant কথা বলতে compelled হয়েছি—বোধ করি তাতেই offence নিয়ে থাকবেন।" বেঞ্চের এক কোণে বসে পণ্ডিত মশায় বল্লেন—সে কি কথা! দাঁতের কামড় জিভে লাগ্‌লে কি কেউ কখনো দাঁতের উপরে অসন্তুষ্ট হয়! ক্ষুব্ধ হবেন না শচীনবাবু আপনি একটু হাসুন আমরা দেখি।" মনে যাই থাকুক না কেন, মুখে শচীন্দ্রবাবু বল্লেন—"না-না আমি ক্ষুব্ধ হই নাই—একটা কথা চিন্তা কর্চ্ছিলাম মাত্র!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"অতি উত্তম! চিন্তার বিষয়টী যদি বন্ধুমণ্ডলী সমীপে প্রকাশযোগ্য হয়, তবে আপনার চিন্তাভারাংশবাহী হয়ে আমরাও কৃতার্থ হই—কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনি একটু হাসুন—মসী-কৃষ্ণ মেঘমণ্ডল "দংষ্ট্রাময়ূখৈঃশকলানি" করুন—সূর্য্যরশ্মি প্রকাশমান হোক!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—ওঁর জন্যে কারো দু'দণ্ড গম্ভীর হয়ে থাকার যো নাই। শুনুন—আমি ভাব্‌ছিলাম—কদিন থেকেই ভাব্‌ছি—এই আপনার গণেশ ঠাকুরের কথা!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—চমৎকার! দেব বিষয়ক ভাবনা অতি উৎকৃষ্ট--"যাদৃশীর্ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"--কি ভাব্‌ছিলেন?" মৃদু হেসে শচীন্দ্রবাবু বল্লেন--"ভাব্‌ছিলাম এই ধরুন, ঠাকুরের মাথাটা হচ্চে গিয়ে হাতীর—শরীরটা মানুষের এ অবস্থায় তিনি খাবেন কি? মুখ যা খাদ্য বলে গ্রহণ কর্ব্বে, পেট তা সইতে পার্ব্বে না—আবার পেটে যা সইবে মুখ তাতে তৃপ্তি পাবে না। এখন উপায় কি?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—Most original conception! জবাব দিন পণ্ডিত মশায়। "পণ্ডিতমশায় বল্লেন—"জবাব অতি সোজা! আমাদের মতন দেবতাদের দৈনিক আহারের বালাই নাই—তাঁরা সবাই অমৃতপায়ী। একবার অমৃত পান করলে কখ্‌খনো ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয় না।"

শচীন্দ্রবাবু কি যেন একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাড়ীর ভিতরে "সপাং সপাং" বেতের আওয়াজ এবং সঙ্গে একটী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনা যাওয়াতে সবাই চুপ্‌ করলেন। স্ত্রীলোকটী

বল্‌ছিল—"পায়ে পড়ি—আর মেরো না ঠাকুর পো—ভাইয়ের চাক্‌রীর জন্যে আর কখনো তোমাকে অনুরোধ কর্ব্ব না।" চাপা গালায় হেড্‌মাষ্টারবাবুকে বল্‌তে শোনা গেল—"চুপ্‌-চুপ্‌ বাইরে লোক রয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে "সপাং" 'সপাং" শব্দ বেড়ে উঠ্‌ল। আবার আর্ত্তনাদে শোনা গেল—"না-না পায়ে পড়ি—মুখ বেঁধো না—চুপ্‌ কর্চ্ছি।" খানিকক্ষণ বেতের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না—মিনিট তিনেক পরে একটা স্ত্রীকণ্ঠ বল্‌ল—"আঃ ছাড় না--খুন কর্ব্বে নাকি!" বেত থেমে গেল।

গোবর্দ্ধনবাবু বল্‌লেন—"বড় ভাই বউকে বেতাচ্ছেন বুঝি! হেড্‌মাষ্টারবাবুর যে লঘুগুরু জ্ঞান নাই এটা বড়ই দুঃখের বিষয়!" কালাচাঁদ বল্লেন—একেবারে devoid of common sense Brute!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"ব্রাহ্মণ কন্যা স্থানান্তরে গেলেও ত পারেন—শাস্ত্র বল্‌ছে —"ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণং।" শচীন্দ্রবাবু বল্‌লেন—"এর প্রতিবাদ করা উচিত। আমার মনে হয়, জেনে শুনেও চুপ্‌ করে থেকে এঁকে আমরা যে indirect indulgence দিচ্ছি, তাতে আমরাও প্রত্যেকেই moral crime commit কর্চ্ছি! পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"চুপ্‌ করে থাকুন—প্রতিবাদ কর্ত্তে গিয়ে চাকরীটী হারাবেন মাত্র। নিজেদের মধ্যে, একজন সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য, মনোমালিন্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। বাইরের লোকেও শেষে সমস্তই জেনে ফেল্‌বে।" "গোবর্দ্ধনবাবু বল্‌লেন —সে-ই ভাল।" কালাচাঁদবাবু চুপ্‌ করে রইলেন।

স্কুলের কেরাণী বিমলবাবু দেখা দিলেন। পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"আসুন—আসুন— কবি গেয়েছিলেন—"একে একে জ্বলিছে দেউটী"। "গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"ঘর থেকে আর একখানা বেঞ্চি আনুন, বসে সবাই মিলে নরক গুলজার করা যাক্‌।" ঘর থেকে একখানা বেঞ্চ বের করে এনে বসে বিমলবাবু বল্লেন—"এলাম পণ্ডিত মশায়কে একটা দুঃসংবাদ দিতে।" শুনে সকলেই তাঁর পানে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালে তিনি বল্লেন - "বলেই ফেলি—বাইরের লোক ত আর কেউ নেই এখানে—ঐ খোট্টা মাগীটা ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে নালিশ কর্ত্তে গিয়েছিল—শুন্‌লাম তাকে নাকি ওরা থানায় পাঠিয়েছে!" নিরুপায় মুখে পণ্ডিতমশায় বল্লেন তা পাঠাক্‌—যদ্‌ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতি—কি আর কর্ব্ব! বিশেষ কৌতূহল হয়ে কালাচাঁদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি?" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"বিশেষ কিছুই নয়—ঐ যে বাজারে শিবু কেঁয়ের ঘরের পেছনে এক মাগী খোট্টা ডালওয়ালী থাকে! কাল সকাল বেলা ওর সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছিল—মাগী এক সেরের দাম নিয়ে চৌদ্দ ছটাক মেপে দেওয়ার ওস্তাদ।" গোবর্দ্ধনবাবু বল্‌লেন—সে বিলক্ষণ জানি—মাগী ভয়ঙ্কর পাজী তারপর?" পণ্ডিত মশায় বল্লেন "সেই কথা কাল ছুটীর পরে হেডমাষ্টারবাবুকে বলেছিলাম।" সাগ্রহে কালাচাঁদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বললেন তিনি?" "তিনি বল্লেন—দুষ্টা স্ত্রীলোককে কিঞ্চিৎ শিক্ষা-প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়—নচেৎ শিক্ষকগণের সুনামে দোষস্পর্শের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাই, মাগী যখন আমার বাসার সুমুখ দিয়ে আজ সকাল বেলা গজেন্দ্রগমনে "গড়াগড়ি" কচ্ছিল, তখন তার উপরে পাত্‌লা পাত্‌লা রকমের ঘা কতক উত্তম মধ্যম প্রয়োগ করেছিলাম।" তাচ্ছিল্যভরে কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"বেশ করেছিলেন—এ সব হচ্ছে simple assault এতে কিছু হবে না।" গোবর্দ্ধনবাবু বললেন—"তবে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা এই যা কথা!" তীক্ষ্ণকণ্ঠে কালাচাঁদবাবু বললেন—"Spoken like an idiot! আইনের কাছে কোন sex-consideration নাই—all are equal in eye of law. একজন স্ত্রীলোককে খুন করলেই যে বেশী ফাঁসী হবে আর একজন পুরুষকে খুন করলে যে ফাঁসীর মাত্রা একটু কমে যাবে তার কিছু মানে নেই।" গোবর্দ্ধনবাবু চুপ করলেন। খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা গেল। বিমলবাবুর পানে চেয়ে নীচু গলায় কালাচাঁদবাবু বল্লেন "Boss coming"

বৈঠকখানার দুটো দরজা—একটা খুলেছে বাইরের বারান্দায়, অন্যটা ভিতর-বাড়ীর দিকে। ভিতর-বাড়ীর দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘর পেরিয়ে, হেডমাষ্টারবাবু বাইরের বারান্দায় এলেন। তাঁকে দেখে সবাই একটু উঠে দাঁড়ানর ভাণ করলেন—অর্থাৎ প্রত্যেকেই বেঞ্চি থেকে আধ ইঞ্চি খানেক উঁচু হয়ে উঠে আবার বসে পড়লেন। হেডমাষ্টারবাবু একটু হেসে—"আপনারা প্রায় সবাই

এসেছেন দেখছি বেশ—"বলে বিমলবাবুর পাশে বস্‌লেন। বিমলবাবু সসম্ভ্রমে অল্প একটু সরে বসলেন। পণ্ডিত মশায় বল্লেন—আমার ত অধুনা রাজদণ্ড হবার উপক্রম হয়েছে! "শুনে হেডমাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন?" পণ্ডিত মশায় নিজে কিছু না বলে বিমলবাবুকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যা বলেছিলেন, এখন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। সমস্ত শুনে হেডমাষ্টারবাবু বললেন—এতে কিছু হবে না—Simple assault বই ত নয়! তারপরে, ফৌজদারীতে নালিশ করলেই কি আর শাস্তি হয়—ঠিক মতন প্রমাণ প্রয়োগ কর্ত্তে হয়! ঘটনা হ'ল গিয়ে আমাদের মাষ্টার পাড়ায়—প্রমাণ পাবেন কোথায়!" কালাচাঁদবাবু বললেন—"এ কথা ত আগেই আমি বলেছি এ trifling matter ওঁর কাছে refer করার কি দরকার ছিল।" গোবর্দ্ধনবাবু একটু হেসে বল্লেন—"ভগবান না করেন—Casual leave টিভএর দরকার হলে তখন ত জানাতে হবে, তা আগেই জানিয়ে রাখলেন। "পণ্ডিত মশায়ও সপ্রতিভ ভাবে বললেন - সে-ই, উনি হচ্ছেন আমাদের মস্তক—আমাদের কোন কথাই ওঁর অবিদিত থাকা উচিত নয়।" অপ্রসন্ন মুখে কালাচাঁদবাবু বল্লেন—'সে পৃথক কথা।"

হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—"যাক্‌গে—সামনের রবিবার যে আমাদের picnic তার কত চাঁদা উঠেছে! বিমলবাবু বল্‌লেন—"সবশুদ্ধ পনরটাকা বাইরের কারো কাছে কি subscription নেবেন?" হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—নিশ্চয় বাইরের লোকের ঠাঁইয়ে আরও পনর টাকা আদায় কর্ত্তে হবে। টাকা ত্রিশেক হলেই একরকম চল্‌বে—কি বলেন কালাচাঁদবাবু? "কালাচাঁদবাবু বল্‌লেন—"একরকম কেন ভালই চল্‌বে। বাইরের কার কাছে নেবেন?" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"লোনাফিসের সেক্রেটারীর ঠাঁইয়ে দশ, আর কবিবরের ঠাঁইয়ে পাঁচ।"

কবিবরের নাম হচ্ছে উমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বয়স চল্লিশের কাছাকাছি স্থানীয় জমিদারের কাছারীতে কাজ করেন নানাপ্রকার প্রাপ্তি থাকায় আয় মোটের উপর মন্দ নয় বিদ্যা কোনরকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কবিতা লেখার এবং লেখা হলে পথের লোককে ডেকে শুনানো বিশেষ অভ্যাস। শুনানো হলে শ্রোতার মতামতের অপেক্ষা না রেখে নিজের কবিতার বাহাদুরি নিজেই করা—সঙ্গে সঙ্গে অমুক অমুক এই কবিতার জন্য আমাকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছিল ইত্যাদি মিথ্যা বলা দাম্ভিকতা, অপঠিত পুস্তক পঠিত বলে লোকের কাছে গল্প করা, জেরা করলে সম্ম গ্রন্থকারের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে "অত সব মনে থাকে না" ইত্যাদি বলা কাহাকেও খারাপ কিছু বল্‌তে হলে পরের নাম করে বলা এবং সর্ব্বদা বক্তার নাম প্রকাশে কুণ্ঠা প্রভৃতি বহু গুণরাজি তাঁর একেবারে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। কবিবরের দুটো চারটে কবিতা কখন কখনো মাসিক পত্রিকায়ও ছাপা হয়। যেগুলো "ধন্যবাদ সহকারে ফেরত" আসে সেগুলো তিনি নিজেই গ্রন্থকারে ছেপে বন্ধু বান্ধবদেরে উপহার দেন—ঘরে তুলে রাখেন—গুরুদাসের দোকানেও মাঝে মাঝে বিক্রীর জন্যে পাঠান, বিক্রী হয় কি না হয় ভগবান জানেন। ইনি নিতান্ত বোকা ধরণের লোক বলে মাষ্টার মশায়রা এঁকে নিয়ে বাঁদর নাচানের সখ মিটান—ইনি তা বুঝ্‌তে পারেন না। এঁকে কবিবর উপাধিও তাঁরাই দিয়েছেন। ইনি কৃপণ লোক।

কবিবরের নাম শুনেই কালাচাঁদবাবু অবিশ্বাস ভরে মাথা নেড়ে বল্লেন—"পার্ব্বেন না।" হেডমাষ্টারবাবু মাথা নেড়ে বল্লেন—"কেন পার্ব্ব না—আমরা যে ওদের সঙ্গে হেসে কথা কই, তাতেই ত ওরা কৃতার্থ হয়—তারপরে চাঁদা পেলে—আমাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাবে। অবিশ্যি বাঁদর দু টাকে একটু pump কর্ত্তে হবে—সে আমি কর্ব্ব। আপনারা কেউ হাস্‌বেন না, পারলে গোছালো ভাবে আমার কথায় সায় দেবেন।" শচীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "সেক্রেটারী দশ টাকা দেবে?" হেড্‌মাষ্টারবাবু বল্‌লেন—"কেন দেবে না - লোনাফিসের তবিল থেকে দু'তিনবারে টাকা চুরী করে ফেপে উঠেছে—দশটাকা দিতে বাধ্‌বে কিসে—আলবৎ দেবে।"

স্থানীয় লোনাফিসের তবিল থেকে সত্যিসত্যিই দু'তিনবারে ঢের টাকা চুরি হয়। মাষ্টার মশায়দের বিশ্বাস যে প্রতি বারেই সেক্রেটারীবাবু নিজে টাকা সরিয়ে রেখে চোরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন।

চুরি কথা শুনে কালাচাঁদবাবু চটে বল্লেন—"Abominable wretch!" ঐ ত সংক্রান্তি ঠাকুরের মতন চেহারা ওর পেটে এত কুবুদ্ধি। বেঁচে গিয়েছে কেবল আত্মীয় স্বজনের জোরে—নইলে Public money misappropiate করার যে কি শাস্তি তা ঠিক বুঝে যেত!" গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"সেক্রেটারী দিলেও দিতে পারে কিন্তু কবিবরের কাছে পাওয়া শক্ত। সে হচ্ছে পিঁপড়ের পোঁদ টিপে গুড় কেড়ে খাওয়া লোক!" হেড্‌মাষ্টারবাবু বল্লেন—"তা কি আর আমি জানি নে! এখন চুপ করুন সেক্রেটারী আস্‌ছে।"

বেঁটে, কাল, রোগা চেহারার একটী লোক এসে বারান্দার নীচে দাঁড়াল—তাকে দেখা মাত্রই হেড্‌মাষ্টারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—আসুন—আজ আপনার জয় জয়কার!"

বারান্দায় উঠে, বেঞ্চিতে বসে, সেক্রেটারীবাবু জিজ্ঞাসা করলে—"কি রকম?" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"কি খাওয়াবেন আগে বলুন, তারপরে আসল কথা বল্‌ব।" অতি বিনীতভাবে সেক্রেটারী বলল—আমি ত আপনাদেরই আজ্ঞাধীন—যা খাবেন—তাই খাওয়াব।" হেডমাষ্টারবাবু বললেন—"এখনকার Sub divisional officer যে আমার বিশেষ অতরঙ্গ বন্ধু তা বোধ হয় জানে না?" ঘাড় নেড়ে সেক্রেটারী সম্মতি জানালে, হেড্‌মাষ্টারবাবু আরম্ভ কর্‌লেন—"আজ সকালে রেল ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে ছিল আমার দেখা—দেখা হওয়া মাত্রই অতি খুঁটীনাটীভাবে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—আমি যা বল্‌লাম তা ত বুঝতেই পাচ্ছেন!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"খারাপ কিছু নিশ্চয়ই বলেন নাই।" হেডমাষ্টার মশায় বল্লেন—"আরে রাখ! খারাপ বল্‌ব—যাকে শতমুখে প্রশংসা করা বলে তাই করেছি। কিন্তু, অনেক রকম জেরা তাঁকে করেও জান্‌তে পারলাম না যে তিনি কেন এত কথা জান্‌তে চাইলেন আপনার সম্বন্ধে—শেষটায় হ'লাম তাঁর আর্দ্দালী দীনুদাসের শরণাপন্ন ও লোকটা অনেক Official information রাখে। সে বল্‌ল Co-operative Bankএর জন্যে একজন ভাল বিশ্বাসী সেক্রেটারী দরকার।" কালাচাঁদ বাবু বল্লেন—এঁর চেয়ে more competent hand আর কোথায় পাবে! হৃষ্টকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেডমাষ্টারের পানে চেয়ে সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করল—"মাইনে কত? Securityর দরকার হবে কি?" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"Starting pay হচ্ছে গিয়ে hundred, বাড়বে three hundred পর্য্যন্ত। আপনার মতন experienced and trustworthy hand পেলে security নাও নিতে পারে।" সেক্রেটারী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—"try কর্ব্ব নাকি? হেডমাষ্টারবাবু বললেন—"তা কর্ত্তে পারেন, কিন্তু আমাকে মাফ কর্ব্বেন" সেক্রেটারীবাবু বললেন—"আপনি না হ'লে আমার চলবে কি করে?" হেডমাষ্টরবাবু বুঝিয়ে দিলেন—"Indirect help ত নিশ্চয়ই কর্ব্ব! তবে আমি Information দিয়েছি, এটা বলার দরকার কি?" আশ্বস্ত সুরে সেক্রেটারী বলল—"না—না—না তা আমি বলতে যাব কেন!" হেডমাষ্টার বল্লেন—"তা'লে, দেখুন না try করে; সামনের রবিবারে হচ্ছে গিয়ে আমাদের picnic—Subdivisional officer কে নেমন্তন্ন কর্ব্ব ভাব্‌ছি—ঐদিন তাঁর সঙ্গে আপনাকে introduce করিয়ে দেব!"

সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করল—"Picnicএ আমি যোগ দিতে পার্ব্ব কি? হেড্‌মাষ্টার বাবু বল্‌লেন—"আরে রাম! হরি ছাড়া কখনও কীর্ত্তন হয়! আপনাকে ছাড়লে কখখ্‌নো চলে! তা আপনার Subscriptionটা কি আজ পাব?" সেক্রেটারী ও একটু কৃপণ স্বভাবের লোক। Subscriptionএর কথা শুনে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল আমাকে কত দিতে হবে?" হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"ওঁর Subscriptionটা কত কালাচাঁদ বাবু" কালাচাদ বাবু বল্লেন—দশটাকা!" দশ টাকার কথাশুনে সেক্রেটারীর চোখ দুটো একটু কেমনতর হয়ে উঠ্‌ল—কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌ল—"আমার টাকাটা, ইচ্ছে করলে, এখন ও নিতে পারেন। একজন খাতক গোটা কয়েক সুদের টাকা দিয়েছিল—আফিসের পরে কিনা—তা আর জমা দেওয়া হয় নাই, বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে বরঞ্চ কাল জমা দেব।" হেসে হেডমাষ্টার বল্লেন—আপনার টাকার জন্যে ভাবনা কি—তা দিয়ে যান বিমল বাবুর হাতে! নিন্ ওঁর টাকাটা।" বিমল বাবু টাকা নিলেন—সেক্রেটারী দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"নমস্কার এখন তবে আসি—একটা বরাত

আছে।—তা হলে—একখানা application পাঠাই—কি বলেন !" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"না—না এখন নয়। picnicএর পরে পাঠাবেন—আগে সাক্ষাৎ—সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হওয়া দরকার। আপনি ব্যস্ত হবেন না। লোক নেবার আরও মাসখানেক দেরী আছে। বাইরের application ও পনর দিনের আগে invite কর্ব্বে না। যে আজ্ঞে বলে সেক্রেটারী চলে গেলে, গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—Sub divisional officerকে নেমন্তন্ন কর্ব্বেন নাকি? হেডমাষ্টার হেসে বল্লেন—"পাগল আর কি! ও কথা না বল্লে টাকা দিতনা—বুঝলেন না 'এটা হচ্ছে গিয়ে a kind of pumping" গোবর্দ্ধনবাবু বললেন "দেখলেন কাণ্ড' পরের টাকা অফিসে জমা না দিয়ে কেমন পকেটে পুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—Office hoursএর পরে কোন টাকা accept করারইবা কি দরকার। "হেডমাষ্টার বাবু বল্লেন—"ও সব হচ্ছে ওয়াশিল ছ'ট করার কায়দা—চোরের অশেষ বুদ্ধি!' কালাচাঁদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "Secretaryর post কি সত্যিই Vacant?"হেডমাষ্টার বল্লেন—"হাঁ, হলেইবা ওর মতন অকাট মুর্থকে অত বড় একটা responsible post offer কর্ব্বে কেন! "পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সংবাদই আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের নখদর্পণে! গম্ভীরমুখে কালাচাঁদবাবু বল্লেন—Administration এর Fundamental Principleই হচ্ছে latest news collection আর সেগুলোর Judicious application. হেডমাষ্টারবাবু কোন কথা বল্লেন না। শচীন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আসছে meeting এর notice এ আমার increment এর item টা বাদ পড়ে গিয়েছে। হেডমাষ্টারবাবু বলেন—"না বাদ পড়ে নাই ও টাকে miscellaneous এর item এ ফেলে দিয়েছি। এই সময়ে দূরে চশমাচোখে একটা লোককে আসতে দেখে পণ্ডিত মশায় বল্লেন রাস্তার মোরে কবিবর উদিত হয়েছেন দেখছি। হ্যাঁ এই দিকেই আসছেন। একটু ভাল করে দেখে গোবর্দ্ধনবাবু বললেন—পকেট হাতড়াচ্ছে—বোধ হয় একটা পদ্যটদ্য কিছু লিখে এনেছে। কালাচাঁদ বাবু বিরক্তিপূর্ণস্বরে বললেন—এই, এখন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কানের মাথা খাবে। মুখে যা দুর্গন্ধ—কাছে বসে কার সাধ্য।" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"বস্বে ত এসে আমারই গা ঘেঁসে। ঘরের কোণ থেকে ঐ মরচে ধরা লোহার চেয়ারখানা বের করে নিয়ে আসুন ত বিমলবাবু অপদার্থটাকে বস্তে দেব—চেয়ারে বসাতে পেলে খুসীও হবে, আমরাও রক্ষে পাব!" ঘরে ঢুকে বিমলবাবু বল্লেন—চেয়ারের উপরে একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে রয়েছে যে। হেডমাষ্টারবাবু হুকুম দিলেন—তাড়িয়ে দিন না। বিমল বাবু তাড়াতে লাগলেন—"ধেৎ—যা—দূর আরে মোলো কামড়াবে না কি—যা—যা—দূর দূর। কুকুর চলে গেলে বিমলবাবু বললেন—আঃ কি দুর্গন্ধ। একখানা ন্যাকরা পেলে চেয়ারখানা মুছে ফেলা যেত।" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—আরে মশায়, আপনি এনে বাইরে রেখে দিন না। মোছা হয়ে যাবে কবিবরের পোঁদের কাপড়ে। ডান হাতে নাক টিপে ধরে, বাঁহাতে চেয়ারখানা বিমলবাবু কোন রকমে এনে বারান্দায় এক কোণে রেখে বল্লেন—"ভারি দুর্গন্ধ কবিবর বসতে পারলে হয়।" গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"খুব পার্ব্বে—ওর কি দুর্গন্ধ সুগন্ধ জ্ঞান আছে। পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন—ওর মুখের যা দুর্গন্ধ ঘেয়ো কুকুরের চেয়ে সেটাও বড় কম নয়! সেদিন থিয়েটার শুন্তে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ওর কাছে বসেছিলাম। আরে বাপ রে বাপ! গন্ধে আমার ত অন্নপ্রাসনের অন্ন উঠে যাবারই উপক্রম। গোবর্দ্ধন বাবু বল্লেন—"একদিন আমার কাছে গল্প করেছিল যে ওর নাকি সিংহরাশ্—"সিংহরাশের লোকের মুখে নাকি ওরকম দুর্গন্ধ হয়েই থাকে।" হেডমাষ্টার মশায় বল্লেন—'সিংহরাশি না ঘোড়ার ডিম! মূর্খ, বাঁদর কোথাকার, ওর হচ্ছে "বরাহরাশি।" সকলেই হাসতে লাগ্লেন। শচীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কবিবর নাকি চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন?" হেডমাষ্টার বল্লেন যাবেন কোন চুলোয়! অন্য জায়গায় গেলে তের টাকার বেশী মাইনেই হবে না। কাজের লোক হলে ত তাকে মাইনে দিয়ে রাখে—এখানে মোটা মাইনে পাচ্ছে নানা কারণে।" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"সেদিন বল্‌ছিল Star theatre নাকি ওকে sixty rupees offer দিয়েছে!" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"বিশ্বাস কর্ব্বেন না—ভুলেও সত্যিকথা বলা ওর অভ্যেস নেই—sixtyর ঐ zero টা বাদ দেবেন। ছ' টাকা

মাইনে দিয়ে তামাক টামাক সাজার জন্যে রাখ্‌লেও রাখ্‌তে পারে।' পণ্ডিত মশায় বল্লেন—দেখুন, দেখুন, কবিবরের আক্কেল! ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কেমন বিনা জলে প্রস্রাব কর্তে বসেছে।" মহা চটে কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"It's highly outrageous to public decency! হাস্‌তে হাস্‌তে হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন আরে না—না এতে, আপনার, public decency কিছুমাত্র outraged হয় নাই। ছাগল পাঁঠা কি আর রাস্তায় বাহ্যি প্রস্রাব করে না—ওটা তাদেরই সামিল। পথের মাঝখানে না দাঁড়িয়ে যে, একধারে গিয়ে বসেছে, সেই public এর বহু ভাগ্যি! যাকগে—আর কোন কথা বল্‌বেন না—উঠেছে—এক্ষুনি হন্ হন্ করে এসে পড়বে!"

একটু পরেই কবিবর এসে বারান্দার নীচে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে চামড়া-মোড়া মোটা বেত—গায়ে গোসাপের গায়ের রংয়ের ছিটের কোট—পায়ে কালো এ্যালবার্ট স্লিপার—সাম্‌নের দাঁতের উপরে দাঁতের মাপের সাদা কাগজের একটা পটী। তাঁকে দেখেই হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"বাঁচ্‌বেন অনেককাল—এইমাত্র নাম কর্ছিলাম!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"আপনার আগমন ভঙ্গিমাটি আমি এতক্ষণ লক্ষ্য কর্ছিলাম—বাগ্দেবীর বাহনের চেয়েও মনোরম বলে বোধ হল।" হেডমাষ্টার বল্লেন—সে ত হবেই—উনি যে বাগ্দেবীর প্রিয়পাত্র!" উপরে উঠে কবিবর বল্লেন—"আপনাদের এখানে এসে আমি বড়ই আনন্দ পাই।" বলেই হেডমাষ্টারবাবুর গা ঘেঁসে বস্‌তে গেলেন। হেড মাষ্টারবাবু বল্লেন—"সেকি হয়—আপনাকে আস্‌তে দেখেই আপনার জন্যে ব্যাসাসন নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছি—ঐ চেয়ারে বস্‌তে হবে আপনাকে!" হাস্‌তে হাস্‌তে চেয়ারের দিকে দু' পা এগিয়ে গিয়ে কবিবর বল্লেন—"আরে না—না—আপনার বস্‌বেন বেঞ্চে আর আমি বস্‌ব চেয়ারে—সে কি হয়!" হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত আসন দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। আজ Sub-divisional officer বল্লেন—আপনার নাকি aristrocratic mind সে হিসেবে আপনাকে aristrocratic seat offer করাই সঙ্গত। তারপরে, আপনার মুখ থেকে আমরা সকলেই কিছু কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা রাখি কি না—তা ওখানে বসে বল্‌লে সবাই শুন্‌তে পাব।" আর দ্বিরুক্তি না করে হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে চেয়ারে বসে কবিবর বল্লেন—"আরে এ যে অবাক্ কাণ্ড! Sub-divisional officerএর সঙ্গে ত আমার আলাপই নাই—তা তিনি কি করে জান্‌লেন যে আমার aristrocratic mind—aristrocracyর কাছেই ত আমি পারতপক্ষে ঘেঁসি না। যেটুকু ঘেঁসি সে কেবল (পেটে হাত দিয়ে) এরই জন্যে। সেই কারণেই এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই বলে উমাপ্রসাদবাবু অত বড় একটা প্রকাণ্ড কবি—বাঙ্গালার—মায় হিন্দুস্থানের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃষ্টরূপে অত্যন্ত সুপরিচিত—রাজ সরকার থেকে প্রায় পৌনে একটা ডিপুটীর বেতন পান—হাজার হাজার পুস্তক ছেপেছেন, তা সত্ত্বেও কেমন সরল—লোকের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করেন! লোকের কথাই বা দরকার কি, আপনারা নিজেরাও ত দেখ্‌তে পাচ্ছেন, আপনাদের এখানে এসে আমি কত হাসি ঠাট্টা করি—কখ্‌খনো আমার position অনুযায়ী ব্যবহার আপনাদের সঙ্গে করি না—তা কর্‌লে বুঝলেন না—আপনারা হচ্ছেন ইস্কুল মাষ্টার আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই আমার হয় না। হাজার হলেও আপনারা আমার চেয়ে এক ধাপ নীচুতে—নয় কি? এই ত সেদিন আমাদের ম্যানেজারবাবু বল্‌ছিলেন—ইস্কুলমাষ্টারদের সঙ্গে freely mix করাতে আপনার position ছোট হয়ে যাচ্ছে—তা কি আর আমি মানি! আমি আপনাদের এখানে—হা—হা—হা—ছোটমুখে বড় কথা বল্‌তে হয়—যতদিন বাঁচি দিনান্তে এক একবার করে পায়ের ধুলো দেবই। আপনারাও ত আমাকে অসম্মান করেন না—নিজেরা বেঞ্চে বসেও আমি এলেই চেয়ার বের করে দেন।" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"আমরা বেঞ্চিতেই বসি। ও চেয়ারখানা রাখাই হয়েছে আপনার মতন distinguished visitorsদের জন্যে—তাই আপনি আস্‌লে ওখানা বের করি—কখনো কখনো ভুলও হয়। বোধ করি আপনি তাতে offence নেন না!" কবিবর হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন দাঁতের উপরকার কাগজের পটীটা অল্প একটু কেঁপে উঠ্‌ল—বল্‌লেন—"আপনাদের ব্যবহারে আমি নেব offence—সেদিন যেন আমার মুণ্ডে বজ্রপাত হয়—কি বলেন হেড্‌মাষ্টারবাবু?"

হেডমাষ্টারবাবু হেসে বল্লেন—না-না-না বজ্রপাত হবার দরকার কি—অমনিই থাকুন। তা, কবিবরের সাম্‌নের দাঁতের উপরে একটা সাদা কাগজের পটী দেখ্‌তে পাচ্ছি—ওটা আবার কি?" ডাইনে বাঁয়ে দু'একবার চেয়ে—কবিবর বল্লেন—"ওটা একটা কৌশল অবলম্বন করা গেছে। সেবার সেয়ালদহ ষ্টেশনে এক ব্যাটা কুলী প্রকাণ্ড একটা ট্রাঙ্ক মাথায় করে এসে পড়েছিল আমার গায়ে—তার মাথায় সেই মজবুত লোহার ষ্টীল ট্রঙ্কের গুঁতো লেগে সাম্‌নের একটা দাঁত গিয়াছিল নড়ে—দুদিন হল সেই নড়াদাঁতটা তুলে ফেলেছি ওখানে বসাবার নকল দাঁতটা তৈরী হ'তে এখন ও দুদিন দেরী আছে কিনা, তাই ওর দুপাশের দুটো দাঁতের সঙ্গে আঁঠা দিয়ে ঠিক দাঁতের মাপের একটুক্‌রো সাদা কাগজ জুড়ে ফাঁকটা আপাততঃ বন্ধ করে রেখিছি। সাম্‌নে একটা দাঁত না থাক্‌লে ভয়ঙ্কর বিশ্রী দেখায় কিনা—দাঁত তৈরী হলেই কাগজটা ছিড়ে ফেলে দিব। দেখুন না দাঁতের সঙ্গে কেমন মানানসই করে এঁটেছি—হঠাৎ কারো ধরবার যো নাই। বলেই কবিবর হিঁ করে কাগজের পটীটা সবাইকে দেখালেন সকলেই দেখে হাস্‌তে লাগ্‌লেন—তাতে উৎসাহিত হয়ে কবিবর আরম্ভ করলেন—দাঁতেরসঙ্গে পটী আঁটাই কি সোজা! প্রথমে আটলাম gloy আঠা দিয়ে—থুথু লেগে ভিজে দুই মিনিটের মধ্যেই সেটা খুলে পরে গেল। তখন বুদ্ধি করে মামার কাছ থেকে একটু secotine চেয়ে নিয়ে এসে মেরে দিলাম কায়েমী করে এক পটী—এখন ঠিক বসে গিয়েছে খুলে পড়ার নামটীও আর নাই। আমিও ত কম চালাক নই! কালাচাঁদ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—পটীটার উপরে একটা লেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি ওটা কি?" কবিবর বুক ফুলিয়ে বললেন—"আমার মশায় কাঁচা কাজ নাই ওর উপরে সাটে নিজের নাম U· p. c. poet. এবং যে তারিখে এঁটেছি সেই তারিখটা 2. 2. 29. লিখে রেখেছি।" শুনে আবার হাসির ধুম পড়ে গেল।" শচীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—হিন্দীসাহিত্যের খবরও আপনি রাখেন না কি? সগর্ব্বে কবিবর বল্লেন রাখি না! হিন্দী "সরস্বতী" মাসিক পত্রিকার আমি নিয়মিত গ্রাহক। হিন্দী কবিতাও মাঝে মাঝে লিখে থাকি—ওরা বেশ যত্ন করে সেসব ছাপে। গেল মাসের আগের মাসের সরস্বতী পত্রিকায় "দুনিয়া কা হাল চাল" বলে আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল তাই পড়ে ছাগলরাম ঝুনঝুনিওয়ালা নাম করে ওদের একজন বড় কবি ভারি প্রশংসা করে একখানা চিঠি আমায় লিখেছিল। চিঠিখানা পড়ে অত্যন্ত গৌরব বোধ করলাম।

সত্যিকথা বলা কবিবরের কোষ্টীতে লেখা নাই—বিশেষতঃ আত্মপ্রশংসার সময়। মাষ্টারমশায়েরা হিন্দিসাহিত্যের খবর রাখেন না বলে, তাঁদের বেমালুম মিথ্যে গল্প করা সম্ভবপর হয়। তবে খবর রাখুন আর নাই রাখুন, কবিবরের একটা কথাও তাঁরা বিশ্বাস করেন না কৌতুক করার জন্যে বিশ্বাসের ভাণ করেন মাত্র।

পণ্ডিত মশায় বল্লেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সাহিত্যের খবরই বোধ করি আমাদের কবিবর রাখেন! গৌরব পূর্ণস্বরে কবিবর বল্লেন—"রাখি-ই-ত! না রাখ্‌লে চলে? গোবর্দ্ধন বাবু জুড়িদিলেন—"উনি পড়েন নাই এমন বই খুব কমই আছে। "কালাচাঁদ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা কবিবর Sir walter scott এর লেখা কেমন লাগে আপনার?" কবিবর বল্লেন অতি উৎকৃষ্ট! ও রকম লেখাই হয় না—পড়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই! কালাচাঁদ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর কোন বই খানা আপনার সব চয়ে বেশী ভাল লাগে? "এইত মশয়, ফেল্‌লেন ফ্যাসাদে বই আমি হরদম পড়ি কিন্তু বইয়ের নাম আর গ্রন্থকারের নাম জিজ্ঞাসা করলেই আমি চুপ্‌। বইয়ের ঘটনা সম্বন্ধে ও ঐরকম! "কালাচাঁদ বাবু নাছোড় বান্দা কারণ কবিবরকে নিয়ে একটু আমোদ করাই হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা scott's ivanhoe পড়েছেন আপনি?" পড়িনি! ঐ খানা দিয়েই আমার ইংরেজী নভেল পড়ার স্বস্তিবাচন।

"scotts' kenilworth?

"হেঁ-চমৎকার বই?

"Scott's Talisman?

"ওখানাই, মনে হচ্ছে, তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

"Scott's old mortality?

"ওখানা ত নিজেই কিনেছি!

হেসে কালাচাঁদ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—Scott's Emulsion বেপরোয়া ভাবে কবিবর জবাব দিলেন—এ বই

খানা এই মাত্র সেদিন এনেছি। বেশ পুরু বই, বাঁধানটাও চমৎকার। তবে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের কথায় ভরা বলে তেমন ভাল লাগে না আমার। শুনে, পণ্ডিত মশায় বাদে আর সকলেই হেসে উঠ্‌লেন। শচীন্দ্রবাবু বললেন— Scott's Emulsion বলে ত কোন বই নাই—ওটা হচ্ছে গিয়ে আপনার, Codliver oil এর একটাPatent preparation, রুক্ষ দৃষ্টিতে শচীন্দ্র বাবুর পানে চেয়ে হেডমাষ্টর বাবুর বললেন, "কে বলে নাই। আমি নিজেই পড়িয়াছি, কবিবর ঠিকই লেছেন বইখানা কেবলই যুদ্ধ বিগ্রহের বৃত্তান্তে ভরা।" শচীন্দ্রবাবু কথা বললেন না— কবিবর কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন—"না থাক্‌লে আমি কিনলাম কোত্থেকে আর হেডমাষ্টারবাবুই বা পড়লেন কোথায়! আপনারা মশায়, সাহিত্যের কোন খবরই রাখেন না, চিনির বলদের মতন কেবল বিদ্যার বোঝাই বইছেন— আর পরের ছেলেদেরে grammar পড়িয়ে বৃথাই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছেন। আজকালকার graduateদেরও লেখাপড়া জ্ঞান তেমন নাই। এরা যথার্থই বিদ্যাবলদ।"

কবিবরকে নিয়ে মাষ্টার মশায়রা যে রহস্য কর্চ্ছেন সেটা পণ্ডিতমশায় বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু রহস্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়ে, বল্‌লেন—"থাক্‌গে, বাজে কথায় ত ঢের সময়ই কেটে গেল—বলি পকেটে কি কিছু আছে শুন্‌তে পাব কি?" সাগ্রহে সোৎসাহে কবিবর বল্লেন—হাঁ—আছে বই কি! শোনাব বলেই ত এনেছি! নতুন আর একটা ছন্দ আবিষ্কার করেছি—একে বলে "পান্তম" ছন্দ। মা'য় উপদ্বীপের এক নারিকেল বৃক্ষতলে বসে ঐ দেশীয় কোন একজন কবি প্রথম এই ছন্দে কবিতা লেখেন। বাঙ্গালা ভাষায় (সগর্ব্বে বুকে হাত দিয়ে) এ ছন্দে শর্ম্মারামই লিখ্‌ছেন প্রথম! মাত্র একটা stanzaই লিখেছি—পরে আরও লিখ্‌ব। এ ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে প্রথম দুটো চরণের শেষের দুটা চরণের অক্ষর সংখ্যা বেশী। চার চরণে এক stanza—এইবার শুনুন—

ডাক্‌রে কোকিল হরদম!
দু'নিয়া হোক্‌ সরগরম!
সকল লোকের খুলে যাক্‌ দেল!
ক্ষয়ে করুক ফেল!

এখানে "হরদম" এবং "সরগরম" এই দুটো শব্দ একটু দীর্ঘ করে পড়তে হবে। শেষ কাণ্ডে ছাত্রদেরেও একটু কষাঘাত কর্ত্তে ছাড়িনি—হা·হা—হা—ছোঁড়াগুলোও আজকাল সব বোম্বেটে হয়ে গিয়েছে—মনোযোগ করে বড় একটা পড়াশুনো করে না—কি বলেন হেডমাষ্টারবাবু?" হেডমাষ্টারবাবু হেসে বল্লেন—"তা কতকটা ঠিক ই ত।" গম্ভীরমুখে কালাচাঁদবাবু বল্‌লেন—পদ্যটা বেড়ে হয়েছে!" পণ্ডিত মশায় কণ্ঠ কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করলেন—"হরদম কোকিল ডাকার কথা শুনে আমার মনে আস্‌ছে, কালিদাসের সেই—

চুতাঙ্কুরা স্বাদ কষায়কণ্ঠ
পুংস্কোকিল যন্মধুরং চুকুজ।
মনস্বিনীমান বিঘাতদক্ষং
তদেবজাতং বচনং স্মরস্য॥

আপনি কিন্তু, কবিবর ছন্দশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আপনাকে "ছন্দাটবী" উপাধি দেওয়া উচিত। হেডমাষ্টার সায় দিলেন—বিভিন্ন রকমের ছন্দের উপরে ওঁর uncommon control রয়েছে।" উৎসাহিত হয়ে উদ্ভাসিত কণ্ঠে কবিবর বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—"হাঁ—ছন্দটা এক রকম আয়ত্ত করেছি বই কি! এই দেখুন, প্রচলিত ছন্দবাদেও আমি নিজের মাথা থেকে—কারো সাহায্যে না নিয়ে—"ঘুঘুডাক", "কুম্ভী পাক্‌", "শুমোর ফাঁক" —"অশ্বদন্ত"—"স্ফটিকস্তম্ভ", "বদন বিষ্টম্ভ"—"হয়দড়বড়ি", "কণ্ঠ ঘড়ঘড়ি", "দন্ত কড়মড়ি"—প্রভৃতি ছন্দ আবিষ্কার করেছি—তারপরে সংস্কৃত শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের অনুকরণে "গৃধ্র মার্জ্জার", "গণ্ডার ভৃঙ্গার", বৃকশৃঙ্গার,—মালিনী, মন্দাক্রান্তা, উপজাতি, বিজয়া, ইন্দ্রবজ্র, উপেন্দ্রবজ্র, শশীবদন প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে, 'ত্রিভঙ্গপাষণ্ড", "গর্দ্দান কোদণ্ড", "প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড" ইত্যাদি ঢের ঢের নতুন ছন্দ তৈরী করেছি। এই সমস্ত ছন্দে কবিতা লিখে যশঃ অর্জ্জনও কম করি নাই। এই দেখুন না দশ পনরখানা মাসিক পত্রিকা আমাকে কেমন অযাচিত প্রশংসা করেছে।" বলেই পকেট থেকে এক গাদা চিঠি বের করে হেডমাষ্টার বাবুর হাতে দিতে গেলেন—তিনি চিঠি না নিয়ে বল্লেন— অরে রাম! চিঠি পড়ব কেন-বিশ্বাস করায় পক্ষে

আপনার মুখের কথাই যথেষ্ঠ! চিঠি পড়ে আপনাকে অসম্মান কর্ব্ব কেন?" হেডমাষ্টারবাবু চিঠি না নেওয়াতে কবিবর একটু ক্ষুণ্ণমনে সেগুলো পকেটে রাখ্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শচীন্দ্রবাবু হাত বাড়িয়ে বল্লেন—"দেখি চিঠিগুলো।" বিশেষ আনন্দিত হয়ে শচীন্দ্রবাবু হাতে চিঠি দিয়ে কবিবর বল্লেন—"ভাল করে পড়ে দেখুন—কে কি বল্‌ল—কোনজায়গায় কথা উঠ্‌লে বল্‌তে পারবেন তখন।"

শচীন্দ্রবাবু চিঠিতে মনোযোগ দিলে হেডমাষ্টার বল্লেন—"আপনার কথা বল্‌তে হলে কি আর চিঠি পড়্‌তে হয়! এই যে Sub-divisional officer এর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে এত কথা হল—তখন কি আপনাকে highly praise করার জন্যে আমি চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। চিঠি না পড়েই যা বলেছিলাম তাতেই তিনি হেসে বল্লেন—"আপনি কবিবরের একজন fondest admirer." কৃতজ্ঞ-কৃতার্থ দৃষ্টিতে হেডমাষ্টারবাবুর পানে চেয়ে কবিবর জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁ্যা—হাঁ্যা ভুলেই গিয়েছিলাম—তাঁর সঙ্গে আমার ত পরিচয়ই নাই! তিনি কি করে জান্‌লেন যে আমার aristrocratic mind আর ও কথাটার অর্থই বা কি?" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—'ব্যক্তিগত পরিচয়ের কিছু দরকার নাই—আপনার অব্যর্থ লেখনীই আপনাকে সকলের কাছে পরিচিত করে তুলেছে। তিনি আপনার "ছন্দলম্ফন" বলে একটা কবিতা পড়েছেন।" কবিবর সংশোধন করেলন "ছন্দলম্ফন নয়—ছন্দ স্পন্দন।" হেড মাষ্টার বল্লেন—তা হবে, কিন্তু দেখলাম, পড়ে খুবই well impressed হয়েছেন!" কবিবর জিজ্ঞাসা করলেন—aristrocratic mind কথাটার তাৎপর্য্য কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে দিলে না!" হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—"ব্যক্তিগত কিম্বা পারিবারিক আভিজাত্যও তেমনি প্রতিভা সাপেক্ষ। আপনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বলেই তিনি আপনার মনটাকে aristrocratic বলেছেন। যে কবিতাটী তিনি পড়েছেন সেটী না-কি কোন plebean mindএর production হতেই পারে না।" হর্ষোচ্ছাসিতকণ্ঠে অর্দ্ধ চীৎকার করে কবিবর বল্‌লেন—"আরে বলেন কি হেডমাষ্টারবাবু—অত বড় একজন মহামান্য ডিপুটী! তিনি আমাকে বল্লেন aristrocratic mind!—আজ আমি ধন্য—ধন্য—ধন্য—আপনার কথা শুনে আজ আমার ডাক ছেড়ে বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—নিধের মা, নিধের মা, মুই কি হনু রে! আনন্দের পুলক শিহরণে আমি আজ "হুটরোমা" হয়ে উঠেছি! আমার প্রতি লোমকূপ থেকে আনন্দরশ্মি বিচ্ছুরিত, হচ্ছে! ভাল করে আমি কথাই বল্‌তে পাচ্ছিনে—আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌ছে!'' হেসে পণ্ডিতমশায় বল্লেন—"কণ্ঠরোধের ত কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে—বরঞ্চ্‌ কণ্ঠ মুক্তই হয়ে গিয়েছে বলে বোধ হচ্ছে!' পণ্ডিত মশায়ের কথা সবাই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। কবিবর হেড্‌মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কালই তাঁকে একখানা পত্র লিখ্‌ব, কি বলেন?" হেডমাষ্টার বল্লেন—"না—না—কিছু দরকার নাই—এ রকম উড়ো খবর পেয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্ত্তে হলে, মাসে আপনার ডাক খরচাই লাগ্‌বে একশ টাকার উপরে, কারণ আপনার কবিতার প্রশংসা যেখানেই যাই, সেখানেই সকলের শুনে থাকি! এদের সবাইকেই যদি ডাকযোগে ধন্যবাদ দিতে হয় তা'লে আপনি একেবারে ফতুর হয়ে যাবেন! আমি বলি আপাততঃ চুপ করে থাকুন—আস্‌ছে রবিবারে হচ্ছে আমাদের Picnic—Subdivisional officer কে নেমন্তন্ন কর্ব্ব। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে যখন আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো—দুটো একটা কবিতা শুনে তিনি যখন মুগ্ধ হয়ে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে প্রশংসা কর্ত্তে থাক্‌বেন, তখন সমস্ত ধন্যবাদ এক সঙ্গে জ্ঞাপন কর্ব্বেন—একটা পয়সাও আপনার খরচ হবে না।" কবিবর সাগ্রহে বল্লেন—"তা হ'লে picnicএ কিন্তু আমার নেমন্তন্ন রইল।" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"আপনি আমাদের দলের লোক—Regular subscription দেবেন—আপনার নেমন্তন্ন ত না বল্‌লেও থাক্‌বে।" Subscription এর কথা শুনে কবিবরের মুখে একটা অশান্তির ছায়া পড়ল—জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাকে কত ধরেছেন?' হেডমাষ্টার বল্লেন—"অতি সামান্য—মাত্র পাঁচ টাকা।" বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে কবিবর বল্লেন—বলেন কি! পাঁ—চ—টা—কা! একবেলা খাওয়ার জন্যে পাঁচ টাকা নেওয়া রীতিমত জুলুম! হেডমাষ্টার বল্লেন—তা হোক্‌ গে—একদিন পাঁচ টাকা দিলে আপনার কিছু হবে

না—এই যে সেক্রেটারী বলা মাত্র দশ টাকা দিলেন— তিনি ত জুলুম বলে মনে করলেন না।" কবিবর বল্লেন— সে ব্যাটা চোরের কথা ছেড়ে দিন—দশ টাকা দিয়েছে নানারকমের মিথ্যে খরচ লিখে কুড়ি টাকা বের করে নেবে। তার সঙ্গে কি আমার তুলনা চলতে পারে! আমার হচ্ছে হকের উপার্জ্জন আমি চুরিচামারীর মধ্যেই নাই।" ব্যথিত স্বরে শচীন্দ্রবাবু বললেন—"আঃ ওসব বলতে নাই সাময়িক একটা দুর্ব্বলতার ঝোঁকে পড়ে বেচারা যা করেছে, তার জন্যে তাকে যখন তখন যাচ্ছে তাই বলা ঠিক্ নয়! Unguarded and weak moments সবারই জীবনে এক আধবার আসে!" সদম্ভে কবিবর বল্লেন—আমার মশায়, তা আসে না—আমি সত্যের দাস।" শচীন্দ্রবাবু বল্লেন—বেশ্ ত—খুব ভাল কথা! কিন্তু দশজন একসঙ্গে পথ চল্‌তে চল্‌তে যদি হঠাৎ একজন পা পিছ্‌লে পড়ে যায়, বাকী নয়জনের কি কর্ত্তব্য নয় সহানুভূতিপূর্ব্বক তাকে হাত ধরে তুলে নেওয়া?—" চটে কবিবর বল্লেন— আপনার পাদ্রীর বক্তৃতা রেখে দেন—"হেডমাষ্টার বল্লেন— আঃ শচীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেন কেন—পাপীর প্রতি দয়া দেখানই হচ্ছে ওঁর চরিত্রের বিশেষত্ব!"—শচীন্দ্র বাবুর দিকে একবার বক্রদৃষ্টি করে বল্লেন—"কথা বলার সময়ে, শচীন্দ্রবাবুরও আমাদের মতন বাজে লোকের level এ নেমে এসেই কথা বলা উচিত—other wise we can't follow him.

বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ঠিক্ নয়! তা, যাক্‌গে, আপনি শুনুন—পাঁচটাকার কমে আপনার ঠাঁইয়ে নেওয়া কোনরকমেই যেতে পারে না। আপনার আর্থিক অবস্থা আমি ত জানিই, আপনাকে aristrocratic mind বলে যিনি তারিফ করেছেন, তিনিও বিলক্ষণ জানেন। তিনি আস্‌বেন, এলে Subscription roll নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন। তখন কম Subscription আপনার নামে লেখা দেখ্‌লে কি ভাব্‌বেন? তাঁর চোখে আপনাকে আমি ছোট হতে কখনই দিতে পারি না। পাঁচটাকা এ যাত্রা আপনাকে দিতে হবে ই।" কালাচাঁদ বাবু বল্‌লেন—"শুনুন, কবিবর, অত বড় একটা Govt. officer এর যখন আপনার উপরে একটা impression হয়ে গিয়েছে তখন সেটা তুটো একটা টাকার জন্যে fade হ'তে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।" গোবর্দ্ধনবাবু বল্‌লেন—"মানসম্মান বজায় রাখার জন্যই ত টাকা— একথাটা আপনার মগজে ঢুক্‌ছে না কেন?" একটু ভেবে চিন্তে কবিবর বল্লেন—"ঢুকেছে অনেকক্ষণই—তবে কি না—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না—আপনারা সবাই যখন বল্‌ছেন তখন দেব—কখন চাই হেডমাষ্টারবাবু?" হেড্‌ মাষ্টার বল্লেন—"আমাদের ত এখন পেলেই ভাল হয়— দিতে পার্ব্বেন কি?" গর্ব্বিতভাবে কবিবর বল্লেন—

"আমাদের ত এখন পেলেই ভাল হয়—দিতে পার্ব্বেন কি? গর্ব্বিতভাবে কবিবর বল্লেন—"তা খুব পার্ব্ব—আমি মশায়, বাকী বকেয়া ধার ধারিনে। পাছে কোন দরকারে কারো কাছে কখনো ধার চাইতে হয়, এই আশঙ্কায় দশ পনর টাকা সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখি।" বলে পকেট থেকে "মণিব্যাগ" বের করে, সবার পানে এক একবার তাকিয়ে, মৃদু হেসে কাণের কাছে একটু ঝাঁকলেন—টাকা পয়সার ঝন্‌ঝনি শুন্‌তে পাওয়া গেলে বল্লেন—"শুন্‌ছেন।" তারপরে মনি-ব্যাগটী খুলে, পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে, উঠে এসে হেডমাষ্টারবাবুর মুখের সাম্‌নে ধরে বল্লেন— "নিন্"। টাকা নেওয়ার জন্যে হাত না বাড়িয়ে, হেড মাষ্টার বল্লেন—"বিমলবাবুর হাতে।" কবিবর বল্লেন—"উঁহু —মুখ থাক্‌তে নাকে ভাত দিতে যাব কেন। আপনি যখন উপস্থিত রয়েছেন তখন আর কারো হাতে দিয়েই আমি স্বস্তি পাব না! আপনি নিন্—আপনার উপরে আমার অখণ্ড বিশ্বাস!" শুনে অন্যান্য মাষ্টার মশায়'রা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন—কবিবর তা লক্ষ্য করলেন না। হেসে হেডমাষ্টারবাবু টাকা নিলেন। টাকা দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে বল্লেন—"একটা রসিদ দেবেন না।" বিস্মিত হয়ে হেডমাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"বুঝ্‌লেন না—ইস্কুলের শীলমোহরযুক্ত কাগজে Sub divisional officer কে নেমন্তন্ন করার জন্যে আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা চাঁদা নিলেন যদি এই মর্ম্মে একটা রসিদ আমাকে দেন, তবে সে রসিদটা আমি খুব যত্ন করে সঙ্গে সঙ্গে রাখব এবং প্রয়োজন হলে সকলকে দেখাতেও পার্ব্ব। এটা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হবে কি না তাই বল্‌ছি"

কবিবরের রসিদ চাওয়ার কৈফিয়ৎ শুনে কালাচাঁদবাবু চাপা সুরে বল্লেন "বাঁদর"। গোবর্দ্ধনবাবু জুতোর ফিতে বাঁধার অছিলায় মুখ নীচু করে হাস্তে লাগ্লেন—শচীন্দ্রবাবু অন্যদিকে তাকালেন—হেডমাষ্টার প্রকাশ্যেই হেসে বল্লেন—"ওঃ এই কথা তা কাল পাবেন। বিমল বাবু দেবেন।" কবিবর বল্লেন—"বিমলবাবুর রসিদ নিচ্ছিনে—আপনার শ্রীহস্তের দস্তখতি রসিদ চাই—হা · হা—হা। "হেডমাষ্টার বল্লেন কোন চিন্তা নাই—সমস্ত রসিদেই আমি দস্তখত করে থাকি।" কবিবর কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে স্কুলের মৌলভী সাহেবকে ছুটতে ছুটতে আস্তে দেখা গেল। সকলেই বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকালেন।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

পল্লী-সাহিতের উপাদান

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ]

আজ বঙ্গ-সাহিত্যের মোহন বাঁশরী নগরীতে নগরীতে বাজিয়া উঠিয়াছে, মহানগরীর বক্ষ হইতে বাঁশরীর সুর ক্ষুদ্র নগরীতে ও উপনগরীতে ধ্বনিত হইয়া পল্লীর প্রান্তে আশ্রয় লইতেছে। জানি না এই শ্রুতিবিমোহন বাঁশীর সুরের গতি কতদূর, জানি না এই সুর পল্লীর গোঠে মাঠে বাটে প্রতিধ্বনিত হইয়া পল্লীর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে কিনা, এবং প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে স্থায়ী আবাস স্থাপন করিবে কিনা!

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মম প্রাণ ;—"

বাঁশীর সুর যদি মন প্রাণ মথিত করিয়া মর্ম্মস্থলে গ্রথিত হইয়া যায় তবেই সেই সুর সুরাসুর বন্দনীয় পরমানন্দ কন্দ অমন্দ মধুর ব্রজসুন্দরের প্রীতিজনক হয়।

একদিন বৈকুণ্ঠপতি ব্রজসুন্দর যমুনাপুলিনে, বৃন্দাবনের বনে বনে মোহন বাঁশরী বাজাইয়া ষোড়শ সহস্র গোপ-রমণীর মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আর আজ হুগলী নদীর তীরে তীরে কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে বসিয়া কতিপয় বঙ্গ-সাহিত্যিক গল্প ও উপন্যাসের ভিতর দিয়া মোহন বাঁশরী বাজাইয়া বোধ করি ষোড়শ সহস্র নারীর নহে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর চঞ্চল হৃদয় আকুল করিয়া তুলিতেছেন; মুহ ধাতুর অর্থ মুগ্ধ করা বোধ করি বা অনেক সহস্রকে মুগ্ধ, মোহিত, করিতেছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দ ঘন রসময় রাসেশ্বরের সন্ধান মিলিবে কিনা জানি না, কিন্তু বাঙ্গালার নগরে ও গ্রামে একটা বিশেষ চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়াছে, একটু অস্থিরতা অনুভূত হইতেছে, হয়ত বা সেই চঞ্চলতা ও অস্থিরতা নিবন্ধন সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবে।

সাহিত্যের সৃষ্টি কি শুধু তরুণ তরুণীর প্রাণে চঞ্চলতা আনিবার জন্য? রসের সৃষ্টি কি শুধু অনাঘ্রাতপূর্ব্ব সুকুমার কুসুমরাশির পেলবতা ও কোমলতা নষ্ট করিয়া উহার সৌন্দর্য্য হানির নিমিত্ত? তা নয়, তা নয়। সাহিতের সৃষ্টি সমাজের, দেশের, পরিবারের, এমন কি ব্যাপকভাবে সমগ্র জগতের হিত সাধনের জন্য। সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐ হিতের কথাটাই ব্যক্ত করে। হিতের সহিত বর্ত্তমান সহিত, সহিতের ভাব সাহিত্য। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির ও সমগ্র ধর্ম্মের সহিত যেই স্থানটুকুতে মিল রহিয়াছে, যেখানে কোনো দেশের কোনা জাতির কোনো ধর্ম্মের বিরোধ নাই তাহাই সাহিত্য। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বলা রহিয়াছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্', 'রসো বৈ সঃ'। এই রসের সমুদ্র মন্থন করিতে চাই কি? চাই শক্তি, চাই স্বাস্থ্য। দুর্ব্বলের হৃদয়ে রসের নির্ঝরিণী ঝিনি ঝিনি ধ্বনি তোলে না, বলহীনের প্রাণে আত্ম-অনুভূতি হয় না;—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

উপনিষদ্ যুগের সাহিত্য আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বৈদিক যুগের সাহিত্য আমাদিগকে জানাইতেছে, মানবের হৃদয়ে যদি সাহিত্যের চাষ করতে চাও তবে আগে তার দেহের চাষ কর, সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তি আসিবে ইহার উত্তর আমি "প্রাচীন ভারতে কৃষি" নামক এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, সেই প্রবন্ধ অনেকদিন পূর্ব্বে মাসিকপত্রে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। (প্রাচী, ১৩৩১ শ্রাবণ)

* জামালপুর সাহিত্য সভায় পঠিত

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, জগতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের সাক্ষী সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব, সাহিত্য প্রচার করিতেছে "ওহে ঋষি তুমি ভূমির মূল্য বুঝ, ওগো গৃহস্থ তুমি হল কর্ষণ কর।"

"শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাসা অভিযান্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসুধত্তম্॥
ঋক্ ৪। ৫৭। ৮

(অর্থ) লাঙ্গলের ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক রক্ষকগণ বলীবর্দ্দ সমূহের সহিত সুখে গমন করুক (যেদিকে বলদগুলি যায় ঠিক সেইদিকে উহাদের পেছনে পেছনে লাঙ্গল ধরিয়া যাক্।) পর্জ্জন্য (মেঘ) মধুর জলের দ্বারা ভূমি সিক্ত করুক, হে শুনাসীর, তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। শুনাসীর অর্থ ইন্দ্রদেব।

মা বসুন্ধরার অণুতে অণুতে, তনুতে তনুতে, সর্ব্ব অঙ্গে অগণ্য বসু, অসংখ্য রত্ন। ওহে বসুমতীর সন্তান, তুমি যদি সেই রত্ন আহরণ না করিবে, তবে তোমার সন্তানত্ব কোথায় মায়েরই বা মাতৃত্ব কোথায়? মায়ের বিশাল বক্ষজোড়া দুধের সমুদ্র. অমৃতের ভাণ্ডার তুমি যদি সেই ভাণ্ডার না চিনিলে তবে তুমি অন্ধ, তুমি যদি অমৃতের সন্ধান না পাইলে তবে তোমার মৃত্যু। অমৃতের অভাবে তুমি মৃত। ওগো বঙ্গবাসী তুমি যে বাঁচিয়া মরা, তুমি যে আজ নিকৃষ্ট অর্থে জীবন্মৃত।

বাঙ্গালার সন্তান স্কুলে, কলেজে, টোলে, মক্তবে, মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিবে এবং সেই শিক্ষার বিলাসে নিজের দেশের কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়া যাইবে, গোমাতার সেবা বিস্মৃত হইবে, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে অমনোযোগী হইবে, ব্রহ্মচর্য্যের বাণীতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে, শারীরিক শক্তি লাভে বীতস্পৃহতা দেখাইবে এই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেতাবতী শিক্ষার ইহাই কি মুখ্য অভিপ্রায়? সকল দেশের সকল জাতির প্রাচীন এবং বর্ত্তমান তথ্য অনুসন্ধান কর, জানিতে পাইবে কোনো দেশই শিক্ষার মোহিনী আকর্ষণী দ্বারা নিজের দেশের মাটিকে ভুলাইয়া দেয় না অবশ্য যেই দেশে মাটি নাই, সেই দেশের কথা স্বতন্ত্র। সেই দেশ হাওয়ার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, বিজ্ঞানের বলে জীবিকা অর্জ্জন করে। যেই দেশে মাটির অভাব নাই, যেই দেশ-মাতৃকা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, আজ সেই দেশের সন্তান হাতে পুঁথি লইয়া কৃষিকে ভুলিতেছে। আমাদেরই দেশের রাজার ঘরের সন্তান রাজর্ষি জনক একদিন এক হাতে নিয়াছিলেন বেদ, এক হাতে লাঙ্গল। রাজার ছেলের সেই মহান্ আদর্শ কি আমরা গরীবের ঘরের ছেলেরা অবহেলা করিয়াই চলিব?

আর শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি একমাত্র চাকরী হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই এক দরজা উত্তীর্ণ হইয়া যদি চাকরী গ্রহণই লক্ষ লোকের লক্ষ্য হয়, যদি বাঙ্গালার হাজার হাজার পাশ করা ছেলে চাকরী কোথায় চাকরী কোথায় বলিয়া হা-হুতাশে গগন পবন বিদীর্ণ করে, তবে বঙ্গবাসীকে আজ অধন্য বলিতে হইবে। বিজ্ঞদিগের বাক্য এখন আর কেউ শুনে না, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মদ্বারা যে দেশের উন্নতি হইতে পারে তাহা আর স্মরণ করে না।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

এই সমস্ত উপদেশজনক বাক্য এখন বঙ্গবাসীর নিকট অশ্রদ্ধেয়, অপাংক্তেয়।

সাহিত্যের রচনার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের অধিকাংশই এখন যৌনতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা বর্ণনে পটুত্ব অর্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালার যেই পল্লীর কোলে শতকরা নব্বইজন লোকের বাস সেই পল্লী-সাহিত্য রচনায় কাহারও লেখনী চালিত হয় না, যদিইবা কাহারও কাহারও ক্ষুদ্র গল্পে সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় তাহারও অধিকাংশ মনস্তত্ত্বের সমাধানেই পরিসমাপ্ত। বাঙ্গালার নানা অভাব অভিযোগ কি প্রকারে সমাধান প্রাপ্ত হয় সেই বিষয়ে কোনও সাহিত্য বড় দেখা যায় না।

বাংলা দেশের শস্যভূমি আজ কচুরিপানার প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে। সাহিত্যিকের সাধনা এই সমস্যার সমাধানে ন্যস্ত হইলে বোধ হয় বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক কচুরিপানার ধ্বংস সাধনে যত্নবান হইত। কাহারও গ্রামের পার্শ্বে কিংবা নিজ বাড়ীতে হয়ত ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি মস্ত বড় বন জঙ্গল রহিয়াছে। গ্রামের

তরুণ সম্প্রদায় ঐ সমস্ত বন জঙ্গল অপরের দ্বারা অথবা স্বয়ং আমূল নষ্ট করিতে পারিলে পল্লী সাহিত্য রচনার সূচীপত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যে আছে তাহাতো মনে হয় না, কারণ বঙ্গদেশের ঘরে ঘরেই কৃষির বিদ্যালয়। কিন্তু আজ বাঙ্গালার অনেক শিক্ষিত ছেলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিবে কি না তাহাই ভাবিতেছে, পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামের অসংখ্য কৃষি ব্যবসায়ীর সন্তানবৃন্দ কৃষিকর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ভাববার বিষয়ও বটে।

প্রতীচ্যের কবি ইবসেন ও মেরীকরেলী প্রভৃতির সাহিত্য যেরূপ Goldsmith ও wordsworth প্রভৃতির সাহিত্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যও তেমনি রবি ঠাকুরের কৃষিক্ষেত্র সুরুল প্রভৃতি স্থানের কৃষিসাহিত্যকে ডুবাইয়া দিতেছে।

পল্লী সাহিত্য বলিতে আমরা কি বুঝি? আমরা প্রথমতঃ বুঝি গোষ্ঠী সাহিত্য। গ্রামের মাতব্বর অপর এক সম্পন্ন গৃহস্থকে ডাকৃছেন "ওগো ঠাকুর্দ্দা কেমন আছ! তিন তিন টামাস বৃষ্টি হচ্ছেনা চাষবাসের অবস্থা যে এবার কি দাঁড়াবে তা জানেন ইন্দ্রদেব!" এই বলিয়া মাতব্বর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে বসিল। পল্লীর আরও কতিপয় গৃহস্থ সেই গল্পে যোগদান করিল। সেই গল্পে গল্পে যে সাহিত্য তৈরী হইল, তাহাই গোষ্ঠী সাহিত্য। বাদল ধারার গান তৈরী হইল, গোপালনের মাঠের ধারে কৃষকের সঙ্গীত রচিত হইল, যুবা গৃহস্থ গৃহিণীর জন্য বাজু ও নথ তৈয়ার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

পল্লীর ভিতরে এই যে এক বিমল আনন্দ কি আর পাওয়া যাইবে? পতির জন্য পত্নীর সমস্ত স্নেহ সমস্ত ভক্তি দান, পক্ষান্তরে পত্নীর জন্য পতির প্রগাঢ় প্রেম বর্ত্তমান সাহিত্য স্বষ্টির ভিতরে আর বুঝি পাওয়া যাইবেনা। পল্লীর সাহিত্য রচনা করিতে হইলে বাঙ্গালার আদর্শ পরিবারের সাহিত্য বাঙ্গালীর ছাঁচে বাঙ্গালীর কাঠামে গরিয়া তুলিতে হইবে। পতি পত্নীর পরস্পর ভালবাসা শুধুই এক মুহূর্ত্তের জন্য নহে বা এক জন্মের জন্য নহে, ইহাই বাঙ্গালার শিক্ষা, ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন নিয়ম।

দেশ-ভরা আইন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উকীল ও মোক্তার গণ পল্লীসাহিত্য গঠনে, লোক শিক্ষা প্রদানে অনেক প্রকারে সহায়তা করিতে পারেন। দেশের শিক্ষক সম্প্রদায়ের হস্তে সেই ভারটী ন্যস্ত বটে কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের অভাব অভিযোগের সমস্যা আর সমাধান প্রাপ্ত হইতেছে না!

এখন অনেক সময়ে স্বয়ং Viceroyএর বক্তৃতায় কিংবা প্রাদেশিক গবর্ণর বাহাদুরদের অনুশাসনে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মহোদয়দের উপদেশে পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে মনোনিবেশ করিতে বলা হয় বটে কিন্তু

"দৈবাদ্ ভাগবতী কথা যদি ভবেৎ
কেবা শুনে সে কথা!

আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত আধুনিক যুবকের কাণে সেই সমস্ত উপদেশ পৌছায় না, যদিইবা পৌছায় তাহাও কার্য্যকরী হয় না। এখন আর গুরু গৃহ নাই, গুরুর জন্য এবং নিজের জন্য গোপালন নাই, কাষ্ঠ সংগ্রহ নাই তরকারীর চাষ নাই; ফুলের বাগান আর তৈরী হয় না, শরীরের শক্তিও আর রক্ষিত হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে শৌর্য্যের অভাব, স্ফূর্ত্তির অভাব। স্ফূর্ত্তির অভাবে নৈরাশ্য নৈরাশ্যের দরুণ মরার মত জীবন যাপন এবং অকালে কালের কোলেএলাইয়া পড়িয়া একদল পরিবারকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া।

বাঙ্গালার এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ পল্লীসাহিত্য গঠনে যত্ন লইতে হইবে। পল্লীর প্রথমতঃ প্রাণ রক্ষাদ্বারাই নগরীর প্রাণরক্ষা।

প্রাচীন সাহিত্যে বরের শোভাযাত্রা

(দ্বিজবংশী ও নারায়ণ দেবের ভণিতা অবলম্বনে)

(শ্রীচন্দ্রকুমার দে)

নির্ব্বন্ধের শেষ পত্র লইয়া ভাট চম্পকনগরে গমন করিল। পুরোহিত জনার্দ্দন রাশিনক্ষত্র বিচার করিয়া শুভদিনে শুভ লগ্ন স্থির করিলেন। অমনি গন্ধবণিক সমাজে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া নানা দিক দেশ হইতে কুলীন অকুলীন গন্ধ বণিকের দল আসিয়া চম্পকনগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সিংহল হইতে আসিলেন চন্দ্রধরের মাতুল ভগীরথ সাধু। তাঁহার সঙ্গে দিব্য শঙ্খ প্রবালাদি বিবিধ সামুদ্রিক রত্নে পূর্ণ চৌদ্দখানি ডিঙ্গা, একদল সিংহলী বাদ্যকর। সিংহলী সদাগর গন্ধ বণিক সমাজের কুলীন চূড়ামণি অগ্রপংক্তিতে ভোজন সভামর্য্যাদা চিকন ধুতির জোর,—সোণার কলসী ও সোণার বাটায় পান। তাহার আকর্ণ বিস্ফারিত বদনমণ্ডল—আবক্ষলম্বিত বিশাল উদর দেখিলে দর্শকমণ্ডলীকে সিংহলের আদিম অধিবাসীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পূর্ব্বদেশ হইতে আসিলেন লক্ষ্মীন্দরের পিসা ধনেশ্বর সাধু। তাঁহার সঙ্গে তেরখানি ডিঙ্গা—ধনরত্নে পূর্ণ। তিনিও গন্ধবণিক সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন। সভা মর্য্যাদা, চিকন ধুতির জোর ও রূপার কলস। দক্ষিণ দেশ হইতে আসিলেন লক্ষ্মীন্দরের মাতুল রত্নেশ্বর সাধু। তাঁহার সঙ্গে বহুমূল্য পট্টপত্রাদিপূর্ণ বারখানি ডিঙ্গা। উত্তর দেশ হইতে—গারোর ছাগল, খাসিয়া পান, "গামছাবান্ধা দই" হস্তিদন্ত নির্ম্মিত শীতল পাটী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ চৌদ্দখানি ডিঙ্গা লইয়া আসিলেন চন্দ্রধরের ভগ্নীপতি হীরাধর সাধু।

গুঞ্জরীর জলে দ্বিতীয় চম্পকনগরী তুল্য সেই বিশাল অর্ণবপুরী শোভা পাইতে লাগিল। কালিদহ সাগরে চৌদ্দ ডিঙ্গা মগ্ন হইবার পর চন্দ্রধর নিরস্ত ছিলেন না। তিনি নূতন করিয়া প্রকাণ্ড এক নৌবহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়ূরপঙ্খী নামক সুবৃহৎ ডিঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন হইয়াছিল। এই ডিঙ্গা বাণিজ্যের জন্য নহে,—লক্ষ্মীন্দরের বিবাহসজ্জার জন্য। তাহার দেহ ময়ূরের অবয়ব বিশিষ্ট। সমুদ্র হইতে নীলপ্রভমণি আনিয়া তাহার নীলকণ্ঠে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হরিৎ, পীত, নীল, লোহিত ও শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের মহামূল্য মণিদ্বারা চন্দ্রকলাপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূর হইতে সেই দৃশ্য দেখিলে মেঘের উপর ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রম হইত। একদিকে সোণার তার অপরদিকে সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা বস্ত্রশিল্পী সেই পাল গড়িয়াছিল। রবির কিরণে সেই পালের স্বর্ণবিন্দুসকল নক্ষত্রের মত ঝলমল করিত। মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণময় মাস্তুল—চূড়ায় সুবর্ণ কলস রবির কিরণে জ্বলিতেছিল। তাহার উপর সুবৃহৎ রক্ত পতাকা—রণজয়ী বীরের উষ্ণীষের মত সগর্ব্বে বায়ুভরে দুলিতেছিল।

পনর শত কুলীন, দশ শত গাবর, সাত শত মাঝী ধাঙ্গর সকলে বিবাহের বরযাত্রী হইয়া চলিল। ভারে ভারে মিষ্ট দ্রব্য বিবিধ রসাল ফল দ্বারা ভাণ্ডারীগণ ভাণ্ডারের নৌকা পূর্ণ করিতে লাগিল। তেরশত ডিঙ্গার পুরোভাগে সেই সুবৃহৎ ময়ূরপঙ্খী শোভা পাইতে লাগিল। শুভক্ষণে "মাইজ দর্পণ" হাতে গন্ধর্ব্বকুমার তুল্য প্রিয়দর্শন লক্ষ্মীন্দর বিবাহযাত্রা করিলেন। ছত্রধারী শিরে সুবর্ণ ছত্র ধরিল। পুরনারীগণ হুলুধ্বনি ও জয়গীতের সঙ্গে সঙ্গে কুমারের শিরে লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সনকা আসিয়া লক্ষ্মীন্দরের উত্তরীয় প্রান্তে মঙ্গলচণ্ডীর অষ্ট দূর্ব্বা বাঁধিয়া দিলেন। চোপদার মণিমুক্তাখচিত উষ্ণীষ শিরে পরাইয়া দিল। পুরনারীগণ লক্ষ্মীন্দরের চক্ষে কাজল পড়াইয়া দিল। পুরোহিত আসিয়া ললাটে চন্দনের ফোটা আঁকিয়া দিলেন। স্কন্দতুল্য সেই বরবপু দর্শকমণ্ডলীর নয়ন আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

শোভাযাত্রার পুরোভাগে সেই বিশাল ময়ূরপঙ্খীতে যাইয়া লক্ষ্মীন্দর উপবেশন করিলেন। তাঁহার একদিকে সিংহলী সদাগর ভগীরথ সাধু—অপর দিকে পিশা ধনেশ্বর আরও কয়েকজন কুলীন চূড়ামণি। চম্পকের প্রিয়দর্শন ছেলেরা হীরা মুক্তা-খচিত বসন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া ডিঙ্গার উপর চামর দুলাইতেছিল।

তাহার পশ্চাৎভাগে অপর এক ডিঙ্গাতে স্বয়ং চন্দ্রধর। পুত্রের বিবাহে তিনিও বরযাত্রী হইয়া

কোন বিশেষ উৎসবে জীর্ণ পুরাতন লোককে আবার তরুণ করিয়া তোলে। সদ্যোজাত শিশুপুত্রের মুখ দেখিলে মৃত পুত্রের স্মৃতি একটা বিগত দুঃখ কাহিনী লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আজ যদি তাহার সেই প্রাণপ্রতিম ছয়পুত্র জীবিত থাকিত তাহারাও ত এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিত। একটী নয়, দুইটী নয়, ছয় ছয়টী পুত্র—কুলের দীপ কালের বাতাসে নিভিয়া গিয়াছে। এ লক্ষীন্দরেরই বা ভরসা কি?

বর্ষার মেঘের মত দারুণ সন্দেহ আসিয়া সদাগরের মনে হানা দিতেছিল। ক্রমে ছয় পুত্রের জীবন শূন্য দেহ—তাহাদের অন্তিম বিদায় বাণী মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শোক স্রোত যেন দ্বিগুণ বেগে তাঁহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বাহিরে উগ্র প্রফুল্লতা দ্বারা সেই রুদ্ধ স্রোতের মুখে পাষাণ চাপা দিয়া চন্দ্রধর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের সঙ্গে পাশা খেলা জুড়িয়া দিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে পতাকা বাহী ও আশাসোটাধারী পদাতিক সৈন্যের তের খানি ডিঙ্গা। তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে নট নটীগণ নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। উপরে স্বর্ণ দণ্ডে চাঁদোয়া তাহাতে মনি মুক্তার ঝালর। নীচে সোণা রূপার চৌকি—আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাহার উপর বিদ্যাধরী তুল্যা নৃত্যশীলা নর্ত্তকীগণ বিহার করিতেছে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বেতস লতার মত তাহাদের সুকোমল দেহ দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে চৌদ্দখানি ডিঙ্গাতে নহবৎ। উচ্চ গজারির স্তম্ভের উপর আকাশ মঞ্চ কোনটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি কোনটী গম্বুজাকৃতি বিচিত্র পক্ষীর পালকে যে সকল মঞ্চের চালে ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। সেই মঞ্চের উপর বসিয়া রৌসনচকীর দল নহবৎ বাদ্য করিতেছে।

তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে বিবিধ বাদ্যভাণ্ড। কারা, নাগারা, জগঝম্প, ঢাক, ঢোল, করতাল—কোলাহলে জলজন্তুগণ প্রমাদ গণিতেছে। তাহার পেছনে ষোলখানি ভাণ্ডারের ডিঙ্গা। চিনি সন্দেশ পিষ্টকাদি বিবিধ সুরসাল মিষ্ট দ্রব্যে পূর্ণ। লক্ষীন্দরের মাতুল রত্নেশ্বর সাধু স্বয়ং ভাণ্ডারী। তাহার পশ্চাতে আতসবাজীর কুড়িখানি ডিঙ্গা। বাজিকরগণ আপন আপন ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার জন্য রজনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে বিবিধ রঙ্গ রহস্য। মানুষ ভালুক সাজিয়াছে। কেউবা বানর সাজিয়া কেউবা বনমানুষ সাজিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছে। জলের উপর এরূপ বিরাট শোভাযাত্রা আর কখনও কেহ দেখে নাই। তামাসা দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক ধরে না। কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দাঁড়ের টানে নদীতে প্রলয় উপস্থিত। ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কল্লোল কোলাহল মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত পৌছিয়া বরুণ দেবের প্রবাল মন্দির কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। রাখাল বালকেরা পান চিনির জন্য ভাণ্ডারের নৌকার পাছে পাছে ছুটিয়াছে—বরের বাপের নামে নানাপ্রকার অশ্লীলছড়া বাঁধিয়া গাহিতেছে। রত্নেশ্বর সাধু তাহাদিগকে চিনি ও পান রসাল মিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বিদায় করিলেন। ছেলেরা উল্টো সুর ধরিয়া চলিয়া গেল।

আসন্ন সন্ধ্যায় সেই বিশাল অর্ণবপুরী যাইয়া উজানী ঘাটে লাগিল। হস্তি ঘোড়ার মিছিল করিয়া উজানীর লোক বরযাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আসিল। দুই উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু যেন পরস্পর মিশিয়া গেল। আতসবাজীর নৌকা হইতে বাজীকরগণ বাজী ছাড়িতে লাগিল। হাৎৈ, শিলৈ, পঞ্চমুখী, জ্বালামুখী, আকাশ প্রদীপ শূন্যধুম প্রভৃতি কত রং বেরংঙ্গের বাজী—আকাশ চাম্পা আকাশে শত শত সুবর্ণ চাম্পাফুল ফুটাইয়া তুলিল। আসমান তারা নভোমণ্ডলে কোটী নক্ষত্রের মালা রচনা করিল। কদম্বদ্রুম, চন্দ্রদ্রুম শূন্যপথে উঠিয়া কোটীচন্দ্রের উদয় দেখাইল। তাহাদের কোনটী অর্দ্ধচন্দ্র কোনটী ষোলকলায়পূর্ণ, কোনটীতে গ্রহণ লাগিয়াছে। শত সহস্র মশালচী জ্বলন্ত মশাল হস্তে রাত্রিকে দিবসে পরিণত করিয়া চলিয়াছে। বরযাত্রীগণ কেউ গজে কেউ অশ্বে কেহ বা পাল্কীতে চড়িয়া উজানী নগরাভিমুখে চলিয়াছেন। মধ্যে সেই প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব্ব কুমার তুল্য লক্ষীন্দরে রক্তবর্ণ অশ্বে সমাসীন। তাহার মস্তকে মণিমুক্তাখচিত মুকুট—গলায় রাঙ্গনের মালা। স্বর্ণখচিত উত্তরীয় বাতাসে দুলিতেছে।

নারী জাগরণের স্বরূপ

(শ্রীবিদ্যুৎলতা দেবী)

শুন্‌তে পাই দেশ বিদেশের নারীগণ জেগে উঠেছে, শুধু ভারতের নারীরাই ঘুমিয়ে আছে। ভারতের নারীদের গভীর নিদ্রার জন্যই নাকি ভারতবাসী স্বরাজ বা স্বাধীনতা কিছুই পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা আজও জানতে পাচ্ছিনা নারীদের জাগরণটা কিরূপ ?

যদি বছর বছর হাজার টাকার পোষাক বদলিয়ে পরাই নারী জাগরণের চিহ্ন হয়, যদি আমেরিকার ধনবতী নারীদের ন্যায় কাহারও কাহারও বিশ হাজার টাকার জুতা মোজা পরিধান নারী-সভ্যতার পরিচয় হয়, তবে তেমন ধারা জাগরণ বা সভ্যতা আমাদের দেশে আজও যে আসেনি তাহা সত্য।

জাগ্রত নারীরা স্কুলে কলেজে শিক্ষালাভ করবে, পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পরীক্ষায় পাশ করবে, এবং পরে পুরুষদের ন্যায়ই চাকরী গ্রহণ করবে, এই যদি নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের পরিচয় হয়, তবে তেমন শিক্ষা বিস্তার আমাদের দেশে কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে বটে।

কিন্তু যে শিক্ষায় নারীকে পুরুষেরই ন্যায় চাকরী গ্রহণ করতে হয়, এবং প্রাতে দশটা থেকে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থানে কাল কাটাতে হয়, সেই শিক্ষায় নারীর নারীত্ব ও মাতৃত্ব থাকতে পারে কিনা তাতে আমাদের সংশয় আছে।

নারী যদি দিবসের অধিকাংশ সময় চাকরী করে' কাটান এবং ভোরে বিকালে বিশ্রাম করেন অথচ প্রাতে ৮টায় ঘুম থেকে উঠেন তবে গৃহের কর্ত্তৃত্ব করবে কে ? চাকর ও পাচকের উপর ঘরকন্নার ভার অর্পণ করে' যদি অব্যাহতি লাভ করা যায়, তবে তেমন গৃহস্থের ভাগ্যে আমাদের দেশের সুপক্ক খাদ্য জুটবে কিনা সন্দেহ।

চাকর পাচক ও ঝি এই তিনের সহযোগে গৃহ মধ্যে প্রত্যহই ত্র্যহস্পর্শ লেগে থাকবে এবং অশান্তির অন্ত থাকবে না। হয়ত বা গৃহস্থ বা গৃহিণী কোনো কোনো দিন বাড়ীর অন্ন না পেয়ে হোটেল থেকে ভাত কিনে কিংবা ময়রার দোকান থেকে খাবার কিনে উদর পূরণ করবেন।

যে সন্তান নিজের উদরে জন্মগ্রহণ করবে সেই সন্তানকে ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখলে নারীদের চাকরী বজায় রাখার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মায়ের মাতৃত্ব যে তাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় ; সন্তান আপন মাকে মা ডাকতে না পেয়ে, মা ডাকবে কিনা ধাই মাকে। আপন মায়ের স্তনধারায় সন্তানের সর্ব্ব অঙ্গ পরিপুষ্ট না হয়ে, পরিপুষ্ট হবে কিনা কেনা মায়ের কেনা দুধে। একথা শুনলে ও যে দুঃখ হয়।

অনেক ঘরের অনেক ছেলেকে শুনেছি মায়ের স্তন থেকে বঞ্চিত করে, মাতৃহারা শিশুর মত বিলেতি দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করা হয়, স্বাধীনতার দাপটে দেশের গরুগুলিও বোধ হয় বাঁচবে না।

শুনেছি আমেরিকার নারীরা তাদের সন্তানকে স্তন্যপান থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাঁরা বলেন স্তনপান করালে নাকি তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য দেশের রমণীর পক্ষে বোধ হয় যা ইচ্ছা তা খাটে কিন্তু ভারতের রমণীর তাতো খাটে না। ভারতের রমণী যে মাতৃরূপিণী, আনন্দদায়িনী।

যে সন্তান নারীর শরীরের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি হয়, সে সন্তানকে কি মা স্তন থেকে বঞ্চিত করতে পারে ? না, ভারত নারী তা পারে না। ভারত রমণীর মত আদর্শ রমণী বুঝি জগতে নেই। অন্য দেশের রমণীরা শুধু স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করে, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তারা চায় না।

ভারত রমণী তা পারে না, তারা চিরদিন থেকে স্বামীর আত্মীয় পরিজন, শ্বশুর শাশুরী ও দেবর ভাসুর নিয়ে ঘরকন্না করে এসেছেন।

এই একতাটাই সে সব চেয়ে ভালবাসে। কিন্তু নারী স্বাধীনতায় ভারতে বুঝি আর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা থাকবে না। ভারত রমণী স্নেহ মমতায় জর্জ্জরিতা, ভারত নারী আমরা, আমাদেরও জাগতে হবে বটে কিন্তু সেই জাগরণটা কিরূপে ?

গৃহকর্ম্ম, সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর সেবা, শ্বশুর শাশুরী গুরুজনের প্রতিশ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, গো সেবা, গৃহে বারব্রত নিয়ম পালন করা। গৃহে থেকে দেশের জন্য স্বামী পুত্রের জন্য কায়মনোবাক্যে মঙ্গল কামনা করা। এই হচ্ছে নারীর কর্ত্তব্য কাজ। অথচ নারী গৃহে থেকেই সতত পুরুষদের সহায়তা করবে, তাঁদের উৎসাহ দিবে।

গৃহে থেকেও নারী উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারে। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাল জানা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সঙ্গে দেশ বিদেশের বৃত্তান্ত জানা, সূতাকাটা, কাপড় বোনা, জামা তৈরী করা প্রভৃতি গৃহশিল্প এবং অন্যান্য কুটিরশিল্প বিষয়ে শাক্ সব্‌জির উৎপাদন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা, গৃহে থেকেও চলে।

অন্য দেশের রমণীরা স্বামীকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু ভারত রমণীদের মত তারা স্বামীকে ভালবাসে ও ভক্তি দেখানো উভয়টী করতে জানে না! ভারত নারীরা স্বামী ভক্তির জোরে কি না করতে পারে, নারীত্বও সতীত্বের জোরে এই দেশকেও তারা উদ্ধার করতে পারে।

এই দেশেই সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী, লীলা, খনা৲বতী জন্মগ্রহণ করে ছিলেন সেই আদর্শ মনে করেই ভারত নারীর চলতে হবে। বর্ত্তমানে সারোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি সেই প্রাচীন সনাতন নারীজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। সেই স্মৃতি যেন ভারত নারীর প্রাণে জাগে।*

পুস্তক পরিচয়

গীতায় স্বরাজ—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। দেশকর্ম্মী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুদীর্ঘ কারাবাস কালে গীতার একটী সময়োচিত ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই সাধনারই ফল। ইহাতে লেখক গীতার সেই শ্লোকাবলী হইতে পাঠকের সম্মুখে প্রকৃত কর্ম্মের সুর ধ্বনিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকার স্বদেশ-ভক্ত, নিষ্কামকর্ম্মী। গীতায় ভগবান যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য পার্থকে ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সকল কথা বিশেষ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারার্থ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন গ্রন্থকার ইহাই নূতন চিন্তার আলোকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ভাবার স্বচ্ছন্দ গতি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার একান্ত নিজস্বতায় পুস্তকটী সকলের কাছেই উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

---

* জামালপুর সাহিত্য সভায় পঠিত।

ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি

১৯২১ সনের অক্টোবর মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এই নগরে একটী মহিলা সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্ব প্রথম ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি স্থাপন করেন এবং কলিকাতা সরোজনলিনী মহিলা সমিতির সহিত ইহার সংযোগ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রায় একবৎসর এই সমিতির কার্য্য চলিতে থাকে। দীর্ঘদিন পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে ইহার আর এক অধিবেশন হয়। এবং এই অধিবেশনে সর্দ্দার বিল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তৎপর এই মহিলা সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণের উদ্যোগে এই নগরে একটী বয়ন বিদ্যালয় ও কয়েকটী শাখা সমিতি স্থাপিত হয়। এই শাখা সমিতিগুলিতে মহিলাদিগকে বিশেষভাবে কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত মহিলাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির অনুশীলনের জন্যও কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুরুসদয় দত্ত এই নগরে উপনীত হইবার পর হইতেই নানা জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ সঞ্চার হয়। মহিলা সমিতির নব জাগরণও তন্মধ্যে অন্যতম।

গত ১৮ই নবেম্বর স্থানীয় বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে এই মহিলা সমিতির এক অধিবেশন হয়। সে সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য স্ত্রী পুরুষ যোগদান করেন। কতিপয় পুরুষ ও মহিলা লইয়া ময়মনসিংহ জেলা মহিলা সংগঠন সমিতির একটী অস্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ময়মনসিংহ জেলায় মহিলা শাখা সমিতিগুলি সংগঠন করা ও এই জেলাস্থ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ এই উপরোক্ত সভার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

ইহার পর মহিলা সমিতির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জেলায় মফঃস্বলে শাখা সমিতি স্থাপিত হইতেছে।

চিত্র পরিচয়

জীবন নদীর ওপারে আশার ক্ষীণতট দৃষ্টিপথে সংসারক্লিষ্ট 'ওপারের যাত্রী'।

আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী।

(কানন কাহিনী হইতে গৃহীত।)

সপ্তদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ ও মাঘ, ১৩৩৬। | একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

কামনা

(শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

ব্যক্তিগত মুক্তি, প্রভু, চাইনে আমি চাইনে, জগৎপিতা !
জাতির সাথে যুক্ত হৃদয়, মুক্ত হবো সবার সাধনাতে !
সবার সাথে বাঁচ্‌তে পারি, মরতে হ'লে মর্‌বো সবার সাথে !
স্বদেশবাসী মেথর মুচি কাঙ্গাল কৃষক সবাই আমার মিতা !
স্তব স্তুতি সন্ধ্যা পূজা আমার কাছে এসব নেহাৎ তিতা !
তোমার কথা ভাবতে গেলেই মন যে কাঁদে গভীর যাতনাতে !
সমাজ স্বদেশ জাতির কথাই মরছি ভেবে সারা দিবস রাতে।
নিজের স্বার্থ ভোলার মতো রেখো, প্রভু, অটুট্ তেজস্বিতা !

দূর করেছি দুঃখ-ভীতি, জাতির সেবায় যায় যেন এই প্রাণ !
সাচ্চা পথে চল্‌তে পারি, দাও গো এমন বিরাট হৃদয়-বল !
আর তো, প্রভু, সয় না মোটেই—সয় না তো আর আত্ম-অসম্মান !
কণ্ঠ নিরোধ, হাত পা বাঁধা, শুষ্ক চোখে নাই যে লোণা জল !
ঠিক দধীচির মতন যেন দুখীর হিতে জীবন করি দান !
জগদ্বাসীর আশীর্ব্বাদে মনের কবে থামবে কোলাহল !

হেড্ মাষ্টার বাবু

[শ্রীবীরেশ্বর বাগচী বি, এ]

মৌলবী সাহেব এসে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত ...তে হেডমাষ্টারের পানে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ...ার, আজ আমার সর্ব্বোনাশ হয়্যা গিছে — ময়দানে এট্টা ...ই বাঁধা ছিল, কলিমদ্দি চোরা সেডা চুরি কর্যা পলাইছে! ...ন হেডমাষ্টার ছাড়া আর সবারই মুখে সহানুভূতি ফুটে ...ল। তিনিই হেসে বল্লেন—"আমি কি কর্ব্ব! স্বজাতীয় ...স্বজাতিই নিয়েছে এর আবার কথা কি! চুপ্ করে বসে ...কুন— আর পারুন ত তার একটা গরু আপনি ও সরিয়ে ...লুন গিয়ে, বাঁধনের গোড়ায় বাঁধন পড়ুক!" শুনে মৌলবী ...হেব চটে বল্লেন— এডা কি কন ছার! আমার তিনশ ...। মুরিদ— আমি খোদ এট্টা এলেম আদ্‌মী— আমি চুরি ...র্ব্বো গরু! আমাকে কাল ক্যাজুয়েল বিদায় মঞ্জুর করেন ...। ফজরের ওক্ত উঠে আমি থানায় এজাহির দিতে চলে ...ব।" গম্ভীর হয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন— "তা পার্ব্বনা— ...পনি বেতনবৃদ্ধির দরখাস্ত করেছেন, ওদিকে আবার ...পনার বিরুদ্ধে পাল্টা আরজী পড়েছে, যে আপনি ...লেদের Persian translation এর খাতা বাড়ী নিয়ে ...র লাল কালী দিয়ে correct করেন না। কাল এই ...। তদন্ত কর্ত্তে সেক্রেটারী বাবু ইস্কুলে আস্‌বেন। অভি-...গ মিথ্যা হলে আপনার মাইনে বাড়বে। চাকরী কর্ত্তে ...ল কাল হাজির থাকা নিতান্তই দরকার। পাল্টা ...রজীর কথা সত্য নয়। কেউ মাইনে বাড়ার দরখাস্ত ...রলেই কোন রকমের একটা চক্রান্ত করে তাঁর মাইনে ...ড়া বন্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে তাঁর বরাবরের অভ্যাস। ...লবী সাহেবের ব্যাপার ও ঠিক্ তাই।

বিরুদ্ধ আরজীর কথা শুনে মৌলবী সাহেব অত্যন্ত ...ম্বিত হয়ে বল্লেন— ছয় সাত থাম্ খাতা তা আর— বাড়ী ...তি যাব ক্যান—কেলাসে বস্যাই সার্যা ফেলি। হেড-...ষ্টার বল্লেন— "সে কথা কাল বলবেন। মৌলবী সাহেব ...স্বরে বল্‌লেন—"তাদি যে আমার থানায় যাওয়া হয় ...।" সহানুভূতিসূচক স্বরে শচীন্দ্র বাবু বল্লেন— আপনার ...জের যাওয়ার দরকার নেই। একটা দরখাস্ত লিখে বাঙ্গলায় লিখলেও চলবে — লোক মারফত থানায় পাঠিয়ে দিন।" আশ্বস্ত হয়ে মৌলভী সাহেব বল্‌লেন— আচ্ছা, তাই গে করি।

মৌলভী সাহেব দ্রুতপদে বাড়ী মুখো রওনা হলে শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে হেডমাষ্টার বল্লেন— শচীন্দ্র বাবুর ত দেখ্‌ছি বেশ legal advise gratis দেওয়ার অভ্যেস্ আছে।" শচীন্দ্র বাবু কোন কথা বল্‌লেন না। কবিবর দাঁড়িয়ে বল্‌লেন— ভাল কথা মনে হয়েছে —আমার গাইটাও মাঠে বাঁধা রয়েছে— চাকর গিয়েছে বাড়ী—দেখিগে সেটা আছে কিনা। তাহলে বুঝলেন হেডমাষ্টার বাবু, কাল যেন আমার রসিদ পাই। হেসে হেডমাষ্টার বল্লেন নিশ্চই পাবেন।"

এই সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করল—হেডমাষ্টার মহাশয়ের এই বাড়ী! "কবিবর জবাব দিলেন—হাঁ। তার পরে হেডমাষ্টার বাবুর কাঁধে হাত দিয়া বল্লেন—"ইনিই হচ্ছেন, আমাদের হেডমাষ্টারে বাবু।" ভদ্র লোকটী হেডমাষ্টরের পানে চেয়ে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বল্ল—"আমি আপনারই কাছে এসেছি।" প্রতি নমস্কার না করে হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন? "স্কুলে নাকি একজন Asst teacher এর post vacant আছে?"

"হাঁ"

"আমি একজন Candidate—application লিখে এনেছি আপনার হাতে দিতে পারি কি?"

"বেশ দিন্।" ভদ্র লোকটী application দিল; হাতে নিয়ে হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—'উপরে উঠে এসে বসুন— কথাবার্ত্তা বলা যাক্।" ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন। অন্যান্য শিক্ষকেরা তখন যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। হেডমাষ্টারবাবু কালাচাঁদবাবুর পানে চেয়ে বল্লেন—"চল্লেন আপনারা!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—হাঁ—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। সবাই চলে গেলে হেডমাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি কি Graduate?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"B. A. তে কি কি Combination ছিল?

'Sanskrit, Mathematics, Mathematics এ honours ও নিয়েছিলাম'।"

"Honours পেয়েছিলেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ—First class 7th হয়েছিলাম।

"তা, ভালই আমাদেরও mathematicsএর handই দরকার—top class এ আঁক কসাতে হবে।"

"তা খুব পার্ব্ব।"

"আপনার বাড়ী কোথায় ?"

"বিষ্ণুপুরে—এখান থেকে মাইল দশেক তফাতে।

"ওঃ, আপনি Local man !—আপনি তpreference পাবেনই।

"সে আপনার অনুগ্রহ—আমি result কবে জানতে পার্ব্ব ?

"আস্‌ছে মঙ্গলবারে আস্‌বেন—এর মধ্যে আমাদের Managing committeeর meetingটাও হয়ে যাবে। এখন বাড়ী যাবেন ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা,লে, সন্ধ্যে হয়েছে—আর আপনাকে detain কর্ব্ব না।" ভদ্রলোকটী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। হেড মাষ্টার হেসে বল্লেন—আপনাকে একটা কাজের ভার দিতে চাচ্ছি—একটু একটু কুণ্ঠাও আস্‌ছে। তবে দুদিন বাদে যখন আপনি আমাদেরই হয়ে যাবেন, তখন কুণ্ঠা বোধ করে আর কি কর্ব্ব ! হেডমাষ্টারের কথা শুনে আশান্বিত হৃদয়ে ভদ্রলোকটী বল্লেন—"আজ্ঞে, আমার কাছে কুণ্ঠা কেন—আদেশ করুন কি কর্ত্তে হবে—আমার দ্বারায় সম্ভব হলে আদেশ পালন করে কৃতার্থ হব।" হেসে হেডমাষ্টার বল্লেন—"না, তেমন বিশেষ কিছু নয়—শুনেছি আপনাদের ওখানে নাকি ভাল খেজুর গুড় পাওয়া যায়—আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি—আসার সময়ে, আমার জন্যে সের দশেক গুড় দয়া করে আন্‌তে পার্ব্বেন কি ?" আঁধারে আলো দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক বল্‌ল—"নিশ্চয় পার্ব্ব—টাকাই বা দিতে হবে কেন—আমার নিজের বাড়ীতেই ভাল গুড় জন্মে—আসার সময়ে দশ সের নিয়ে আস্‌ব।" হেডমাষ্টার বল্লেন—"তা কি হয়, টাকা নিতে হবে আপনাকে।" বারান্দা থেকে নীচে নেমে হেসে ভদ্রলোক বল্‌ল—"আচ্ছা গুড় ত আগে আনি—টাকার কথা হবে পরে।" টাকা নেওয়ার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না করে হেডমাষ্টার বল্লেন—"আপনার যা অভিরুচি—আমার বাড়ী ত চিন্‌লেনই এখানে গুড় পৌছে দিয়ে স্কুলে যাবেন। আমি থাকব তখন। না থাক্‌লে আমার অপেক্ষা কর্ব্বেন। "যে আজ্ঞে বলে ভদ্রলোক চলে গেল।

একা বারান্দায় পাইচারী কর্ত্তে কর্ত্তে, হেডমাষ্টার দেখ্‌লেন—একজন লোক তাঁরই বাড়ীর দিকে আস্‌ছে তখন একটু একটু আঁধার হয়েছে—তফাতের লোক ভাল চেনা যায় না। লোকটা আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে ?" কোন জবাব না দিয়ে সরাসর বারান্দায় এসে উঠে, প্রণাম করে লোকটী বল্‌ল—"আজ্ঞে, আমি প্রভাত।" প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী হেডমাষ্টারবাবুর শালীর ছেলে—বয়স ২৪।২৫—pass course নিয়ে এইবার B. A. পাশ করেছে।

প্রভাতকে দেখে চটে হেডমাষ্টার বল্লেন—"ঢেঁকিরাম ! এতদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে ! কবে vacancy হয়েছে—দু'খানা চিঠি লিখেছি—কর্ত্তার হুঁসই হয় না ! এই Post এর জন্যে দু'শ লোক হাঁটাহাঁটি কচ্ছে—আজও একজন scholar এসেছিল !" মেসো মহাশয়ের গালাগালিতে একটুকুও অসন্তুষ্ট না হয়ে, প্রভাত বল্‌ল—'applicationত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি !" পূর্ব্ববৎ হেডমাষ্টার বল্লেন—"তবেই আর কি আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। দু দিনের পথে থেকে একখানা application ছুঁড়ে মারলেই অম্‌নি চাকরী হয় ! গাধা কোথাকার!" প্রভাত চুপ্‌ করে রইল। হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—"আমি একখানা চিঠি দেব, তাই নিয়ে কাল ভোরে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা কর্ব্বি। দেখা হলেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা চাই।" প্রভাত জিজ্ঞাসা করল—"তিনি বামুন নাকি ?" হেডমাষ্টারবাবু চড়াস্বরে বল্লেন—"না—কায়স্থ"। বিস্মিত মুখে মেসোর মুখপানে তাকিয়ে প্রভাত জিজ্ঞাসা করল—"তবে—আমি বামুন হয়ে তাঁকে প্রণাম কর্ব্ব কেন ?" চোখরাঙ্গিয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন—"ভারি বামুন তুমি !" যা বলি তাই কর্ব্বি !" ভয়ে ভয়ে প্রভাত আবার জিজ্ঞাসা করল—"আমার নাম ত চিঠিতে লেখা থাক্‌বে—তিনি কি ব্রাহ্মণের প্রণাম নেবেন ?" হেডমাষ্টার একটু নরম হয়ে বল্লেন—"তিনি জান্‌তেই পার্ব্বেন না—চিঠিতে আমার

আত্মীয় বলে পরিচয়ও দের না। "বিশ্বাস, চৌধুরী, মজুমদার, বুঝ্লি. এ সবগুলো হচ্ছে খুবই elastic উপাধি এতে কিছু জাত বোঝা যায় না। ভাল কথা তোর কি কি Combination ছিল B. A. তে ?"

"History, Sanskrit."

"I. A. তে ?"

"History, Logic, Sanskrit." অপ্রসন্নমুখে হেড মাষ্টার বল্লেন—"তা'লে কি করে হবে! আঁক কসাতে পার্ব্বিনে ?

মাথা চুল্কাতে চুল্কাতে আম্তা আম্তা করে প্রভাত বল্ল—"একটু চেষ্টা করলে, নীচের দিকে কসাতে পারি বোধ হয়!" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—আচ্ছা, আপাততঃ তাতেই চল্বে বাড়ীতে আমার কাছে রোজ আঁক শিখবি। পরে উপরের ক্লাসেও কসাতে হবে। application নতুন একখানা লিখে দিতে হবে—তোর সেখানা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।" পূর্ব্বাগত ভদ্রলোকের দেওয়া application খানা প্রভাতের হাতে দিয়ে বল্লেন—"Candidate এর নামের জায়গায় তোর ঠিকানা লিখে বাকীটা একখানা ভাল কাগজে নকল করে ফেল্গে—কাল সেক্রেটারীর হাতে দিতে হবে। মুখে জিজ্ঞাসা করলে বল্বি—B. A. তে Mathematics এ first class honours পেয়েছিলি—নইলে চাক্রী হবে না কিন্তু। বিবর্ণমুখে প্রভাত বল্ল—"শেষে যদি ধরা পড়ি!" হেডমাষ্টার তাড়া দিলেন—"সে ভাব্না তোকে ভাব্তে হবে না—যা বলি তাই কর্ব্বি!" "যে আজ্ঞে" বলে প্রভাত মেসোর সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

(খ)

বেলা ১২॥০টা স্কুল বসেছে—হেডমাষ্টার বাবুর ঘরে, সেক্রেটারী বাবুর তাকে বল্ছেন—"আজ প্রাতঃকালে যে ছেলেটীকে পাঠায়েছিলেন তার application পড়ে দেখ্লাম সে Mathematicsএ first class honours পেয়েছিল। ছোকরা খুব বিনয়ী কি অমায়িক ব্যবহারটাই করলে আমার সঙ্গে! আমরা বরং একেই appointment দিয়ে ফেলি! এরকম লোক হঠাৎ পাওয়া যাবেনা। আচ্ছা ছেলেটী কে? হাস্তে হাস্তে হেড মাষ্টার বল্লেন—"না বল্তেই যখন আপনি তাকে select করে ফেলেছেন, তখন আর পরিচয় দেওয়াতে আপত্তি কি! ওটী হচ্ছে আমার শালীর ছেলে প্রভাত।" অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে সেক্রেটারী বল্লেন—"এ্যা বলেন কি! বামুনের ছেলে হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল!" হেডমাষ্টার বাবু বললেন—"এসে সে কথা আমাকে ও বলেছে—শুনে আমি গালাগালি করাতে বলল—তা যাকৃগে চেহারা দেখে উনি যে ব্রাহ্মণ নন, তা আদপেই বুঝতে পারি নি! অমন গম্ভীর সাত্তিক চেহারা যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের থাকতে পারে বলে এতদিন আমার বিশ্বাসই ছিল না!" সেক্রেটারী একটু ধর্ম্মভীরু লোক হলেও একথা শুনে মনে মনে বেশ একটু খুসী হলেন; কিন্তু বাহ্যতঃ সেটা না দেখিয়ে অতি গম্ভীর মুখে বললেন—"বড়ই অন্যায় কাজ হয়েছে! আপনি এক্ষুনি একবার ডাকুন তাকে। প্রতিদিন, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কালে অজ্ঞানে, অমনিই যে কত পাপ কর্চ্ছি, তারই ত জমা, খরচ রাখতে পারিনে এর পরেও ব্রাহ্মণের প্রণাম গ্রহণ করে নতুন করে আর একটা মহাপাতক করলাম—হা ভগবান্—হরিহে দীনবন্ধো আমার কি গতি হবে! ডাকুন, ডাকুন, শিগগির ডাকুন তাকে একবার!"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হেডমাষ্টার বাবু প্রভাতকে এনে হাজির করলেন। মেসো মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রভাত এক রাত্রেই বেশ তৈরী হয়ে উঠেছিল। ঘরে ঢুকেই সেই হাত জোড় করে সেক্রেটারী বাবুকে নমস্কার কর্ত্তে উদ্যত হওয়া মাত্রই, তিনি ধমক দিয়ে বল্লেন—"থাম ঠাকুর! আজ কোন্ আক্কেলে গিয়ে সকাল বেলা আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে বল ত!" অতি সপ্রতিভ ভাবে প্রভাত বলল "আজ্ঞে, ওটা আমার ভুল হয়েছিল! আপনি যে ব্রাহ্মণ নন, তা মেসো মশায়ও বলে দেননি—চেহারা দেখে ভক্তি ভরে আমার মাথা আপনা আপনিই আপনার পায়ের কাছে নুইয়ে পরে ছিল। এখনও, আপনি কায়স্থ জেনেও, আপনাকে প্রণাম করার জন্যে কোন রকমের অশ্বস্তি আমি বোধ কর্চ্ছি না! আনন্দ মিশ্রিত কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে, সেক্রেটারী বল্লেন—চুপ কর ঠাকুর ওসব কথা বলতে নাই। ঠিক্ হয়ে দাঁড়াও।" বলেই, প্রভাতের "করেন কি—বলে সরে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই, তার বাদামী রংয়ের দু'খানা

ব্লোগ মু থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ধূলা নিয়ে সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি নিজের কপালে দিয়ে বল্লেন—"হরিহে অজ্ঞান কৃত পাতক থেকে মোচন কর !" কুণ্ঠিতভাবে হেডমাষ্টার বল্লেন—"অতটা করার কি দরকার ছিল ! সেক্রেটারী বল্লেন—"না করলে কি চলে ! হাজার হলেও আপনার হচ্ছেন গিয়ে জাত সাপের বাচ্ছা—বিষ থাক্ আর নাই থাক্, আপনাদের লেজে পা দিতে স্বভাবতঃই একটু বুক কাঁপে ! আর দেখুন, আজই ওকে কাজে ভর্ত্তি করে দিন attendance বইয়ে দস্তখত করুক গিয়ে। আজ থেকেই ওর service counted হবে।" প্রভাতের পানে চেয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন—"আজ থেকেই সেক্রেটারী বাবু তোমাকে চাকুরীতে বহাল করলেন। তুমি বিমল বাবুর কাছে গিয়ে সব কথা বল। তিনি Teachers attendence বইয়ের যেখানে দস্তখত কর্ত্তে বলেন, সেখানে দস্তখত করে আজকের মতন বাড়ী চলে যাও গিয়ে। কাল নতুন Routine করে তোমাকে duty assign কর্ব্ব।"

"যে, আজ্ঞে বলে প্রভাত দ্রুতপদে চলে গেল।

প্রভাত চলে যাওয়ার পরে সেক্রেটারী বললেন—"শচীন্দ্রবাবুর গোটা কয়েক টাকা মাইনে বাড়ান'র দরকার তিনি প্রাতঃকালে গিয়েছিলেন আমার কাছে।" হেডমাষ্টার বললেন—"বাড়ানো যে দরকার তা বেশই বুঝ্তে পাচ্ছি—কিন্তু তাঁকে বাড়িয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে যে আরও অনেকেরই বাড়াতে হয় ! এত টাকা কোথায় ! অমনিইত মাসে মাসে একশ' টাকা কার deficit টান্‌ছি !" সেক্রেটারী বল্লেন—"শুনেছি, শচীন্দ্র বাবু নাকি খুবই able man ছেলেরাও খুব পক্ষপাতী—এ ক্ষেত্রে অন্যের জন্যে তাঁকে খাটো করে রাখার দরকার কি ?" হেড্মাষ্টার বল্লেন—"Honestly speaking, শচীন্দ্র বাবু able মোটেই নন। তার পরে, ছেলেদের কাছে popular হওয়ার উপরে আমি কোন inportance ই attach করিনা। দুটো বাজে গল্প করলে তাদের ঠাঁইয়ে রীতমতি কাজ আদায় না করলে, popular হতে বড় বেশী দেরী হয় না। মোটের উপরে dutyful হল, Popular হওয়া যায় না। ফিঃ বছরে Cent Percent ছেলে পাশ করাচ্ছি, কিন্তু ছেলেদের popularity gain কর্ত্তে আজ ও পারলাম না। একটু ভেবে সেক্রেটারী বল্লেন—"যা বল্লেন সত্যি হলে, মাইনে বাড়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে তিনি যাতে faithfully কাজ করেন সে দিকে আপনি ও একটু নজর রাখবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে—কমিটীকে মানাতে পার্ব্বেন কি ?—তিনি বেশ ভাল রকমের তদ্বির আরম্ভ করেছেন।" মৃদু হেসে হেডমাষ্টার বাবু বল্লেন—"আপনার সাহায্য পেলেই পার্ব্ব। আপনি যদি মেম্বরদেরে আগে থেকে সকল কথা বলে রাখেন তবেই ভাল হয়।" রুক্ষস্বরে সেক্রেটারী বল্লেন—"তা আমি পার্ব্ব না। আমি যখন তাঁকে কোন definte word দেই নাই এবং আপনার কাছে ও আসল কথা জান্‌লাম। তখন তাঁর মাইনে বাড়ার Proposal উঠলেই, I shall be the first man to oppose it. কিন্তু একজন ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে, অন্যের কাছে গিয়ে আমি Canvass কর্ত্তে পার্ব্ব না—I think it quite beneath my dignity. শেষের কথাগুলো একটু বেশী ঝাঁঝালো গলায় বলাতে হেডমাষ্টার কুণ্ঠিতভাবে যোড় হাত করে বল্লেন "Kindly offence নেবেন না—সে কি আর আমি জানি না—"হেসে সেক্রেটারী বল্লেন—না—না Offence নেব কেন ! আপনি কিছু মনে কর্ব্বেন না।" অভয় পেয়ে করুণস্বরে হেডমাষ্টার আরম্ভ করলেন—"দেখুন, আমার হয়েছে—"না মারিলে রাজা বধে মারিলে ভুজঙ্গ"। meetingএ to keep up proper appearances before my staff, শচীন্দ্র বাবুর increment এর জন্য আমাকে fight কর্ত্তে হবেই। কিন্তু এদিকে আমাদের হচ্ছে "মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজা" গোছের অবস্থা ! শেষটায় আমার supportএ যদি increment এর একটা resolution হইয়া যায় তা'হলে defecit এর মাত্রা ত বেড়ে যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে একজন লোকের unfitness connive করে অন্যান্যের উপরে ও partial injustice করা হবে।" হেডমাষ্টার বাবুর মুখপানে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন—কি কর্ত্তে চান ?" নীচু গলায় হেডমাষ্টার বল্লেন - Members দের Confidentially আসল কথাটা জানিয়ে দিলে কেমন হয় !" বিরক্তিপূর্ণ স্বরে সেক্রেটারী বল্লেন—"আঃ সেই আগের কথাই ত হ'ল। আমি বলি Staff এর মন রক্ষার্থে

fight কর্ত্তে চান কর্ব্বেন, কিন্তু অতটা stoop down কর্ব্বেন না।" হেডমাষ্টার তর্ক ধরলেন—"যদি শেষকালে একটা resolution হয়ে যায়। তখন ত school কেই suffer কর্ত্তে হবে।" সেক্রেটারী বল্লেন—"আমিত oppose কর্ব্বই—আমার সঙ্গে আরও দু চার জনও হয় ত কর্ত্তে পারে—তা সত্তেও যদি হয়ে যায় যাবে। বুঝব ভদ্রলোকের বরাত ভাল।" হেডমাষ্টার এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলেন—"oppose করার সময়ে আমাকে expose কর্ব্বেন না ত?" হেসে সেক্রেটারী বল্লেন—"আরে না—না তা'লে কি কাজকর্ম্ম চলে! সেক্রেটারীর কাছে হেডমাষ্টার Confidential report সর্ব্বদাই কর্ব্বেন কিন্তু সেক্রেটারী তাঁকে কখ্‌খনো expose কর্ব্বেন না—এই হচ্ছে দস্তুর। "বলে সেক্রেটারী হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আশ্চস্ত হয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন—"মৌলভী সাহেবের কেসটা এখন গিয়ে enquiry করলে ভাল হয়।" সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে তাঁকে ডাক্‌বেন?" হেডমাষ্টার জবাব দিলেন—ক্লাসে গেলে কি ভাবে কাজকর্ম্ম করেন, তা দেখারও একটা সুবিধা হতে পারে।" সেক্রেটারী যেতে স্বীকৃত হলে, হেডমাষ্টার দপ্তরীকে ডেকে মৌলভী সাহেবের ক্লাসে আরও দু'খানা চেয়ার দিয়ে আস্‌তে বলে, সেক্রেটারীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন।

তাঁরা মৌলভী সাহেবের ক্লাশে দরজার সাম্‌নে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে "আদাব আরজ" করলেন—ছেলেরা সবাই তাঁর অনুকরণ করল। ক্লাসে সাত আট জনের বেশী ছেলে ছিল না। দুখানা চেয়ার ইতি পূর্ব্বেই দপ্তরী দিয়ে গিয়েছিল। সেক্রেটারী এবং হেডমাষ্টার উভয়েই বসে মৌলভী সাহেবকে এবং ছাত্রদেরও বসার অনুমতি দিলেন। সবাই বস্‌লে, সেক্রেটারী বল্‌লেন—"মৌলভী সাহেব, আপনার বিরুদ্ধে একটা অপ্রীতিকর অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি নাকি ছেলেদের translationএর খাতা বাড়ী নিয়ে গিয়ে লাল কালি দিয়ে শুদ্ধ করে দেন না।" মৌলভী সাহেব বললেন—"ছয় সাত খান খাতা, ছার, এহাঁনে বস্যাই সার‍্যা ফেলি।" সেক্রেটারী বল্লেন—"তাই আমি দেখ্‌তে এলাম, এখানে বসে সেরে ফেলা সম্ভবপর হয় কি না। আপনি translation কর্ত্তে দেন আমরা বসে দেখি।

কোন কথা না বলে মৌলভী সাহেব চেয়ার থেকে উঠে ছাত্রদের সম্বোধন করে বল্লেন—"ল্যাহো. ট্যান্‌সেলেট ইন্‌টো ফারছী ল্যাহো ফচর ফচর ল্যাহো—খুব হুসিয়ার!' ছেলেরা খাতা পেন্সিল নিয়ে তৈরী হলে, আরম্ভ করলেন-"পইলা দফে ল্যাহো, ফরদেঘোনা পাঁচীরের ইমারত গুলা বড় খাপ্‌ছুরত্‌ দেহাইতেছে।" একটী ছেলে তাড়াতাড়ি লিখে বল্‌ল—'হয়েছে, স্যার"। বাকী ছাত্রেরা তখনও লিখ্‌ছিল। তাদের উপরে বিরক্ত হয়ে মৌলভী সাহেব ধমক দিলেন—ফচর্‌ ফচর্‌ ল্যাহো—তোমরা বড় নালায়েক হইছে?" ছাত্রেরা ঘাড় নাড়লে, মৌলভী সাহেব দ্বিতীয় দফা সুরু করলেন—যাহার সঙ্গে পাছাড়্‌ ধরিয়া না পারিবা তাহাকে দুর হইতে ঢিলা মারিয়া দৌড় দিবা।" লেখা সারা হলে বল্‌লেন "ল্যাহো—ভাদ্দোর মাসে কদাচ গোসল করিবা না পানীতে অধিক ডুবাইলে জ্বর বেমারী হইতে পারে। ফচর ফচর ল্যাহো।" এই পর্য্যন্ত শুনেই হেডমাষ্টার এবং সেক্রেটারীর পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। কোন রকমে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে সেক্রেটারী বল্লেন—চট্‌ পট্‌ সেরে ফেলুন—বেশী লম্বা করার দরকার নাই।" মৌলভী সাহেব বল্লেন—"হঃ তাই করি ল্যাহো ময়দানে বাঁধা গরু চুরি করা ভাল নয়। চুরি করিলে ফাটক হইতে পারে। পারদ পক্ষে কদাপি চুরি করিবা না।" হেডমাষ্টার অল্প একটু হেসে বল্লেন এখন থামলে হয়না।" মৌলভী সাহেব বল্লেন "হঃ এই. আর এট্টা ল্যাহো ফচর ফচর ল্যাহো "পুলিশের দারোগা দেখিলে দুর হইতেই সেলাম করিবা কারণ উহারা হামেসাই আদ্‌মীগণকে তক্‌লিক্‌ দিয়া থাকে। আর না" ট্যানসেলেট ইনটো ফারছী ল্যাহো—ফচর ফচর দেরী মৎকরো।

মৌলভী সাহেব বস্‌লে, সেক্রেটারী বল্লেন—"ওদের Persian translation কর্ত্তে দিলেই পারেন!" মৌলভী সাহেব জানালেন যে প্রায়ই তা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আজ তাঁরা এসেছেন বলে, তাঁদের সম্মানার্থে গোটা কয়েক উপদেশ মূলক কথা অনুবাদ কর্ত্তে দেওয়া হল। উপদেশের নমুনা শুনে সেক্রেটারী বড়ই কৌতুক অনুভব কচ্ছিলেন;

এবার কৈফিয়ৎ শুনে মৌলভী সাহেবের উপরে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আস্‌ল। মুখে কিছুই বল্‌লেন না।

ছেলেরা এক এক করে খাতা এনে মৌলভী সাহেবের টেবিলে হাজির কর্ত্তে লাগলো আর তিনি সে সব গুলো যথারীতি ভুল সংশোধন করে ফেরত দিতে লাগ্‌লেন। সমস্ত সারা হলে সেক্রেটারী হেডমাষ্টার কে সঙ্গে করে বাইরে এসে বল্লেন—"অভিযোগ শত্রুতা মূলক ওতে কান দেবেন না। মৌলভী বেশ honest. worker ওঁর গোটা পাঁচেক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে।" অপ্রসন্ন মুখে হেডমাষ্টার বল্লো—"যে ভাবে উনি কাজ করলেন। ওটা কিন্তু ঠিক process নয় —ওতে class supper করে। নিয়ম হচ্ছে ক্লাসের সব ছেলেকেই সমস্তটা period engaged রাখ্‌তে হবে। তা উনি পারেন না। তাচ্ছিল্য ভরে সেক্রেটারী বল্লেন—"আরে নিন্—যা পারেন ওতেই চল্‌বে! বটে। লোকটা একটু underpaid ও বটে। পাঁচ টাকা বাড়াইলেই ঠিক হবে। আম্‌তা আম্‌তা করে হেডমাষ্টার বল্লেন— "তা আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন আমার আর আপত্তি কি! মৌলভী সাহেবকে ডেকে বলে দেবখন।" সেক্রেটারী বল্লেন—"এখন আমি যাচ্ছি শচীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় মতই কাজ হবে। আমি oppose কর্‌লে forএ কেউ যাবে বলে বোধ হয়না। দেখা যাক্।"

সেক্রেটারী চলে গেলেন। মৌলভী সাহেবকে ডেকে হেডমাষ্টার বল্লেন—"আপনার জন্যে আজ সেক্রেটারী শুধু দু'হাত দিয়ে পা জড়িয়ে ধরি নাই তা বাদে আর সবই করেছি। পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে আপনার—আস্‌ছে মাস থেকে পাবেন। আপনি ত থানায় যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। গেলে কিছু কর্ত্তে পারা যেত না। কাল বোধ করি খুবই চটে গিয়েছিলেন।" মৌলভী সাহেব যে মোটেই চটেন নাই বার বার করে সে কথা তিনি হেড-মাষ্টারকে বুঝিয়ে দিলেন এবং নানা রকমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অবশেষে ক্লাসে ফিরে গেলেন।

বেলা একটা—মঙ্গলবার—বিমল বাবু স্কুলের আফিসে বসে কাজ কচ্ছেন। ঠিক এই সময়ে একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল—হেডমাষ্টার বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।" Cash Book এর পাতা উল্‌টাতে উলটাতে বিমল বাবু বল্‌লেন—"কোন দরকার থাকলে আমাকে বল্‌তে পারেন—তিনি বাইরে গিয়েছেন।" এক খানা চেয়ার টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসে ভদ্রলোক বল্‌ল—"আপনার কাছে আর কি বল্‌ব—বরঞ্চ আমি একটু অপেক্ষাই করি।" লিখ্‌তে লিখ্‌তে বিমল বাবু বল্‌লেন—তা করুন। পুরো এক ঘণ্টা পরে ভদ্রলোকটী একটু অধৈর্য্য হয়ে ঘরের মেঝেতে পাইচারী করে বেড়াতে লাগ্‌ল। আরও তিন পোয়া ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরে, নিতান্ত অতিষ্ট হয়ে বিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল তিনি কোথায় গিয়েছেন। নির্ব্বিকারভাবে বিমল বাবু বল্লেন—"পুরী" মহাচটে ভদ্রলোক বল্‌ল—"আপনি ত মহাশয় সাংঘাতিক লোক। একথা এতক্ষণ বলেন নাই কেন? অতি ধীরভাবে বিমল বাবু—জবাব দিলেন—"আপনি ত জিজ্ঞাসা করেন নাই। ভদ্রলোক বল্‌ল—"নাই বা করলাম অমনিওত বল্‌তে পার্ত্তেন।" বিমল বাবু খাতার রুল টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন—"গায়ে পরে কথা বলার সময় কোথায়!" ভদ্রলোকের—মেজাজ তখন রীতিমত চড়া, জিজ্ঞাসা করল—কবে ফিরবেন? বিমল বাবু বল্লেন—" "দিন দাশেক পরে।"

"তা'লে দশ দিনের আগে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"দয়া করে পুরী গেলে হতে পারে।

মহাবেগে ভদ্রলোক বল্‌ল—আপনি, মশায় ভারি সদ্‌লোক!" বিমলবাবু বল্লেন—"স্থানীয় জনমত ঠিক উল্টো।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোকটী বলল—"চুলোয় যাক্! আপনাদের স্কুলে যে একটা vacancy হয়েছিল "সেটা কি filled up হয়েছে?"

"হাঁ"

"কাকে দেওয়া হয়েছে সে Post?

"হেডমাষ্টার বাবুর শালীর ছেলেকে।"

"আমি যে সে Postএর জন্যে Candinate ছিলাম।"

"আরও ঢের লোক ছিল।"

এম্নি সময়ে শচীন্দ্রবাবু এলেন এবং ভদ্রলোকটীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনিই সেদিন সন্ধ্যাকালে হেডমাষ্টার মশায়ের ওখানে এসেছিলেন না?"

হ্যাঁ, মশায়! আমি Candidate ছিলাম।

"আপনার বোধ হয় হ'ল না?"

"তাই ত শুনছি।"

"হেডমাষ্টার বাবু কোথায়?"

আমি ত তাঁর বাসায় গুড় পৌঁছে দিয়ে এলাম—শুনলাম বাসায় নাই। কেরাণী বাবু বলছেন পুরী গিয়েছেন।

"কিসের গুড়?"

"দশসের খেজুরগুড় আন্‌তে বলেছিলেন।

"দাম পান নাই বুঝি?

"না।"

"তিনি এলে দেবেন। হ্যাঁ বিমল বাবু হেডমাষ্টার বাবু পুরী থেকে কবে ফির্ব্বেন?

"দিন দশেক পরে।" ভদ্রলোকটী বল্‌ল—"দিন দশেক পরেই আস্‌ব—এখানে আর বসে থাকা নিষ্প্রয়োজন।"

ভদ্রলোক চলে গেলে শচীন্দ্র বাবু বিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"Resolution বইখানা কোথায়?"

"কেন আপনি দেখেন নি?"

"না—শনিবারে বাড়ী গিয়েছিলাম—সোমবারও আসতে পারি নি।"

"সে বই হেডমাষ্টার মশায় বন্ধ করে রেখে গিয়েছেন। আপনার মাইনে বাড়ে নাই। সমস্ত মেম্বরই আপত্তি করেছিল। হেডমাষ্টার শেষ পর্য্যন্ত আপনার জন্যে fight করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

"আর কারো মাইনে বাড়ল?"

"মৌলভী সাহেবের পাঁচ টাকা বেড়েছে।

"হুঁ" বলে শচীন্দ্র বাবু বেড়িয়ে গেলেন। বিমল বাবু আবার কাজে মন দিলেন।

ইতিহাস ও তাহার উপকারিতা

(শ্রীহরিদাস মজুমদার)

ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ইহার একটী আখ্যা দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু এই বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর ভিতর নানা মত দেখা যায়। ইতিহাসকে অল্প কথায় বলিতে গেলে অতীতের কথা বলা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখা যায় না। বর্ত্তমান ঘটনার সহিত অতীতের কতকগুলি ঘটনার যোগ সূত্রের উপরই ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বস্তুরই পৃথক ২ কাহিনী আছে। সেই হিসাবে ইতিহাসের ক্ষেত্র অসীম। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা ইতিহাসের গণ্ডী ক্ষুদ্র করিয়া দেখি; মানব জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনীকেও একমাত্র ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লই। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের আরও ক্ষুদ্রতর গণ্ডী আছে। আদিম মানব তাহার বন্য প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হইল। এই দলপতি হইতে ক্রমে রাজা ও রাজধানীর সৃষ্টি হইল। জাতির উপর রাজার প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম গণ্ডি বিশিষ্ট ইতিহাস সৃষ্টি হইল তাহার সীমা রাজা ও রাজধানীতে আবদ্ধ হইল।

মানুষ সৃষ্টির প্রথম যুগে অর্থাৎ পেলিও লিথিক এজে অত্যন্ত অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল, তাহারা গাছের ফল মূল অথবা মৃগয়া প্রাপ্ত কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। তাহারা প্রস্তর খণ্ড অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিত, মানব সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ নিও লিথিক্ এজে দেখিতে পাই যে মানুষ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা সোণা চিনিয়াছে আগুন আবিষ্কার করিয়াছে এবং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। মানব সভ্যতার তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ মিথিকেল এজে তাহাদের উন্নতি আরও দ্রুত বহুদূর ব্যাপি হয় এবং বর্ত্তমান সমাজ জীবনের আরম্ভ তখন হইতেই হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার বিকাশ এক দিনে বা এক পুরুষে হয় নাই। আদিম কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষের অল্পাধিক চেষ্টার ফলে ইহার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষই তাহার লব্ধ জ্ঞান অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী পুরুষকে দান করিয়া গিয়াছেন। এবং এই ভাবেই জ্ঞান ভাণ্ডারের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষ এই দানের ও

দানের গৌরবের ভিতরই নিজকে অমর করিতে চাহিল ও পরবর্ত্তী লোকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে চাহিল তখন হইতে ইতিহাস রচনার প্রথম সূত্রপাত হইল। যদি লিখিত অথবা মৌখিক কোনরূপ ইতিহাস না থাকিত তবে ইতর প্রাণীরা যেমন তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরিবর্ত্তিদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারে না এবং প্রত্যেককেই আবার অজ্ঞানতা লইয়া জীবন আরম্ভ করিতে হয়। সেই রূপ অদ্যাপিও মানুষ তাহার আদিম অবস্থায় থাকিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী লোকের মুখে ২ গল্পাকারে রচিত ও প্রচারিত হইত। পরে সেই কাহিনী গাঁথার আকার ধারণ করিল এবং গায়ক ও চারণের মুখে মুখেই গীত হইয়া পরবর্ত্তি লোকদের কৌতূহল নিবারণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তীদের জন্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগল। অতঃপর সেই সকল গাঁথা গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হইল ও সাধারণের ভিতর বহুল প্রচারের ব্যবস্থা হইল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইল ভূর্জ্জ পত্রে কিন্তু প্রচারিত হইল পর্ব্বত গাত্রে ও শিলা লেখ্যে। মিশরের ইতিহাস লিখিত হইল পেপিরসে কিন্তু খোদিত রহিল পিরামিডের গর্ভ গৃহে। এই রূপে প্রাচীন কালে সভ্য বা অসভ্য সকল দেশে ইতিহাস রচিত হইল এবং প্রকৃতির গাত্রে অঙ্কিত রহিল। কাল ক্রমে রচিত ইতিহাসের অনেক কিছুই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু প্রকৃতির গাত্রে অঙ্কিত ইতিহাসের কতক কতক পারিপার্শ্বিক চিহ্ন অর্দ্ধ বিলুপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ হইতে আবার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার আরম্ভ হইল। এই নব জীবনের মুহূর্ত্তেইতিহাসের বৃহত্তর গণ্ডী পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত ও আদৃত হইল। এই পুনরুদ্ধার কার্য্যে যে প্রণালী ব্যবহৃত হইল, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই ক্ষেত্রে অবশ্য বলা আবশ্যক যে প্রমাণের অভাবে বিস্মৃত ইতিহাসের হয়ত সবখানি আবিষ্কৃত হয় নাই; ভবিষ্যতে হইতে পারে।

ইতিহাসের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পাঠে ইতিহাসের কতক সনের অথবা ঘটনার নীরস সমষ্টি বলা চলে না। ভূতত্ত্ব যেমন পৃথিবীর আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনাদির কারণ দেখাইয়া দেয়, ইতিহাসও সেইরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির উপর দিয়া উত্থান ও পতনের যেতরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে তাহার কারণ দর্শাইয়া সবগুলি ঘটনার ঐক্য সাধন করে।

আর্য্যজাতির উত্থানও পতন প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন লোকের মনে গভীর বিস্ময়ের রেখা টানিয়া দেয় কিন্তু ইতিহাস মানবের সেই বিস্ময় অপনোদন করিয়া কঠিন অথচ সরল সত্য কথা দেখাইয়া সবগুলি ঘটনার ঐক্য সাধিত করে।

ঐ ঐক্যবাদের জন্য ইতিহাসকে মানব বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কারণ ইতিহাস মনুষ্যনীতি সংক্রান্ত কতকগুলি সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন সত্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই সমস্ত সত্য মানব প্রকৃতির আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন ব্যতীত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবেনা।

এইরূপ একটী সত্য হইতেছে যে Uniformity of Nature বা প্রকৃতির ঐক্যবাদ। অর্থাৎ মানুষ একযুগে এক এক রকম অবস্থায় যে কার্য্য করিয়াছে। বিভিন্ন যুগে সেই অবস্থায় ও সেইরূপ কার্য্যই করিবে। এই ঘটনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লস এর অত্যাচারে ও অবিচারে উৎপীড়িত হইয়া জনসাধারণ ক্রমওয়েলের নেতৃত্বাধীনে রাজা প্রথম চার্লস্ এর ছিন্ন মুণ্ডের উপর বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ক্রমওয়েল প্রবল পরাক্রমে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিলেন। আবার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ সিংহাসনারোহণ পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বোর্বো বংশীয় ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর মস্তক ও সেইরূপ অত্যাচারিত জন রোষে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারিরাজ তন্ত্রের পরিবর্ত্তে ফরাসী দেশে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের নেতা মহাবীর নেপোলিয়ান দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের প্রতাপ অস্তমিত হইলে অষ্টাদশ লুই পুনঃ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন ও সাবধানে রাজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই দুই ঘটনার ইতিহাস আরও পর্য্যালোচনা করিলে আমরা আরও সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। রাজা দ্বিতীয় চার্লস এর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্ স্বীয় অদূরদর্শিতার ফলে প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলেন এবং সিংহাসন

পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পলায়নের পর রাজা উইলিয়ম ও রাণী মেরী ইংলণ্ডেশ্বর পদে বৃত হইলেন এবং ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিক—রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কার্য্যকরী ভাবে হইল। ফরাসী দেশেও রাজা অষ্টাদশ লুইর ভ্রাতা দশম চার্লস্ প্রাচীন বোবোঁক্ষমতা পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ সিংহাসন হারাইলেন ও প্রানভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ফরাসী দেশেও লুই ফিলিপী রাজপদে বৃতহইলেন এবং স্বেচ্ছাচারি রাজ তন্ত্রের ধ্বংসহইল।

এইরূপ আর একটী সত্য আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে পাইব যে ভারতের অধিবাসীরা অন্য দেশবাসী অপেক্ষা সামরিকশক্তি হিসাবে হীনবল। ইহার কারণ এই যে ভারতের জলবায়ু লোককে অলস করিয়া দেয়—পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু হইতে দেয় না। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যাইতে পারে যে যুগে যুগে ভারত নবাগত লোকদ্বারা অধিকৃত ও শাসিত হইয়াছে। আবার নূতনের আগমনে শাসক শাসিতের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অনার্য্য বা আর্য্যদিগের দ্বারা পরাজিত ও শাসিত হইয়াছে। অতঃপর যবন, শক, হুন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতিগণ পর্য্যায় ক্রমে শাসক ও শাসিতের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ভারত ইতিহাসের আর একটী সত্য হইতেছে যে, ভারতবর্ষের সম্পদই তাহার শত্রু। ভারতবর্ষের অনায়াস লভ্য সম্পদ যেমন ভারতবাসীকে জগতের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ করিয়াছে; সেইরূপ অপর দিকে ভারতবাসীকে শ্রম বিমুখ ও পরশ্রীকাতর করিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া যখনই কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর বা জাতি আসিয়াছে, তখনই ভারতবাসীরা আর তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। কতককে বাধা দিলেও কতক পরশ্রীকাতর ব্যক্তি দেশের দুর্দ্দিনে একমত হইতে পারেন নাই ও অন্যের অনিষ্ট করিতে যাইয়া দেশেরই অনিষ্ট করিয়াছে।

যদিও প্রত্যেক জাতির ও দেশের ঘটনাবলীর মধ্যে সাধারণতঃ একটী ক্রমমুক্রমিক যৌক্তিকতা দেখা যায় তবু ও সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস একত্র আলোচনা করিলে প্রকৃতির বিভিন্নতা ও দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির কতক সময় এই যৌক্তিকতার মধ্যে ধরা দেন না। আবার কতক সময় দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী একই আন্দোলন নানাভাবে হইতেছে। যথা—খৃষ্টের জন্মের সমসাময়িক কালে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়; পারস্যে নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এইরূপ ভাবে একটী ধর্ম্ম প্রচারের যুগ দেখা যায়। এইরূপ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে একটী জাগরণের যুগ দেখা যায়। আবার বর্ত্তমান যুগকে বিশ্লেষণ করিলেও সেই সত্য প্রকাশিত হইবে।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে ইতিহাস অতীতের কথা, অর্থাৎ ইতিহাস পাঠে আমরা অতীতের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন স্মৃতিশক্তির সাহায্যে নিজ জীবনের অতীত বৃত্তান্ত মনে রাখে; প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ ইতিহাসের সাহায্যে নিজ জাতির অতীত কথা জ্ঞাত হয়। কাজেই ব্যক্তির জীবনে স্মৃতিশক্তির যে প্রয়োজনীয়তা সমষ্টির জীবনে ইতিহাসেরও সেই উপকারিতা।

ইতিহাস পাঠ করিলে মানুষের মনে অতীত গৌরবের প্রতি একটী বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব জাগরিত হয় ও এই ভাবটী হইতে স্বজাতিপ্রীতি আত্মপ্রাধান্যলাভ ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সঙ্কল্প মানব হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে অনেক সময় আশা ফলবতী হইয়া থাকে। নেপোলিয়নীয় সময়ে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্দ্দশার শেষ সীমায় পতিত হয়। জার্ম্মাণী তখন নিজ জাতির ইতিহাস পাঠে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে ও জাতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা জগতে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়। অথচ অসভ্য কোল সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির কোন গৌরবময় অতীত ইতিহাস না থাকায় তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপরই প্রায় একরূপ চলিয়া আসিতেছে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে যে জাতির অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া ইতিহাস পাঠের মূল্য অধিক। কারণ,—বর্ত্তমানের ইতিহাস অতীতের রাষ্ট্রনীতি ও বর্ত্তমানের রাষ্ট্রনীতি ভবিষ্যতের ইতিহাস। ইতিহাস পাঠে জাতির উত্থান বা পতনের যথাযথ বিবৃতি পাওয়া যায়। অতীতকালের রাষ্ট্রনীতিকগণ কি উপায়ে সমাজকে একত্র উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন অথবা সমাজের

অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা পাঠে বর্ত্তমানের রাষ্ট্রনীতিকগণ সাবধান হইতে পারেন। এইভাবে সাবধান হইতে পারিলে জাতির অভ্যুত্থানকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে; অথবা পতনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

ইতিহাস পাঠের সর্ব্বাপেক্ষা উরকারিতা হইতেছে ভবিষ্যৎদৃষ্টি। প্রত্যেক জাতির ভিতর একটী ঘটনা পরম্পরার ঐক্য আছে। এই যোগসূত্র হইতে অতীতের ইতিহাস জ্ঞানের বলে ভবিষ্যৎ ফলাফলের অনুমান হয়। এই অনুমিতি যতদূর সম্ভব যুক্তি ও বিচারমূলক হওয়া উচিত। এই অনুমিতির ফলাফল দেখিয়া একটী জাতি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবার অবকাশ পায় ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিতে দেখিতে পাইব। ভারতের অধিবাসীদের জল বায়ুর দোষে সামরিক শক্তি নষ্ট হয় বলিয়াই ইংরাজের পক্ষে ভারতের অধিবাসী হওয়া নিষেধ। ইংরেজ প্রত্যেক বৎসরই স্বদেশ হইতে পুরাতন সৈন্যের পরিবর্ত্তে নূতন সৈন্য আমদানি করিয়া সামরিক শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের এই কৌশল তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। কেবল ইতিহাস পাঠজনিত ভূয়োদর্শনের ফলেই।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে ইতিহাস অনেকখানি সাহায্য করে। সেজন্য প্রাচীনকালের ভারতবর্ষে ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। রাজা বা রাজপুত্রদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের একাংশ ইতিহাস পাঠে ব্যয়িত হইত। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর ইতিহাস পাঠের আগ্রহ ধীরে ধীরে জাগিতেছে। আশাকরি ও ভারতের স্বপ্নময় অতীতের ইতিহাস পুনরুদ্ধার হইবে ভারতের ঘরে ঘরে পঠিত হইবে ও ভারতের জাগরণকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে যাহাতে ভারতের সেই স্বর্ণময় যুগ আবার নবীন ও অফুরন্ত ভাবে ফিরিয়া আইসে।

অজিতার বিদ্রোহ

[শ্রীসুধাংশু ভূষণ রায়]

ঘোষেদের পুকুর হইতে জল নিয়া অজিতা যখন ঘরে ফিরিতেছিল তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিক গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরাণ মণ্ডলের পাঁচ বৎসরের ছেলে চরণ পাশ কাটীয়া যাইতেছিল, অজিতা তাহাকে ডাকিয়া বলিল "কিরে চরণ তোর মায়ের অসুখ সেরেছে?" চরণ ওরফে সেই ছেলেটী সংক্ষেপে মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।" "তবে তোরা ওবেলা কিছু খাস্‌নি বুঝি।"—

এই সহানুভূতির সুরে বালকটী কাঁদিয়া ফেলিল। সেই ঘনায়মান অন্ধকারেও চরণের মুখের অনাহার-ক্লিষ্ট ভাবটা লক্ষ্য করিতে পারিয়া অজিতার কষ্টের সীমা রহিল না। তাদেরি ঠিক বাড়ীর কাছে দুতিনটী কচি শিশুর সারাদিন উপবাস থাকার কথা ভাবিতেও তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। ব্যথিত অন্তরে এক হাতে চরণকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল "চল চরণ তোদের বাড়ী গিয়ে আমি তোদের নিজে রেঁধে খাইতে দিব।"

অজিতার মা বিশ্বেশ্বরী ঘরের ভিতর আহ্নিক করিতেছিলেন, দাওয়ায় দাঁড়াইয়া অজিতা তাহারই উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল "মা, চরণের মার অসুখ বলে ওদের আজ কিছু খাওয়া হয়নি, আমি গিয়ে ওদের সবাকে রেঁধে খেতে দিব, কি বল।"

অন্য কোন রকম কথা হইলে বোধ হয় আহ্নিকের সময় বলিয়া বিশ্বেশ্বরী সাড়া নাও দিতেন, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুতির ক্ষুদ্র সম্ভাবনাও নাকি তার সহ্যসীমা অতিক্রম করিত। এত বড় একটা অনাচারের কথায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। "এই সন্ধ্যা বেলা একি অনাসৃষ্টির কথা তুই মুখে আনলি অজিত।" বলিতে বলিতে রাগের মাথায় ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই বিশ্বেশ্বরী নিশ্চলভাবে স্তব্ধ হইয়া গেলেন,—এ সন্ধ্যা বেলায় এই পবিত্রক্ষণে মানসিক বিধবা মেয়ের কোলে পরাণ মণ্ডলের ছেলে চরণ!—এযে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।—বিশ্বেশ্বরীর আছাড় খাইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। চরণকে এক নিমিষে ছাড়িয়া দিয়া মায়ের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অজিতা বলিল "কেন মা,

তাদের দুঃখে বেদনা জানানো কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়, আমরা ছাড়া তাদের খোঁজ খবর নেবার লোক কে আছে?" চরণের দিকে একটা বিতৃষ্ণাসূচক মুখনাড়া দিয়া বিশ্বেশ্বরী রুক্ষভাবে জবাব দিল কষ্টে পড়েছে বলেই কি ওদের জন্য আমরা নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াতে যাব নাকি?—বলি বিধবা ধেড়ো মেয়ে হয়েও তুই ধর্ম্ম বলে যে একটা কিছু আছে তাকি মানবিনে।—কতদিন বলেছি ছোট লোকদের ছেলে মেয়েদের স্পর্শ করে অশুচি হোসনে--এই যে সময়ে অসময়ে তাদের কোলেকাকে নিয়ে নিজের পবিত্রতা নষ্ট করছিস, এর প্রতিকার কি করে হবে শুনি?" "ছোট লোকদের কাছে গেলে, সেবা করলে অশুচি হতে হয় এত বড় কথাটা তুমি কোথা থেকে জানালে মা "ওমা তাকি আর আমি জানি না বামুনের ঘরের বিধবার ছোট লোকের ছায়া মারানোই পাপ, আর কেবল বিধবাই বা বলি কেন ভদ্র ঘরের সকল লোকদের পক্ষেই ত এটা শাস্ত্রের বিধান। এত সবাই মেনে চলে। তুই কেবল অলক্ষী হয়ে জন্মেছিল বলেই—"

এসব বিষয়ে নিজের মাকে পরাভব করা অজিতার পক্ষে সম্ভবও নয় সাধ্যও নয়। ক্ষুব্ধভাবে কতকটা অভিমানের সুরে বলিল "আচ্ছা তোমাদের শাস্ত্রে ত অশুচি হলে চান করে শুদ্ধ হওয়ার প্রথা আছে—আমি না হয় তাই করব। চটপট ওদের জন্য দুটো রেঁধে তারপর বেশ একটু নাইয়ে বাড়ী আসব খন—চল চরণ আর দেরী করে কাজ নেই,—কষ্টত তোদের আর কিছু কম হয় নি।" মনে মনে দারুণ অসহিষ্ণু হইয়া বিশ্বেশ্বরী বিকৃতভাবে মাথা নাড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল "না না এই মাঘের শীতে রাত্রি বেলায় নাইতে তুই পারবিনে. অজিতা কথাটা আমার শুন্ বলছি। স্থির সঙ্কল্প অজিতা চরণের সাথে অগ্রসর হইতে হইতে নম্রস্বরে জবাব দিল না মা তোমার এ অন্যায় আদেশ আমি মানতে পারব না। অলক্ষী হই আর যা হয় আমার সম্মুখে কয়টী প্রাণী অনাহারে মরবে এ অসহ্য—এমন সময়ে নিজের ঠুনকো ধর্ম্ম নিয়ে। বসে থাকলে ভগবানের রাজ্যে অপরাধ করা হবে।"

—দুই—

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া অজিতাকে কোন ঝগড়া-বিবাদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। রাগে দুঃখে বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়টা এমনি নিপীড়িত হইয়া রহিয়াছিল যে নিদারুণ ক্রোধে তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভবপর হয় নাই।

পরদিন দুপ্রহরে অজিতা পাড়ার রায়দের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরী সবেমাত্র দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া বিকালের কাজকর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ওপাড়ার গুনিঝি আসিয়া গল্প জমাইয়া বসিল। পাড়ার মধ্যে এই গুনিঝির প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। মেয়ে মহলে তাহাকে ছাড়া কোন ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত না, অধিকন্তু নানাপ্রকার কানাঘোষার সাহায্যে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলাতে তার যথেষ্ট হাতযশ ছিল।

প্রাঙ্গনে ঢুকিয়াই কার্য্যেরত বিশ্বেশ্বরীর প্রতি সমবেদনা জানাইয়া প্রশ্ন করিল "দিদি যে বড় একা একা কাজ করে মরছ—তোমার মেয়ে কইগা? বৃদ্ধ বয়সে কোথায় বসে বসে দুটী ভাত গিলবে তাও কিনা পোড়া অদৃষ্টে ঘটে উঠছে না। বলি বকাটে মেয়েটীর কি দয়মায়া বলে কোন জিনিষ নেই।" "এই বৃদ্ধ বয়সে কার না সুখভোগের ইচ্ছা হয় বোন, কিন্তু কি করব বল, মেয়েত আর আমার কথার বাধ্য নয়। পোড়ারমুখিকে সারাদিন কি বকাঝকাই না করছি, কিন্তু শুধরে উঠার কোন লক্ষণই যেন ওর ভিতর নেই। দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে সেইযে ঘোষেদের বাড়ীর বড় বউয়ের সাথে দেখা কর্ত্তে যাচ্ছি বলে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল কই এখনও ত ফিরলে না! ওকে নিয়ে আমি যে কি করব বোন তাই কেবল ভাবি। "বলি প্রত্যেক দিন এমনি সময় ঘোষেদের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারখানা কি বুঝলে দিদি,—কি করেই বা বুঝবে, ছুড়ী ত আর তোমাকে জানায়ে কোন কাজ করে না।

বিশ্বেশ্বরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুনিঝির দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুনিঝি কিন্তু সুজাসুজি ব্যাপারখানা বলিবার পাত্রী নয়, সে বেশ একটু ঘোরাফেরা করিয়াই ব্যাপার খানা বলিতে আরম্ভ করিল "ব্রাহ্মণ বিধবার মেয়ে ও নিজে বিধবা হয়ে কিনা ছোট লোকের মেয়ে ছেলেদের বলতে আমার বেঁধে আসছে দিদি, এর চেয়ে বাড়া পাপ কি আর জগতে আছে?" বিশ্বেশ্বরী নিদারুণ ভাবে নিজ ভীত দৃষ্টিটা গুনিঝির দিকে স্থাপন করিয়া বলিল "প্রত্যেক দিন দুপুর বেলা ঘোষেদের বড় বউয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি বলে চলে যায় আমি কি আর ছাই কোন খোঁজ খবর রাখি?

না জানি সে পোড়ারমুখী কি অনাসৃষ্টি কাজই করে বসেছে। বল আমার আর সহ্য হচ্ছেনা।" "বলব বই কি, অন্য সবাই এ অনাচার নী বে সহ্য করতে পারে কিন্তু তোমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী হয়ে আমি কি আর চোপ করে থাকতে পারি? সেদিন দুপুর বেলা ঘোষেদের বাড়ীর সামনের পথটী ধরে বাড়ী ফিরছিলুম, বাইর বাড়ীর বড় ঘরটায় ছেলেমেয়েদের উচ্চৈঃস্বরে পড়ার শব্দ শুনে মনে করলুম নূতন পাঠশালা খানা একবার দেখে আসি। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে গিয়াই আমার গা কেঁপে উঠল দেখলুম তোমাদের অজিতা কি সব বই পুস্তক নিয়া একখানা চৌকির উপর বসে আছে আর ত কে ঘিরে পাড়ার নমদাস ছুড়ীদের থেকে আরম্ভ করে পরাণ পরামানিকের ছেলে চরণ পর্য্যন্ত পড়া শুনা করতে বসে গেছে পঞ্চা মণ্ডলের ছোট্ট মেয়েটী কিনা তার ঠিক কোলেই বসেছিল।

বিশ্বেশ্বরীর চোখ মুখে একটা অসহ্য ভাব আত্মপ্রকাশ করিল নিজের চুল ছিঁড়িয়া এপাপের প্রায়শ্চিত্র করার উপক্রম করিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। শুনিঝি পূর্ণ উদ্যমে বলিয়া যাইতে লাগিল "একজন ব্রাহ্মণ কুলের বালবিধবার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কলঙ্কের কথা আর কি হতে পারে। বড়বাড়ীর রামঠাকুর দা ত সেদিন স্পষ্ট করেই বল্লেন "এক পক্ষের ভিতর আমি যদি ওদের সমাজচ্যুত করতে না পারি ত আমার নাম রামঠাকুরই নয়। বিশ্বেশ্বরী কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলেন "এখন আমাদের কি হবে বোন, লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে টাকে নিয়ে শেষে বুঝি সমাজেও স্থান হবে না।" "তাইত দেখছি তবে এই একটী উপায় কিনা আছে, সামাজিকদের ভিতর কথাটা জরুরী হয়ে উঠার আগে তুমি যদি অজিতাকে নিয়ে সমাজপতি রামঠাকুরের পাদুটো জড়ায়ে ধরতে পার তবেই সব চুকে যাবে। না হলে এ যাত্রায় আর রক্ষা নেই।—পাড়ার ভিতর তোমার ওই মেয়েটীর সম্বন্ধে যা সব কুৎসীৎ আলোচনা কানাঘুষা চলছে সে আমি জানি। নিজ লাঠিখানায় ভর করিয়া শুনিঝি এতক্ষণে যাইবার উপক্রম করিয়াছে ঠিক এমনি সময়ে প্রাঙ্গনের ধারে অজিতার গলার স্বর শুনা গেল ব্যাপার খানা কতটুক দাঁড়ায় দেখিবার জন্য শুনিঝি সেই অবস্থায়ই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অজিতাকে সামনে পাইয়া বিশ্বেশ্বরী যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অজিতার নিজেরও উদ্বিগ্নতার সীমা রহিল না। একটা অজানিত ঝঞ্ঝাবাতের সম্মুখীন হইয়া সে তাহারই বিরুদ্ধে সজীব হইয়া রহিল।

শুনিঝির নিকট সংবাদ পাইয়া আসল ব্যাপার সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরীর লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং এই জন্যই অজিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য মনে করিলেন। অসহ্য রোষে দাতমুখ খিচাইয়া ও কণ্ঠে যথাসম্ভব বিষ মিশাইয়া তিনি সবেগে তাহারই দিকে তাড়িয়া গেলেন। মাধুরী হতভম্বের মত নিশ্চল ভাবে বলিয়া উঠিল কিছু জিজ্ঞাসা করা নেই; কথা কওয়া নেই এসব কি বল দেখি? বিশ্বেশ্বরী চীৎকার করিয়া বলিলেন বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে যে হতভাগিনী তার নিজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখতে জানেনা তার কি কিছু মাথার ঠিক আছে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, পুড়ার মুখি এতবড় হয়েও কি একটীবার ভাবলিনে সদাসর্ব্বদা ছোটলোক-দের মেয়ে ছেলেদের সাথে মিশে কি কেলেঙ্কারীই না করতে বসেছিল। কথা বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বরী হাতের ঝাড়ুটা সবেগে অজিতার দিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন।

আহত ক্ষুব্ধ অজিতা এতক্ষণে ব্যাপার খানা যেন বুঝিতে পারিল। কিন্তু এতসব আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আর তার ছিল না। ইহাদের সম্মুখ হইতে নিজকে বাচাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে নিজ হৃদয়ের উদ্ধত কাশিকে কোন রকমে বাধা দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতর গিয়া দ্বারা রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

—তিন—

নিজ আজন্ম সংস্কার ছাড়া অজিতার এই আচার ও বিদ্রোহে বিশ্বেশ্বরীর এতদূর ক্ষুব্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল। তাহাদের গ্রামের সমাজপ্রতি রামঠাকুরকে সে ভাল রকমই চিনিত তার নির্ভীক শাসনে গ্রামের আনাচে কানাচে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবির্গাইত কিছু ঘটিবার জো ছিল না। অজিতার যা কিছু কাণ্ডকারখানা শুনিঝি ও এমনিতর আরও কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণা নরনারীর মারফতে যথাসময়ে রামঠাকুরের কর্ণকুহরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া গিয়াছে একথা বিশ্বেশ্বরী জানিতেন বলিয়াই তার পক্ষে ক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিলেন অদূর ভবিষ্যতে রামঠাকুরের হাতে একটী বিরাট লাঞ্ছনা তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

রাত্রে অনেক সাধ্য সাধনায়ও অজিতা উঠিয়া আসিল না। সাধাসাধির হুলুস্থুলে সে এমনিভাবে বিছানায় নিজকে আকড়াইয়া রহিল যে বিশ্বেশ্বরী আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহাই হউক তাহার নাকি এই একটী মাত্র মেয়ে। ক্ষোভে দুঃখে বিমর্ষ থাকিলেও রাগ দেখানোর সময় সে নয়। এত সাধ্য সাধনা সমস্তই বিফল হইতে দেখিয়া তিনি অবসন্নভাবে মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন, আর তার দুই চোখ প্লাবিত করিয়া অশ্রুজল ঝড়িতে লাগিল।

এমনি ভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রন্দন রত অবস্থায় একে অন্যের ব্যথায় গুরুত্ব অনুভব করিয়া দুজনেরই অশ্রু যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিল সর্ব্বপ্রথম বিশ্বেশ্বরী। মুখটা যথাসম্ভব নীচের দিকে গুজিয়া দিয়া তিনি যেন অচেতন দেহ বিছানাটাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন তুই একদিন বুঝলিনা অজিতা কি অবস্থায় আমরা আছি। ভাগ্য নেই বিত্ত নেই একজন আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত আমাদের পিছনে দাঁড়ানোর নেই—এই অবস্থায় যে গাঁয়ের ভিতর কুটীর বেঁধে টিঁকে আছি সে কেবল দশজনের সহানুভূতির জোরে। তুই হয়ত জানিস্‌নে কিন্তু আমি জানি ওই রামঠাকুরপোর রোষদৃষ্টি হলে এগাঁয়ে আমাদের একদণ্ড টিক্‌বার জো নেই। দশখানা গ্রামের সেই হর্ত্তাকর্ত্তা আর কাউকে না মানিস্‌ অন্ততঃ তাকেতো অবজ্ঞা করা চলেনা।

বিশ্বেশ্বরীর স্বরটা কোমলতার দিকে এতটুকু নামিয়া আসিয়াছিল যে অজিতা মনে মনে আজকের মত একটা আপোষেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ঠিক পূর্ব্ব অবস্থায় থাকিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জবাব দিল—আমি ত তোমাদের রামঠাকুরের কাছে এমন কোন অপরাধ করিনি যাতে তাঁকে অবজ্ঞা করা হতে পারে। বিশ্বেশ্বরী নম্রস্বরেই জবাব দিলেন রামঠাকুর হলেন একটা সমাজের মাথা, আর তার সমাজের ভিতর বাস্তবিা করে কোন একটা অধর্ম্মের কাজ করাই হল তাকে অবজ্ঞা করা।

"তাই যদি হল আমিত তেমন কিছুই করিনি যাতে তোমার এতভয় হর্ত্তে পারে?" "করিস্‌নি কে বল্‌ল বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটী ছোঁয়াধরার সীমা যে রাখতে পারে না, তার অপরাধের মাত্রা কি কিছু কম! কি দরকার ছিল তোর পদে পদে ছোটলোকদের গা ছোঁয়ে নিজকে অপবিত্র করার, আর ধুবি মুচি নির্ব্বিশেষে স্কুল জমানোর।

এ অভিযোগের সত্যিকার জবাব কি হইতে পারে! যে আসল দরকার বোধের উপর আজ দেশের সমস্ত উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজজীবিদের নিকট বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা সহজেই ধরা পরিবে না। স্বামীর মৃত্যু সময়ে ব্যথা বেদনার ভিতর দিয়া অজিতা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশকে সমস্ত হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা সকলের কাছে প্রাঞ্জল হইয়া ধরা পরিবার জিনিষ নয়। নিজ মাকে সে বেশ করিয়াই চিনিত। শত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁর দুটী কুসংরাচ্ছন্ন চোখের সামনে কুলাভিমানের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যের সত্য অধিকার উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে না। তার কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়াই বৃথা। তার উপর আবার সমাজ লাঞ্ছনার ভয়। জবাব স্বরূপ অজিতা সংক্ষেপে বলিল "বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে যে সমাজ আমাকে আমার বড়কর্ত্তব্য থেকে সঙ্কীর্ণ করে দিতে চায় তার যে কি মাহাত্ম্য সে আমি জানি। যারা মিছামিছি একটা বিদ্রোহ করে তোমাদের সমাজের নিষ্কলঙ্ক জীবনস্রোতে কোন ঘুর্ণিপাকের সৃষ্টি করতে আমি চাইনে। কিন্তু যা করেছি তার জন্য কি ক্ষমা পাবার কোন উপায়ই নেই।

নিজের বিবেকবাণী ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে ঠেলিয়া দিয়া কত দুঃখে যে অজিতা এই কথাগুলি বলিল তাহা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা বিশ্বেশ্বরীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মেয়ের দিক হইতে এই পরাজয় স্বীকারে নিজের অসামান্য সফলতায় উল্লসিত হইয়া এত দুঃখের ভিতরও বিশ্বেশ্বরী একটা আরাম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

—চারি—

সমাজপতি রামঠাকুর মহাশয় অজিতার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। অচিরেই হয়ত একটা সমাজ নিগ্রহের বুঝাপড়া হইয়া যাইত কিন্তু বিশ্বেশ্বরী ও অজিতার পূর্ব্ব সতর্কতায় সহজেই তাহার একটা কিনারা হইয়া গেল। গোপনে পনরটী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া মা ও মেয়ে কাঁদিয়া কাটিয়া রামঠাকুরের পা দুটী এমন ভাবে আকরিয়া ধরিল যে এই গুরু অপরাধটী বিস্মৃত হওয়া ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর রহিলনা।

বাড়ীর পথে শুনিবি আসিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্খীনির ন্যায়

স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া জানাইল এত সহজে যে অজিতা এবার মুক্তি পাইয়াছে সে কেবল তাহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। রামঠাকুরত এতবড় একটা ধর্ম্মবিচ্যুতির যোগ্য শাস্তি বিধানেই অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু গুনিঝির মত একজনের অনুরোধ অবহেলা করা নাকি তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। তার দুটী কথায় প্রীত হইয়া জমিদার নরম হইয়া বলিয়াছিল গুনিঝি যখন বলছ তখন শাস্তি নাহয় নাই দিলুম কিন্তু তুমি তাদের জানায়ে দিও ওরকম কাজ করলে ভবিষ্যতে আমি আর তাদের গ্রামে রাখতে পারব না। অজিতা কাঁদ কাঁদ ভাষায় জবাব দিল না মাসী ওরকম কাজ আর আমি জীবনে করবনা।

—পাঁচ—

তারপর মাসখানেক কাটীয়া গিয়াছে। এর ভিতর আর যাই করুক অজিতা গ্রামের অস্পৃশ্য লোকদের সংস্পর্শে আর যায় নাই। পাঠশালার পড়োয়াদের দল দুচারদিন দল বাঁধিয়া আসিয়া তার নিকট পড়িবার কতুহল জানাইয়াছে, নিতাই খুবীর মেয়ে চিন্তা এই সেদিন তার মায়ের দিব্যি দিয়া কি একটা জরুরী ব্যাপারে তাদের বাড়ী নেওয়ার জন্য মিনতি জানাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে অচল অটল। "না" বলিবার ক্ষমতা নিজের নাই জানিয়া সে মাকে দিয়া তাদের কটুকথা শুনাইয়া পুনর্ব্বার আসিতে বারণ করিয়াছে।

কিছুদিন হয় গ্রামে বেশ কলেরা দেখা দিয়াছে। এ দারুণ ব্যাধির কবলে পড়িয়া অনেকের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। অজিতাদের বাড়ীর কাছটীতেও রোগ ও মৃত্যুর ভয়াবহ হাহাকার ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল। আর এই সবেরই একটা করাল ছায়া নিয়া আসন্ন সন্ধ্যায় গুনিঝি আসিয়া অজিতাদের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল। বিশ্বেশ্বরী একখানা আসন আনিয়া দিলেন কিন্তু গুনিঝি তাতে বসিবার কিছুমাত্র উপক্রম না করিয়াই বলিতে লাগিল "বলি ওপাড়ার চণ্ডি ঠাকরুণের কলেরায় মরার খবরটা তোমরা ত পেয়েছ দিদি। আহা কি ভাল মানুষই না ছিলেন! এই গেলো বছর পুজার সময় চুপি চুপি ডেকে নিয়ে হাতে পাঁচটী টাকা গুজে দিয়ে বললেন "পুজোর সময় দুটো ভাল কাপড় চোপড় এনে পয়ো দেবার লোক তোমার ত আর কেউ নেই। হোকনা কলেরা এত সকালেই কি আর তিনি মরে যেতেন, বিধবা মানুষ একাদশী পরে গেলো তাই—কলেরা হলেও নিরম্বু উপবাস বলে অসুধ পত্তর ত আর কেউ গিলতে দিতে পারে না!" কথাগুলো বিশ্বেশ্বরীকে এমনি আহত করিল যে তিনি কিছু বলিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল "এখন তবে যাই আর একদিন আসব বলিয়া গুনিঝি চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর হইতে চণ্ডি ঠাকুরুণের এই কাহিনীটি শুনিয়া আর একটী নারীর ব্যথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মর্ম্মাহতভাবে বসিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল এই একটী শোচনীয় মৃত্যুর কথা। "কলেরা হলেও নিরম্বু উপবাস বলে অসুধ পত্তর ত আর কেউ তাকে গিলতে দিতে পারে না!" গুনিঝির এ সত্য কথাটা অজিতার কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে বিশেষভাবে ব্যথা বিজড়িত করিয়া দিল। হায় হিন্দুর অন্ধ আচার! একটী নারীপ্রাণ কলেরায় মৃত্যুবরণ করিতেছে একাদশীর দিন বলিয়া ঔষধ ব্যবহারে তার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা নাই!

চণ্ডী খুড়িমার সেই শান্তধীর মূর্ত্তিখানি স্মরণ করিয়া অজিতার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া যাইতে লাগিল দারুণ ব্যথা-গলা অশ্রুরাশি।

এমনিভাবে থাকিয়া বাহির বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিতে পাইল ভিতরে-আসা রাস্তাটার এক কিনারায় মলিন মুখে বসিয়া আছে চরণ। দেখিয়াই অজিতা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চরণকে ঐদিকে আসিতে ইঙ্গিত করিল। চরণ বাহির বাড়ীর ওধারটায় আসিতেই অজিতা লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল ঐ কচিমুখের সমস্ত উজ্জ্বলতাই আজ যেন কিসে ছিনাইয়া নিয়া গিয়াছে। কথা বলিতে গিয়া চরণের চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার সেই অস্ফুটস্বর হইতে অজিতা এইমাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল যে কলেরা আজ সকাল বেলা হইতে চরণের মাকে বিশেষভাবে কবলিত করিয়াছে—এতটুকু সাহায্য করিবার কেউ নাই। নিমেষের সেজন্য ব্যাপারের গুরুত্বটা তলাইয়া দেখিয়া মনে প্রাণে শিহরিয়া উঠিল। একটী অনাত্মীয় নিম্নশ্রেণীর রমণীর এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাহার তিন চারটী ছেলে মেয়ের মাথার উপর দিয়া আজ কি ভীষণ ঝড়ই না প্রবাহিত হইতেছে। অব্যক্ত বেদনার তীব্র জ্বালায় অজিতার ক্ষুব্ধ

প্রাণ আজ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। করুণার অশ্রু আবেগ বোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল—ক্ষণ পরেই যে মায়ের অজ্ঞাতে চরণের হাত ধরিয়া সে মণ্ডলদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

—ছয়—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসার পূর্ব্বেই পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী দেহত্যাগ করিল। ছেলেমেয়েদের বুকফাটা কান্নায় বিচলিত হইয়া ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া চরণদের বাড়ীর কাছে উচু জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। কার্য্যে না হউক মুখের সহানুভূতির তখন আর এতটুকু অভাব সেই জনতার ভিতর ছিল না। গুনিঝিও তার সেই লাঠিখানায় ভর দিয়া উপস্থিত ছিল। এই একটা শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাহার কথাবার্ত্তা আর ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাড়ীর কাছে সন্ধ্যা বেলায় এমনি একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল, বিশ্বেশ্বরীও একটীবার না আসিয়া পারিলেন না। গুনিঝির দিকে আগাইয়া আসিয়া তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন "বাড়ীর কাছে এমনি সময় এক বিপৎপাৎ হল, ভাবলুম একটীবার দেখে গিয়ে না হয় নাইয়েই বাড়ী ফিরব। আহা! চরণদের এই বিপদে এদের একটা স্বজনও বুঝি দেখতে এলে না! ছেলেমেয়েগুলির কিন্তু···। কিন্তু আর কিছু বলা সম্ভবপর হইল না। এতক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ওবাড়ীর উঠানটার দিকে গিয়া পড়িয়াছিল। বজ্রাহতের মত বিশ্বেশ্বরী দেখিলেন চরণের মার মৃতদেহটার পাশে শোকাচ্ছন্ন ভাবে অজিতা বসিয়া, পরাণ মণ্ডলের দু'বছরের সেই ছোট মেয়েটা কিনা তাহারই কোল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

নৌকা বাইচের সাড়ি

[শ্রীদেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ]

নৌকা বাইচ একটা আমোদ জনক ব্যাপার। উহা পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় অনেক জায়গায়ই অল্প বিস্তর প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ভাটী অঞ্চলের নৌকা বাইচের বেশ একটা বিশেষত্ব আছে। ভাটী অঞ্চলে নৌকা বাইচের অপর নাম "আরঙ্গ"।

কোন দিন কোন জায়গায় আরঙ্গ জমিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ আছে। শ্রাবণ মাসের শেষ দিন হইতে ভাদ্র ভরা এই আরঙ্গ হইয়া থাকে।

শুনা যায় পূর্ব্বে দুই তিন শত পর্য্যন্ত দৌড়ের নৌকা জমাট হইত। এখনও শ দেড়শ নৌকা হইয়া থাকে। দৌড়ের নৌকাগুলি সাধারণত ৫০।৬০ হাত পরিমাণ। তাহাতে দুই দিকের গুড়ায় দুই সার লোক ছোট ছোট বইটা নিয়া বসে। হাইলের দিকে ৫।৬ জন খুব জোয়ান এবং শ্রম সহিষ্ণু ব্যক্তি থাকে, তাহাদের উপরেই নৌকার হার জিতের সম্পূর্ণ ভার। নৌকাগুলিকে সুন্দর স্থায়ীরংয়ে সাজান হয়!

কাহারও কাহারও নৌকার পূর্ব্বভাগ ঠিক ময়ূরাকৃতি তাহাতে রং থাকায় অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এক একখানা নৌকার রং দিতে ২০।২৫ টাকারও অধিক ব্যয় পড়ে।

বর্ষাকাল চারিদিক জলে প্লাবিত থাকায় দর্শকগণের ও নৌকাতেই আরঙ্গে যাইতে হয়। আরঙ্গের স্থানে দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দর্শক মণ্ডলীর নৌকা গুলিকে রাখা হয়। মধ্যভাগ দিয়া বাইচের নৌকা গুলি ঠিক এক সময় সুরু করিয়া ছাড়ে। তখনকার দৃশ্য বাস্তবিক প্রাণে বেশ আনন্দ প্রদান করে। কাহার নৌকা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীতে পারিবে তজ্জন্য বাহকগণ প্রাণপণে বইটা চালায়। যাহার নৌকাখানা সর্ব্বাগ্রে গেল, তাহারই জয় হইল। সর্ব্বাগ্রগামী নৌকা ফিরিবার সময় ধীরে ধীরে বাহিয়া আনা হয়। সব ভাইকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নৌকার আগায় একখানা নূতন কাপড় অথবা গামছা পাতা হয়, তাহাতে দর্শক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা নৌকা বাইচের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই তাহারাও বুঝিল যে কাপড় দেওয়া নৌকাই জয়ী হইল। অনেক সময় অতি দ্রুতগামী নৌকা গুলির উচ্ছ্বসিত জল প্রবাহে কাঁড়ারী কিছুই দেখিতে পায়না বলিয়া কাঁড়ীর ঠিক রাখিতে পারে না।

তাহাতে দর্শকদের নৌকার মধ্যে বাইচের নৌকা উঠিয়া দর্শকদিগের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মহাবিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে। বাইচের নৌকায় নৌকায় ঠেসাঠেসী ত প্রায়েই ঘটে, ফলে বিবাদের সূত্রপাত, শেষে বাইচের স্থান মাথার রক্তে লাল হইয়া যায়, তখন দর্শক মণ্ডলী কে কোথায় পলায়ন করিবে এই দৃশ্য ভয়ানক দেখায়। বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে, তজ্জন্য সকল বাইচের

নৌকায়েই ৫।৬ হাত লম্বা লম্বা কাচা বাঁশের লাঠি এবং দূর হইতেই আঘাত করিতে পারা যায় এরূপ কতকগুলি লগি থাকে। ঘা দেওয়ার জন্য আবার কতক গুলির অগ্রভাগ চোকা করিয়া নেওয়া হয়। মোটের উপর ভাটী অঞ্চলের নৌকা বাইচে আনন্দের সঙ্গে ভয় জড়ান আছে। নৌকা বাইচের সাড়িগানগুলিতে কয়েকটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমস্তরে নৌকা ঘাট হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে বন্দনা গীতি ২য় স্তরে যখন নৌকা আরম্ভ অভিমুখী হইয়া চলে তখন এক প্রকার বিজয় সঙ্গীত ৩য় স্তরে বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিদায় সঙ্গীত, সাড়ি গানগুলিতে নিমাইর সন্ন্যাস, রাধাকৃষ্ণ ও জলভরার গানই বেশী। গানগুলি গ্রাম্য কবির তৈয়ারী। বাইচের নৌকায় ঢোল করতাল ঝাঁজে এবং ছোট ছোট বইটার মধ্যে ঘুঙ্গুর থাকে। ঘুঙ্গুরের শব্দ ঢোল করতাল প্রভৃতির সঙ্গে মিশে সাড়িগানের তালে তালে বেশ একটা মধুর তান ধরে। সাড়ি প্রথম যে একজন দাঁড়াইয়া গায় তাহাকে "সাইড়ল" বলে। সাইড়ল শরীর বাঁকাইয়া হাত নাড়িয়া বলিলে পর অন্যান্যরা এক সময়ে সমস্বরে গাইতে থাকে। এটি গানের ধারা।

এবার কয়েকটি মাত্র উপস্থিত করিলাম।

বন্দনা

প্রথমে বন্দনা করি নিত্যানন্দ গৌরহরি,
নিত্যানন্দ গৌরহরি, নিত্যানন্দ গৌরহরি।
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি পূবে ভানু শ্বর,
এক দিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর।
তৃতীয়ে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী,
এস মাগো মোর কণ্ঠে করহ বসতি।
তার পরে বন্দনা করি দেব ত্রিপুরারি,
মাথে শোভে গঙ্গাদেবী বামে শোভে গৌরী।
পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথে,
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার যে দেখ্যাছে রথে।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরদী সাগর,
যাহাতে বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর।
ভকতি করিয়া বন্দি জগৎগুরু হরি,
বৈষ্ণবের চরণ বন্দি নমস্কার করি।
সর্ব্ব দেব দেবীর পদ বন্দি ভক্তি করি,
এই পর্য্যন্ত বল্যা আমি বন্দনা সাঙ্গ করি।

যাত্রা ও সাজন

(২)

যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো মা নন্দরাণী,
মাগো কালীদয়ে যাব আমি।
যাত্রা করাও নন্দরাণী বেইলের দিকে চাইয়া,
আইজের যাত্রা করাইয়া দাও তেল সিন্দুর দিয়া।
যাত্রা করায় নন্দরাণী মুখে দিয়া পান,
ঘরত না বাইরি অইল পূর্ণমাসীর চান্।
ভাত যে রান্ধিবা মাগো না কালাইও ফেণা,
কালীদয়ে যাইতে মাগো না করিও মানা।
সাজ সাজ বইলারে নগরে দিল সারা,
শ্রীকৃষ্ণের সাজন দেইখ্যা সাজে গোয়ালপাড়া।

আরম্ভের চলতি পথে

(৩)

আমার গৌর যায়রে আরে নবীন সন্ন্যাসে,
নবীন সন্ন্যাসে আরে নবীন সন্ন্যাসে।
সন্ন্যাসী না অইও বাছা বৈরাগী না অইও,
অভাগিনী মায়ের পরাণ বধিয়া না লইও।
আগে যদি জানতাম নিমাই যাইবেরে ছাড়িয়া,
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া না করাইতাম বিয়া
নিমতলে থাক নিমাই নিমের মালা গলে,
অইয়া পুত্র মইরা যাইতা না লইতাম কোলে।

(৪)

বাজল বাঁশী গইন কাননে, প্রিয়ে রাধে রাধে বইলে,
প্রিয় রাধে রাধে বইলে (গো) প্রিয় রাধে রাধে বইলে।
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা,
(হাঁ হাঁ বেশ)
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা (গো)
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে জলে ভাস্যা যায়,
(হাঁ হাঁ বেশ)
বালু চড়ে ঠেক্যা বাঁশী রাধা গুণ গায় (গো)
যদিরে শ্যামের বাঁশী তোর লাগাল পাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
জড়ে পড়ে উগ্‌ড়াইয়া যায়রে ভাসাই (গো)

(৫)

কোন কোন সখি তোরা যাবে গো জল ভরিতে,
(ওগো) জল ভরিতে (ওগো) জল ভরিতে।
সাজিয়া চল গো সখি জলের ঘাটে যাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
যে ঘাটে ভরিব জল সেই ঘাটে কানাই। (গো)
জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ,
(হাঁ হাঁ বেশ)
হাসি মুখে কও কথা ঘাটে নাই কেউ। (গো)
জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন,
(হাঁ হাঁ বেশ)
কাইল যে কইচ্‌লাম কথা আছেনি স্মরণ। (গো)

আমেরিকার পত্র

[শ্রীআবদুল কাদের]

নমস্কারান্তে নিবেদন—

চক্রবর্ত্তী মশাই!

আপনার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে দেরী হল, তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আমরা এখানে যত লোক আছি, তন্মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন খেটে খাই ও মজুরের কাজেতে বা এই রকম কাজেতে যেখানে কাজ খালি থাকে আমাদিগকে নিয়া নেয়, তাতে কোন পার্থক্য রাখে না। আমরা যত পয়সা বাঁচাতে পারি অন্যান্য লোকে অর্থাৎ এই দেশের লোকেরা তা বাঁচাতে পারে না; কারণ তাঁরা পরিবার নিয়ে বা মাতাপিতার সঙ্গে থাকে; কাজেই বেশী খরচা, তবে এ দেশের লোকেও অনেক পয়সা বাঁচায়; তারা আমাদের চেয়েও ভাল কাজ করে ও বেশী পয়সা পায়। আমরা অবিবাহিত ও এক সঙ্গে দু'তিনজন করে থাকি; আর এক একটা ঘরের ভাড়া, ৫০।৬০।৭০৲ টাকা ইত্যাদি যে যেমন ঘর চায় সেই অনুসারে ভাড়া দিতে হয়, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ঘর আছে; Steam-heated and not steam heated. Steam heated ঘরগুলার ভাড়া তুলনা হিসাবে অধিক। প্রত্যেক ঘরেতে লোহার নল আছে ও সেই নল দিয়ে Steam আসে, যখন Steam আসে তখন নলটা খুব গরম হয়ে যায় ও সেই গরমেতে ঘরগুলা গরম হয় ও শীতেতে কষ্ট পেতে হয় না। যে ঘরেতে Steam heat নাই সেই ঘরেতে যারা থাকেন তারাই gass stove কিনে gass জ্বালিয়ে ঘর গরম করে। এখানে প্রত্যেক ঘরেতে gass and electric বন্দোবস্ত আছে ও সেই সঙ্গে metre আছে। gass জ্বালিয়ে রান্না হয় ও electric বাত্তির কাজ করে। আবার কোন কোন স্থানেতে যেখানে নগর ছোট; সেখানে, কয়লার Stove ও কেরোসিন তেলের Stove ব্যবহার করে; এই সব Stoves এমন ভাবে তারা বসিয়ে দেয় যে ঘরের মধ্যে একেবারেই ধুয়া হয় না। অথচ ঘর বেশ গরম হয়। এখানে কাঠ পোড়ান হয় না ও gassতে খুব কম ও খরচা পড়ে। এখানে ৪ তালা হতে ৬১ তালায় ঘর আছে ও প্রত্যেক ঘরেতে ১২টা পরিবার থেকে ১০০টা পরিবার থাকবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা কামরা বন্দোবস্ত ও তৎসহ পায়খানা ও স্নান করবার ঘর নির্দ্দিষ্ট। এই সব থাকবার জন্য ব্যবস্থা। এ দেশেতে প্রত্যেক জিনিষ পাওয়া যায়। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁরা শাক সবজি কিনে রেঁধে খেতে পারেন রেঁধে না খেলেও Restaurant অর্থাৎ হোটেলেতে গিয়ে খেতে পারেন। যেখানে সেখানে হোটেল আছে, কারণ হিন্দু বা মুসলমান-দের মত ইহারা কিছু বাচে না; যেখানে পাবে সেইখানে খাবে ও যাঁরা সর্ব্ব-ভক্ষক তাঁদের জন্যই ত অগাধ জিনিষপত্র। অবশ্য আমাদের দেশের গজা এখানে পাওয়া যায় না—তবে সেই প্রকারের মিষ্টান্ন আছে তাকে এ দেশেতে Candy বলে। এখানে পোষাক পরিচ্ছদের দর আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক অধিক। ৪০৲ টাকা হতে ১৫০৲ টাকা দাম। ৪০৲ টাকার নীচে পোষাক পাওয়া যায় না। পোষাক অর্থাৎ কোট প্যাণ্ট ও মেয়েদের পোষক কাচাতে এক ডলার অর্থাৎ ২॥৴০ আনা থেকে আড়াই ডলার অর্থাৎ ৬৷৴০ পর্য্যন্ত খরচা পড়ে জামা অর্থাৎ কামিজ কাচাতে ।৴০ থেকে এক টাকা খরচা পড়ে। এই ভাবে খরচাও খুব বেশী। এই দেশের খরচা বিলাতের খরচার দেড় গুণ। এ দেশেতে একটা ছেলেকে পড়াতে হলে কম পক্ষে ৩০০৲

টাকা মাসিক খরচা করতে হবে। এখানেও আমাদের দেশের অনেক গুলা Students দিনের বেলাতে কোন খানেতে কাজ ক'রে রাত্রিতে College করে ও ইহারাই প্রকৃত পক্ষে Self supporting Student ও energetic, কেউ Industrial, কেউ Mechanical, Civil, Aeronautical Engineering পড়েন। কেউ কেউ বা arts পড়েন; কেউ কেউ এখানে ভাল ভাল কাজ করেন। এই সব Students দ্বারা ও অন্যান্য আমাদের দেশের বক্তাগণের দ্বারায়, আমাদের দেশের কথা খুব দ্রুতগতিতে এ দেশেতে প্রচার হচ্ছে। বক্তাগণের মধ্যে সৈয়দ হোসেন, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মজুমদার, হেমেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সুধীরেন্দ্র বসু ইত্যাদি। আগামী জানুয়ারী মাসেতে এখানে India Hindu Temple নামে একটী বাড়ী স্থাপিত হইবে। এই মাস হইতে সামাজিক কাজ আরম্ভ হইবে। এখানে Hindustani Association ও বিবেকানন্দ সমাজ আছে। এ ছাড়া আরও অনেক Social activity আছে। যাঁরা এই দেশেতে এসে শিক্ষা করতে চান তাঁদের পক্ষে অনেক সুযোগ আছে। Night School, Day School, Night College and Day College আছে। এখানে 7th class থেকে High School পর্য্যন্ত free. অর্থাৎ ছেলের বা মেয়ের বাপের ছেলেদের পড়ার জন্য Schoolতে মাহিনা দিতে হয় না। এখানকার High School আমাদের দেশের I. A. সমান। কেবল যখন Collegeতে যাবে তখন Collegeতে পয়সা দিতে হবে। আমাদের দেশের চেয়ে এখানে College খরচা অনেক বেশী। এই সব College, Schoolতে, Engineering, Science ও arts সবই শেখা যায়। এখানে ৫ বৎসরের ছেলে থেকে ৮০ বৎসরের বুড়োরাও পড়তে পারে এবং পড়েও। ৫ বৎসরের মেয়ে থেকে ৪০ বৎসরের বুড়ীরাও পড়ে। বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে কেউ ছোট বড় বলে লজ্জা বা অপমান বোধ করে না।

সামাজিক আচার ব্যবহারও স্বাধীন। ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে যদি কোন ছেলে বা কোন মেয়ে কুঅভ্যাসাসক্ত হয় ও এই কথা যদি Children Societyতে জানায় তাহ'লে প্রমাণ হলে তাদের কয়েদ করে রাখে ও ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হলে ছেড়ে দেয় বা যদি জেলেতে দেখে যে কুঅভ্যাস আর নাই তখন তাকে ছেড়ে দেয়। স্বেচ্ছাচারী হলেও তার আবার কঠোর শাসন আছে। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কি ছেলে, কি মেয়ে মাতাপিতার অধীন। তার পর সকলেই স্বাধীন; নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে; মাতাপিতার তাতে কোন আপত্তি থাকে না ও আপত্তি করলেও তা নাও শুন্‌তে পারে। তবে সকল স্থানেতে ভাল মন্দ আছে; যারা ভাল তারা নিশ্চয়ই স্নেহময় মাতাপিতাকে দেবতা জ্ঞানে তাঁদের আদেশ পালন করে। সকলেই আপন আপন উদ্দেশ্য নিয়ে উন্মত্ত তা ভাল হোক, আর মন্দ হোক! নিজের ইচ্ছানুযায়ীও নিজের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে এরা, স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগ করে ও ইচ্ছানুযায়ী যতটা পারে বিবাহ করতে পারে। সাধারণ আচার ব্যবহার—কি রাস্তায়, কি আহার করবার স্থানেতে, সকলেই সমান ভাবে সম্মান করতে হবে, কি মজুর কি কোন বড় চাকরী ওয়ালা লোকের কোন প্রভেদ নাই। সকলেই সম্মান সূচক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। সকলেই সম্মানের যোগ্য। স্বাধীনতার পুণ্য প্রবাহে আনন্দে দিন যাপন করে। রাস্তা ঘাট সম্বন্ধেও অতি উত্তম বন্দোবস্ত। রাস্তার নীচে দিয়ে যে রেলগাড়ী যায় তাকে এরা Subway বলে; রাস্তার উপর দিয়ে Tram গাড়ী যায় তাকে এখানে Street Car বলে; আবার রাস্তার উপরে লোহার খুটি দিয়ে তার উপরে রেল বসিয়ে গাড়ী চালায়, তাকে এদেশেতে elevator বলে। এই সব গাড়ীতে city মধ্যেতে সহরের মধ্যেতে ও সহরের Subarb তে যে কোন স্থানে উঠলে পাঁচ সেন্ট লাগে। এই পাঁচ সেন্ট, আমাদের দেশের এক আনার মত বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত আমাদের দু আনার কিছু বেশী। এই পাঁচ সেন্টতে যে লাইনে উঠা যায় সেই লাইনের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়; বেশী পয়সা লাগেনা। আবার ঢোকবার সময় Stationএর মধ্যে এক রকম Machine আছে, তাতে এই পাঁচ সেন্টের একটা Nickel ফেলে দিলে আপনা আপনি খুলে যায় ও তাতে চাকার মত একটা দরজা আছে' সেইটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়, কেবল এই Machineএর সামনে একটা

ঘরে এক জন লোক পয়সার Change দেবার জন্য বসে থাকে ও Station watch করে। Public জায়গায় কোন স্থানেতে থুতুও Smoke করবার নিয়ম নাই। তবে Taxi cars প্রভৃতির বিভিন্ন নিয়ম ও দূরত্ব অনুসারে তারা পয়সা নেয় ও এই পয়সা Taxi car এর metre উঠে যায়। এ দেশেতে কোন গাড়ীতে অর্থাৎ United States কোন স্থানেতে কোন গাড়ীতে First class Second class বা Third class নাই, সকলেই এক রকমের Ticket কিনবে ও যার যেখানে ইচ্ছা সে সেইখানে বসবে। জগতের এই বৃহত্তম নগরের ব্যবস্থা অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। এখানে গাড়ী Right side turns করে।

আমরা যাকে প্রমোদোদ্যান বলি এখানে প্রকৃত তাই আছে। শীত অবসানে, বসন্তের প্রারম্ভ। পুনঃ শীত আগমন পর্য্যন্ত কোণী আইল্যাণ্ড (Coney Island) নামক দ্বীপেতে আমোদ আহ্লাদের কত তামাসা হয় ও লাখে লাখে লোক যাইয়া সেই সব কৌতুক দেখে ও আনন্দ উপভোগ করে; জগতের কোন সহরে এত সুন্দর ও বড় প্রমোদোদ্যান নাই গ্রীষ্মের প্রখর তাপের রৌদ্রেতে হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ স্নান করবার পোষাক পরে এক সঙ্গে স্নান ও সাঁতার কাটে। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর; দেখলে কত আনন্দ হয়। তা ছাড়া যেখানে সেখানেতে Motion Picture আছে যাকে আমরা বাইস্কোপ বলি। বেলা দুটা থেকে রাত ১০॥ সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত Motion Picture খোলা থাকে। এখানে যেমন মানুষে পয়সা উপায় করে তেমনি খরচাও করে। আমার মত লোক এখানে ৪।৫ বৎসর থেকে বেশ দুপয়সা জমা করে দেশে নিয়ে যেতে পারে অবশ্য ২।৪ হাজার টাকা বড় লোকের পক্ষে কিছুই নয়। তবে আমাদের মত লোকের ও পল্লীগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট। একথা আমিও বলি যে এখানে আমাদের দেশের অনেক লোকও যা উপায় করে সবই খরচা করে ফেলে। ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ দেশ ছেড়ে বিদেশে না বার হলে, নিজের সঙ্গে অপরের কতটুকু সম্বন্ধ ও ছোট বড় বুঝা যায় না। আমরা অর্থাৎ পল্লীগ্রামের লোক কোথায় কি হচ্ছে কিছুই জানি না। লেখা পড়া জানি না, কাজেই খবরের কাগজ পড়তে পারি না, কাজে কাজেই অন্য দেশের বা দেশের কথা জানতে পারি না। এদেশেতে প্রত্যেক লোকটী লেখাপড়া জানে ও প্রত্যেকেই খবরের কাগজ পড়ে। তাই এরা এত উন্নত ও এত জ্ঞানী। যত দিন না আমাদের অজ্ঞতার দৈন্য ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে আমরা স্বাধীন বা মুক্ত হতে না পারি, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। শিক্ষা আমাদের এখন প্রথম লক্ষ্য হওয়া চাই। ঘরে ঘরে যখন আমরা শিক্ষা প্রচার করবো তখন আমরা ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারবো; আমাদের লুপ্ত গৌরবের আবার পুনরুত্থান হইবে। United States একমাত্র স্থান যেখানে ছাত্রেরা স্বাবলম্বন করে শিক্ষালাভে রত, তাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিই ও তারাই ধন্য। যৌবনকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই সময়েতে মানুষের উন্নত হবার সময়, তারা যদি নিজকে বিশ্বাস করে; যদি নিজের স্বাধীনতা জন্য ও নিজ দেশকে উন্নত করবার জন্য দেশত্যাগ করে, পরদেশে শিক্ষালাভে উন্নত হয়, তা হলে আমাদের দৈন্য অচিরে দূর হবে। যুবকেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ও সহায়ক। অবশ্য দেশ ত্যাগের অনেক প্রকার কষ্ট আছে; কিন্তু দেশ থেকে অজ্ঞতা, দৈন্য ও নানাবিধ সামাজিক বৈষম্য অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে বিদেশে এসে শিক্ষালাভ করে নিজের অবস্থা উন্নত করা শ্রেষ্ঠতর।

আমরা যেভাবে এখানে এসেছি; তাতে নানান বিপদ; কিন্তু বিপদ থাকলেও সে বিপদে থেকে আমরা এতদিন এখানে আছি ও অনেকে যথেষ্ট পয়সা উপায় করে দেশে গেছেন। Students রাও এ দেশের University থেকে Degree নিয়ে গেছেন। এ দেশেতে কি করে এসেছি, কোথায় থাকি ইত্যাদি কোন খোঁজ নেয় না ও এদেশের লোকের সঙ্গে সমানে শিক্ষা লাভ করি। Passport নিয়ে এসেও পড়তে পারেন এবং জাহাজে কাজ করে এদেশেতে এসে College শিক্ষা লাভ করতে পারেন। Where there is will, there is way, ইচ্ছা থাকে উপায় হয় এ কথা সত্যও আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এখানে সকলেই দিনেতে খেটে রাত্রিতে বেশ ভাল ভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারে। আশা করি আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন ও এত দেরীতে উত্তর দিতেছি বলে বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম।

আশাকরি পুত্র পরিবার সহ ভাল আছেন। আমরা ভাল আছি। আমাদের সকলের নমস্কার গ্রহণ করবেন ইতি। *

শিক্ষার আদর্শ

[শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস.]

আমি এবার এক বৎসরের জন্য বিলাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইউরোপের অনেক দেশে বেড়িয়ে এসেছি। সে সব দেশে সব চুপচাপ—কোন গোলমাল নেই। ট্রেন ষ্টেশনে থামল—মানুষ গাড়ীতে উঠছে নামছে কোন গোলমাল নেই—সব চুপচাপ। জাহাজ ঘাটে লাগল—লোক উঠছে নামছে, কোন গোলমাল নেই, সব চুপচাপ। সেখানেও গোলমাল কখন কখন হয় বটে—তা ছাত্রেরা করে এবং পূর্ব্ব হতেই ঠিক করে আসে যে একটা কিছু করবে। তাকে rag অর্থাৎ গুণ্ডামী করা বলে। যেদিন তারা মনে করে যে rag বা গুণ্ডামী কর্ব্বে সেদিনই করে, তারপর সব চুপচাপ। আগে থেকে চুপ করে থেকে পরে শক্তিপ্রয়োগ কর্ত্তে হয়। আগে গোলমাল কল্লে পরে প্রয়োগ করার সময় শক্তি থাকে না। জাপানেও এরূপ দেখেছি, সব কাজ হচ্ছে চুপচাপ কোন গোলমাল নেই। যখন ইউরোপ ছেড়ে পোর্ট সৈদে এলুম তখনই কেবলই হৈচৈ, কেবলই গোলমাল। ডেক্ পেসেঞ্জাররা মারামারী হুড়াহুড়ী আরম্ভ করে দিলে। একবার এক জাহাজে এক মাড়োয়ারী ও এক মুসলমানে মারামারী লেগে গেল। চারিদিকের লোক তামাসা দেখতে লাগল, মেম সাহেবেরা হাসতে লাগল, এক সাহেব ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে এল। এডেনেও এইরূপ গোলমাল মারা মারী হুড়াহুড়ী দেখলুম। কিন্তু জাপানে এরূপ নয়। সেখানকার লোক সহজে চটে না। একজনকে আর এক জনে ঠেলে দিলে সে কিছুই বলে না, সহ্য করে রইল, কিন্তু যখন চটে তখন ভয়ানক। আবার চীনের লোকেরা অনেকটা আমাদেরই মত—জাহাজে উঠতে নামতে মারামারী হুড়াহুড়ী গোলমাল কর্ব্বে। শক্তি যে সংযম অভ্যাস করে প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, এ তারা জানে না। যাদের শক্তি আছে তারা সংযম অভ্যাস করে বলেই শক্তি পায়। আমাদের রবিবাবু লিখেছেন যে "আমরা আগেই হৈ চৈ করে শক্তি ক্ষয় করে ফেলি, পরে কাজের সময় শক্তি থাকে না। এই হৈ চৈ খুব খারাপ এতে মানুষের শক্তি ক্ষয় হয়। বিশেষ করে আজ তরুণদের কথাই বলি। আমাদের এ দেশের তরুণগণ যখন কোন সভায় মিলিত হয় তখন বসবার জায়গা নিয়ে তাদের ভিতর একটা হৈ চৈ হুড়াহুড়ী আরম্ভ হয়। এরূপ সংযমের অভাব হলে কি করে দেশের উন্নতি লাভ হতে পারে। আমি এস্থানে বসেছি, আমি কোন মতেই এস্থান ছাড়ব না। অন্য একজন এক স্থানে বসেছে তাকে সেখান হতে দূর করে আমি বসব এভাব থাকলে কিছুই হবার নয়। যে বড় হয় তাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ছেলেদের সম্বন্ধে এটা খুবই দরকারী কারণ এই তাদের শিক্ষার সময়। পরের প্রতি একটা দায়িত্ব জ্ঞান থাকা খুবই দরকার। আমি একটা জায়গা দখল করে বসেছি সেটা তাকে দিব না এই ভাব আমাদের দেশে সকলের মধ্যেই দেখা যায় কেবল ছেলেদের মধ্যে নয় বড়দের মধ্যেও দেখা যায়।

আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে যত নিতে পারে সে তত বাহাদুর তত বড় লোক; এ ভাবটা পূর্ব্বে ভারতে ছিল না। এভাবটা পশুদের মধ্যেই দেখা গিয়া থাকে, তারা হাম্বড়া। একটা ষাঁড় যেখানে থাকবে, অন্যটাকে সেখানে কিছুতেই থাক্‌তে দিবে না। কিন্তু মৌমাছিদের মধ্যে তা নয় তারা দলবদ্ধ হইয়েই থাকে—এক সঙ্গে বাস কর্ত্তেই ভালবাসে। একে বলে Team spirit, এই জিনিষটা আমাদের খুবই দরকার। পূর্ব্বে এদেশে village community ছিল তাতে সবাই দলবদ্ধ হ'য়ে বাস কর্ত্ত। এখন আর এ ভাবটি তেমন নেই। এই ভাবটী এদেশে জাগায়ে তুলতে হবে। অন্যান্য দেশ দেখে দেখে আমাদের দেশের এই ভাব দেখে বড়ই দুঃখ হচ্ছে। আমাদের দেশে পরস্পর এক সঙ্গে থাকার ভাবটার বড় অভাব। আমাদের ভাব হচ্ছে আমি যতটা পারি নিয়ে নিব—তোমাকে দিব না। এই অবস্থটা খুব খারাপ।

ইংরেজী মতে একটা কথা আছে A Healthy mind in a healthy body আমি তার বাংলা করেছি "তনু দুরস্তে মন দুরস্ত"। বাস্তবিক শরীর ভাল না থাক্‌লে মনে তেজ আসবে কোথা হতে? Duke of

* শ্রীযুক্ত শশীধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে এই পত্রখানা মুদ্রণের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সোঃ সঃ

আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃষি কাজ হয় না, এই আমরা মনে করি। আমরা ভাবি, সেখানে খালি গোলাগুলি, বন্দুক, কামান, কলকারখানা এসব। কিন্তু তাদের সেখানে বড় লোক সব কি করে ধন উৎপাদন করা যায় তার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের বড়লোকদের যদি বলা যায় কটা গাই আছে মশাই, তবে তাঁরা বলেন এসব কি রাখা যায়। আমাদের এসব চলে না কিন্তু তাঁরা বলবেন, তাঁদের মটর আছে, গাড়ী আছে। কিন্তু সে দেশে দেখি উল্টো। ইংলণ্ডের রাজার Cattle farm আছে, তাঁর কৃষি কাজ আছে। তাঁর ষাঁড় গাই প্রায়ই প্রথম Prize পায়, তিনি তাঁর শব্জী, কপি দিয়ে পুরস্কার আনেন। সেখানে বড় বড় Lord আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ভাল গাই আছে, ষাঁড় আছে। তাঁদের ভিতর এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্চে।

এ জেলায় দুধের সের ১৲ পর্য্যন্ত হয় শুনলুম্। লণ্ডনে দুধ ৵৹ আনা কি ৶৹ আনা সের। সে দেশে কত বড় বড় ধনী অথচ দুধ এত সস্তা। এগুলি হচ্চে ধন বৃদ্ধি উপায়ের ফল। ইংলণ্ডের প্রত্যেক গ্রামে Young farmers' Club আছে প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ে গাই ও বাছুর একটা করে রাখে। American Boys Club এ মৌমাছি কপি, আলু ও সব্জীর চাষ করা হয়। ভাল সার দিয়ে একই জমিতে হয়ত ১০ গুণ ফসল পায়। তিনটী জিনিষ হচ্চে ধনের আধার একটী হচ্চে দুধ, অপরটী মাটী আর একটীর কথা পরে বলব। মুরগীর ব্যবসায় খুব লাভ, হিন্দুরা তা করবেন না—মুসলমানেরা কর্ত্তে পারেন। শিক্ষিত লোকেরা যে জিনিস ধরবে তাই সফল কর্ত্তে পার্ব্বে। আমরা কৃষিকাজ অশিক্ষিত লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, শিক্ষিতেরা করি না। আজকাল চা বাগান ইত্যাদি কেহ২ কচ্চেন কিন্তু ২ | ১ জন ধনী হলে ত চলবে না প্রত্যেক লোককে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে ধনের জন্ত চেষ্টা কর্ত্তে হবে। সকলে চেষ্টা করে ধন উৎপাদন কর্ত্তে হবে। এখানে শিক্ষার ভয়ানক গলদ, ধন উৎপাদনের উপায় স্কুল কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরাও এদিকে কিছুই করে না—তাই দেশে শুদ্ধ লোক খালি চাকরী খোঁজছে। আমি ছড়া লিখেছি,—

লাগো চাষে কোমর বেঁধে, খুলে দেখ
জ্ঞানের চোখ,
কোদাল হাতে খাটে যারা তারাই আসল
ভদ্রলোক।"

নিজেরা কোদাল হাতে করে কৃষি কাজ কর্ত্তে হবে নৈলে আর কোন উপায় নাই। কোদাল ধরে আগে অনেকেই কাজ কর্ত্তে লজ্জা বোধ কর্ত্তনা। এই লজ্জাটা কয় বৎসরের ভিতর এসেছে—এদেশে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন বি, এ পাশ করে কেউ এতে আসতে চায় না, এ বড় ভুল, এই ভুল দূর কর্ত্তে হবে। ময়মনসিংহের যামিনীরঞ্জন গুহ মহাশয় বল্লেন Queen আনারস যদি ৬ বিঘা জমিতে একটু বই পড়ে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে করা যায় তবে ৪ হাজার টাকা লাভ হতে পারে, তা বি, এ পাশ করে কেউ কর্ব্বে না। বি, এ হলে কি হবে একবার ঘানিতে পড়লেই সব শেষ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে মাড়োয়ারীরা লোটা হাতে এসে বড়লোক হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোক কিছুই কর্ব্বে না। যে সব ছেলে স্কুল হতে পাশ করেছে তারা যদি মন দিয়ে এ সব করে তবে খুব লাভবান হ'তে পারে। বিলাত থেকে আসতে একটা জাহাজে দেখলুম, আলু বোম্বাই হয়ে ইটালী হতে আমাদের দেশে আসছে। তারা বড় বড় মাইনের কর্ম্মচারীদের মাইনে দিয়ে, সব খরচ পোষায়ে হাজার হাজার টাকা লাভ কচ্চে। আমরা শিক্ষিতরা কৃষিকাজে যাই না; আবার অশিক্ষিত দেরেও শিখাই না। তাই দেশের এ অবস্থা। আমাদের সবকে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত এই কাজ কর্ত্তে হবে।

আমাদের আর একটা ভুল এই যে পরীক্ষা পাশ হলেই পড়া শেষ। স্কুল কলেজের শিক্ষা শেষ হলেই প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। অন্য দেশে আছে Adult Education Committee' তারা বয়স্ক ও প্রৌঢ়দের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এসব না থাকলে শুধু স্কুল দিয়ে কি হবে? অবশ্য স্কুল না থাকলেও চলবে না। আমাদের গ্রামে একটী M. E. School ছিল, সেই স্কুল ছিল, বলেই আমি আজ এই সব কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি। যদি সবাই লোকেরা এরূপ সুযোগ পেত তবে আরও অনেকে পারত।

আমি হাবড়া থাকা কালীন একবার উলুবেড়ে গিয়েছিলুম। তথায় কালীবাড়ী দেখতে গেলুম। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় একজন বল্লেন যে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। লোক এখানে এসে বেশ টাকা দেয়, কিন্তু শিক্ষা পায়না। এসব ধর্ম্ম মন্দিরে শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

স্কুল ছেড়ে যখন সংসারে প্রবেশ করা যায় তখনই প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। তখন নানারূপ বই দেখে শিখতে হয়। বিলাতে Adult Education Committee ক্লাশ করে Magic lantern দ্বারা বক্তৃতা করে লোক শিক্ষা দেয়।

আমাদের সংস্কৃতে আছে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যা-মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" কিন্তু আজকাল এটা হয় না। কি করে, শরীর ভাল থাকে, কলেরা হয় না, ম্যালেরিয়া হয় না, শরীরের পুষ্টি হয় তাই শিক্ষা কর্ত্তে হবে। শিক্ষার শেষ নাই। প্রতি গ্রামে Magic lantern ও Bioscope দিয়ে, সমিতি করে, শিক্ষার প্রসার কর্ত্তে হবে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যে দেশের বহুলোক এগিয়ে যায় তারই উন্নতি হবে। District Board হতে, কোন বয়স্ক লোক শিক্ষার বা কোন Magic lantern lecture এর বন্দোবস্ত নেই। উকীল মোক্তার বাবুরাও বলেন তাঁদের সময় হয় না। তাঁরা বলেন স্কুল আছে, ছেলেরা স্কুলে যায়, তথায় শিক্ষা পায় তাদের ত কিছু করবার নেই। উকীল হউন, মোক্তার হউন, ডেপুটী হউন, জমিদার হউন, সংঘবদ্ধ হ'য়ে, শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলেরই দায়িত্ব আছে। সবে সংঘবদ্ধ হয়ে, ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে—অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে ছোট বড় সকলের দায়িত্ব আছে। বয়স্কদের শিক্ষার সম্বন্ধে ও সকলেরই দায়িত্ব। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে, সমিতি স্থাপন করে দেশশুদ্ধ লোককে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করুন।

মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কল্লে অনেক কাজ কর্ত্তে পারে। শিক্ষার প্রসারের বন্দোবস্ত করে, স্বাস্থ্য ও অর্থ সম্বন্ধে, উন্নতি করবার একটা ভাব একটা আন্দোলন উঠাতে হবে—তাতে কাজ হবে। গবর্ণমেন্টের উপর সব জিনিষের জন্য নির্ভর করে বসে থাকলে কোন উন্নতি হবে না। জাপানে দেখলুম প্রত্যেক দোকানের সামনের স্থানটী দোকানী নিজে ঝেড়ে জলদিয়ে পরিষ্কার করে রাখছে। এজন্য তারা Municipalityর উপর নির্ভর করে না। আমাদের তাই কর্ত্তে হবে, নিজের উপর নির্ভর কর্ত্তে হবে। ধনের একটী আধার হচ্চে গরু আর একটী মাটী। তৃতীয়টীর উন্নতি বাড়ী বাড়ী কর্ত্তে হবে। নতুবা হাজার Lecture দিলেও আমরা কোন উন্নতি কর্ত্তে পার্ব্ব না। আমাদের শক্তির আমাদের ধনের সে আধার হচ্চে আমাদের—মেয়েরা। আমাকে আজ বিশেষ করে তাদের কথা বলতে হচ্চে—আমার মায়ের পেটে জন্ম—কাজেই মাদের কথা না বলে ত পারছি না। এই স্ত্রীলোকদের জ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা নূতন দেশ গড়ে উঠছে; এক একটা দেশ একেবারে তেজঃপুঞ্জ হয়ে উঠছে; সিংহীর গর্ভে না হলে ত সিংহ জন্মে না। যারা দেশকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুলবে—আমরা তাদের রেখেছি অজ্ঞান অন্ধকারে। তারা জানে না কি করে গরু পালন কর্ত্তে হয়, তারা জানে না স্বাস্থ্যের নিয়ম, জানে না কি করে শব্জী ইত্যাদি কর্ত্তে হয়।

নিজ হাতে কাজ করা আমাদের দেশে একটা লজ্জার কথা। Mr. Fawcus I. C. S. সিরাজগঞ্জের সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁর পিতা Col. Fawcus ছেলের সঙ্গে এ দেশে এসে কিছুদিন তথায় ছিলেন। তিনি যখন বিলাতে ফিরে গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম "আমাদের দেশটা কেমন দেখে এলেন? তিনি বল্লেন "তোমাদের দেশটা ভারী চমৎকার, বড় বড় পাহাড়, সুন্দর নদী, সুন্দর দৃশ্য কিন্তু আমার তথায় থাকা পোষাল না তাই ছেড়ে এসেছি"। আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার পোষাল না কেন?" তিনি উত্তর দিলেন "বসে বসে রোগে ধরেছিল, চেষ্টা করে কোদাল পেলুম না যে একটু কাজ কর্ব্ব, একটা ঘাস কাটা কল ছিল তাই নিয়ে একটু চালাচ্ছি, এমন সময় মালী এসে সেটা আমার হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে গেল। বুঝতে পারলুম না যে ব্যাপারটা কি? পরে ছেলে বাড়ী এলে তার নিকট এর কারণ জান্তে চাইলুম। সে বল্লে এখানে যদি আপনি ঘাস ছটেন তবে লোকে মনে কর্ব্বে আপনি মালীর ছেলে—এদেশে এসেও সেই কাজই কচ্ছেন। কাজেই যে দেশে শরীর খাটানোকে ছোট লোকের কাজ বলে সে দেশে থাকতে পার্ল্লেম না।"

দেশের আর একটা অভাব হচ্ছে, দেশে আনন্দ বলে একটা জিনিষ নেই। নৃত্যগীত যা আছে সবই কুৎসিৎ, খারাপ বলে মনে করি—গান বাজনা কুৎসিৎ এতে একটা কদর্য্যভাব আসবে, এ অবস্থা কোন দেশে নেই। মানুষ যখন একটা গান করে তখন সে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছে এর চেয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার সহজ পথ খুব কম। এ যেন পাখাতে উড়ায়ে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। গানটাকে খারাপ লোকে করে; 'গানকে' 'ঘাটুতে' খারাপ করে, বাই নাচে খারাপ করে—তাই গানকে মনে করি এটা একটা জঘন্য জিনিষ। আমাদের দেশের গরু নাচে না, কেননা খাবার পায় না। বিলাতের গাই গুলি খুব লাফায় ও নাচে, কারণ তারা খুব খাবার পায়। সেখানে ছেলেরা নাচে বুড়োরাও নাচে। তাতে আনন্দ হয়, শরীরের শক্তি ও বাড়ে। খেলাও একটা নাচ। এতে Muscle এর উপর লিভারের উপর কাজ হয়, পিলে বাড়ে না, সালস', টনিক এসব খেতে হয় না; ডাক্তার সব দেশেই আছে—কিন্তু কেবল তার উপর নির্ভর কর্লে চলবে না, যাতে ব্যারাম না হ'তে পারে তা কর্ত্তে হবে। এ দেশে নাচটাকে খারাপ ভাবে দেখে; এজন্য যে একজন নাচছে আর সবে কদর্য্য ভাবে তাকে দেখ্‌ছে কিন্তু অন্যদেশে তা নয়—অন্যের নাচ কেউ দেখেনা, সে সব দেশে সবাই নিজেরা নাচে। ইউরোপ আমেরিকায় সবে নাচে তাতে 'ক্ষুধা বাড়ে, আর আনন্দ হয়। যাকে বলে Community singing বা folk singing এতে কদর্য্য ভাব আসে না। নিজেই গাবে, নিজেই নাচবে—সবাই নাচবে, মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে নাচবে, ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে নাচবে এতে আয়ু বাড়বে, শক্তি বাড়বে, আনন্দ হবে; আনন্দ উৎসবে সবকেই নাচা উচিত। এর কদর্য্য ভাব দুর করে নিতে হবে। সবাই আনন্দকে লক্ষ্য করে সংবদ্ধ হয়ে নাচতে হবে, তবে কোন দোষ থাকবেনা।

যদি বাঁচতে চয় তবে জীবনকে পূর্ণ কর্ত্তে হবে এসব ভাব দিয়ে। কবি, বাউল, নাগার্চ্চি এসব পূর্ব্বে আমাদের দেশে খুব ছিল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এসব গান কর্ত্তেন, রাজা বাদশা নবাব তাতে উৎসাহ দিতেন। কবি বাউল নাগার্চ্চির গান থিয়েটার গান হতে খুব ভাল। এসব জাগিয়ে তুলতে হবে, এসব শিখতে হবে। এসব দ্বারা জীবনকে সুন্দর করে নির্ম্মল আনন্দময় করে তুলতে হবে। নিজের দেশের এসব প্রাচীন সভ্যতার গান শিখে তা হতে উপদেশ লাভ কর্ত্তে হবে। এ সবের ভিতর এমন ভাব রয়েছে যা স্কুল কলেজের কোন পুস্তকে নাই। এসবকে জাগিয়ে তুললে আবার আমরা জাতীয় জীবনে নির্ম্মল আনন্দের সাড়া পাব।

অভিশপ্ত।

(বিংশ পরিচ্ছেদ)

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন)

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। বাদসা সাহেব আমিনার কারাকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং দৃষ্টি ঘুরাইতেই দেখিতে পাইলেন, আমিনা নীরবে একটী উন্মুক্ত গবাক্ষ-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার সুগৌর আননে, ক্ষোভ ও বিরক্তির একটা ম্লান ছায়া স্পষ্ট প্রতিভাত। তাহার ভাব সমুদ্রে কি তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল;—তাহা সেই জানে,···তবে তাহার মুখে চোখে একটা বিজাতীয় ক্রোধ বহ্নির পরিস্ফুট আভা যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল।

বাদসা সাহেব, সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার তীক্ষ্ণ ও কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টি, আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিলেন। কয়েক মুহুর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, দ্বিধা ও কুণ্ঠা বিরহিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন "আমিনা!"

আমিনা বাদসার আহ্বানে চমকিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি তাহার বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া, নৈরাশ্য ভীত ম্লান মুখে বাদশার প্রতি নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া দৃষ্টি আনত করিল। শেষে নিতান্ত সহজ ভাবে, পূর্ব্বের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইতে লাগিল।

বাদসা সাহেব আমিনার নির্লিপ্ত আচরণে অনেকটা অস্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিয়া, নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন "আমিনা! আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি, তুমি এখন আর বন্দী নও,—এখন তুমি স্বাধীন ও মুক্ত।"

শরীরের কোন স্থানে একটা কাঁটা ফুটিলে, যেমন খিচ্ খিচ্ করে বাদসার কথাগুলি যেন ঠিক তেমনি ভাবে তাহার প্রাণের ভিতর অস্বস্তি দিতে লাগিল। তাহার মর্ম্মে

যেন একটা বিষাক্ত তীরের আঘাতে, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে চাহিল। আমিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এবং পরিহাসের সহিত তীব্র কণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমিত আপনার নিকট মুক্তি ভিক্ষার প্রার্থী নই। মানুষের অন্তর চিরদিনই মুক্ত, বাহ্যিক বন্ধনের অসীম তাড়নে, তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না। আমি এই রুদ্ধ কারাকক্ষে বসে, আমার মনকে নিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছি। উন্মুক্ত চিন্তা তরঙ্গে,—আমার মন আলোড়িত হচ্ছে,- এর প্রতিরোধ করবার শক্তি আপনার আছে? আমি যে দিন আপনার অন্তরে প্রবেশ করেছি সে দিনই, আমি স্বইচ্ছায় বন্দী সেজেছি। খোদা যে দিন মুক্তি দিবেন, সে দিনই মুক্ত হব? আমাকে মুক্তি দিবার আপনি কে? তবে—কক্ষের বাইরে স্বাধীন ভাবে চলবার কথা বল্‌ছেন,—তা' স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ স্বাধীনতা কোন দিনই বাঞ্ছনীয় নয়,—তা'তে বিপদের আশঙ্কাই যথেষ্ট।"

বাদসা সাহেব প্রত্যুত্তরে ঈষৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, তখনই আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি সবেগে বলিলেন— সে রূপ কিছু বলার উদ্দেশ্য আমার নেই, তোমার অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় চলা ফেরার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে আমি এসেছি। আমিনা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি না বুঝে তোমাকে বন্দী করেছিলুম—তজ্জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত হয়েছি।"

বাদসার উক্তিতে আমিনার অন্তর অসীম উত্তেজনায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার আননে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভ্রুকুটিবদ্ধ নেত্রে,—বাদসার প্রতি তাকাইয়া বলিল" ক্ষমা! ক্ষমা করবার আমি কে বাদসা সাহেব? আমি বাঁদী,—তা'র বেশী কিছু নই। বাদসার যিনি বাদসা একমাত্র তিনিই—আপনার ক্ষমা কত্তে পারেন। একটা অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্দী করে, আপনি হয়ত, আত্মশক্তি স্ফুরণের পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন,—কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার এ সমস্ত তৎপরতা, আপনার কাপুরুষতারই পরিচায়ক।

বাদসা সাহেব আমিনার পরিহাসের তীক্ষ্ণ-বাণে এতটুকু বিচলিত হইলেন না। আমিনার স্থির, ধীর, গাম্ভীর্য্য ও অকুতোভয়তা তাঁহার চিত্তে যেন একটা বিস্ময়ের প্রলেপ লেপিয়া দিল। বাদসা সাহেব নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন" আমিনা! আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি। তুমি শত বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করলেও—আমি তোমাকে প্রীতির চক্ষেই দেখ্‌ব।"

আমিনা অবাক বিস্ময়ে বাদসার প্রতি তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—আমার প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করেছে? সে আবার কিসে সম্ভবপর হতে পারে? দৌলৎ আমার অনেকটা পরিচয় পেয়েছে। দৌলৎ বাদসাকে সব প্রকাশ করে দিয়েছে? না—তা' হতে পারে না। প্রকাশ্যে বলিল "বাদসা সাহেব আমি ক্ষুদ্র নারী, আশ্রয়হীন, আমার কি পরিচয় আপনি সংগ্রহ করেছেন?"

বাদসা সাহেব শান্ত ও সংযত স্বরে, কাজী সাহেবের উক্তির সা'র অংশ, সরল ভাবে বিবৃত করিয়া ফেলিলেন। হোসেনের সহিত মতিয়ার বিবাহ দিতে তিনি যে কৃতসংকল্প হয়েছেন, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

বাদসার উক্তিতে আমিনার শরীরে মধ্যে,—অকস্মাৎ যেন একটা আনন্দের শিহরণ, তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গেল। বিজয় পূর্ণ আনন্দের একটা উৎকট হর্ষচ্ছটায় আমিনার আশা হত মলিন মুখ,—সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা একটা গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে মৃদুমন্দ হাসির ছটায়, মরকত মণিপ্রভ আরক্ত অধর রঞ্জিত করিয়া, সকৌতুকে উত্তর করিল "বাদসা সাহেব। খোদার ইচ্ছায়—অসম্ভব ব্যাপারও, বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে,·· তিনি তাঁহার নিপুণ করস্পর্শে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অস্বস্তি ও অশান্তির অবসান করে দিলেন। আমার পরিচয় আপনি পেয়েছেন,—হয়ত এই আত্ম গোপনের প্রসঙ্গ নিয়ে আপনি আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বাদসা সাহেব! আজ আমার প্রাণে যে তৃপ্তির সঞ্চার হয়েছে, তাঁর তুলনা জগতে নেই। আমি যে মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নিজকে অসীম বিপদ সঙ্কুল পথে ফেলে দিয়েছিলুম,—তার পশ্চাতে গভীর স্নেহের স্ফুরণ ছাড়া আর কিছু ছিল না; আজ আমার তৎপরতা সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে দেখে, খোদাকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অবশান গ্রহণ কচ্ছি। আমি ক্ষুদ্র নারী, আপনাকে খুবই প্রতারণা করেছি,—তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, বাদসা সাহেব, আবেগ মথিত কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা" তুমি যা' করেছ, তাঁর তুলনা হয় না। তোমার বুদ্ধি ও কার্য্য তৎপরতার ফলে, আজ একটা অন্যায় অনুষ্ঠানের পথ হতে, আমি নিজকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। তুমি কৌশলে, গোপনে, সমস্ত বিষয় কাজী সাহেবকে না জানালে,—চারিটী প্রাণী একেবারে অশান্তি জালে আচ্ছন্ন হত। খোদার ইচ্ছায় সকল ঝঞ্ঝাট কেটে গেছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত কত্তে চাই।

আমিনা অঞ্জলিবদ্ধা থাকিয়া প্রসন্ন-স্মিত কণ্ঠে বলিল "খোদাবন্দ্! আমি পুরস্কৃত হবার মত কোন কাজ করিনি। ন্যায়ের পথে প্রাণপণে যুদ্ধ কর্ত্তে চেষ্টা করেছি। আমি বাল বিধবা, ভিখারিণী। ধন, দৌলৎ পুরস্কারের প্রার্থী আমি নই। খোদার নিকট প্রার্থনা করবেন, আমার অবশিষ্ট জীবন পরের কাজে যেন নিয়োজিত কত্তে পারি।"

বাদসা সাহেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "আমিনা! আমি পুরস্কার স্বরূপ কোন ধন, দৌলৎ দিতে আসিনি। আমার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-প্রণয়, তাই তোমাকে পুরস্কার দিব। তুমি আমার বেগম হয়ে আমাকে আজীবন তৃপ্ত কর।"

আমিনা বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া সহসা আসন ত্যাগ করিল এবং কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইল এবং বাদসার প্রতি তাচ্ছিল্য পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! আপনি ভুল বুঝেছেন।—আমি কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আপনাকে মিথ্যা প্রতারণা করেছি। বেগম হবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার অন্দরে প্রবেশ করি নি। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আমি এখন প্রত্যাবর্ত্তন কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। বেগম হবার ক্ষমতা আমার নেই,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্ভোগের অতুলনীয় চিত্র,—আমাকে মুগ্ধ কত্তে পারবেনা।"

বাদসা সাহেব বিস্ময়ভরে "বলিলেন" তুমি বাল বিধবা। পরের আশ্রয়ে, বাঁদীর মতই দিন গুজরাণ কচ্ছ। বেগম হবার সাধ তোমার হয় না? স্বামীর ঘর করবার ইচ্ছা কি তোমার অন্তরে স্থান পেতে চায় না? তুমি যুবতী—এবয়সে এমনি ভাবে, সর্ব্বত্যাগী হয়ে, শান্তির সন্ধান ত কোন দিনই পাবে না,—পদস্খলন অনিবার্য্য!"

বাদসার প্রেমোৎফুল্ল চিত্তের সাগ্রহ অভিনন্দনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া,—আমিনা সগর্ব্বে বলিল "আপনি ভুল বুঝেছেন। আমার স্বামী আছেন,—অন্ততঃ আমি একজনকে স্বামী নির্ব্বাচন করে, তাঁর ছবি অন্তরে অঙ্কিত করে রেখেছি। অতি শৈশবে বৈধব্য দশা ঘটেছে,—স্বামী যে কি তা' জান্‌বার মত অবস্থা আমার ছিল না। যৌবনে পদার্পণ করে,—ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত নিয়ে, যখন আজীবনের সাথী করবার মত লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তখন এক শুভ মুহূর্ত্তে আমার উপাস্য আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে তাঁর চরণে বিলিয়ে দিয়েছি,—আমি এখন তাঁরই! বেগম হবার অধিকার ত আমার নেই। সেই উপাস্য দেবতার কাজেই আমি আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম,—কার্য্য শেষ হয়ে গেছে,—এখন আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা কচ্ছি।"

বাদসা সাহেব একান্তই আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে, আমিনার আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত গম্ভীর মুখের প্রতি তাকাইয়া, নিতান্ত আহত চিত্তে, জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "কে সে ভাগ্যবান পুরুষ—আমিনা!"

আমিনা মাথা নত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বিবর্ণ মুখে ঈষৎ লজ্জার একটা আরক্ত আভা ক্ষীণ ধারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। আমিনা জড়িত কণ্ঠে বলিল "খোদাবন্দ! আমি হোসেন আলীর মা। ওস্তাদজীই আমার হৃদয় দেবতা।" বলিয়াই আমিনা দ্রুত পদ বিক্ষেপে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমিনা কয়েক মিনিটের মধ্যে মতিয়ার সহিত মিলিত হইল। মতিয়া হাস্যস্মিত মুখে আমিনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, তাহার বুকে মাথা গুঁজিল। শেষে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া, মতিয়া সহজ ও সরল ভঙ্গিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

আমিনা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল, এবং মতিয়ার মুখ খানা সাগ্রহে তুলিয়া, অজস্র চুম্বন ধারায় অভিষিক্ত করিল ঠিক এমনি সময়ে সাহাজাদা তথায় উপস্থিত হইয়া উদগ্রীব আগ্রহে বলিলেন "মতিয়া! বোন, দিদি আমার,—ইনি কে আমাদের, আমি ত কখনও এঁকে দেখিনি,—চিন্‌তে পারলুম না।"

মন্তিয়া একগাল হাসিয়া,—সাহাজাদাকে আমিনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিল। সাহাজাদা সসম্ভ্রমে আমিনাকে অভিবাদন করিয়া,—এক পার্শ্বে দাঁড়াইল।

আমিনা সাহাজাদাকে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া, ব্যস্ততার সহিত বলিল "সাহাজাদা! খোদা আমাদের করুণ-রোদন শুনে, সকল উদ্বেগের অবসান করে দিয়েছেন। আপনি যদি জান্‌তে চেষ্টা কত্তেন—ভালবাসার কতটুকুন উদ্বেলিতধারা বুকে করে, দৌলৎ আপনাকে আমরণ সাথী কত্তে চেয়েছিল, তা' হ'লে আপনি তা'কে, এমনি তাচ্ছিল্য-ভরে, তা'র বরণ-ডালা, প্রত্যাখ্যান কত্তে চাইতেন না! যা'ক্ সে কথা দৌলৎকে আপনি এ-শুভ সংবাদ জানিয়েছেন কি সাহাজাদা!"

প্রশ্ন শুনিয়া, অনুতাপের তীব্র তিরস্কার যেন, একগাছা কাঁটার চাবুকের মতই, কষাঘাতে, সাহাজাদার বুকের পাঁজর গুলি ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। সাহাজাদা মস্তক নত করিয়া বলিলেন "না,—মস্ত ভুল হয়ে গেছে।"

আমিনা গম্ভীর স্বরে বলিল "সাহাজাদা! আপনি এ মুহূর্ত্তেই দৌলতের কাছে যান্। তাঁর অশান্ত হৃদয়ে, শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে আসুন। দৌলতের মত পত্নী লাভ,—যা'র ভাগ্যে ঘটে, তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্।"

সাহাজাদা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, ত্বরিত পদে দৌলতের শয়ন কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কক্ষের দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। ভিতর হইতেই অর্গল বদ্ধ! সাহাজাদা কয়েকবার দৌলতকে ডাকিলেন, কোনই প্রত্যুত্তর পাইলেন না। একটা অসীম বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার শরীর দিয়া, একটা প্রবল কম্পন বহিতে লাগিল। তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র জড় করিয়া কপাটে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। উপর্য্যোপরি প্রচণ্ড আঘাতের ফলে, অর্গল ভাঙ্গিয়া দ্বার মুক্ত হইয়া গেল।

সাহাজাদা উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে, দৌলতের শয্যা পার্শ্বে যাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। শয্যার উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিতেই দেখিলেন,—তাঁহার বাঞ্ছিতা, সম্পদ স্বরূপা—মোহিনী নারী—দৌলৎ,—দলিত পুষ্প মাল্যের মতই মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ভ্রমর লাঞ্ছিত কৃষ্ণ কেশ পাশ, রুক্ষ ও অযত্ন শিথিল। তাহার চারু দেহ—ভূষণ মাত্র-হীন! তাহার অধরের স্বাভাবিক রক্তরাগ টুকু,—পাটল পুষ্পের মতই বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস, মৃদু মন্দ ভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল।

সাহাজাদা একেবারে উন্মত্ত অধীরের মতই শয্যায় যাইয়া বসিলেন,—এবং দৌলতের মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে সযত্নে রক্ষা করিয়া, অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিল।—সাহাজাদার নয়ন যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুক চিরিয়া, কণ্ঠ ঠেলিয়া, একটা অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ আপনাকে ছিট্‌কাইয়া, ফাটাইয়া দিবার জন্য, তাঁহার অন্তরটাকে, নির্দ্দয় ভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সাহাজাদা শয্যায় দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া দেখিলেন, দৌলতের লিখিত একখানা পত্র, সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সাহাজাদা হস্ত প্রসারণ করিয়া পত্রখানা তুলিয়া লইলেন। ব্যগ্রতাতিশয্যে পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন।

সাহাজাদা! প্রিয়তম,—

আত্ম-হত্যা মহাপাপ,......তা' জেনেও, আজ আমাকে তা'রি আশ্রয় নিতে হ'ল! আমার অন্তরে,—সে বিষয়ের ঝাঁঝ ছড়ান রয়েছে, তা'র সংঘাতে অতিষ্ঠ হয়েই, এমনি করে আজ বিদায় নিতে বসেছি।

প্রাণের অসহ্য দুঃখ জানাব বলেই,-সেদিন তোমার আশ্রয় নিয়েছিলুম,—তোমারই চরণে, নিতান্ত অসহায়ের মত লুটে পড়েছিলুম! তুমি ত আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! বিনিময়,—তোমার নিকট হ'তে পেলুম,—যা' স্বপ্নের অতীত ছিল,—সেই প্রত্যাখ্যান!...আর অপ্রত্যাশিত নির্ম্মম ভর্ৎসনা তুমিই জানিয়ে দিলে,—আমার মরণে তোমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই! সেই উক্তির প্রেরণায়,—আমি মরণ পথে ছুট্‌বার জন্য বিদ্রোহী হয়েছিলুম! তুমি মর্‌তে অনুমতি দিয়েছিলে, তোমার অনুমতি নিয়েই আজ মর্‌তে বসেছি,—দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন ত আমার নেই!

একদিন আগুনের হল্‌কা বুকে করে, সুদীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়ে দিয়েছি। মরণ বরণ কর্‌বার জন্য কি পথ খুঁজে বেড়িয়েছি,—কোনটাই মনঃপুত হয় নি। তুমি আমাকে না চাইলেও,—আমি তোমার আশা একেবারে ছেড়ে দিতে পারিনি, তাই তোমাকে ফেলে,—অচিন দেশে বিদায় নিতে এতদিন ইচ্ছা হয় নি! ভোরে যখন শুনলুম,—মন্তিয়ার সাথে আজই তোমার বিয়ে হবে, এবং আমার বিয়ে আগামী

কলা সম্পন্ন করাবে,—তখন আমি,—আমার শেষ ক্ষীণ আভা টুকু মন হতে মুছে ফেল্‌তে বাধ্য হলেম। তাই আজ বিষ সংগ্রহ করে,—আমার অস্তিত্ব লোপ কত্তে বসেছি!

আমি তোমার পরিত্যক্তা,—তুমি আমার কেউ নও,—একথা ভাব্‌তেও আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চাচ্ছিল,—তোমাকে ছেড়ে আর কেউকে পতি রূপে বরণ কত্তে হবে,—একথা চিন্তা কত্তেও,—আমার অন্তর, শতধা হয়ে ছিন্ন হতে চাচ্ছিল। যা কখনও ভাবিনি,—যা ঈপ্সিত নয়,—সে অবস্থা বরণ করে, কৃত্রিম অভিনয় কত্তে, যেটুকুন শক্তির প্রয়োজন, তাত আমার নেই! শৈশব হ'তে তোমাকেই চিনেছিলুম,—তোমাকেই চেয়েছিলুম,—তোমাকে পাবনা,... এত বড় অভিসম্পাত বরণ করার মত শক্তি সঞ্চয় করবার জন্ত প্রস্তুত ছিলুম না!

নারী সব ত্যাগ কত্তে পারে,—কিন্তু মনমাতানো পবিত্র ভালবাসার স্মৃতিটুকুন বিসর্জ্জন দিয়ে, আবার নূতন ভাবে মন গড়ে নিতে পারে না! যদি সেরূপ কত্তে চেষ্টা করে—তবে সে নিজে ত পুড়ে মরেই,—বিনা দোষে অপরকেও পুড়িয়ে মারে! এ ত তুমি বুঝ্‌লে না,—বুঝ্‌তেও চাইলেনা যদি কোন দিন,—এ অভাগিনীকে স্মরণ পরে,—একটা দীর্ঘশ্বাসও যদি তার জন্ত ফেল্‌তে চাও,—তবে মনে রেখো,—সে দীর্ঘশ্বাস টুকুনই—আশীর্ব্বাদরূপে,—আমাকে পরপারে শান্তি দিবে!

আজ মৃত্যুকণে বল্‌ছি,—তুমি আমারি ছিলে, আজ পর্য্যন্ত আমারি আছ,—আমার মৃত্যুর পরও—আমি তোমারি থাক্‌ব। তুমি আমারি, এ স্মৃতি নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি,—কাল, বিয়ের পরে, সে সৌভাগ্য হয়ত আমার ঘটে উঠ্‌বে না কাল হয়ত আমি অপরের হব.--তোমার ছায়াচিন্তা টুকুও ঘোর পাপ পঙ্কে ডুববার একটা অস্ত্র উপাদান আখ্যা দিয়ে'—নরকের দিকে টেনে নিতে চাইবে। তাই—আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে বিদায় নিতে চাইছি। অনেক লিখবার ছিল,—লিখবার শক্তি ত আর নেই,—সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, শত অপরাধ ভুলে,—আমাকে ক্ষমা করো,—তবে যাই।
এ জন্মের মত হতভাগিনী দৌলতন্নেছা বিদায়!

পত্র পাঠ করিয়া সাহাজাদা—একেবারে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দৌলতের মুখের উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অশ্রুর বাঁধ মুক্ত করিয়া দিলেন! শেষে অসীম অমঙ্গল চিন্তায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া, বালকের স্থায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্দরের প্রায় সকলেই আসিয়া, কক্ষ মধ্যে জড় হইল। প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, সকলেই অসীম অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। বাদসা সাহেব, "হেকিম" আনাইবার জন্ত লোক পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং দৌলতের শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। বেগম সাহেবা উন্মাদিনীর স্থায় ছুটিয়া আসিয়া, দৌলতের সংজ্ঞাহীন দেহ বক্ষে টানিয়া লইয়া,—অশ্রুজলে বক্ষসিক্ত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে, অন্দরের ছোট, বড় সকলেরই মুখে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

বঙ্গ সাহিত্যে বিপ্লব

(শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায়)

সমাজ বিপ্লব রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল বঙ্গ সাহিত্যে ও ভয়ানক বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলেই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, এ কথা যথার্থ হইলেও বিপ্লবের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। তীক্ষ্নদর্শী ও ক্ষমতাশালী নেতার অভাবে যে অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, তাহাকেও বিপ্লব সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান বিপ্লব এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বালক কালের কথা মনে হইতেছে—তখন বঙ্কিম চন্দ্র, হেম-নবীন, রমেশ চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বঙ্গবাণীর সেবার্চ্চনায় নিযুক্ত। সে দিক্‌পালগণ অতি সতর্ক দৃষ্টিতে মাতৃ মন্দিরের এক এক দিক্ রক্ষা করিতে ছিলেন—কোন অনধিকারী প্রবেশ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গন কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। সেটা বঙ্গদর্শনী যুগ। বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য সম্রাট। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা সম্মার্জ্জনী তখন সাহিত্য ক্ষেত্রকে সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিল। তখন সাহিত্যের আসরে নামিয়া দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাহাবায় সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিচিত হইবার যো ছিল না। সম্মার্জ্জনীপাণি

বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব জ্ঞানই অনেকের অসঙ্গত যশোলিপ্সাকে অঙ্কুরেই শুষ্ক করিয়া ফেলিত। তখন সাহিত্যের হাটে মালের অল্পতা থাকিলেও যাহা কিছু ছিল সুপরীক্ষিত খাটি জিনিষই ছিল। সেই জন্ম তখনকার সাহিত্য সেবীর সংখ্যা অঙ্গুলির পর্ব্বমালায় গণনা করা সম্ভবপর হইত এবং তাঁহাদিগকে চিনিবার ও বাছাই করিবার সুযোগ ঘটিত।

অধুনা বর্ষাকালের "বেঙের ছাতার" মত চারিদিকে প্রতি নিয়ত শত শত সাহিত্য সেবী গজাইয়া উঠিতেছে; অধুনা নগরে নগরে পত্র পত্রিকার সমাবেশ, গ্রামে গ্রামে ঐতিহাসিক, পল্লীতে পল্লীতে কবি, ঘরে ঘরে ঔপন্যাসিক। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিনিয়ত রাশি রাশি গ্রন্থ প্রসব করিয়াও প্রসব বেদনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। উৎপাদিকা হিসাবে বঙ্গজননী পরম সৌভাগ্যশালিনী সন্দেহ নাই। কিন্তু সংখ্যার আধিক্য বা তাহার অল্পতা সর্ব্বত্র উন্নতি বা অবনতির নিয়ামক নহে। শত পুত্রের জনক কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তি-মাদ্রী সমধিক সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

আধুনিক বঙ্গে খাটি সাহিত্যসেবী ও সৎগ্রন্থের অত্যন্ত অভাব, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় সত্য; কিন্তু পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভিতর হইতে আসল জিনিষ উদ্ধার করা কি সহজ কথা এবং সকলের পক্ষে সম্ভবপর? অপদ্রব্যে চটক বেশী এবং তাহার বিজ্ঞাপন সর্ব্বত্রই জাঁকাল। বাজারের ফটক পার হইলেই ডাকাডাকি, হাঁকা হাঁকি, লাফা লাফিতে তাক্ লাগিয়া যায়। ডাকে হাঁকে গ্রাহক জোটে। লাফা লাফিতে অন্যের উচ্চতার উপর দিয়া আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে। ফলে ঘটিয়াছে এই, কাঞ্চনের আদর নাই, কাঁচে বাঙ্গালার বাজার ছাইয়া গিয়াছে।

সুধিগণ বলিয়া থাকেন সাহিত্যে জাতীয়তা পরিস্ফুট হয় কোন একটা জাতিকে জানিতে হইলে, তাহার সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে জানিতে হয়। আমরা উল্লিখিত সিদ্ধান্তানুসারে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতিটাকে চিনিবার প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে গল্পোপন্যাস এবং কবিতার কথাই বলিতে হয়। কারণ আজ কালকার সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে উপন্যাস এবং কবিতার ভিতর দিয়াই বাঁচিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণ আমরা উপর্য্যুক্ত দুইটি সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মানুষের মনের উপরে গল্পোপন্যাসের প্রভাব অসাধারণ। শিশু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরমা'র রূপকথা শুনিতে ভালবাসে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মার প্রাচীন ঝুলিতে আর তার তেমন মন বসে না। আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উচ্চ স্তরে উঠিয়া যায় নূতন বিচিত্র অথচ সম্ভাব্য ঘটনার কাহিনী শুনিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হয়। মানুষের ধর্ম্মই জাতির ধর্ম্ম। মানুষের সমষ্টি নিয়াই ত জাতি। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতি যখন জন্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানটুকু পৌরাণিক উপাখ্যান—বেনু-ধেনু, চূড়া-বাঁশী, কালিন্দী-কদম্ব, বস্ত্রহরণ, অভিসার এবং আদিরসাত্মক কবি কাহিনী—রূপতৃষ্ণা, গুপ্তপ্রণয়, সখী, সুড়ঙ্গ চোর কোটাল প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাইয়াই তৃপ্ত হইল। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিটা শুধু প্রাচীন দেবলীলা ও মানব-লীলার উৎকট কাহিনী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহার ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা বাণীর মন্দির দ্বারে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন বঙ্গবাণীর প্রিয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশ নন্দিনী" হাতে লইয়া বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে কোকিল কূজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, ফুলের সুবাসে, মলয় সমীরণ, বাঙ্গালা সাহিত্যে বসন্তের মধুর আগমনী বাজিয়া উঠিল। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। প্রকৃত পক্ষে সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসের প্রথম সৃষ্টি।

বলিয়াছি মানুষের মনের উপরে উপন্যাসের প্রভাব অসাধারণ। মানব চরিত্রেই উপন্যাসের প্রধান উপাদান। বাস্তবতার মধ্যেই উহার প্রাণ। বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যেই উহার সৌন্দর্য্য। লিপিকুশল শিল্পি উপন্যাসের প্রধান প্রধান চিত্রগুলির অঙ্গে অঙ্গে এমনি একটা সম্মোহন শক্তি পুরিয়া রাখেন যে মানুষ সহজেই তদ্দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পড়ে, এবং তাহারই ইঙ্গিতে সে আপনার যাত্রাপথ নির্ণয় করিয়া লয়। সুতরাং একটা জাতিকে সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য কিরূপ উপন্যাসের প্রয়োজন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, মধুকর বিভিন্ন ফুলের মধু

আহরণ করিয়া যেমন মধুক্রম রচনা করে, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ তেমনি বিভিন্ন মানব চরিত্র হইতে সার সত্য টুকু উদ্ধার করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মানবাত্মার পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করেন। ঐরূপ সুরচিত মধু চক্রে মানবাত্মা যুগ যুগান্ত কাল 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ঔপন্যাসিকগণের দৃষ্টি একটু দূরগামিনী ছিল। তাঁহারা সুধু লোকালয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। লোকালয়ের বাহিরে কাননে কান্তারে মনুষ্য সমাজের যে একটা বিশিষ্ট ও গরীষ্ট অংশ বর্ত্তমান, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইতেন না। গিরি কাননের সহিত লোকালয়ের যোগ বন্ধন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বৈষয়িক জ্ঞানের সংমিশ্রন, তাঁহারা মানব জাতির পক্ষে অতি কল্যাণকর মনে করিতেন। একটা জাতি গড়ার পক্ষে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আছে কিনা জানি না। তবে দুচারখানা গ্রন্থে যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, এমন কথা বলা চলে না। ভালমন্দ সকল সময়েই আছে এবং থাকিবেই সংখ্যার আধিক্য এবং প্রাধান্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ প্রাচীনদের মত ততটা পরিশ্রমের আবশ্যকতা স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সুধু লোকালয়ের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি সুলক্ষনা হইলে আমাদের অভিযোগের বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। আজ তাঁহাদের কলুষিত দৃষ্টি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাঁরা ব্রীড়াসঙ্কুচিত অন্তঃপুর চারিনিগণকে নিতান্ত কুৎসিত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। সাহিত্যে এ হেন দুঃশাসনী নীতির সাদর সম্বর্দ্ধনা বাঙ্গালীর জাতীয়তার ইতিহাসকে নিতান্তই কলঙ্ক মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। সুধু কতক গুলি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তরুণ সাহিত্যিকের স্বৈরচারিতা আমাদিগকে ক্ষুব্ধ বা ভীত করিতে পারিত না। আজকালকার কোন কোন মাসিক সাহিত্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গল্পোপন্যাস প্রচার এবং রমণীর সযত্ন লুক্কাইত বক্ষের নগ্ন চিত্র প্রকাশ অতি প্রশংসনীয় কার্য্য মনে করিতেছেন শুনিতে পাই ইহাই নাকি এ যুগে মাসিক সাহিত্যের জীবন রক্ষার এবং বিপুল প্রচারের সুচিন্তিত অথচ অব্যর্থ কৌশল।

সত্যই কি বাঙ্গালীর আজ এত দূর অধঃপতন? কিছু কাল পূর্ব্বে মার্জ্জিতঃরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বিদ্যাসুন্দর' অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া ভারতচন্দ্রকে সাহিত্যের দরবার হইতে গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নয়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বামী স্ত্রীর প্রণয় সম্ভাষণ কাহিনী, বিবৃত করিতে যাইয়া বৃদ্ধ কালের অসাবধানতা প্রযুক্ত উহার সুখসমাপ্তি 'চুম্বন' কথাটী জিহ্বাগ্রে আসিবা মাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া শঙ্কাকুল চিত্তে বলিয়াছিলেন—'মার্জ্জিত রুচি নবীন পাঠক হয়ত এইখানে বই পড়া বন্ধ করিবেন। আর আজ সেই বাঙ্গালী রমণীর লজ্জাকর অশ্লীল চিত্র কাহিনী নির্জ্জন অবসর বিনোদনের প্রধান সহচর রূপে গ্রহণ করিতেছেন ভাবিয়া, আমরা বড়ই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। হায়! নেতৃহীন বাঙ্গালা সাহিত্য আজ তোমার বক্ষের উপর পৈশাচিক লীলাভিনয় দর্শন করিয়া, আমরা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।

আমরা এক্ষণে কবিতা সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিতা প্রসঙ্গে পদ্য সাহিত্যই আমাদের আলোচ্য বিষয় ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'মেঘনাদ বধ' 'বৃত্র সংহার' অথবা 'পলাশীর যুদ্ধের' ন্যায় কাব্যগ্রন্থের অত্যন্তাভাব বলিয়া আমরা দুঃখ প্রকাশ করিব না। কারণ প্রতিভা বিধাতার বিশেষ দান। উহা সকল সময়ে এবং সকল ব্যক্তিতে সমপরিমাণে বিতরিত হয় না। আধুনিক কবিতায় সিংহধ্বনি নাই। বীণার উচ্চ ঝঙ্কার নাই—আছে সুধু মধুকরের মৃদু আলাপন তাহাও না হয় কান পাতিয়া শুনিয়া কোন প্রকারে রস ভোগ করিলাম। কিন্তু যাহাতে কবিতার পদ্যত্ব—সেই ছন্দের সুপ্রণালী বদ্ধ বাঁধন ও শব্দাক্ষরে সুচারু বিন্যাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন আমরা অনুদ্বেগ চিত্তে সহ্য করিতে পারিতেছি না। বেদমন্ত্র যেমন গেয় এবং তাহা যথাযথ সুরতানে ধ্বনিত না হইলে জাগ্রত হয় না। তেমনি পদ্য ও গীতিকা বই আর কিছুই নয়; ছন্দোবন্ধন দোষে উহাতে সুর যোজনার ব্যাঘাত ঘটিলে নিতান্তই প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কেহ দেবতার ধ্যানগত মূর্ত্তি গড়িতে যাইয়া

অক্ষমতা প্রযুক্ত যদি বানর মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে এবং বলে কজে তাহারই পূজার্চ্চনা চালাইবার প্রয়াস পায় তাহাকে যেমন ধর্ম্ম দ্রোহী বলা যাইতে পারে, তেমনি যাহারা প্রাচীন প্রণালী বদ্ধ ও সুচিন্তিত নীতির অনুসরণ কষ্ট সাধ্য বিবেচনা করিয়া সাহিত্যে যথেচ্ছাচারিতা ঢুকাইয়া দিতে সমুৎসুক হয়, তাহারা তরুণ দলের জয় ধ্বনিতে সম্বর্দ্ধিত হইলেও আমরা তাহাদিগকে সাহিত্য দ্রোহী বলিয়া অভিহিত করিব।

এই শ্রেণীর লেখকগণ মনে করেন—'ব্যাকরণ' আবার কে, সেত আমার অনুচর। ছন্দোবন্ধনে আত্মসমর্পণ করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন। এত মাপিয়া জোখিয়া চরণ রচনারই বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু বিশেষ সতর্কতা নিতে হইবে পদের অন্তে, যেখানে মিলনের সুর বাজিবে। ইহারা আবার যুক্তবর্ণাত্মক শব্দ ব্যবহারের খুব পক্ষপাতী—ইহাতে নাকি পদ্যের গৌরব বাড়ে! এই শ্রেণীর জনৈক কবির একটি কবিতার সমালোচনা উপলক্ষে এ যুগেরই নির্ভীক সমালোচক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র 'সমাজ পতি' ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়া ছিলেন :—

"আমি—এমনি করিয়া লিখিব কবিতা
জড় করি সুধু শব্দ,
কালী ও কাগজ খরচ করিয়া
পাঠক করিব জব্দ।"

বস্তুতঃই এই রূপ জবরদস্ত কবিদের দন্তভাঙ্গা কবিতার স্বাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া আমাদের মত প্রাচীনের দলকে জব্দই হইতে হয়।

কেহ কেহ তরুণ কবি সম্প্রদায়কে সমর্থন করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন—'ছন্দের বেড়া ঘেরা নিয়ম কণ্টকিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবিতার তেমন খেলিবার সুবিধা হয় না। তদুত্তরে আমরা বলিব যাহাদের কবিতা সুন্দরী পদ্যের সীমাবদ্ধ বন্ধুর ভূমিতে ঢুকিতে ভীতা ও সঙ্কুচিতা তাহাদের পক্ষে গদ্যের সমতল ক্ষেত্রাবলম্বনই শ্রেয়।

অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু শুনিবে কে? আর মানিবেই বা কে? জোর যার মুলুক তার'। আজ যে যত পুরু করিয়া দল গড়িতে পারিতেছে, সে তত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতেছে। নব্য দল সাহিত্যের এক একটা দিক এমনি ভাবে ঘেরিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাদিগকে স্থান চ্যুত করা সহজ কথা নয়। হটাইতে গেলে হটিয়া আসিতে হইবে। সেদিন সৌরভ পত্রে জনৈক মহিলা সত্যই লিখিয়াছিলেন—'চরিত্র হীন উচ্ছৃঙ্খল লেখকগণের মোসাহেবের দল এত পুরু যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।' একটা কথা আছে যে যত বেগে উঠে, সে তত বেগেই পড়ে। বাঙ্গালা সাহিত্য খুব বেগেই উঠিয়াছিল, আবার তত বেগেই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে মাসিক পত্র গুলি সাহিত্যের রক্ষক ও পরিচালক, উপযুক্ত নেতার অভাবে তন্মধ্যে অনেকেই আজ অরক্ষিত। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে তথা কথিত সাহিত্যিকগণ অশ্লীল গল্পোপন্যাস ও অসার গীতিকা, কথিকা সাহিত্যে ঢুকাইয়া দিয়া আপনাদিগকে অসাধারণ সাহিত্য সেবী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন। ইহাদের অনাহুত আস্পর্দ্ধা ও সাহস ক্রমশঃ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, উহারা আজ কালের 'খোকা খুকির' জন্যও সাহিত্যের দরবারে স্থান প্রাপ্তির দাবী উপস্থিত করিতেছেন! হায়! বঙ্কিমচন্দ্র তুমি আজ কোথায়?

আবার সেই মহিলার কথাই বলিতে হইল। তিনি ক্ষোভে রোষে লিখিয়াছেন—'আমরা + পূতিগন্ধ ময় দুষ্ট আবর্জ্জনা ঝাটাইয়া সাহিত্য মন্দির পবিত্র করিবার পক্ষপাতী উচ্চ প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলি আমরাও উহার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা ঝাঁটা চালাইতে নিতান্ত অনভ্যস্ত অসমর্থ। মা লক্ষ্মীরা উহা তোমাদের হাতেই খুলিবে এবং খেলিবে ভাল। একবার প্রকৃত মূর্ত্তিমতী হইয়া ঝাঁটা প্রহরণ হস্তে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াও, কে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারে? রোগ যেমন গুরুতর ঔষধ তেমনি উগ্র বীর্য্য হওয়া চাই, নতুবা ফল দর্শিবে কেন?

তাই আবার বলি জগদম্বাগণ ঝাঁটাও। তোমাদের ঝাঁটার মুখে সাহিত্য মন্দির আবর্জ্জনা মুক্ত হইয়া পবিত্র হউক। আর অসমর্থ আমরা অহিংস অসহযোগিতা ও অস্পৃশ্যতা অবলম্বনে গর্ব্বোৎফুল্ল সাহিত্য সফরীদল হইতে দূরে রহিয়া যুগাবতারের আবির্ভাব কামনায় ধ্যানমগ্ন হই।

নারীর কর্ত্তব্য

(শ্রীপঙ্কজলতা দেবী চৌধুরাণী)

আজকাল মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই শুনছি। তাদের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে তাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলে পারছিনা! আমি ও নারী; তাই আজ নারীদের এতদূর অবনতি দেখে লজ্জায় মাথা আপনা হতেই নুয়ে পরছে। মেয়েরা মনে করছেন "আমরা এখন আলোক প্রাপ্তা হয়েছি"। কিন্তু সে আলোক পাওয়া যে কাকে বলে সেটাই বুঝ্‌ছিনা। পুরুষ আর নারীর জ্ঞানে ও শিক্ষায় সমান অধিকার একথা সত্য; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে নারীতো নারীই। ধৈর্য্য, সংযম, নম্রতা লজ্জাশীলতা এই সব হচ্ছে রমণীর ভূষণ। কিন্তু পুরুষ এসব গুণ পাবে কোথায়? তারা কঠোর কর্ম্মী এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম কর্ত্তে হয়। তাই এগুণ গুলি তাদের নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল মেয়েদের মুখে খুব স্বাধীনতার কথা শুনা যায়। পুরুষদের সঙ্গে অতটা মেশামেশী করা, বাইরে বেড়ানো, সর্ব্ব সমক্ষে থিয়েটার করা এরূপ নেচে বেড়ানোর নাম কি নারী স্বাধীনতা? এতে নারীদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্ অমঙ্গল হচ্ছে বেশী। কারণ তথাকথিত শিক্ষিতা নারীরা এত বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ভেসে যাচ্ছে যে তাদের কিছুমাত্র সংযম আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশে নারী অন্তঃপুরচারিনী দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রেম প্রীতি ও পবিত্রতা এই সব হচ্ছে নারীর শ্রেষ্ঠ উপাদান। পুরুষেরা যখন সংসারে কঠোর কর্ম্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের কর্ম্মে প্রেরণা দিবে নারী। যে সংসারে নারী পুরুষ ভাবাপন্ন হয়, সে সংসার শ্মশান তুল্য। কেননা শুধু কঠোরতা কিছুরই পরিপোষণ করিতে পারে না!

আমাদের দেশে অনেক মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করে গেছেন। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরনীয়া নারীগণ বিশেষ বিদুষী ছিলেন। বেদে, উপনিষদে পুরাণে, সংহিতায় সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিদুষী নারীর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে দিনের কথা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাটিগণিত ও লীলাবতী নামক গ্রন্থ রচনা করে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন। অদ্বিতীয় বৈদিক কর্ম্মবীর পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বদা বিচারে সাহায্য করিতেন। মিহিরের পত্নী খনাদেবী যে কিরূপ বিদুষী ছিলেন তাহা হিন্দু মাত্রই জানেন। তাঁহাদের তো কোন দিন কোন উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনা যায় নাই। প্রকৃত জ্ঞান হল শিক্ষার মূল। জুতা পরে বাইরে বেরুলেই শিক্ষিতা হল না যেমন সূর্য্যের আলোক চারদিক উদ্ভাসিত করে সেইরূপ জ্ঞানের আলোকও মানব হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। পুরুষের পুরুষত্ব আর নারীর নারীত্ব না থাকিলে, সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এতে আর সন্দেহ কি! পুরুষদের সঙ্গে মেয়ে এত মেশামেশী করলে তাদের যৌবনের ক্ষুধা বাড়বে বই কমবে না। কেননা এখনকার পুরুষরাতো আর কেহ ঋষিকুল্য নয়। তাদের সংযমের বাঁধই বা কতটুকু! তাই মহাজন বলছেন:—

ঘৃতকুম্ভসমা নারী
তপ্ত অঙ্গারসমঃ পুরুষঃ।

অনেকে বলেন নারী পুরুষের দাসী। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। দাসী কেন হবে? নারী পুরুষের সহধর্ম্মিনী, সঙ্গিনী সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহদায়িনী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা। মেয়েরা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই সুখী নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে দিতে না পারলে সুখী হওয়া যায় না। পুরুষ কঠোর, আর নারী কোমলা ও ভাবপ্রবণা। তাদের ধর্ম্মই হচ্ছে সেবা, সন্তান পালন, পরোপকার ও সহিষ্ণুতা। এই গুণগুলি প্রত্যেক রমণীর থাকা দরকার। যার নেই সে সংসারে সুখী হতে পারে না। অদৃষ্ট তৈরী করেন ঈশ্বর আর স্বভাব তৈরী করে মানুষ নিজে। নিজেদের দুঃখ অনেকে নিজেরাই তৈরী করে, অগাধ সলিলে ডুবে মরে।

আমাদের দেশেও মহীয়সী নারীর অভাব নেই। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সব রমণীর উচিত। সংযমহীন ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের দেশ উচ্ছন্ন গেল। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে নগ্নরূপ দেখিয়ে পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করা। কিন্তু আমাদের দেশেত সে দৃষ্টান্ত নাই। এযে ব্রহ্মচর্য্যের দেশ; যে দেশ নারীর সতীত্বে চির গৌরবান্বিত। হায় যে দেশে নারী স্বেচ্ছায় হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতেন সে দেশের কি এই পরিণাম!

শ্রদ্ধেয়া অনুরূপাদেবীর গ্রন্থ পড়ে দেখবেন কোথাও একটু অশ্লীলতা পাবেন না। তিনিও ত বর্ত্তমান যুগের মেয়ে। আজকাল দেশের ও সমাজের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের জাগা বিশেষ প্রয়োজন। তবে এ ভাবে না জেগে, প্রকৃত জ্ঞানের দিক্ দিয়ে জাগ্‌লে সমাজের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

সভ্যতার বিকাশ

(শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,)

আমাকেই যদি জীবনের সত্য অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, অধ্যাত্ম আত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অখণ্ড পূর্ণতা লাভই যদি আমাদের আত্মবিকাশের উত্তম রহস্য বলিয়া স্বীকার করি, তবে এ কথাও ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে হয় যে আমাদের অস্তিত্বের উন্নততর একটি স্তর আছে ও তদুপযোগী শক্তি সমূহও তথায় রহিয়াছে। আত্মার সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত গুণাবলী, অধ্যাত্ম ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান—যাহা বিচারবুদ্ধি ও মনোবল অপেক্ষা অনেক বড় সেই স্তরেই বিদ্যমান। আর এই স্তরে গিয়াই মানব সন্তানে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধি বৃত্তির নীচেকার অন্ধসংস্কারপূর্ণ সত্বা কখনই এই সুমহৎ লক্ষ্যে মানুষকে উপনীত করিতে পারে না। বিচারবুদ্ধির আলো ও শক্তিও এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে আত্ম পরিপূর্ণতা অর্থে আমরা বুঝিতেছি আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবানের অখণ্ড আত্মপ্রসারণ, আমাদের ব্যক্তিগত সত্বার ও সমষ্টিগত জীবনে। একথা যদি ভুলিয়া যাই তবে আমরা আবার প্রাচীন আদর্শেই ফিরিয়া যাইব; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন যে আদর্শ ছিল তাহা মহৎ সন্দেহ নাই কিন্তু পূর্ণতার সকল লক্ষণ তাহাতে পাইনা। আধ্যাত্মিক শ্রেণীমূলক সমাজই প্রাচীন আদর্শ সমাজ। একটি ধারণার উপর এই সমাজের পত্তন হইয়াছিল। সে ধারণা হইতেছে এই যে প্রতি মানুষেরই একটি বিশিষ্ট স্বভাব আছে, তাহা দিব্য প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদান হইতে উদ্ভূত; সেই বিশিষ্ট উপাদানকেই তাহা প্রতিফলিত করে। তাহার চরিত্র, তাহার নৈতিক আদর্শ, তাহার শিক্ষা, সামাজিক কর্ত্তব্য ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সমূহ সেই বিশিষ্ট উপাদান অনুযায়ী গঠিত হইতে বাধ্য; তাহার পক্ষে যে পূর্ণতা আমরা বাঞ্ছা করিব, সে পূর্ণতাও ঐ বিশিষ্ট উপাদানেরই নিয়মাধীন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যদিচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে theoryর ব্যতিক্রম আমরা সর্ব্বত্র যেমন, এখানেও তেমনই দেখিতে পাই। এই মতবাদ মানব সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভাগ অনুযায়ী গঠিত করিয়াছিল। আধ্যাত্মিক ও ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ হইতেছে ব্রাহ্মণ, দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন শক্তিমান্ মানুষ হইতেছে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ অর্থ ব্যবহার কুশল ও ভোগী আর শূদ্র স্থূল মাটীর সহিতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে সমগ্র সমাজ সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতার (ব্রহ্মার) একটি সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ। শ্রেণীগত সমাজের অনুরূপ বিভাগও বেশ সম্ভবপর কিন্তু ব্যবস্থা ও বিভাগ যেরূপই হউক, জাতিত্বও আদর্শ মানবসমাজের জন্য নহে। এমন কি হিন্দু ধারণা অনুযায়ীও একথা সত্য যে মানুষের উন্নততম অথবা নিম্নতম সম্ভাবনার যুগে শ্রেণীভেদের স্থান থাকে না। মানুষের আদর্শ যুগ যাহাকে আমরা সত্য যুগ বা কৃত যুগ বলি পূর্ণাঙ্গ সত্য যে যুগে বিরাজমান—মানুষ যে যুগে তাহার দিব্য সম্ভাবনার উন্নত ও গভীর উপলব্ধিতে বাস করে, শ্রেণীবদ্ধ সেই যুগের সত্য নহে। আবার কলিযুগে মানুষ যখন বাসনা, আবেগ ও সংস্কারপূর্ণ জীবনে নিজেকে হারাইয়া ফেলে ও বুদ্ধিবৃত্তিকেও এই অধঃপতিত জীবনেরই সেবায় নিযুক্ত করে, তখনও জাতির অস্তিত্ব আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। যুগচক্রের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতেই ভেদ-প্রতিষ্ঠ সমাজের যথার্থ স্থান। এই সময়ে মানুষ তাহার স্বধর্ম্মের কতক অসম্পূর্ণ রূপ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ত্রেতা যুগে এই চেষ্টাটা চলে ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া, আর দ্বাপর যুগে আইনকানুন বিধিব্যবস্থা ও বাঁধা রীতিনীতির প্রচলনে। বিষ্ণুকে তাই ত্রেতায় রাজা বলা হইয়াছে, কিন্তু দ্বাপরে তিনি জ্ঞান ও রীতিসমূহ সংহিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ণ মানুষ কখনও বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ ছাঁচে গঠিত হইতে পারে না। তার কর্ম্মপ্রকৃতির প্রধান অংশটিকে

স্থির নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ও একমাত্র সেই অংশটির উপরই ঝোঁক দিয়া আমরা তাহাকে কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলি কিন্তু প্রতি মানুষের মধ্যেই তাহার সমগ্র দিব্য সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে! শূদ্রকে তাই তার শূদ্রত্বের মধ্যে শক্ত করিয়া বাঁধা যায় না। ব্রাহ্মণও তার ব্রাহ্মণ্যের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নহে। পরন্তু প্রত্যেকেই তার গভীরতর চেতনায় দিব্য মানবতার অপরাপর উপাদান সমূহ ধারণ করিয়া আছে। ঐ গুলিরও দিব্য সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য কলিযুগে এই সকল উপাদান একটা অন্ধ অনিয়মের মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে ও আমাদের সত্তার মাঝে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া নব শৃঙ্খলা-লাভের সকল বিশৃঙ্খল প্রয়াসই ব্যর্থ করিয়া দেয়। মধ্যবর্ত্তী যুগের নিয়ম শৃঙ্খলা একটি অসম্পূর্ণ আদর্শেরই আশ্রয় নিয়া টিকিয়া থাকে—তখন কতকগুলি গুণের উৎকর্ষের জন্য অপর গুণগুলি দাবাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যযুগের ধর্ম্ম হইতেছে আমাদের সত্তার সমগ্র সত্যের এক সুবৃহৎ বিকাশ। একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ দিব্য সামঞ্জস্যের উপলব্ধি এই বিকাশের উপায়। যুগাবর্ত্তের ক্রম প্রসারণের মধ্য দিয়া মানুষের সাধ্য অনুসারে যতটা সম্ভব, তাহার অধ্যাত্ম সত্তার স্বভাবসিদ্ধ আলো, জ্ঞান, শক্তি ও দিব্য গুণাবলীর ক্রম বিকাশের উপরেই ইহা নির্ভর করে।

পুস্তক পরিচয়

কানন কাহিনী—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন লিখিত। দাম ১।০ সিকা। প্রাপ্তিস্থান ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স ঢাকা ও ময়মনসিংহ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইত্যাদি।

আমরা এই বইখানা পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি জাগাইবার সহায়ক কথা বা কাহিনী আমাদের সাহিত্যে বিরল। এই দৈন্য দূর করিবার পক্ষে এই জাতীয় বইয়ের বহুল প্রচার আবশ্যক। বইখানিতে অনাবশ্যক অসম্ভাবিতার আশ্রয় নেওয়া হয় নাই, কোন প্রকার কুরুচির নিদর্শনও ইহাতে নাই। আমরা প্রত্যেক বালক-বালিকার হাতে এই বই দেখিলে সুখী হইব। বইখানির বহিঃসৌষ্ঠব ও উত্তম এবং অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে ইহা আরও মনোরম হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় সৌরভের পাঠকবর্গ একখানি চিত্রের নমুনা দেখিতে পাইবেন।

জগন্মাতা—মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান রায় চৌধুরী এণ্ড কোং ১৩৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দি ওর্য়াল্ড মাদার নামক ইংরাজী পত্রিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা হইতে শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুদিত। এই পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ 'নিমতা সমবায় মাতৃসমিতি লিমিটেডের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া যাহাতে প্রত্যেক নারী পূর্ণমাতৃত্বের অধিকারিণী হওয়ার জন্য সচেষ্টা হন তাহাই এই পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু বক্তব্য বিষয়টা অনেকাংশেই দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে।

শোক সংবাদ

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'সিরাজুদ্দৌলা' গ্রন্থ প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আর ইহ জগতে নাই। গত ২৭শে মাঘ সোমবার প্রাতে রাজসাহী নিজ বাসায় পরলোক গমন করিয়াছেন। অক্ষয় কুমার ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বাধীন ভাবে ঐতিহাসিক আলোচনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ঐতিহাসিক বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া বিরাজ করিবে। দীঘা পাতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায়ের সাহায্যে তিনি যে বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বারেন্দ্র ভূমির লুপ্ত ঐতিহাসিক বিভব বহুল পরিমাণে উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী অথচ তাহাতে মাধুর্য্যের অভাব নাই। তাহার সম্পাদিত "গৌড়রাজ মালা" ও গৌড়লেখ মালা " ভাষার সম্পদ। অক্ষয় কুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন সে সম্পদ চিরকাল বাঙ্গালী স্মরণ করিবে। আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।